আন্তন চেখভ

গল্প ও ছোটো উপন্যাস

শিল্পী হিসেবে চেখভের তুলনা নেই। বাস্তবিকই তাই — তুলনাহীন! জীবন-শিল্পী তিনি। তাঁর বইগুলির গুণ — শুধু প্রত্যেক রুশীর কাছে নয় প্রত্যেক মানুষের কাছেই সেগুলি বোধগম্য এবং সগোত্রজ ...

লেভ তলস্তয়

রাশিয়া বহুকাল তাঁকে মনে রাখবে এবং জীবনকে বুঝতে শেখার জন্য বহুকাল তাঁর রচনা পড়বে। তাঁর রচনা স্নেহশীল হৃদয়ের বিষণ্ণ হাসিতে উদ্ভাসিত, তাঁর গল্পে সর্বত্রই জীবন সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান পরিব্যাপ্ত ...

স্টাইলের দিক থেকে চেখভকে কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিককে রুশ ভাষার ক্রমবিকাশের কথা আলোচনা করার সময় বলতেই হবে যে এই ভাষা পুশকিন, তুর্গেনেভ এবং চেখভের সৃষ্টি।

মাক্সিম গোর্কি

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যত আশাবাদীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে আন্তন চেখভ তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রাশিয়ার সামনে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উন্মোচিত হবে তার বর্ণনা করার সময় সর্বদাই তিনি প্রফুল্ল ও সজীব হয়ে উঠতেন। সেই ভবিষ্যতের প্রতি ছিল তাঁর দৃঢ় আস্থা। বর্তমানের বর্ণনা করতেন মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে, সত্য থেকে কখনো বিচ্যুত হতেন না।

ক. স. স্তানিস্লাভস্কি

А. Чехов

আন্তন চেখভ * গল্প ও ছোটো উপন্যাস

А. П. ЧЕХОВ

ПОВЕСТИ и РАССКАЗЫ

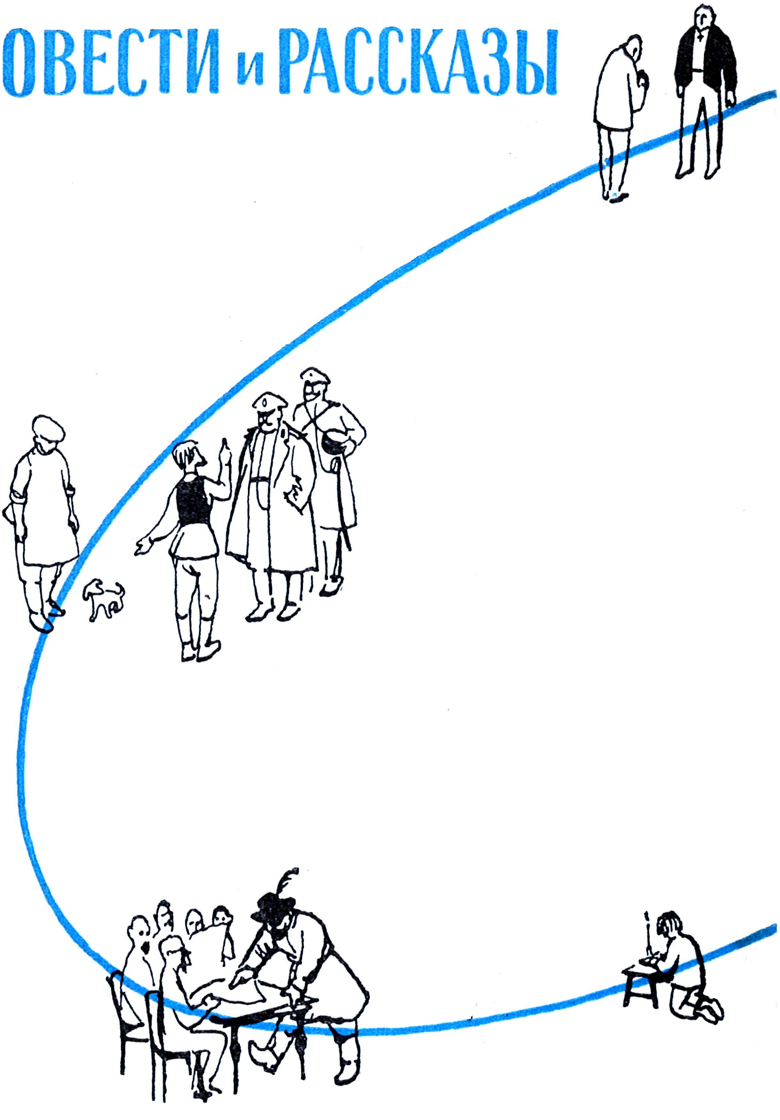

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ
НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
МОСКВА

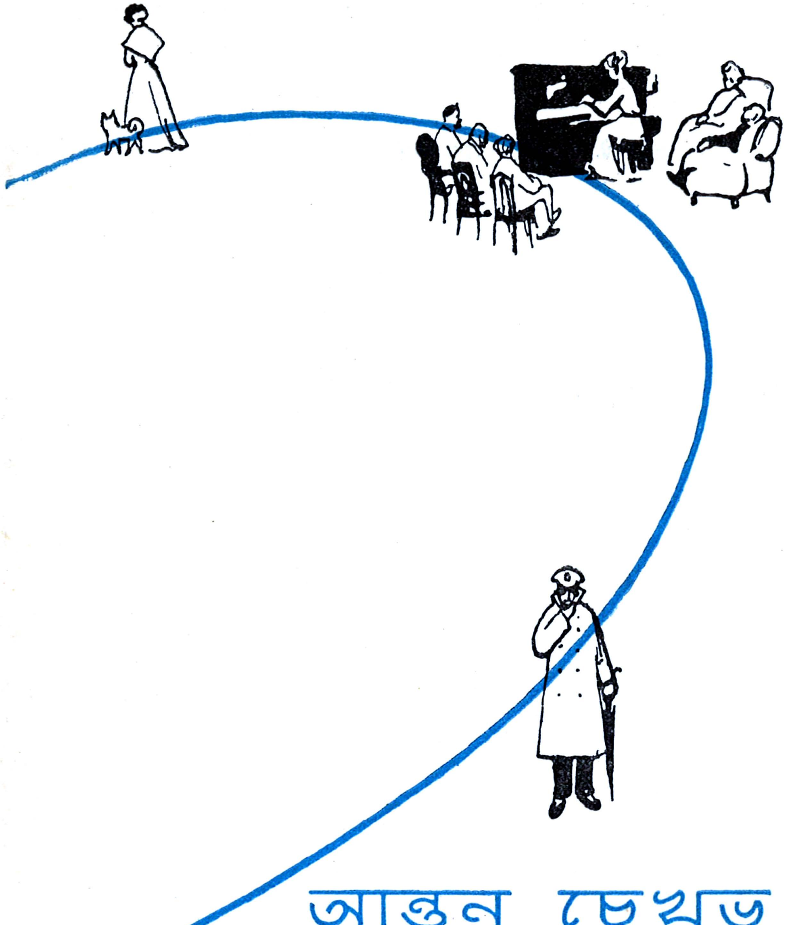

আন্তন চেখভ

গল্প ও ছোটো উপন্যাস

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: ভ. ত্রিফনভ

সূচীপত্র

কেরানির মৃত্যু . ৭

বহুরূপী ১১

মুখোশ . ১৬

শোক . . ২৪

শত্রু ৩২

বিরস কাহিনী (এক বৃদ্ধের নোট-বই থেকে) ৫০

প্রজাপতি ১৩৩

৬নং ওয়ার্ড ১৬৩

বনেদী বাড়ি (শিল্পীর গল্প) ২৩৫

ইয়োনিচ ২৫৯

খোলসের লোক ২৮৪

গুজবেরি ৩০২

কুকুরসঙ্গী মহিলা ৩১৬

নালায় ৩৪০

কনে ৩৯৩

কেরানির মৃত্যু

অপরূপ একরাতে নাম-করা কেরানি ইভান দ্মিত্রিচ্ চেরভিয়াকভ* স্টলের দ্বিতীয় সারিতে বসে অপেরা গ্লাস দিয়ে 'লা ক্লশে দ্য কর্ণেভিল্' অভিনয় দেখছিলেন। মঞ্চের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হচ্ছিল, মরজগতে তাঁর মতো সুখী বুঝি আর কেউ নেই। এমন সময় হঠাৎ ... 'হঠাৎ' কথাটা বড়ো একঘেয়ে হয়ে পড়েছে। কিন্তু কী করা যায় বলুন, জীবনটা এতই বিস্ময়ে ভরা যে কথাটা ব্যবহার না করে লেখকদের গত্যন্তর নেই! সুতরাং, হঠাৎ, ওঁর মুখখানা উঠল কুঁকড়ে, চক্ষু শিবনেত্র, শ্বাস অবরুদ্ধ... এবং অপেরা গ্লাস থেকে মুখ ফিরিয়ে সিটের ওপর ঝুঁকে পড়ে— হ্যাঁচ্চো! অর্থাৎ হাঁচলেন। হাঁচার অধিকার অবশ্য সকলেরই আছে, এবং যেখানে খুশি। কে না হাঁচে — চাষী হাঁচে, বড়ো দারোগা হাঁচে, এমন কি প্রিভি কাউন্সিলররাও মাঝে মাঝে হাঁচে, হাঁচে সবাই। কাজেই চেরভিয়াকভ একটুও অপ্রতিভ না হয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করে নাক মুছলেন, এবং সভ্যভব্য মানুষের মতো আশেপাশে তাকিয়ে দেখলেন কারুর কোন অসুবিধা হল কিনা। আর তাকাতে গিয়েই বিব্রত হতে হল তাঁকে। কেন না, চোখে পড়ল ঠিক তাঁর সামনে, প্রথম সারিতে একটি খর্বকায় বৃদ্ধ দস্তানা দিয়ে টেকো ব্রহ্মতালুটুকু এবং ঘাড়খানা সযত্নে মুছে বিড় বিড় করে কী বলছেন। বৃদ্ধটিকে চেরভিয়াকভ চিনতে পারলেন, তিনি ছিলেন যানবাহন মন্ত্রিদপ্তরের বেসামরিক জেনারেল ব্রিঝালভ।

---

* চেরভিয়াক থেকে চেরভিয়াকভ। রুশ ভাষায় চেরভিয়াক মানে কীট।

চেরভিয়াকভ ভাবলেন, 'সর্বনাশ, ও'র মাথার ওপরেই হে'চে ফেলেছি তাহলে! উনি অবিশ্যি আমার বড়ো সায়েব নন, তবু কাজটা খারাপ হয়ে গেল। ক্ষমা চেয়ে নেওয়া দরকার।'

একটু কেসে চেরভিয়াকভ সামনে ঝু'কে জেনারেলের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন, 'মাপ করবেন স্যার, হে'চে ফেলেছি, ... অনিচ্ছায়।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে...'

'ভগবানের দোহাই, আপনি আমায় মাফ করুন। আমি... মানে ব্যাপারটা ঠিক ইচ্ছে করে ঘটেনি।'

'কী জ্বালা, থামুন দিকি! শুনতে দিন!'

কিঞ্চিৎ হতভম্ব হয়ে চেরভিয়াকভ বোকার মতো হাসলেন। তারপর মঞ্চের দিকে চোখ ফিরিয়ে অভিনেতাদের দিকে তাকাতে লাগলেন। তাকালেন বটে, কিন্তু কিছুতেই আর মরজগতের সবচেয়ে সুখী মানুষটি বলে নিজেকে ভাবতে পারলেন না। অনুশোচনায় মরে যাচ্ছিলেন তিনি। ইণ্টারভালের সময় হতে চলে এলেন ব্রিঝালভের কাছে। একটু ইতস্তত করে সঙ্কোচ কাটিয়ে গুই-গুই করে শুরু করলেন, 'আপনার গায়ের ওপর তখন হে'চে ফেলেছিলাম, স্যার... আমাকে মাফ করুন... মানে... ব্যাপারটা আমি ঠিক ইচ্ছে করে করিনি...'

জেনারেল বললেন, 'ও, তাই নাকি ... আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি কি এমনি ঘ্যান ঘ্যান করতেই থাকবেন?' নিচের ঠোঁটটা অধৈর্যে বে'কে উঠল তাঁর।

চেরভিয়াকভ কিন্তু জেনারেলের দিকে অবিশ্বাস ভরে তাকালেন। তাঁর মনে হল, 'উনি তো বলে দিলেন ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছেন, কিন্তু কই, ওঁর চোখমুখ দেখে তো ভালো ঠেকছে না। আসলে আমার সঙ্গে কথা কইতেই উনি নারাজ। উ'হু, ব্যাপারটা ওঁকে বুঝিয়ে বলতেই হবে যে ওটা আমি ইচ্ছে করে করিনি ... এ হল গিয়ে একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। নইলে উনি হয়ত মনে করবেন আমি বুঝিবা ও'র গায়ের ওপর থুথু ফেলতেই চাইছিলাম। এখন সে কথা যদি বা নাও ভাবেন পরে যে ভাববেন না তার ঠিক কি!..'

বাড়ি ফিরে চেরভিয়াকভ তাঁর অশিষ্ট আচরণের কথা স্ত্রীর কাছে খুলে

বললেন। মনে হল স্ত্রী যেন বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। প্রথমে অবশ্য তাঁর স্ত্রীও একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন কিন্তু যেই শুনলেন ব্রিঝালভ ওঁদের আপিসের কর্তা নন, অমনি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। তবু পরামর্শ দিলেন, 'তা যাই হোক, ওঁর কাছে তোমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। নইলে উনি হয়ত ভাববেন, তুমি ভদ্রতাও জানো না।'

'ঠিক বলেছো। ক্ষমা চাইতেই তো গিয়েছিলাম। কিন্তু উনি ভারি অদ্ভুত ব্যবহার করলেন। যা বললেন তার মানেই হয় না। তাছাড়া তখন আলাপ করার মতো সময়ও ছিল না।'

পরদিন চেরভিয়াকভ আপিস যাবার নতুন ফ্রককোটটি গায়ে চাপিয়ে, চুলটুল ছেঁটে ব্রিঝালভের কাছে গেলেন তাঁর আচরণের কৈফিয়ত দাখিল করতে। জেনারেলের বসবার ঘরখানা দরখাস্তকারীদের ভিড়ে ভরে উঠেছে। জেনারেল স্বয়ং হাজির থেকে দরখাস্ত গ্রহণ করছেন। জনকয়েকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার শেষ করে জেনারেল চেরভিয়াকভের দিকে চোখ তুলে চাইলেন।

কেরানিটি শুরু করলেন, 'বলছিলুম কি, স্যারের বোধহয় মনে আছে, কাল রাত্রে, সেই যে আর্কাডিয়া থিয়েটারে আমি, মানে হেঁচে ফেলেছিলাম, মানে হাঁচি এসে গিয়েছিল ... দয়া করে ক্ষমা!..'

'কী জ্বালা! আচ্ছা আহাম্মকের পাল্লায় পড়েছি তো!' বলে জেনারেল পরবর্তী লোকটিকে উদ্দেশ করে জিগ্যেস করলেন, 'হ্যাঁ, আপনার কী দরকার বলুন?'

চেরভিয়াকভের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভাবলেন, 'আমার কথা উনি শুনতেই চান না! তার মানে উনি চটে গিয়েছেন। কিন্তু ওঁকে এরকম চটিয়ে রাখা তো ঠিক হবে না ... ওঁকে বুঝিয়ে বলা দরকার ...'

সর্বশেষ দরখাস্তকারীর সঙ্গে কথা শেষ করে জেনারেল যখন তাঁর খাস-কামরার দিকে পা বাড়িয়েছেন, অমনি চেরভিয়াকভ গিয়ে তাঁর পিছু ধরলেন এবং বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'মাপ করবেন, আমার এমন একটা আন্তরিক অনুশোচনা হচ্ছে যে আপনাকে আবার বিরক্ত না করে পারছি না...।'

জেনারেল এমনভাবে চেরভিয়াকভের দিকে তাকালেন যেন বুঝি তিনি কেঁদে ফেলবেন। হাত নেড়ে চেরভিয়াকভকে ভাগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমাকে নিয়ে তামাসা পেয়েছেন, না?' কেরানির মুখের সামনেই দরজা বন্ধ করে দিলেন।

'তামাসা!' চেরভিয়াকভ ভাবলেন, 'এর মধ্যে তামাসার কী আছে। জেনারেল হয়েও কিন্তু কথাটা বুঝতে পারছেন না? বেশ, মাপ চাইতে গিয়ে ভদ্রলোককে আমিও আর বিরক্ত করতে আসছি না। চুলোয় যাক! বরং একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দেওয়া যাবে, বাস। এই শেষ, আর কখনো আসছি না ওঁর কাছে।'

বাড়ি যেতে যেতে চেরভিয়াকভের চিন্তা এই ধরনের একটা খাতে বইছিল। চিঠিখানা কিন্তু তাঁর আর লেখা হয়ে উঠল না। ভেবে ভেবে কিছুতেই ঠাহর করতে পারলেন না, কথাগুলো কী করে সাজাবেন। সুতরাং ব্যাপারটা ফয়সালা করে নেবার জন্যে পরের দিন আবার তাঁকে যেতে হল জেনারেলের কাছে।

জেনারেল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই চেরভিয়াকভ শুরু করলেন, 'গতকাল আপনাকে একটু বিরক্ত করতে হয়েছিল, কিন্তু তার মানে আপনি যা বলতে চাইছিলেন তা নয়। রসিকতা করার কোন মতলবই আমার ছিল না। সেদিন হেঁচে ফেলে আপনার যে অসুবিধা ঘটিয়েছিলাম, তার জন্যে মাপ চাইতেই এসেছিলাম... আপনাকে নিয়ে রসিকতা করার কথা আমার মনেই হয়নি। তাই কখনো হয়! লোককে নিয়ে রসিকতা করার ইচ্ছে যদি একবার আমাদের পেয়ে বসে তাহলে কোথায় থাকবে মানসম্মান, কোথায় থাকবে আমাদের ওপরওয়ালাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা?...'

রাগে বিবর্ণ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে জেনারেল হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'নিকালো! আভি নিকালো!'

আতঙ্কে বিমূঢ় হয়ে চেরভিয়াকভ বললেন, 'আজ্ঞে?'

পা ঠুকে জেনারেল ফের চেঁচিয়ে উঠলেন 'আভি নিকালো!'

চেরভিয়াকভের মনে হল বুঝি ওঁর শরীরের মধ্যে কী একটা যন্ত্র যেন বিকল হয়ে গেছে। কান ভোঁ ভোঁ করছে, চোখে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। দরজা দিয়ে কোনো মতে পেছিয়ে এসে হোঁচট খেতে খেতে চেরভিয়াকভ হাঁটতে শুরু করলেন। আচ্ছন্নের মতো বাড়ি পেঁছে আপিসের ফ্রককোট সমেতই সোফার উপর শুয়ে পড়ে মরে গেলেন।

১৮৮৩

বহুরূপী

পুলিস ইন্‌স্পেক্টর ওচুমেলভ* হেঁটে যাচ্ছিলেন বাজারের মধ্যে দিয়ে। গায়ে তাঁর নতুন ওভারকোট, হাতে পুঁটুলি এবং পিছনে এক কনেস্টবল। চুলের রঙ্‌টা তাঁর লাল, হাতের চালুনিটা ভর্তি হয়ে গেছে বাজেয়াপ্ত-করা গুজ্‌বেরিতে। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই ... বাজার একেবারে খালি ... ক্ষুদে ক্ষুদে দোকান আর সরাইখানার খোলা দরজাগুলো যেন একসার ক্ষুধার্ত মুখ-গহ্বরের মতো দীনদুনিয়ার দিকে হাঁ করে আছে। ধারে কাছে একটি ভিখিরি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নেই।

হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কামড়াতে এসেছ হতচ্ছাড়া, বটে? ওকে ছেড়ো না হে। কামড়ে বেড়াবে সে আইন নেই আর। পাকড়ো পাকড়ো! হেই!'

কুকুরের ঘ্যান ঘ্যান ডাকও শোনা গেল একটা। ওচুমেলভ সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, পিচুগিন দোকানীর কাঠগোলা থেকে বেরিয়ে এসে একটি কুকুর তিন ঠ্যাঙে লাফাতে লাফাতে ছুটছে আর তার পেছু পেছু তাড়া করেছে একটি লোক, গায়ে তার মড়মড়ে ইস্ত্রির ছাপা কাপড়ের জামা, ওয়েস্টকোটের বোতাম সব খোলা, সারা শরীর ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে লোকটা কুকুরের পিছনের পাটা চেপে ধরল। কুকুরটা আবার কেঁউ কেঁউ করে উঠল, আবার চিৎকার শোনা গেল, 'পাকড়ো, পাকড়ো!' দোকানগুলো থেকে উঁকি মারতে লাগল নানা তন্দ্রাচ্ছন্ন মুখ। দেখতে দেখতে যেন মাটি ফুঁড়ে ভিড় জমে উঠল কাঠগোলার কাছে।

কনেস্টবল বললে, 'বেআইনী হল্লা বলে মনে হচ্ছে, হুজুর।'

---

* ওচুমেলি কথার অর্থ ক্ষিপ্ত। তাই থেকে ওচুমেলভ।

ওচুমেলভ ঘুরে দাঁড়িয়ে দুমদুম করে গেলেন ভিড়টার কাছে। কাঠগোলার ফটকটার ঠিক সামনেই তাঁর নজরে পড়ল বোতাম খোলা ওয়েস্টকোট-পরা সেই মূর্তিটি দাঁড়িয়ে। ডান হাত উঁচু করে লোকটা তার রক্ত মাখা আঙুলখানা সবাইকে দেখাচ্ছে। তার মাতাল চোখমুখগুলো যেন বলছে, 'শালাকে দেখে নেবো!' আঙুলটা যেন তার দিগ্বিজয়েরই নিশান! লোকটাকে ওচুমেলভ চেনেন — স্যাকরা খ্রিউকিন্।* ভিড়ের ঠিক মাঝখানটায় বসে আছে আসামী, অর্থাৎ বর্জোই জাতের একটি বাচ্ছা কুকুর — চোখা নাক, পিঠের ওপর হলদে একটা ছোপ। সর্বাঙ্গ তার কাঁপছে। সামনের দুপা ফাঁক করে সে বসে, সজল দুই চোখে ক্লেশ আর আতঙ্কের ছাপ।

ভিড় ঠেলে ঢুকতে ঢুকতে ওচুমেলভ জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপারটা কী? কী লাগিয়েছো তোমরা? আঙুল তুলে রেখেছিস কী জন্যে? চিল্লাচ্ছিল কে? কে চিল্লাচ্ছিল?'

খ্রিউকিন মুঠো-করা হাতের ওপর একটু কেশে নিয়ে শুরু করলে, 'আমি, হুজুর, হেঁটে যাচ্ছিলাম নিজের মনে, কারুর কোনো ক্ষেতি না করে। ওই তো ওই রয়েছে মিত্রি মিত্রিচ্ — উর ঠেঁয়ে লকড়ীর দরকার ছিল হুজুর — তা খামকা, হুজুর, এই কুত্তার বাচ্ছাটা এসে কামড়ে দিলে একেবারে। বুঝুন হুজুর, মেহনত করে খেতে হয় আমাদের ... আমার ব্যবসার কাজটিও তেমন সাদা-মাটা নয় হুজুর — এর লেগে ক্ষেতিপূরণ করা করান উদিকে। যা গতিক তাতে আঙুলটি তো আর হপ্তাখানেক লড়াচড়া চলবে না। আইনে তো ইসব নাই হুজুর কি বুনো জানোয়ার-মানোয়ারদের সহ্য করতে হবে আমাদের? সব কিছুই যদি কামড়াতে লেগে যায় তবে জীবনে সুখ কী রইল, আজ্ঞা?'

'হুম্! বটে! গলাখাঁকারি দিয়ে ভুরু কুঁচকে ওচুমেলভ বললেন কড়া সুরে, 'বটে, আচ্ছা! ... কার কুকুর এটা? এ আমি সহজে ছাড়ছি না! কুকুর ছেড়ে রাখার মজাই দেখিয়ে ছাড়ব! যেসব ভদ্রলোক আইন মেনে চলতে চান না তাঁদের ওপর মন দেবার সময় এসেছে। শালার ওপর এমন জরিমানা

---

* খ্রিউ খ্রিউ — অর্থ শুয়োরের ঘোঁৎ ঘোঁৎ।

চাপাবো যে শিক্ষা হয়ে যাবে: যতো রাজ্যের গরু ভেড়া কুকুরকে চরতে ছেড়ে দেওয়ার মানে কী! কতো ধানে কতো চাল তা টের পাওয়াচ্ছি!'

কনেস্টবলের দিকে ফিরে ওচুমেলভ হাঁকলেন, 'এল্‌দীরিন, তল্লাস লাগাও কার কুত্তা, আর একটা এজাহারও লিখে ফেলো। যা মনে হচ্ছে এ কুকুর ক্ষ্যাপা না হয়ে যায় না — ওটাকে সাবাড় করে ফেলা দরকার এখুনি! ... কার কুকুর এটা, জবাব দাও, কার কুকুর?'

ভিড় থেকে কে যেন বলে উঠল, 'মনে হচ্ছে ওটা জেনারেল ঝিগালভের কুকুর!'

'জেনারেল ঝিগালভ? হুম্‌! ... এল্‌দীরিন, আমার কোটটা খুলে দাও ... উহ্‌ কি গরম! বোধ হয় বৃষ্টি পড়বে। ইনস্পেক্‌টর খ্রিউকিনের দিকে তাকালেন, 'কিন্তু একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না, তোকে কামড়ালো কী করে? একেবারে হাতের আঙুলে গিয়ে কামড় বসালো, এটা কী রকম? এইটুকু একটা বাচ্ছা কুকুর আর তুই বেটা এমন এক মদ্দ জোয়ান? আলবৎ ও আঙুল তুই পেরেক-মেরেকে খুঁচিয়ে এখন মতলব করেছিস ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায় কিনা। তোদের চিনতে তো আমার বাকি নেই, শয়তানের ঝাড় সবাই!'

'ও লোকটা, হুজুর, তামাসা করে কুকুরটার নাকে সিগারেটের ছেঁকা দিতে গিয়েছিল। কুকুরটাও অমনি কামড় লাগিয়েছে। ঐ খ্রিউকিন হুজুর, চিরকালই বদমাইসি করে বেড়ায়।'

'মিছে কথা বলছিস, ট্যারা চোখো কোথাকার! আমাকে ছেঁকা দিতে দেখেছো? তবে মিছে কথা বলছো কেনে? হুজুরের বুদ্ধি বিবেচনা আছে। উনি নিজেই বুঝতে পারবেন কে মিছে বলছে, কে ধম্মকথা বলছে। মিছে কথা বললে আদালতে তার বিচার হোক কেনে। আইন হয়ে গেইছে ... সব মানুষ এখন সমান বটে। না জানো তো বলি, আমারও এক ভাই পুলিসে আছে ...'

'তর্ক কোরো না, তর্ক কোরো না বলছি!'

'উঁহু, এটা জেনারেলের কুকুর নয়,' কনস্টেবল বললে বিচক্ষণের মতো, 'অমন কোনো কুকুরই নেই জেনারেলের। ওনার সবকটা কুকুরই শিকারী কুকুর।'

'ঠিক জানিস?'

'ঠিক জানি, হুজুর।'

'ঠিকই বটে, আমিও তাই ভাবছিলাম! জেনারেলের কুকুরগুলো সব দামী দামী, উঁচুজাতের কুকুর। আর এটা — তাকাতেই ইচ্ছে করে না, হতকুচ্ছিৎ খেঁকি একটা। অমন কুকুর কেউ পোষে নাকি? তোদের মাথা খারাপ? মস্কো কি পিটার্সবুর্গে ওরকম কুকুর দেখা গেলে কী হত জানো? আইন দেখত না ছাই, পেলেই দফা শেষ করে ছাড়ত। খ্রিউকিন, তোমাকে কামড়েছে মনে রেখো, সহজে ব্যাপারটা ছাড়া হবে না। শিক্ষা দেওয়া দরকার! সময় হয়েছে ...'

কনেস্টবল আপন মনে বলতে শুরু করলে, 'তা জেনারেলের কুকুরও হয়ে যেতে পারে শেষ পর্যন্ত। চেহারা দেখে কি কিছু বলা যায়। সেদিন জেনারেলের উঠোনে এমনি একটা কুকুর দেখেছিলাম যেন।'

'জেনারেলের কুকুরই তো বটে!' ভিড় থেকে কে একজন বললে।

'হুঁ! ... এল্‌দীরিন কোটটা পরিয়ে দে ... দমকা হাওয়া দিল কেমন, শীত করছে... জেনারেলের কাছে এটাকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয়। বলবি, আমি কুকুরটাকে পেয়ে পাঠিয়েছি। বলবি, অমন করে যেন রাস্তায় ছেড়ে না দেন। হয়ত বা দামী কুকুর। শুয়োরগুলো যদি সবাই সিগারেট দিয়ে অমন করে নাকে ছ্যাঁকা দিতে থাকে তবে অমন দামী কুকুরের বারোটা বেজে যেতে কতোক্ষণ? কুকুর হল গিয়ে আদুরে জীব ... আর তুই ব্যাটা আহাম্মক, হাত নামা শীগ্‌গির! উজবুকের মতো আঙুল দেখাচ্ছিস কাকে? তোরই তো দোষ!..'

'ওই তো জেনারেলের বাবুর্চি এসে গেছে। ওকেই জিগ্যেস করা যাক ... ওহে, ও ভাই প্রোখর, এসো তো বাপু একটু! দেখতো ভালো করে, কুকুরটা কি তোমাদের?'

'মানে! কস্মিনকালেও অমন কোনো কুকুর আমাদের ছিল না।'

'বাস, বাস! ব্যাপারটা বোঝা গেল তাহলে।' ওচুমেলভ বললেন, 'বেওয়ারিশ একটা কুকুর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুলতানি করে আর কী হবে। বলছি বেওয়ারিশ কুকুর, বাস, ওটাকে খতম করে ঝামেলা চুকিয়ে দেওয়া যাক।'

প্রোখর কিন্তু বলে চলল, 'এটা আমাদের নয়। এই কিছুদিন হল জেনারেলের ভাই এসেছেন, এটা তাঁরই কুকুর। বর্জোই জাতের কুকুর সম্পর্কে

আমাদের জেনারেলের কোনোই শখ নেই। কিন্তু ওঁর ভাই — ওঁর পছন্দ হল গিয়ে ...'

'কী বললে, জেনারেলের ভাই? ভ্লাদিমির ইভানিচ্ এসেছেন?' ওচুমেলভ চেঁচিয়ে উঠলেন, তাঁর সারা মুখ ভরে উঠল এক অপার্থিব হাসিতে, 'কী কাণ্ড। আর আমি কিনা জানি না! এখন থাকবেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, থাকবেন।'

'কী কাণ্ড। ভাইকে দেখতে এসেছেন। আর আমি খবর পাইনি! কুকুরটা তাহলে ওঁরই? ভারি আনন্দের কথা। নাও হে নাও ওটিকে ... তোফা ছোট্ট কুকুরটি। ওর আঙুলে কামড়ে দিয়েছিলি! হাঃ-হাঃ-হাঃ! তু-তু, আরে কাঁপছিস কেন? ... বিচ্ছুটা চটেছে ... কী তোফা বাচ্চা!'

প্রোখর কুকুরটাকে ডেকে নিয়ে কাঠগোলা থেকে চলে গেল। ভিড়ের লোকগুলো হেসে উঠল খিত্রউকিনের দিকে চেয়ে। ওচুমেলভ হুমকি দিলেন, 'দাঁড়া না, তোকে আমি দেখাচ্ছি পরে!' তারপর ওভারকোটটা ভালো করে গায়ে টেনে নিয়ে বাজারের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চললেন।

১৮৮৪

মুখোশ

ন· ভদ্রলোকদের ক্লাবে চ্যারিটি বল্‌নাচ চলেছে। ফ্যান্সি-ড্রেস বলনাচ। স্থানীয় তরুণী মহিলারা অবশ্য এ ধরনের অনুষ্ঠানকে 'জোড়া নাচের আসর' বলে থাকেন।

মধ্যরাত্রি। বারোটা বেজেছে। একদল বুদ্ধিজীবী নাচে নামেনি বা মুখোশ পরেনি। সংখ্যায় তারা পাঁচজন। পড়ার ঘরে বড়ো টেবিলটার চারদিকে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় নাক এবং দাড়ি গুঁজড়ে বসে। বসে বসে পড়ছে এবং ঢুলছে। মস্কো ও পিটার্সবুর্গের খবরের কাগজের স্থানীয় বিশেষ প্রতিনিধির ভাষায় বলতে গেলে, সবিশেষ উদারমনোভাবাপন্ন ভদ্রলোকটি — 'অনুধ্যানরত'।

নাচের ঘর থেকে ভেসে আসছে কোয়াড্রিল নাচের বাজনা। কাঁচের বাসনের ঝনঝন শব্দ তুলে পা ঠুকে খোলা দরজার কাছে ছুটোছুটি করছে ওয়েটাররা। কিন্তু পড়ার ঘরে একটুও গোলমাল নেই।

হঠাৎ এই নিঃশব্দতাকে ভঙ্গ করে একটা চাপা ও নিচু গলার স্বর শোনা গেল। মনে হল যেন চিমনির ভিতর থেকে শব্দটা আসছে।

'এই তো, পাওয়া গেছে, এই ঘরটাতেই আরাম করে বসা যাক। চলে এসো, এই যে এদিকে!'

দরজাটা খুলে গেল। পড়বার ঘরে ঢুকল চওড়া কাঁধ, গাঁট্টাগোঁট্টা একটি পুরুষ। তার পরনে কোচোয়ানদের মতো উর্দি, টুপিতে ময়ূরের পালক গোঁজা, মুখে মুখোশ পরা। লোকটির পিছনে দুজন মহিলা আর ট্রে হাতে একজন ওয়েটার। মহিলা দুজনও মুখোশ আঁটা। ট্রের উপরে রয়েছে লিকিয়রের একটা পেটমোটা বোতল, লাল মদের তিনটে বোতল আর কয়েকটা গ্লাস।

লোকটি বলল, 'এই যে এদিকে। এ জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা। কই হে, টেবিলের ওপর ট্রে-টা রাখ দিকি। আপনারা বসুন, মাদ্‌মোয়াজেল। জে ভু্য

পাস আ ল্যা ত্রিমনত্রান আর মশাইরা শুনুন, জায়গা দিন তো ... আপনাদের জন্যে আমাদের অসুবিধে হচ্ছে।'

এই বলে খানিক টলে উঠে সে টেবিলের উপর থেকে খানকয়েক পত্রিকা হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল।

'এই যে, রাখ এখানে। আর পড়ুয়া মশাইরা, আপনারা জায়গা দিন! আপনাদের ওই খবরের কাগজ আর রাজনীতির সময় এটা নয় ... এখন ওসব রেখে দিন!'

'আপনি হৈ-হট্টগোলটা আরেকটু কম করবেন কি!' চশমার ভিতর দিয়ে মুখোশ-পরা লোকটিকে আগাগোড়া দেখে নিয়ে একজন পড়ুয়া বলল, 'এটা পড়বার ঘর, মদের বার নয় ... মদ খাবার জায়গাও নয় এটা।'

'আহা, কী কথাই বললেন! টেবিলটা কি স্থির হয়ে নেই, কিম্বা ঘরের ছাদ কি মাথার ওপরে ভেঙ্গে পড়ছে? উদ্ভট সব কথা আপনাদের! যাক গে, এখন আর আমার কথা বলবার সময় নেই। কাগজ পড়া শেষ করুন ... যথেষ্ট পড়া হয়েছে, আর না পড়লেও চলবে। এমনিতেই আপনাদের মগজে বুদ্ধির কমতি নেই। তাছাড়া বেশি পড়লে চোখের মাথা খেয়ে বসবেন। অবিশ্যি আমার তাতে বয়েই যাবে। মোদ্দা কথা — আমি চাই না আপনারা এখানে থাকেন। বাস, এই হচ্ছে শেষ কথা!'

টেবিলের ওপরে ট্রে-টা রেখে হাতে একটা ঝাড়ন নিয়ে ওয়েটার দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। মহিলারা কাল বিলম্ব না করে লাল মদ নিয়ে বসেছেন।

ময়ূরের পালক গোঁজা লোকটি নিজের জন্যে খানিকটা লিকিয়র ঢেলে নিয়ে বলল, 'আর সত্যি কথা বলতে কি, আমি তো ভাবতেও পারি না, কোনো বুদ্ধিমান লোক এমন চমৎকার পানীয়ের চেয়েও খবরের কাগজকে বেশি পছন্দ করতে পারে! আমার কী মনে হয় জানেন মশাইরা, আপনাদের পয়সা নেই বলেই খবরের কাগজ ভালোবাসেন। ঠিক কথা বলিনি? হা-হা!.. দ্যাখ, দ্যাখ, পড়ার ঢঙ দ্যাখ! আপনাদের খবরের কাগজে কী লেখা আছে মশাইরা? ও মশাই চশমাপরা ভদ্দরলোক, কোন তথ্য নিয়ে পড়ছেন? হা-হা! বাস, যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়! তোমার মুরুব্বিপনা আর বাইরের ঠাট রাখ তো! এস মদ খাওয়া যাক!'

বলতে বলতে ময়ূরের পালক গোঁজা লোকটি ঝুঁকে পড়ে চশমাপরা ভদ্রলোকের হাত থেকে খবরের কাগজটা ছিনিয়ে নিল। ব্যাপারটা দেখে ভদ্রলোক প্রথমে লাল তারপরে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অন্য বুদ্ধিজীবীদের দিকে। তারাও তাকাল তার দিকে।

ভদ্রলোক চিৎকার করে বলল, 'দেখুন মশাই, আপনি নিতান্তই কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো ব্যবহার করছেন। এটা পড়ার জায়গা, কিন্তু আপনি এটাকে তাড়িখানা বানিয়েছেন। খুশিমতো হৈ-হট্টগোল করছেন, হাত থেকে খবরের কাগজ ছিনিয়ে নিচ্ছেন। আপনার ব্যবহার অসহ্য। আপনি জানেন না কার সঙ্গে কথা বলছেন। আমি ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর ঝেস্‌তিয়াকভ!'

'তুমি ঝেস্‌তিয়াকভ হও বা যে-ই হও আমি থোড়াই কেয়ার করি। তোমার এই খবরের কাগজটা সম্বন্ধে আমার কী ধারণা জান? এই দেখ।'

লোকটি খবরের কাগজটাকে উঁচু করে তুলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল।

'এসবের কী মানে মশাইরা!' ঝেস্‌তিয়াকভ বিড়বিড় করে বলতে লাগল, রাগে তার প্রায় বুদ্ধিলোপ হয়ে আসছে, 'এমন অদ্‌ভুত কাণ্ড... যাকে বলে... যাকে বলে... হতভম্ব হয়ে যাওয়া!'

'ও বাবা রাগ করেছেন, দেখছি!' লোকটি হেসে উঠল, 'হায়, আমার কী হবে, ভয় লাগছে যে আমার! দ্যাখ, দ্যাখ, আমার হাঁটুদুটো যে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপতে লেগেছে! যাক্‌ গে, এসব ঠাট্টাতামাসার কথা থাক এখন। শুনুন মশাইরা, আপনাদের সঙ্গে কথা বলবার প্রবৃত্তি আমার নেই ... বুঝতেই পারছেন, আমি চাই এখানে বাইরের লোক কেউ না থাকে, মাদ্‌মোয়াজেলদের সঙ্গে একা থাকতে চাই আমি। নিজের ফুর্তিতে থাকতে চাই... কাজেই আপনারা দয়া করে আমাকে ঘাঁটাবেন না, এখান থেকে চলে যান... সামনেই দরজা খোলা আছে। ও মশাই বেলেবুখিন! অমন নাক উঁচু করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন কেন? যে যার খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢোক, বেরিয়ে যাও, এক্ষুনি বেরিয়ে যাও এখান থেকে! আমার হুকুম... আমি যখন বেরিয়ে যেতে বলি তখন বেরিয়ে যেতেই হবে ... জল্‌দি, নইলে ঘাড় ধাক্‌কা দিয়ে বার করে দেব!'

'কী বললেন, কী?' রাগে লাল হয়ে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে অনাথভবনের কোষাধ্যক্ষ বেলেবুখিন জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। কাণ্ড দেখেছ, একটা বেয়াদপ লোক কথা নেই বার্তা নেই ঘরের মধ্যে ঢুকে যা খুসি তাই বলে যাবে!'

'কী বললে? বেয়াদব লোক? বটে!' ময়ূরের পালক-গোঁজা লোকটি রেগে চিৎকার করে উঠল। আর টেবিলের উপরে সে এমনভাবে ঘুঁষি মারল যে ঝনঝন শব্দে লাফিয়ে উঠল ট্রে-র উপরে রাখা গ্লাসগুলি। 'কার সঙ্গে কথা বলছ জান কি? ভাবছ, আমি তো মুখোশ পরে আছি, আমাকে যা খুশি বলা চলে—তাই না? আস্পদ্দার একটা সীমা আছে! তোমাকে বেরিয়ে যেতে বলেছি — বেরিয়ে যাও! ব্যাঙ্কের ম্যানেজারও সরে পড়! তোমরা দলশুদ্ধু বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আমি চাই না একটা শয়তানও এই ঘরে থাকে! বাস, আর কথা নয় — যে যার খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢোক!'

'আচ্ছা কে যায় দেখা যাবে!' ঝেস্তিয়াকভ বলল। মনে হল তার চশমার কাঁচদুটো পর্যন্ত উত্তেজনায় ঘেমে উঠেছে। 'যাওয়া কাকে বলে দেখাচ্ছি! কই হে, কে আছ, নাচঘরের একজন মুরুব্বিকে ডেকে আন তো দেখি!'

মিনিটখানেক পরেই নাচঘরের মুরুব্বি এসে হাজির। ছোটখাটো লোকটি, মাথায় লাল চুল, কোটের বুকের উপরে ফলাও করে নীল রিবনের টুকরো ঝুলিয়েছে। নাচঘরের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সে হাঁপাচ্ছে।

সে বলতে শুরু করল, 'দয়া করে এঘর থেকে চলে যান। এটা মদ খাবার জায়গা নয়। দয়া করে খাবার ঘরে গিয়ে বসুন।'

মুখোশ পরা পুরুষটি বলল, 'তুমি আবার কোথা থেকে এসে উদয় হলে হে? তোমাকে তো ডাকিনি—ডেকেছি কি?'

'আপনাকে মিনতি করছি, কথা বাড়াবেন না, দয়া করে চলে যান।'

'শোনো বাপু, ... তোমাকে আমি ঠিক একমিনিট সময় দিচ্ছি... তুমি তো আর যা তা লোক নও, নাচঘরের মুরুব্বি... তাই তোমাকে শুধু একটি কাজ করতে হবে। এই পড়ুয়াদের ঘর থেকে হটিয়ে দাও দিকি। বাইরের লোককে মাদমোয়াজেলরা বরদাস্ত করতে পারে না... তারা লাজুক। আর আমি চাই আমার টাকা উশুল করে নিতে, দেখতে চাই ভগবান তাদের যেমন সৃষ্টি করেছেন...'

ঝেস্‌তিয়াকভ চেঁচিয়ে উঠল, 'এই অসভ্য লোকটা বোধ হয় এখনো বুঝতে পারেনি যে এটা খোঁয়াড় নয়। কে আছিস, ইয়েভস্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচকে ডেকে আন্‌ তো!'

ক্লাবঘরের চারদিকে হাঁক উঠল, 'ইয়েভস্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচ, ইয়েভস্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচ কোথায়!'

ইয়েভস্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচ কিছুক্ষণের মধ্যেই সশরীরে হাজির। পুলিসের উর্দি পরা এক বুড়ো।

ভয়ঙ্কর চোখদুটোকে ভাঁটার মতো গোল করে, রং করা মোচের শুঁড়দুটোকে কাঁপিয়ে তুলে, মোটা মোটা হেঁড়ে গলায় সে বলল, 'দয়া করে ঘর ছেড়ে চলে যান।'

দিলদরিয়া ভাবে হাসতে হাসতে লোকটি বলল, 'ওরে বাবা, তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ যে! দোহাই তোমার, ভয় পাচ্ছি আমি! হায়, হায়, মরে যাই, ভগবান! এমন মজার চেহারা তো আর দেখিনি! বেড়ালের মতো গোঁফ, চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে ... হা-হা-হা-হা-হা!'

'বাস্‌, খবরদার—আর একটিও কথা নয়!' রাগে কাঁপতে কাঁপতে ইয়েভস্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচ যতোটা সম্ভব চড়া গলায় হুঙ্কার ছাড়ল, 'বেরিয়ে যাও বলছি, নইলে ঘাড়ধাক্‌কা দিয়ে বার করে দেব!'

পড়বার ঘরে দারুণ হট্টগোল উঠল। গল্‌দা চিংড়ির মতো লাল হয়ে ইয়েভস্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচ চেঁচাচ্ছে আর দাপাচ্ছে। চেঁচাচ্ছে ঝেস্‌তিয়াকভ, চেঁচাচ্ছে বেলেবুখিন। চেঁচাচ্ছে পড়ুয়ার দলের সবাই। কিন্তু তবুও সক্‌কলের গলার স্বরকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে মুখোশ-পরা লোকটির চাপা নিচু ভরাট গলার স্বর। হৈ-হট্টগোল শুনে নাচ থেমে গেছে আর নাচঘর থেকে অতিথিরা বেরিয়ে এসে ঢুকেছে পড়বার ঘরে।

ঠাট বজায় রাখার জন্যে ক্লাবের যেখানে যতো পুলিস ছিল সবাইকে ডেকে আনা হয়েছে। ইয়েভস্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচ রিপোর্ট লিখছে বসে বসে।

কলমের নিচে আঙুলটা গুঁজে মুখোশ পরা লোকটি বলল, 'লেখো, লেখো, যতো খুশি লেখো! এই গরীব লোকটা এবার মলাম গো! হায়, হায়, আমার কী হবে গো! আমি কোথায় যাব গো! এই নাচার গরীব মানুষটাকে কেন এত হেনস্থা গো! হা-হা! লেখো, লেখো, লিখে যাও! তৈরি হয়েছে

রিপোর্ট? সবাই সই করেছে তো? বেশ, এবার দ্যাখ তাহলে — এক, দুই, তিন …’

মাথা খাড়া করে টান হয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটি। তারপর ছিঁড়ে ফেলল মুখোশ। বেরিয়ে পড়ল মাতাল একটা মুখ, চারদিকে ঘাড় ফিরিয়ে প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল কার কতটা ভাবান্তর হয়েছে। তারপর আবার চেয়ারে ধপ্ করে বসে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। আর সত্যি কথা বলতে কি, ভাবান্তরটা লক্ষ্য করবার মতোই বটে। পড়ুয়ার দল ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, হতভম্ব হয়ে একজন আরেকজনের দিকে তাকালে। ঘাড় চুলকাতে দেখা যাচ্ছে কাউকে কাউকে। গলা খাঁকারি দিল ইয়েভস্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচ, না বুঝেশুনে ভয়ংকর একটা ভুল করে-বসা লোকের মতো।

হল্লাবাজ লোকটিকে চিনতে পেরেছে সবাই। ইনি বনেদী সম্মানিত নাগরিক পিয়াতিগোরভ। স্থানীয় ব্যবসাদার, কোটিপতি, কলকারখানার মালিক। সবাই তাঁকে চেনে তাঁর দাঙ্গাবাজীর জন্যে, সমাজ-কল্যাণমূলক কাজের জন্যে, আর স্থানীয় পত্রপত্রিকায় যে-কথাটা অক্লান্তভাবে লেখা হয় — শিক্ষার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার জন্যে।

অল্প একটু চুপ করে থেকে পিয়াতিগোরভ জিজ্ঞেস করলেন, ‘কই, যাচ্ছ না যে?’

পড়ুয়ার দল একটিও কথা না বলে পা টিপে টিপে পড়ার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সবাই চলে গেলে পিয়াতিগোরভ দরজা বন্ধ করে দিলেন।

একটু পরে ওয়েটার মদ নিয়ে পড়ার ঘরে আসছিল, ইয়েভস্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচ তার ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে নিচু কর্কশ গলায় বলে উঠল, ‘তুই তো জানতিস উনি পিয়াতিগোরভ। কেন তুই আগে থেকে বলিসনি?’

‘আমাকে বলতে মানা করেছিলেন যে।’

‘মানা করেছিলেন যে! ব্যাটা শয়তান, দাঁড়া তোকে একমাস হাজতবাস করিয়ে আনি তারপর বুঝতে পারবি মানা করা কাকে বলে। দূর হ … আর আপনাদেরও বলিহারি যাই, চমৎকার ভদ্দরলোক আপনারা,’ পড়ুয়ার দলের দিকে তাকিয়ে সে বলে চলল, ‘কী হট্টগোলই বাধালেন! কেন, মিনিট দশেকের জন্যে পড়ার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসা যেত না বুঝি! এবার বুঝুন ঠ্যালা,

নিজেরাই গণ্ডগোল পাকিয়েছেন, এবার নিজেরাই বাঁচবার ব্যবস্থা করুন ... ইস, দেখুন তো কী কাণ্ড ...আপনাদের ধরনধারন আমার একেবারেই পছন্দ নয় ...ভগবানের দিব্যি, পছন্দ নয়!'

পড়ুয়ার দল বিমর্ষ মুখে, ক্লিষ্ট মনে, অনুতপ্ত হৃদয়ে, একজন আরেকজনের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে ক্লাবের চারদিকে ঘুরঘুর করতে লাগল। ভয়ঙ্কর কিছু একটা বিপদ উপস্থিত হলে লোকের যেমন অবস্থা হয়, তাদের অবস্থাও তেমনি। তাদের স্ত্রী কন্যারা যেই শুনল যে পিয়াতিগোরভকে 'অপমান করা হয়েছে' এবং পিয়াতিগোরভ রুষ্ট হয়েছেন অমনি তাদের মুখেও আর কথা নেই। চুপচাপ বাড়ির দিকে রওনা দিল সবাই। থেমে গেল নাচ।

রাত দুটোর সময় মদের নেশায় টলতে টলতে পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন পিয়াতিগোরভ, নাচঘরে গিয়ে বাজনদারদের পাশে বসে বাজনা শুনতে শুনতে ঢুলতে লাগলেন। শেষকালে তাঁর মাথাটা অসহায়ভাবে ঝুলে পড়ল আর নাক ডাকতে লাগল।

'বাজনা থামাও!' নাচঘরের মুরুব্বিরা বাজনদারদের হাতের ইঙ্গিতে থামতে বলে উঠল, 'শ্‌শ্‌! চুপ, চুপ ... ইয়েগর নিলিচ ঘুমোচ্ছেন।'

কোটিপতির কানের কাছে মুখটা নামিয়ে এনে বেলেবুখিন জিজ্ঞেস করল, 'ইয়েগর নিলিচ, বলেন তো আপনাকে বাড়ি পেঁছে দিই!'

পিয়াতিগোরভ ঠোঁটদুটোকে ছুঁচলো করে রইলেন, যেন তিনি ফুঁ দিয়ে গাল থেকে একটা মাছি উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছেন।

বেলেবুখিন আবার বলল, 'বলেন তো আপনাকে বাড়ি পেঁছে দিই। নাকি, আপনার গাড়িটা এখানে নিয়ে আসতে বলব?'

'এ্যাঁ কী? ও! তুমি ... কী চাও?'

'আপনাকে বাড়ি পেঁছে দিতে চাই... ঘুমবার সময় হয়েছে...'

'বাড়ি। হ্যাঁ, বাড়ি যাব ... বাড়ি নিয়ে চলো আমাকে!'

আহ্লাদে আটখান হয়ে পিয়াতিগোরভকে তুলতে লাগল বেলেবুখিন। অন্য পড়ুয়ারাও সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে ছুটে এসেছে। সবাই মিলে ধরাধরি করে বনেদী সম্মানিত নাগরিকটিকে দু'পায়ে দাঁড় করিয়ে দিল, তারপর অতি সন্তর্পণে নিয়ে চলল গাড়ির দিকে।

কোটিপতিকে গাড়িতে তুলে দিতে দিতে ঝেস্তিয়াকভ মনের খুশিতে অনর্গল কথা বলছিল: 'যিনি সত্যিকারের শিল্পী, সত্যিকারের প্রতিভাবান, একমাত্র তিনিই পারেন আজকের মতো এমন একটা গোটা দলকে এমনভাবে নাস্তানাবুদ করতে। ইয়েগর নিলিচ, সেই যাকে বলে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে যাওয়া, আমি তাই হয়েছি। এখনো আমি না হেসে থাকতে পারছি না ... হি-হি! আর আমাদের সকলেরই কী রকম মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল, সবাই কী রকম হট্টগোল পাকিয়েছিলাম! হি-হি! বিশ্বাস করুন, কোনো নাটক দেখেও আমি কোনোদিন এত বেশি হাসিনি। কী গভীর রসজ্ঞান! এই স্মরণীয় সন্ধ্যাটি সারা জীবন মনে থাকবে!'

পিয়াতিগোরভকে বিদায় জানাবার পর উৎফুল্ল ও আশ্বস্ত বোধ করতে লাগল পড়ুয়ারা।

আহ্লাদে আটখান হয়ে জাঁক করে বলল ঝেস্তিয়াকভ:

'উনি আমার সঙ্গে করমর্দন করেছেন। তার মানে, সব ঠিক আছে, উনি রাগ করেননি।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল ইয়েভস্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচ: 'তাই যেন হয়! লোকটা হাড়-পাজি, নচ্ছার—কিন্তু তবুও উনি আমাদের উবগারই করেন। কাজেই কিছু করার নেই...'

১৮৮৪

শোক

সারা গালচিনো জেলায় কুন্দকার মিস্ত্রি গ্রিগরি পেত্রভের নাম ওস্তাদ কারিগর হিসেবে যেমন, পাঁড় মাতাল ও পয়লা নম্বরের হতচ্ছাড়া বলেও তেমনি। সেই পেত্রভ তার অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে চলেছে জেমস্তভো হাসপাতালে। ত্রিশ ভের্স্ট রাস্তা তাকে ঘোড়ার গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে, আর রাস্তা ভয়াবহ, এমনকি ডাক হরকরাও এই রাস্তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যায়, কুঁড়ের রাজা কুন্দকার গ্রিগরির কথা ছেড়েই দিচ্ছি। হাড়-কাঁপানো হিমেল বাতাসের ঝাপটা তার মুখে এসে পড়ছে। তুষার পাপড়ির ঘূর্ণীতে চারদিক ছেয়ে গেছে, তুষার আকাশ থেকে পড়ছে না মাটি থেকে উঠে আসছে বোঝা ভার। মাঠ বন টেলিগ্রাফের থাম — কিছুই ঠাওর করা যাচ্ছে না। ঝাপটাটা যখন জোর হচ্ছে গ্রিগরি গাড়ির বোমটাও দেখতে পাচ্ছে না। বুড়ী দুর্বল ঘোটকীটা ধুঁকতে ধুঁকতে ঢিকিয়ে চলেছে। গভীর বরফের মধ্যে বসে যাওয়া পা-খানাকে টেনে তুলে একই সঙ্গে মাথাটাকে সামনের দিকে ঠেলে এগিয়ে দিতে তার যেন সব শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে। কুন্দকারের ভীষণ তাড়া। সে তার আসনে স্থির থাকতে পারছে না, থেকে থেকে লাফিয়ে উঠছে আর ঘোড়াটার পিঠে প্রায়ই চাবকাচ্ছে।

'মাত্রিয়োনা, কেঁদ না...' সে বিড়বিড় করে বলছে। 'একটুখানি সহ্য কর। ভগবানের দয়ায় হাসপাতাল এই এসে গেল। এক্ষুনি ওরা তোমায় দেখবে ... পাভেল ইভানিচ কয়েক ফোঁটা ওষুধ দিয়ে দেবে কিংবা ওদের বলবে কিছু বদরক্ত কেটে বার করে দিতে। হয়ত বা বলবে তোমার গা-টা আচ্ছা করে স্পিরিট দিয়ে মালিস করে দিতে। জানো তো, তাতে পাঁজরার ব্যথাটা কমে। পাভেল ইভানিচের সাধ্যে যা কুলোবে সবই করবে, ভেব না। চিৎকার করে

পা ঠুকবে, তারপর কিছুই বাদ রাখবে না ... লোকটা বড়ো ভালো, দরাজ দিল, ভগবান তার ভালো করুন... আমরা যেই পেঁছবো অমনি হন্তদন্ত হয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেই খেঁকিয়ে উঠবে, "কী চাই, এ্যাঁ?" তারপর চেঁচাতে থাকবে। "আরেকটু আগে আসতে কী হয়েছিল? আমাকে কী মনে করিস? একটা কুত্তা? সারাদিন ধরে তোদের মত ভূতদের বেগার খাটব! সকালে আসিসনি কেন? যা, বেরো! কাল আসিস।" আমি তখন বলব, "ডাক্তারবাবু, পাভেল ইভানিচ! হুজুর!" এই ব্যাটা, জলদি চল, জলদি!'

সে ঘোড়টার পিঠে আবার চাবুক কষাল। স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে বিড়বিড় করে সমানে সে বকে চলল। '"দেবতার দিব্যি, পবিত্র ক্রুশের দিব্যি, ডাক্তারবাবু, সেই ভোরে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, দেবতা যদি গোঁসা করে এমনি বরফ-ঝড় চালান, কী করে আমি ঠিক সময়ে পেঁছোই, বলুন? আপনিই ভেবে দেখুন, ডাক্তারবাবু ... তাগড়াই ঘোড়াও এই ঝড় ঠেলে আসতে কাহিল হয়ে পড়ত, আর চেয়ে দেখুন আমার ঘোড়ার কী হাল, এটাকে ঘোড়া বলতেও লজ্জা।" পাভেল ইভানিচ তখন ভুরু কুঁচকিয়ে আমায় ধমক লাগাবে, "তোদের চিনতে আমার বাকি নেই! তোদের যে ওজরের অভাব হয় না, জানি! বিশেষ করে তো তুই, তোকে তো হাড়ে হাড়ে জানি! আসতে আসতে তো বার পাঁচেক ভেটেরাখানায় ঢুকেছিলি।" আমি তখন বলব, "কী যে বলেন, ডাক্তারবাবু, মায়া মমতা জ্ঞানগম্যি কিছুই কি আমার নেই? আমার বুড়ীটা মরতে বসেছে, ধুঁকছে, আর আমি কিনা ভেটেরাখানায় দৌড়োব? ছি, ছি, ছি, একথা আপনি বললেন কী করে, ডাক্তারবাবু? চুলোয় যাক এখন ভেটেরাখানা!" তারপর পাভেল ইভানিচ তার লোকজনকে হুকুম করবে তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। আমি তখন তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলব: "ডাক্তারবাবু, হুজুর, আপনি আমাদের কী যে উপকার করলেন! আমাদের, বোকাহাবাদের ক্ষমা করুন। আমাদের ব্যাভারে দোষ নিবেন না। আমরা শুধু মুঝিক। আমাদের এখান থেকে তাড়ানো উচিত, তবু আপনার কত দয়া, এই বরফ-ঝড়ের মধ্যে নিজে আমাদের দেখতে বেরিয়ে এসেছেন।" পাভেল ইভানিচ আমার কথা শুনে এমন কটমট করে তাকাবে, মনে হবে এই বুঝি দু'ঘা বসিয়ে দিল। পরে

বলবে, "আমার পায়ের ওপর গড়াগড়ি না দিয়ে, আগে ভদকার নেশাটা ছাড়, আর ওই বুড়ীটার ওপর একটু দয়ামায়া আন। তোকে আগা-পাস্তোলা চাবকানো উচিত।" "চাবকানো উচিত, যা বলেছেন ডাক্তারবাবু, ভগবানের দিব্যি চাবকানো উচিত! আপনার পায়ের ওপর পড়ে গড় না করে আমাদের উপায় কী বলুন? আপনিই আমাদের মা বাপ। আপনার দয়াতেই তো আমরা বেঁচে আছি। এ কথা হক কথা, হুজুর। দেবতা জানে, একরত্তি মিথ্যে নয়, একথা অমান্যি করলে আমার মুখে থুতু দেবেন। আমার মাত্রিয়োনা যেই একটু সামলে উঠবে, গা গতরে একটু জোর পাবে, আমাকে আপনি যা হুকুম দিতে চান সব তৈরি করে দেব। চান তো, ফুট্‌ফুট্‌ দাগওয়ালা বার্চ কাঠের সুন্দর দেখতে সিগারেট কেস, কিংবা ক্রোকে খেলার বল বা স্কিট্‌ল্‌ এমন তৈরি করে দেব, ভাববেন, বিদিশী জিনিস ... যা বলবেন তাই তৈরি করে আনব! তার জন্যে আপনার একটা কোপেকও খরচ লাগবে না! আমি যে সিগারেট কেস করে দেব মস্কোয় তার দাম কম-সে-কম চার রুবল অথচ আমি একটা কোপেকও নেব না।" ডাক্তারবাবু তাই শুনে হেসে ফেলে বলবে: "আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। শুধু বড় আপসোসের কথা, তুই মাতাল।" গিন্নী, ভদ্দরলোকদের মন রেখে কী করে কথা কইতে হয় জানি। এমন কোনো ভদ্দরলোকই নেই যাকে বাগে আনতে পারি না। দেবতার দয়ায় এখন পথ বেভুল না হলেই হল। উঃ কী ঝড়! বরফের জন্যে কিছুই যে ঠাওর হচ্ছে না।'

কুন্দকার অনর্গল বকে চলেছে। অস্বস্তিটাকে চাপবার জন্য দম-দেওয়া কলের মতো অনর্গল বকে চলেছে সে। মুখ যদিও থামছে না, তবুও তার মাথায় কিন্তু ভাবনাচিন্তার কামাই নেই। সে অপ্রত্যাশিতভাবে নিদারুণ শোক পেয়েছে, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত। শোকে মুষড়িয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছে সে। সামলিয়ে উঠতে পারেনি। পারেনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে। এতদিন বিনা চিন্তাভাবনায় তার জীবন ভেসে চলেছিল মাতলামির ঘোরের মধ্যে। আনন্দ বা দুঃখ কিছুই সে জানেনি। হঠাৎ সে বুঝতে পারল তার বুকের মধ্যে দারুণ একটা যন্ত্রণা। ফুর্তিবাজ নিষ্কর্মা মাতালটা হঠাৎ দেখল ব্যস্তসমস্ত কাজের মানুষ হয়ে উঠেছে, তাকে যুঝতে হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে।

তার মনে পড়ছে এই শোকের সূত্রপাত গত রাত থেকে। আগের দিন সন্ধ্যায় যথারীতি মাতাল অবস্থায় বাড়িতে ফিরে এসে বহুদিনের অভ্যাস মতো মারধোর গালিগালাজ করার পর দেখল স্ত্রী তার দিকে এমন অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে যে-ভাবে আগে কখন তাকায়নি। সাধারণত তার এ সময়কার চাউনিটা থাকে আধমরা গোবেচারা কুকুরের মতো, যার বরাদ্দ বেদম মার আর সামান্য খাদ্য। কিন্তু তখন সে তাকিয়ে ছিল স্থির, কঠিন দৃষ্টিতে, সাধুদের বিগ্রহ বা মুমূর্ষু মানুষ যেমন চেয়ে থাকে। অদ্ভুত অস্বস্তিকর সেই চোখদুটো দেখার পর থেকে তার দুঃখের সূত্রপাত। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সে এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে ঘোড়াটা চেয়ে এনেছে। এখন চলেছে স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে। আশা, ডাক্তার মলম আর পুরিয়া দিয়ে বুড়ীর চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টিটা ফিরিয়ে আনবে।

সে আবার বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'মাত্রিয়োনা, খেয়াল রেখো, পাভেল ইভানিচ যদি জিজ্ঞেস করে আমি তোমায় মেরেছি কিনা, বোলো: "না, না হুজুর!" কখনো আর তোমার গায়ে হাত তুলব না। পবিত্র ক্রুশের নামে দিব্যি করছি, কখ্‌খনো মারবো না। তুমি তো মনে মনে জানো মাত্রিয়োনা, তোমায় মারবো বলে মারিনি। কিছু করার ছিল না বলেই মারতাম। তোমার ওপর সত্যি আমার টান আছে। অন্য কেউ হলে গ্রাহ্যই করত না। আমি বলে তোমায় হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি ... দেখছ তো, যা সাধ্যে কুলোয় করছি। উঃ, কী ঝড়! হা ভগবান, পথটা যেন না হারাই। মাত্রিয়োনা, তোমার কোমরের ব্যাথাটা এখন কেমন? কথা বলছ না কেন? কোমরটায় কি লাগছে?'

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, বুড়ীর মুখের ওপর বরফটা গলছে না, মুখটা কেমন যেন লম্বাটে ধরনের হয়ে গেছে, রংটাও ময়লা মোমের মত বিবর্ণ, ফ্যাকাশে। চেয়ে আছে ভারি কঠিন গম্ভীরভাবে।

'ওরে বুড়ী!' কুন্দকার বিড়বিড় করে বলল। 'আমি কোথায় ভালো ভাবে জিজ্ঞেস করছি ভগবানকে সাক্ষী করে আর ... দুত্তোর বুড়ী, তবে এই রইল ডাক্তারের কাছে যাওয়া — বোঝ এবার!'

সে লাগাম আলগা দিয়ে বসে বসে ভাবতে লাগল। ঠিক পাচ্ছে না বুড়ীর দিকে ফিরে তাকাবে কিনা: আসলে সে ভয় পেয়েছে। অনবরত

প্রশ্ন করা সত্ত্বেও কোনো উত্তর না পেয়ে সে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছে। শেষ অবধি সব সংশয় দূর করতে বুড়ীর দিকে না তাকিয়ে তার ঠাণ্ডা হাতটা সে ধরল। হাতটা ছেড়ে দিতে সেটা পড়ে গেল পাথরের মতো।

'মারা গেছে তাহলে! হা কপাল!'

সে কাঁদতে লাগল। শোকের চেয়ে বিরক্তটাই তার বেশি। ভাবল, জীবনে ঘটনাগুলো কী তাড়াতাড়িই না ঘটে। তার মনে শোক দানা বাঁধতে না বাঁধতেই সব শেষ হয়ে গেল। বুড়ীকে নিয়ে সবে বাঁচতে শুরু করতে না করতেই, তাকে মনের কথা বলতে না বলতেই, দয়ামায়া দেখাতে না দেখাতেই সে মরে গেল... চল্লিশ বছর সে বুড়ীকে নিয়ে কাটিয়েছে, এই চল্লিশটা বছর তো যেন কেটে গেছে কুয়াশার মধ্যে। মারধোর, মাতলামি, অভাব অনটন — এ সবের ভেতর দিয়ে কী করে যে দিন কেটে গেছে সে ঠাওর পায়নি। যে মুহূর্তে বুঝতে পারল সে ভালোবাসে তার স্ত্রীকে, তাকে ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না, তার উপর কী অকথ্য অত্যাচার করেছে, সেই মুহূর্তেই বুড়ী তাকে ছেড়ে গেল।

তার মনে পড়ছে কত কথা। 'দোরে দোরে সে ভিক্ষে করে বেড়াত। আমি, আমিই তাকে পাঠাতাম, এক টুকরো রুটির জন্যে। হ্যাঁ, আমার পোড়াকপাল! বুড়ী হয়ত আরো বছর দশেক বাঁচত। এখন সে ভাবছে আমি সত্যিই এমনি বদ। কী কাণ্ড, আমি চলেছি কোথায়? এখন যে ওকে কবর দেবার দরকার, ডাক্তারের দরকার নেই। হেই-হেই-টা-টা!'

গ্রিগরি ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে সজোরে চাবুক চালাল। প্রতি ঘণ্টায় রাস্তার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠছে। গাড়ির বোমটা এখন সে একেবারেই দেখতে পাচ্ছে না। ছোটো ফার গাছের সঙ্গে মাঝে মাঝে ধাক্কা লেগে গাড়িটা থেকে থেকে লাফিয়ে উঠছে। কালো মতো কিসের সঙ্গে ঘষা লেগে তার হাতটা ছড়ে গেল। নিমেষের জন্যে সেটা যেন তার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল; আবার ধু ধু সাদা ঘূর্ণী। সাদা ঘূর্ণী ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না।

'জীবনটা যদি গোড়া থেকে আবার আরম্ভ করা যেত ...' কুন্দকার ভাবল।

তার মনে পড়ল চল্লিশ বছর আগে মাত্রিয়োনা ছিল লাস্যময়ী সুন্দরী তরুণী, তার বাপের বাড়ির অবস্থা ছিল সচ্ছল। ওস্তাদ কারিগর বলেই তার সঙ্গে তারা তাদের মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। জীবনে সুখী হতে যা কিছু দরকার কিছুই তাদের অভাব ছিল না, কিন্তু বিয়ের পরেই সেই যে সে উনুনের পাশের তাকে বেহুঁশ হয়ে পড়ল তারপর থেকে ভালো করে সে আর যেন জেগেই ওঠেনি। বিয়ের কথা তার মনে আছে, কিন্তু তারপর কী ঘটেছে কিছুতেই সে মনে করতে পারে না, শুধু মনে পড়ে মদ খেয়েছে, মারামারি করেছে আর বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়েছে। এই করেই তার চল্লিশটা বছর হেলায় কেটে গেছে।

তুষার ঘূর্ণীর সাদা মেঘগুলো এবার আস্তে আস্তে হয়ে আসছে ধোঁয়াটে। সন্ধে হয়ে আসছে।

‘আরে, আমি চলেছি কোথায়?’ কুন্দকার নিজেকে জিজ্ঞাসা করল। ‘ওকে যে কবর দিতে হবে, অথচ হাসপাতালের দিকে চলেছি... নির্ঘাত আমার মাথা খারাপ হয়েছে।’

আবার সে ঘোড়াটা ঘুরিয়ে কষে চাবুক মারল। ঘোড়াটা চিঁহিঁ ডাক ছেড়ে সমস্ত শক্তি নিয়ে কদমে ছুটতে শুরু করল। বার বার কুন্দকার তাকে চাবুক মেরে চলল ... পিছনে কোথা থেকে যেন ঠক ঠক একটা শব্দ তার কানে এল, না তাকিয়েই সে বুঝতে পারল স্লেজের গায়ে লাশটার মাথাটা ঠুকছে। অন্ধকার ক্রমে ঘন হয়ে আসছে, ঝড়ের বেগ যেমন বাড়ছে, বাতাসও তেমনি ঠাণ্ডা ও তীক্ষ্ন হয়ে উঠছে।

‘নতুন করে আবার জীবন শুরু করতে হলে,’ কুন্দকার ভাবল, ‘নতুন সব যন্ত্রপাতি যোগাড় করতাম... নতুন কাজের ফরমাসও আনতাম ... পয়সাকড়ি ওর হাতেই তুলে দিতাম ... নিশ্চয়ই দিতাম!’

তারপর তার হাত থেকে লাগামটা খসে পড়ল। সেটাকে খুঁজতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাতে তুলে নিতে পারল না। তার হাতদুটো অসাড় হয়ে গেছে ...

‘কুছ পরোয়া নেই,’ সে ভাবল। ‘ঘোড়াটা নিজে নিজেই যেতে পারবে, পথ চেনে। এখন একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে হত ... কবর দেবার আর শেষ উপাসনা করার আগে পর্যন্ত জিরিয়ে নিতে পারলে হত।’

কুন্দকার চোখ বুজে ঝিমুতে লাগল। একটু পরে সে শুনল ঘোড়াটার দাঁড়িয়ে পড়ার শব্দ। চোখ মেলে সামনে দেখল কালো মতো কী যেন একটা কুঁড়েঘর বা খড়ের গাদার মতো ...

মনে মনে সে বুঝল এবার তার স্লেজ থেকে নেমে খোঁজখবর নিয়ে আসা উচিত কোথায় এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু তার সারা অঙ্গ এমন অবসন্ন যে মনে হোলো একটুও নড়তে পারবে না, এমনকি জমে মরার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যও না ... নিশ্চিন্তে সে ঘুমোতে লাগল।

ঘুম ভাঙতে দেখল চুনকাম করা মস্ত একটা ঘরে সে শুয়ে রয়েছে। জানলা দিয়ে উজ্জ্বল রোদ ঘরে এসে পড়েছে। কুন্দকার দেখতে পেল ঘরের মধ্যে লোকজন রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল ওদের সামনে ভব্যতা বজায় রাখা দরকার, মার্জিত ব্যবহার করা দরকার।

'বুড়ীর জন্যে শেষ উপাসনার ব্যবস্থাটা করা দরকার,' সে বলল। 'পুরুতকে একবার খবর দিতে হয় ...'

তার কথায় বাধা দিয়ে কে যেন বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে! তুমি এখন চুপ করে থাকো।'

'আরে! এ যে পাভেল ইভানিচ,' ডাক্তারকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে কুন্দকার অবাক বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল। 'হুজুর! মা বাপ!'

সে চেষ্টা করল বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে চিকিৎসা শাস্ত্রের কাছে আভূমি প্রণত হতে, কিন্তু বুঝতে পারল তার হাত পা অবশ হয়ে গেছে।

'হুজুর! আমার পা কই? আমার হাত?'

'তোমার হাত পা'র মায়া ছেড়ে দাও ... জমে গিয়ে অসাড় হয়ে গেছে! আরে, আরে, কাঁদছ কিসের জন্যে? জীবনে কিছুই তো তোমার বাকি নেই, সেই ভেবে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও। ষাট তো পার হয়ে গেছে, তাই না? তাহলে তোমার দিন তো কাটিয়েই দিয়েছ।'

'হা আমার কপাল! হুজুর, অপরাধ নেবেন না। আর ছটা বছর যদি বাঁচতে পারতাম!'

'কিসের জন্যে?'

'ঘোড়াটা আমার নয়, ওটাকে ফিরিয়ে দিতে হবে... আমার বুড়ীটাকে কবর দিতে হবে। জীবনে ঘটনাগুলো কী তাড়াতাড়িই না ঘটে! হুজুর! পাভেল ইভানিচ! আপনার জন্যে ঠিক তৈরি করে দেব—ফুটফুটে দাগওয়ালা সেরা বার্চ কাঠের সিগারেট কেস আর ক্রোকে খেলার পুরো একটা সেট আর...'

ডাক্তার হাত দিয়ে ইশারা করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কুন্দকারকে নিয়ে আর করার কিছু নেই!

১৮৮৫

শত্রু

সেপ্টেম্বর মাসের কোনো এক অন্ধকার রাত্রে, নটা বাজার কিছু পরে, জেমস্তভোর ডাক্তার কিরিলভের একমাত্র পুত্র ডিপথিরিয়া রোগে মারা গেল। ডাক্তারের স্ত্রী সবে মাত্র আশাভঙ্গের প্রথম আঘাতে মৃত সন্তানের শয্যাপাশে নতজানু হয়ে বসেছে, এমন সময় সদর দরজার ঘণ্টাটা সজোরে বেজে উঠল।

ডিপথিরিয়ার ভয়ে বাড়ির চাকরবাকরদের সকাল থেকেই বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিরিলভ যে অবস্থায় ছিল, পরনে শুধুমাত্র সার্ট আর বোতাম খোলা একটা ওয়েস্টকোট, সেই অবস্থাতেই, এমনকি চোখের জলে ভেজা মুখ ও কার্বলিক এসিডের দাগ-লাগা হাতদুটো না মুছেই, দরজা খুলতে গেল। হলঘরটা অন্ধকার, আগন্তুককে দেখে এইটুকু শুধু বোঝা গেল, সে মাঝারি লম্বা, তার গলায় একটা সাদা মাফলার জড়ানো আর তার প্রকাণ্ড মুখটা এমন বিবর্ণ যে মনে হল তাতে যেন ঘরের অন্ধকারটাও ফিকে হয়ে গেছে...

'ডাক্তারবাবু কি বাড়ি আছেন?' ঘরে ঢুকেই সে প্রশ্ন করল।

'হাঁ, আমি আছি,' কিরিলভ উত্তর দিল। 'আপনি কি চান?'

'যাক, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বাঁচলাম!' লোকটা হাঁফ ছেড়ে বলল। অন্ধকারে ডাক্তারের হাতের সন্ধান করে সাগ্রহে দুহাত দিয়ে চেপে ধরল। 'সত্যিই বাঁচলাম... কী আর বলব! আপনার সঙ্গে আমার আগেও দেখা হয়েছে। আমার নাম আবোগিন... গুচেভদের ওখানে আপনার সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়েছিল, মনে আছে? গত গ্রীষ্মে? আপনার দেখা পেয়ে

সত্যিই খুব খুশি হলাম। এক্ষুনি আমার সঙ্গে আসতে হবে। দয়া করুন... আমার স্ত্রী ভীষণ অসুস্থ। আমার গাড়ি হাজির রয়েছে।'

আগন্তুকের হাবভাব কথাবার্তা থেকে বোঝা যাচ্ছিল সে খুব একটা মানসিক উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে। তার নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন, গলার আওয়াজ কাঁপছে, কথাও বলছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, মনে হচ্ছে যেন আগুনে পোড়ার হাত থেকে কিংবা পাগলা কুকুরের তাড়া খেয়ে কোনক্রমে সে এইমাত্র বেঁচে এসেছে। শিশুর মত কোন রকম ভনিতা না করে সে কথা কয়ে যাচ্ছে — ভাঙা ভাঙা অসম্পূর্ণ তার কথা আতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তির মত। মাঝে মাঝে এমন কথাও বলছে আসল বক্তব্যের সঙ্গে যার কোন সম্পর্কই নেই।

'আপনাকে বাড়িতে পাবো না ভেবে তো ঘাবড়িয়েই গিয়েছিলাম,' সে বলে চলল। 'কী দুর্ভাবনায় যে এতটা পথ এসেছি... কোটটা পরে ফেলুন, দোহাই আপনার, চলে আসুন ... ঘটনাটা এই: পাপচিনস্কি আলেক্সান্দ্র সেমিওনভিচ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আপনি তো তাকে চেনেন। আমরা কিছুক্ষণ কথাবার্তা কয়ে চায়ের টেবিলে গিয়ে চা পান করতে বসেছি হঠাৎ, আমার স্ত্রী বুকে হাত দিয়ে চিৎকার করে উঠে সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারে এলিয়ে পড়ল। আমরা দুজনে ধরাধরি করে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। তার রগ দুটোয় এমোনিয়া ঘষে দিলাম... জল ছিটলাম, কিন্তু মড়ার মত অসাড় হয়ে সে পড়ে রয়েছে। আমার তো ভয় হচ্ছে, শিরাটিরা ছিঁড়ে গেল না তো? দয়া করে চলে আসুন... ওর বাবাও অমনি শিরা ছিঁড়ে মারা গেছেন...'

কিরিলভ চুপচাপ শুনে গেল। ভাবটা যেন সে রুশ ভাষা বোঝেই না।

আবার যখন আবোগিন পাপচিনস্কির ও তার শ্বশুরের কথা তুলে অন্ধকারে কিরিলভের হাতটা সন্ধান করতে লাগল, ডাক্তার মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে নির্বিকারভাবে ধীরে ধীরে বলল:

'অত্যন্ত দুঃখিত, আমি যেতে পারছি না। পাঁচ মিনিট আগে আমার... আমার ছেলে মারা গেছে।'

'না না, সে কি!' এক পা পিছু হটে আবোগিন অস্ফুটস্বরে বলল। 'হা ভগবান, কী দুঃসময়ে আমি এসে হাজির হলাম। উঃ, আজকের দিনটা কী

দুর্দিন ... বাস্তবিক, মনে রাখার মত। কী যোগাযোগ ... কেউ কি এ কথা ভাবতে পেরেছিল!'

সে দরজার হাতলটা ধরল, তার মাথাটা নুয়ে পড়েছে যেন দারুণ ভাবনায়। স্পষ্টতই সে ঠিক করতে পারছে না চলে যাবে, না আসার জন্যে ডাক্তারকে অনুনয় চালিয়ে যাবে।

'শুনুন!' কিরিলভের সার্টের আস্তিনটা ধরে আবেগভরে সে বলতে লাগল। 'আপনার অবস্থাটা সম্পূর্ণ বুঝছি। এই সময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে আমি যে কত লজ্জিত তা ভগবানই জানেন। কিন্তু আমার উপায় কী বলুন। আপনি নিজেই ভেবে দেখুন, আমি কোথায় যাই। আপনি ছাড়া এ অঞ্চলে আর একজনও ডাক্তার নেই। দোহাই আপনার, একবার আসুন। নিজের জন্যে আমি আপনাকে ডাকছি না ... আমার নিজের কোন রোগ হয়নি!'

দুপক্ষই কিছুক্ষণ চুপচাপ। কিরিলভ আবোগিনের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। দু-এক মিনিট ওইভাবে থেকে হলঘর থেকে ধীরে ধীরে সে চলে এল বসার ঘরে। অন্যমনস্কভাবে ও অনিশ্চিত যান্ত্রিক পদক্ষেপে যেভাবে সে ঘরের ভিতর প্রবেশ করল এবং ঘরে ঢুকে নেভানো বাতির ঢাকার কিনারটা যে রকম মনযোগের সঙ্গে টেনে সোজা করল, টেবিলের মোটা বইটায় যেভাবে চোখ বোলাতে লাগল, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল, সেই সময়ে অন্তত তার ইচ্ছা অনিচ্ছা কামনা বাসনা বলতে কিছুই নেই, সে তখন কিছুই ভাবছে না। হয়ত সে ভুলেই গেছে হলঘরে একজন আগন্তুক অপেক্ষা করছে। ঘরের ভিতরকার আবছা আলো ও নিস্তব্ধতা আরো বেশি করে যেন তার বিমূঢ়তা বাড়িয়ে দিল।

বসার ঘর থেকে পড়ার ঘরে যাবার সময় ডান পাটা যতটুকু তোলা দরকার তার চেয়ে বেশি তুলে সে দরজাটার জন্যে হাতড়াতে লাগল। তার সর্বাঙ্গে বিমূঢ় ভাব পরিস্ফুট। মনে হচ্ছে যেন অচেনা কোন বাড়িতে এসে পড়েছে কিংবা জীবনে এই প্রথম মদ্যপান করেছে আর তার অনভ্যস্ত প্রতিক্রিয়ায় হতবুদ্ধি হয়ে যাচ্ছে। পড়ার ঘরের একটা দেয়ালে বইয়ের আলমারিগুলোর উপর চওড়া একফালি আলো এসে পড়েছে, আলোটা আর সেইসঙ্গে কার্বলিক এসিড ও ঈথারের উগ্র গন্ধ শোবার ঘর থেকে আসছে, শোবার ঘরের দরজাটা

হাট করে খোলা... টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে ডাক্তার বসে পড়ল, আলোর রেখা অনুসরণ করে বইগুলোর দিকে সে একবার তাকাল, তারপর আবার উঠে দাঁড়িয়ে শোবার ঘরে চলে গেল।

এইখানটা, এই শোবার ঘরের ভিতরটা মৃত্যুর মত স্তব্ধ। এ ঘরের নগণ্যতম জিনিসটা দেখে বোঝা যাচ্ছে কিছুক্ষণ আগে এখানে কী ঝড় বয়ে গেছে। সেই ঝড় এখন ক্লান্ত একটা অবসাদে স্তিমিত। সব কিছু এখন স্থির নিশ্চল। একটা টুলের উপর একরাশি শিশি বোতলের মাঝখানে একটা মোমবাতি, ও দেরাজের উপর মস্ত একটা বাতিদান থেকে সারা ঘরটা আলোকিত হচ্ছে। ঠিক জানলার নিচে বিছানার উপর একটি ছোট ছেলে শুয়ে রয়েছে, তার চোখদুটি বিস্ফারিত, মুখে চকিত বিস্ময়। ছেলেটি স্থির নিস্পন্দ কিন্তু তার খোলা চোখদুটো প্রতি মুহূর্তে যেন কালি মেরে আসছে এবং ক্রমেই কোটরস্থ হচ্ছে। মা বিছানার পাশে নতজানু হয়ে বসে, শয্যাবস্ত্রে তার মুখটা ঢাকা, হাতদুটো দিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে রয়েছে। ছেলের মত মাও নিস্পন্দ, কিন্তু তার হাতদুটোয় তার দেহের রেখায় না জানি কী অস্থিরতা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে! সে যেন তার সমস্ত সত্তা দিয়ে লুব্ধ আগ্রহে বিছানাটা আঁকড়ে রয়েছে, মনে হচ্ছে তার অবসন্ন দেহের এই যে শান্ত স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীটি অনেক কষ্টে সে আবিষ্কার করেছে, এটি সে হারাতে চায় না। কম্বল, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, জলের গামলা, মেঝের উপরে গড়িয়ে পড়া জল, এখানে ওখানে ছড়ানো চামচ, ব্রাশ, সাদা চুনের জল ভর্তি বোতল, এমনকি ঘরের বদ্ধ ও ভারি বাতাস—সবকিছুই যেন গভীর ক্লান্তিতে শ্রান্ত ও অবসন্ন।

ডাক্তার স্ত্রীর পাশে একবার দাঁড়াল। ট্রাউজারের পকেটে হাতদুটো চালিয়ে ঘাড়টা কাত করে তাকাল সন্তানের দিকে। তার মুখের ভাব নির্বিকার। দাড়িতে যে জলবিন্দুগুলো ঝিকমিক করছে তাতেই শুধু বোঝা যাচ্ছে কিছুক্ষণ আগে সে কেঁদেছে।

অপ্রীতিকর যে বীভৎসতা মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত শয়নকক্ষে তার লেশমাত্র নেই। ঘরের ভিতরকার নিথরতায়, মায়ের ভঙ্গীতে, পিতার সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট নির্বিকারত্বে—কী যেন ছিল যা প্রায় মনোহর, যা মনকে নাড়া দেয়। মানবীয় শোকের এই সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য এমনিতেই সহজবোধ্য নয়, বর্ণনাতীত তো বটেই। একমাত্র সঙ্গীতের মাধ্যমে হয়ত তার কিছুটা

বোঝান যায়। শোকার্ত এই নীরবতা তাই সুন্দর। কিরিলভ ও তার স্ত্রী দুজনেই নীরব, কাঁদছেও না। মনে হচ্ছে গুরুভার শোক ছাড়াও তারা তাদের বর্তমান অবস্থার কাব্যময়তায় বিহ্বল। যথাকালে যেমন তাদের যৌবনও চলে গেছে, একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সন্তানলাভের সম্ভাবনাও চিরতরে বিলুপ্ত হল। ডাক্তারের বয়স চুয়াল্লিশ, এরই মধ্যে তার মাথার চুলে পাক ধরেছে এবং চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে। তার বিবর্ণ রুগ্না স্ত্রীরও পঁয়ত্রিশ চলছে। আন্দ্রেই তাদের একমাত্র সন্তানই ছিল না, সে তাদের শেষ সন্তানও।

ডাক্তারের প্রকৃতি তার স্ত্রীর বিপরীত। মানসিক কষ্টের সময় কাজের মধ্যে যারা ডুবে থাকতে চায় ডাক্তার তাদের দলে। স্ত্রীর পাশে কয়েকমিনিট দাঁড়িয়ে থেকে শোবার ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল। চৌকাঠ পার হবার সময় ডান পাটা আবার অকারণে একটু বেশি উঁচু করল। এবারে গেল সে ছোট একটি কামরায়। ঘরটার অর্ধেকটাই জুড়ে রয়েছে একটা সোফা। সেখান থেকে গেল রান্নাঘরে। উনুনের কাছটায় ও পাচকের বিছানার পাশে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে মাথা নিচু করে একটা ছোট দরজা পার হয়ে আবার সে ফিরে এল হলঘরে।

হলঘরে আবার সে সাদা মাফলার ও বিবর্ণ মুখটার সম্মুখীন হল।

'শেষ অবধি তাহলে এলেন,' আবোগিন হাঁফ ছেড়ে বলল। সঙ্গে সঙ্গে হাতটা বাড়িয়ে দরজার হাতলটা ধরল। 'অনুগ্রহ করে আসুন তাহলে!'

ডাক্তার চমকে উঠল। ভালো করে তাকে দেখবার পর ডাক্তারের সব কথা মনে পড়ল ...

'কিন্তু আমি তো বলেই দিয়েছি আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব,' ডাক্তার হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। 'কী আশ্চর্য!'

'আমি পাষাণ নই ডাক্তারবাবু, আপনার অবস্থা আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। আপনার জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত।' মাফলারে হাতদুটো রেখে অনুনয়ের সুরে আবোগিন বলল। 'কিন্তু আমার জন্যে আমি আপনাকে ডাকছি না। আমার স্ত্রী মারা যাচ্ছে। আপনি যদি তার সেই আর্তনাদ শুনতে পেতেন, যদি তার মুখখানা দেখতেন, বুঝতে পারতেন কেন আমি এত করে সাধাসাধি করছি। হা ভগবান, আমি ভাবলাম আপনি

পোষাক বদলাতে গেলেন! ডাক্তারবাবু, সময়ের বড় দাম। দোহাই আপনার, আসুন!'

'আমি যেতে পারব না!' বসার ঘরের দিকে যেতে যেতে ডাক্তার প্রতিটি কথা স্পষ্টভাবে বলল।

আবোগিন পিছনে পিছনে গিয়ে তার সার্টের আস্তিনটা ধরে ফেলল। 'আমি বুঝতে পারছি আপনি খুব বিপদে পড়েছেন, কিন্তু আমি আপনাকে দাঁতের ব্যাথা সারাতে বা রোগ ধরে দেবার জন্যে ডাকছি না, মৃত্যুর কবল থেকে একটা মানুষকে বাঁচাবার জন্যে ডাকছি।' কাতরকণ্ঠে সে বলে চলল: 'একটা মানুষের জীবন ব্যক্তিগত দুঃখশোকের ওপরে। মনের বল আর বীরত্বের পরিচয় দিন! মানবতার আবেদনে সাড়া দিন!'

'মানবতা — মানবতা তো শাঁখের করাত,' কিরিলভ চটে উঠে বলল। 'সেই মানবতার দোহাই দিয়েই আমি আপনাকে বলছি আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করবেন না। আশ্চর্য, এখন আমার দাঁড়িয়ে থাকতেই কষ্ট হচ্ছে, অথচ মানবতার নামে এখন আমাকে শাসাবার চেষ্টা করছেন। ঠিক এই মুহূর্তে আমার দ্বারা কিছুই করা সম্ভব নয়... না কিছুতেই আমি যাবো না। তাছাড়া আমার স্ত্রীর কাছে থাকার মতো কেউই নেই। না, না, আমি যাবো না ...'

হাত দিয়ে আগন্তুককে ঠেকিয়ে কিরিলভ এক পা পিছিয়ে এল।

'দোহাই আপনার, আমাকে যেতে বলবেন না,' হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে সে বলতে লাগল। 'আমাকে মাপ করবেন ... আইনের ত্রয়োদশ খণ্ডে ডাক্তারী পেশার কর্তব্য অনুসারে আমি যেতে বাধ্য, আপনি আমার কোটের কলার জোর করে ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেতে পারেন। বেশ, তাই যদি চান, করুন ... কিন্তু ... আমার দ্বারা কিছুই হবে না ... আমার এখন কথা বলারও অবস্থা নেই ... আমায় মাপ করুন ...'

আরেকবার ডাক্তারের সার্টের আস্তিনটা ধরে আবোগিন বলল, 'ডাক্তারবাবু, ওইভাবে কেন কথা বলছেন? ত্রয়োদশ খণ্ড সম্বন্ধে আমি মোটেই মাথা ঘামাচ্ছি না। আপনার ইচ্ছে না থাকলে জোর করে আপনাকে নিয়ে যাবার কোনো অধিকার আমার নেই। আপনি যদি আসতে চান তো আসুন। না আসেন, কী আর করা যাবে। আমার আর্জি আপনার ইচ্ছা

অনিচ্ছার কাছে নয়, আপনার হৃদয়ের কাছে। একটি তরুণী মারা যাচ্ছে। আপনি বললেন আপনার ছেলে এইমাত্র মারা গেছে, তাহলে তো আপনারই আমার কষ্ট সবচেয়ে বেশি করে বোঝা উচিত!'

আবেগে ও উত্তেজনায় আবোগিনের কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল। কথার চেয়ে তার আবেগকম্প্র কণ্ঠস্বরের ওঠানামা অনেক বেশি মর্মস্পর্শী। আর যাই হোক, আবোগিনের মধ্যে কপটতা ছিল না, তা সত্ত্বেও কিন্তু তার কথাগুলো মনে হচ্ছিল কৃত্রিম ও নিষ্প্রাণ। ডাক্তারের বাড়ির পরিবেশে আর কোথাও এক মুমূর্ষু মহিলা সম্পর্কে তার গালভরা কথাগুলো বিসদৃশ ঠেকছিল। সে নিজেও যে তা বুঝছিল না, তা নয়। সেইজন্যে, পাছে তাকে ভুল বোঝা হয়, তার গলার আওয়াজটা সাধ্যমত করুণ ও কোমল করে, কথায় যা সে পারল না কথা বলার আন্তরিক ভঙ্গী দিয়ে নিজের কাজ হাসিল করার চেষ্টা করল। কথা, যতই তা সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হোক না কেন, কেবল নির্বিকার উদাসীনের মনে সাড়া জাগাতে পারে। সত্যি যে সুখী বা শোকার্ত বিশুদ্ধ কথায় প্রায়ই সে তৃপ্তি পায় না। সেইজন্যেই নীরবতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুখ বা দুঃখের চরম প্রকাশ। প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পরকে তখনই ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যখন তারা নির্বাক। সমাধিক্ষেত্রের আবেগপূর্ণ আন্তরিক ভাষণ যাদের স্পর্শ করে তারা অনাত্মীয়। মৃতের বিধবা স্ত্রীর কাছে বা তার সন্তান সন্ততির কাছে তা নিষ্প্রাণ ও অবান্তর।

কিরিলভ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। আবোগিন যখন মহৎ ডাক্তারী পেশা সম্পর্কে আরো কিছু যেমন, ডাক্তারদের পরোপকারিতা, মানবিকতা, ইত্যাদি বলে যেতে লাগল তখন ডাক্তার বিমর্ষভাবে জিজ্ঞাসা করল:

'কতদূরে যেতে হবে?'

'মাত্র তেরো চোদ্দ ভের্স্ত। আমার ঘোড়াগুলো খুব ভালো। আপনাকে কথা দিচ্ছি, ডাক্তার, এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনি গিয়ে ফিরে আসতে পারবেন। মাত্র এক ঘণ্টা!'

মানবতা ও ডাক্তারী পেশা সম্পর্কে বড় বড় বুলির চেয়ে এই শেষের কথাটায় ডাক্তার অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করল। মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করে ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

'আচ্ছা বেশ! চলুন!'

ডাক্তার দ্রুত পদক্ষেপে তার পাঠকক্ষে প্রবেশ করল। এখন সে নিজেকে সামলিয়ে নিয়েছে। ক্ষণেক পরেই একটা লম্বা ফ্রককোট পরে সে হাজির হল। উৎফুল্ল আবোগিন তার পাশে পাশে হন্তদন্ত হয়ে যেতে যেতে কোটটা তাকে পরিয়ে দিতে সহায়তা করল। তারপর তার সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরুল।

বাইরে অন্ধকার, তবে তা হলঘরের অন্ধকারের থেকে ফিকে। ডাক্তারের দীর্ঘ নুয়ে পড়া দেহ, সরু দাড়ি, খাড়া ও বাঁকা নাকটা অন্ধকারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আবোগিনের বিবর্ণ মুখটা ছাড়াও এখন দেখা গেল তার বিরাট মাথাটা আর মাথায় ছাত্রদের ছোট টুপি। তা দিয়ে মাথার সামান্য অংশই ঢাকা পড়ছে। মাফলারের সামনের সাদা অংশটুকু শুধু দেখা যাচ্ছে, পিছনের বাকি অংশটা লম্বা চুলে ঢাকা।

'আপনার এই সদাশয়তার সম্মান কী করে করতে হয় আমি জানি, দেখে নেবেন,' আবোগিন ডাক্তারকে গাড়িতে বসিয়ে দিতে দিতে বিড়বিড় করে বলল। 'এক্ষুনি আমরা পেৌঁছিয়ে যাব। লুকা, শুনছিস বাবা, গাড়িটা জোরসে চালা — যত জোরে পারিস, বুঝলি।'

গাড়োয়ান জোরেই চালাল। প্রথমে তারা ফেলে গেল হাসপাতাল প্রাঙ্গণের সার সার কতকগুলো কুৎসিত বাড়ি। সেগুলো সবই অন্ধকার। শুধু প্রাঙ্গণের পিছনদিককার একটা জানলা থেকে একফালি আলো সামনের বাগানটায় এসে পড়েছে আর হাসপাতালের একটা বাড়ির উপরতলার তিনটে জানলা থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। জানলার কাঁচগুলো তার ফলে পরিবেশের চেয়ে বেশি বিবর্ণ দেখাচ্ছে। এর পরেই গাড়িটা জমাট অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেল। শুধু ভিজে মাটির সোঁদা ব্যাঙের ছাতার গন্ধ, তারই সঙ্গে পাতার মর্মর শব্দ ভেসে আসছে। চাকার শব্দে গাছের পাতার মধ্যে কাকগুলো চমকে জেগে উঠে করুণভাবে চিৎকার করে উঠল, চিৎকার শুনে মনে হল তারা যেন জানে ডাক্তারের ছেলে মারা গেছে আর আবোগিনের স্ত্রী অসুস্থ। শীঘ্রই দেখা দিল জঙ্গলের বদলে ছাড়া ছাড়া গাছ, তারপর ঝোপঝাড়। নিমেষের জন্যে দেখা গেল একটা পুকুর, তার কালো জলে প্রকাণ্ড ছায়াগুলো নিথর নিশ্চল। এর পরেই দুধারে খোলা মাঠ। দূরাগত কাকের ডাক অস্পষ্ট হতে হতে ক্রমে মিলিয়ে গেল।

কিরিলভ ও আবোগিন সারাপথ প্রায় কথাই কইল না। একবার মাত্র আবোগিন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল:

'মর্মান্তিক অবস্থা! যখন আপনার লোককে হারাবার ভয় থাকে, তখন তাকে যতটা ভালোবাসি, সাধারণ অবস্থায় তার কিছুই বাসি না।'

ছোট নদীটা পার হবার জন্যে গাড়িটার গতি যখন মন্থর হয়ে এল, কিরিলভ হঠাৎ চমকে উঠে আসনে নড়ে বসল। মনে হল জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দে সে ভয় পেয়েছে।

'দেখুন, আমায় ছেড়ে দিন,' বিষণ্ণভাবে সে বলল, 'পরে আমি আপনার কাছে আসছি। আমি শুধু আমার সহকারীকে আমার স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিতে চাই। বুঝছেন তো, আমার স্ত্রী একেবারে একা রয়েছেন।'

আবোগিন কোনই মন্তব্য করল না। গাড়ির চাকায় পাথরের ধাক্কা লাগতে গাড়িটা দুলে উঠল। তীরের বালি পেরিয়ে গাড়িটা আবার এগিয়ে চলল। নিজের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে কিরিলভ বসে ছটফট করতে লাগল আর চারদিকে তাকাল। পিছনে তারার অনুজ্জ্বল আলোয় দেখা যাচ্ছিল পথ ও ক্রমশ মিলিয়ে-যাওয়া নদীর ধারের ঝোপঝাড়গুলো। ডানদিকে এক প্রান্তর, আকাশের মতো অবাধ তার বিস্তার। দূরে অস্পষ্ট আলোকবিন্দু ইতস্তত জ্বলছে নিভছে, খুব সম্ভব জলায় আলেয়ার আলো। বাঁ দিকে রাস্তার সমান্তরালে অনুচ্চ পাহাড়। জায়গাটা ঝোপঝাড় আগাছায় ভর্তি। এর উপর সামান্য কুয়াসার ঘোমটার আড়ালে প্রকাণ্ড বড়ো বাঁকা লাল চাঁদ নিশ্চল হয়ে রয়েছে। তাকে ঘিরে টুকরো টুকরো মেঘ। তারা যেন চারদিক থেকে চাঁদকে নজরবন্দী করে রেখেছে, যাতে পালিয়ে না যায় সেইজন্যে যেন তাকে পাহারা দিচ্ছে।

সারা প্রকৃতি যেন রোগে ও হতাশায় আচ্ছন্ন। ভ্রষ্টা নারী অন্ধকার ঘরে যখন একা থাকে তখন যেমন সে আপ্রাণ চেষ্টা করে অতীতের কথা মনে না আনতে, তেমনি, শীতের অনিবার্য আক্রমণের আশংকায় উদাসীন পৃথিবী গ্রীষ্ম ও বসন্তের স্মৃতি থেকে পরিত্রাণ চাইছে কিন্তু পাচ্ছে না। যে দিকেই তাকাও না কেন, সারাপ্রকৃতিটা মনে হচ্ছে অতল গভীর একটা খাদ, যেখানে না আছে একটু আলো, না আছে একটু তাপ, তার ভেতর থেকে কিরিলভ আবোগিন তো দূরের কথা ওই লাল চাঁদটা পর্যন্ত কখনো উঠে আসতে পারবে না...

গাড়িটা যতই গন্তব্যের কাছাকাছি হয়ে আসছে, আবোগিন ততই হয়ে উঠছে অধৈর্য। কখনো সে এদিকে ওদিকে নড়ে বসছে। কখনো লাফিয়ে উঠছে। কখনো গাড়োয়ানের কাঁধের উপর দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখছে। অবশেষে গাড়িটা একটা ফটকের সম্মুখীন হল। ডোরাকাটা ক্যানভাসের পর্দা দিয়ে অলিন্দটা সুন্দরভাবে সাজানো। দোতলার জানলাগুলো দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। সে দিকে নজর পড়তেই আবোগিনের নিশ্বাস ঘন ঘন ও জোরে জোরে পড়তে লাগল।

উত্তেজনায় হাতদুটো রগড়াতে রগড়াতে ডাক্তারকে নিয়ে হলঘরে ঢোকার সময় সে বলল, 'কিছু যদি ঘটে, তার ধাক্কা কখনো আমি সামলাতে পারব না। কিন্তু তেমন কোন সাড়াশব্দ তো পাচ্ছি না, তাহলে এখনো অবধি নিশ্চয় সব ঠিকই আছে,' এই বলে সে নিস্তব্ধতায় কান খাড়া করে রইল।

হলঘরে পায়ের বা গলার কোনো আওয়াজই নেই। মনে হচ্ছে আলো ঝলমল করা সত্ত্বেও সারা বাড়িটা যেন ঘুমিয়ে রয়েছে। এতক্ষণ ডাক্তার ও আবোগিন ছিল অন্ধকারে, এই প্রথম তারা পরস্পরকে ভালোভাবে দেখতে পেল। ডাক্তার দীর্ঘকায়, একটু কুঁজো, পোষাক আশাক আলুথালু। দেখতে সে মোটেই ভালো নয়। নিগ্রোদের মতো ভারি ভারি ঠোঁট, খর্গনাসা আর নির্বিকার পরিশ্রান্ত চাহনি — সব মিলিয়ে কেমন একটা রুক্ষনির্মম অপ্রীতিকর ভাব ফুটিয়ে তুলছে। তার মাথার চুলের অযত্ন, বসে-যাওয়া রগ, অকালপক্ক বিরল লম্বা দাড়ি, দাড়ির ফাঁকে ফাঁকে চিবুক, মাটির মতো বিবর্ণ ত্বক, অসাবধানী আনাড়ীর মতো ব্যবহার — সব কিছুতেই তার ঔদাসীন্য, দৈন্যদশা, জীবন ও জনসাধারণ সম্পর্কে ক্লান্তি সুপরিস্ফুট। তার শুষ্ক চেহারার দিকে তাকালে কিছুতেই মনে হয় না, এই লোকটার স্ত্রী আছে, সন্তানের জন্য এ লোকটা কাঁদতে পারে। আবোগিন কিন্তু ওর থেকে একেবারে ভিন্ন ধরনের। মোটা-সোটা, হৃষ্টপুষ্ট সুপুরুষ সে, চুলগুলো সোনালী, মাথাটা বড়, মুখাবয়ব ফোলা ফোলা হওয়া সত্ত্বেও বেশ নজরে পড়ে। হালফ্যাসনের পোষাকে সে সুসজ্জিত। তার হাবেভাবে তার ফিটফাট ফ্রককোটে, কেশরের মত একমাথা চুলে একটা আভিজাত্য একটা পৌরুষ ফুটে বেরুচ্ছে। মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে সে চলে, কথা বলে মিষ্টি ভারি

গলায়। গলার মাফলারটা যেভাবে সে সরিয়ে দেয়, কিংবা মাথার চুলটা যেভাবে সে ঠিক করে, তাতে প্রায় মেয়েদের মতো মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। মুখের ফ্যাকাশেভাবে আর ওভারকোট খুলতে খুলতে সিঁড়ির দিকে শিশুর মতো ভীতিবিহ্বল চাহনিতে তার সম্পর্কে সাধারণ ধারণা মোটেই নষ্ট হোলো না, তার সমস্ত অবয়বে সযত্ন লালিত যে স্বাস্থ্য ও আত্মপ্রত্যয় পরিস্ফুট, এর ফলে তা মোটেই ক্ষুন্ন হোলো না।

'কী ব্যাপার, কাউকে তো দেখছি না, একটা টুঁ শব্দও তো শুনছি না,' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সে বলল। 'কোনো চেঁচামেচিও তো নেই। আশা করি ...'

হলঘর পার হয়ে সে ডাক্তারকে একটা বড় ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। ঘরটা জুড়ে কালো রঙের বিরাট এক পিয়ানো। উপরের সিলিং থেকে ঝুলছে সাদা কাপড়ে আলগাভাবে ঢাকা একটা ঝাড়লণ্ঠন। এই ঘর থেকে তারা গেল ছোট একটা বসার ঘরে। ঘরটা বেশ আরামপ্রদ ও মনোরম। মৃদু গোলাপী আলোয় আলোকিত।

'ডাক্তারবাবু, এখানে একটু বসুন,' আবোগিন বলল। 'আমি এক মিনিটের মধ্যে আসছি। আপনি এসেছেন, এই খবরটা শুধু ওদের দিয়ে আসি।'

কিরিলভ একাই থাকল। বসবার ঘরের এই বিলাস ব্যবস্থা, আলোর সুখপ্রদ অস্পষ্টতা, অজানা অচেনা একটা বাড়িতে তার এই উপস্থিতি, যা নিজের থেকেই একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা—মনে হচ্ছে কোনো কিছুই তার মনে রেখাপাত করছে না। একটা আরাম চেয়ারে বসে সে তার কার্বলিক এসিডে পোড়া আঙুলগুলো নিরীক্ষণ করতে লাগল। লাল রঙের আলোর ঢাকা কিংবা চেলো বাজনার কেস, কিছুই তার নজরে পড়ল না, তবে টিকটিক শব্দ অনুসরণ করে ঘড়িটার দিকে তাকাতে সে দেখতে পেল একটা নেকড়ের মূর্তি, আবোগিনের মতো বৃহদাকার ও পরিপুষ্ট।

চারদিক নিস্তব্ধ। দূরে অন্য কোন ঘর থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'এ্যাঁ', সঙ্গে সঙ্গে একটা কাঁচের পাল্লার, স্পষ্টতই কোনো পোষাক আলমারির, ঝনঝন শব্দ হল। তারপর আবার সব আগের মতো নিস্তব্ধ নিঝুম। মিনিট

পাঁচেক পরে কিরিলভ হাত থেকে চোখ তুলে যে দরজা দিয়ে আবোগিন বেরিয়ে গেছে সেদিকে তাকাল।

দরজার সামনে আবোগিন দাঁড়িয়ে রয়েছে, তবে যে আবোগিন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল এ সে আবোগিন নয়। তার সেই মার্জিত পরিতৃপ্ত দৃষ্টি অন্তর্হিত হয়েছে। তার হাত মুখ, দাঁড়ানোর ভঙ্গী সব কিছুতে এমন একটা অপ্রীতিকর ভাব জড়ানো যাকে ঠিক আতঙ্কও বলা চলে না, দৈহিক যন্ত্রণার অভিব্যক্তিও বলা চলে না। তার নাকটা, ঠোঁটদুটো, গোঁফজোড়া, তার সর্বাঙ্গ খালি কুঁচকে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে সেগুলো যেন তার মুখ থেকে চাইছে ছিটকে বেরিয়ে যেতে। তার চোখদুটোয় বেদনার আভাস ...

ভারি ভারি লম্বা পা ফেলে সে বসবার ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল, তারপর নুয়ে পড়ে গোঙাতে গোঙাতে দুহাতের মুঠিদুটো নাড়াতে লাগল।

'আমায় প্রতারণা করেছে!' প্রতারণা কথার মাঝের অংশে বেশি জোর দিয়ে সে চিৎকার করে উঠল। 'আমায় প্রতারণা করেছে! আমায় ছেড়ে পালিয়েছে! তার অসুখ, আমাকে দিয়ে ডাক্তার ডাকতে পাঠানো — কিছু নয়, ওসব পাপচিন্স্কি বাঁদরটার সঙ্গে পালিয়ে যাবার ফিকির। হা ভগবান!'

আবোগিন থপ থপ করে ডাক্তারের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার মুখের সামনে, গোদা গোদা হাতের মুঠোদুটো নাড়াতে নাড়াতে চেঁচাতে লাগল:

'আমাকে ছেড়ে গেল! আমাকে প্রতারণা করল! কী দরকার ছিল এত মিথ্যের?! উঃ ভগবান! ভগবান! কেন এই জঘন্য জুয়াচুরি, এই নিমকহারামি, এই শয়তানি? কী তার অনিষ্ট করেছি? আমায় ছেড়ে চলে গেল!'

তার দুগাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। গোড়ালিতে ভর করে সে ঘুরে দাঁড়াল, ঘরের মধ্যে লাগল পায়চারি করতে। ছোট ফ্রককোট, সরুপাওয়ালা ফ্যাসনদুরস্ত প্যাণ্ট, যার ফলে পাদুটোকে তার দেহের তুলনায় বড় বেশি শীর্ণ দেখায়, বিরাট মাথা ও কেশরের মতো একমাথা চুল — এ সবে এখন যেন তাকে আরও বেশি করে সিংহের মতো দেখাচ্ছে। ডাক্তারের নির্বিকার মুখে কৌতূহলী দৃষ্টির একটা ঝলক খেলে গেল। দাঁড়িয়ে উঠে আবোগিনের দিকে তাকাল সে।

'কিন্তু রোগী কই?' সে প্রশ্ন করল।

'রোগী! রোগী!' সমানে ঘুষি চালাতে চালাতে আবোগিন কখনো হেসে

কখনো কেঁদে চেঁচাতে লাগল। 'সে রোগী নয়। একটা হতচ্ছাড়ী! উঃ কী নীচ! কী কদর্য! মনে হয় শয়তান নিজেও এর চেয়ে জঘন্য কিছু আবিষ্কার করতে পারত না! যাতে পালাতে পারে সেইজন্যে আমাকে কিনা ভাগিয়ে দিল, আর পালাল কার সঙ্গে — ওই ফচকে বাঁদরটার, অসহ্য ওই ভেড়ুয়াটার সঙ্গে? উঃ ভগবান! এর চেয়ে সে মরল না কেন? কখনোই আমি এই ধাক্‌কা সামলে উঠতে পারব না, কখ্‌খনো না!'

ডাক্তার খাড়া হয়ে দাঁড়াল। তার চোখদুটো জলে ভরা, ঘন ঘন চোখের পাতা পড়ছে। মুখ নড়ার সঙ্গে তার সরু দাড়িটা ডাইনে বাঁয়ে দুলতে লাগল।

'মাপ করবেন, এ সবের কী অর্থ?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল। 'আমার ছেলে মারা গেছে, আমার স্ত্রী শোকে অজ্ঞান, বাড়িতে সে একা রয়েছে... আমি নিজেও আর দাঁড়াতে পারছি না, গত তিনরাত আমার চোখে ঘুম নেই ... অথচ এখানে এসে কী দেখছি? কুৎসিত একটা প্রহসনের অভিনেতা হিসেবে আমাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি যেন স্টেজের একটা আসবাব। আমি ... আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না!'

আবোগিন একটা মুঠি খুলে দলাপাকানো একটা কাগজ মেঝের উপর ফেলে দিল, তারপর সেটাকে এমনভাবে পায়ে দলতে লাগল যেন সেটা পোকামাকড় আর তাকে সে নষ্ট করতে চাইছে।

'আশ্চর্য, আমি কিছুই লক্ষ্য করিনি, কিছুই বুঝিনি,' দাঁতে দাঁত দিয়ে মুখের সামনে হাতের মুঠিটা নাড়াতে নাড়াতে এমন ভাব করে সে বলতে লাগল যেন তার পাকা ধানে কেউ মই দিয়ে গেছে। 'রোজ সে কীভাবে আসত আমি লক্ষ্যই করিনি। লক্ষ্যই করিনি আজ যে সে গাড়িতে করে এসেছিল। গাড়িতে আসার মতলব কী? হায়, আমি কী অন্ধ গাড়ল, আমার তা নজরেই পড়ল না। কী অন্ধ গাড়ল আমি!'

'আমি... আমি কিছুই বুঝছি না,' ডাক্তার বিড়বিড় করে বলল। 'এ সবের অর্থ কী? এ তো রীতিমত অপমান, মানুষের দুঃখ নিয়ে তামাসা! এও কি কখনো সম্ভব... জীবনে এ-রকম করা কখনো শুনিনি!'

যে লোক সবেমাত্র বুঝতে শুরু করেছে যে তাকে গভীরভাবে অপমান করা হয়েছে, তার মতো ভোঁতা বিস্ময়ের ভাব নিয়ে ডাক্তার ঘাড়টায় ঝাঁকি

দিয়ে হাতদুটো সামনের দিকে মেলে দিল। তার কিছু করার বা বলার শক্তি নেই, আরাম চেয়ারে গা এলিয়ে সে বসে পড়ল।

'তাহলে আমাকে আর ভালোবাস না, আরেকজনকে ভালোবাস — বেশ তার জন্যে এই প্রতারণা কেন, কেন এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা?' ছলছল চোখে আবোগিন বলল। 'এতে কী লাভ হল? কেনই বা একাজ করলে? কখনো তোমার উপর কি কোনো অবিচার করেছি? ডাক্তারবাবু!' কিরিলভের কাছে এগিয়ে গিয়ে সে কাতরভাবে বলল। 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার এই দুর্ভাগ্য আপনি স্বচক্ষে দেখলেন। আপনার কাছে আমি সত্য গোপন করব না। আপনার কাছে শপথ করে বলছি, ওই মেয়েকে আমি ভালোবাসতাম, আমি তাকে মাথায় করে রাখতাম, আমি ছিলাম তার কেনা গোলাম। তার জন্যে আমি সব খুইয়েছি। আত্মীয়দের সঙ্গে ঝগড়া করেছি, কাজকর্ম জলাঞ্জলী দিয়েছি, গানবাজনা ছেড়েছি, তার এমন এমন দোষত্রুটি মাপ করেছি যা আমার মা বা বোনেদের মধ্যে দেখলে রক্ষা রাখতাম না ... চোখ বড় করে কোনোদিন তার দিকে তাকাইনি পর্যন্ত ... আমার ব্যবহারে কখনো কোনো ত্রুটি রাখিনি! কিসের জন্যে এত মিথ্যে ব্যবহার? আমি তো ভালোবাসা দাবি করিনি। তবে কেন এই নীচ প্রতারণা? আমাকে যদি নাই ভালোবাসতে, খোলাখুলি বললে না কেন, এই সব ব্যাপারে আমার মনোভাব তোমার তো জানা ...'

সজল চোখে, কাঁপতে কাঁপতে আবোগিন ডাক্তারের কাছে তার মন খুলে ধরল, কিছুই গোপন করল না। তার কথায় আবেগ ভরা। বুকের উপর হাতদুটো চেপে ধরে বিনা দ্বিধায় সে বলে গেল তার ঘরোয়া জীবনের গোপন কাহিনী। মনে হল, তার মনের এই গোপন কথাগুলো মন থেকে বের করে দিতে পেরে সে খুশিই হল। এইভাবে কথা বলার আরো ঘণ্টা খানেক যদি সে সুযোগ পেত এবং মনের মধ্যে যা কিছু ছিল সব উজাড় করে দিতে পারত, তাহলে হয়ত সে অনেকটা সহজ বোধ করত। কে বলতে পারে, ডাক্তারও যদি বন্ধুর মতো সহানুভূতি নিয়ে শুনত, সে হয়ত অকারণ কতকগুলো ছেলেমানুষী না করে, বিনা প্রতিবাদে এই ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারত, সচরাচর এমনিই হয়... কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হবার নয়। আবোগিন যখন কথা কইছিল, ডাক্তারের মুখের চেহারাটা দেখতে দেখতে

বদলে গেল। এতক্ষণ তার মুখে বিস্ময় ও ঔদাসীন্যের যে ভাবটা ছিল তা চলে গিয়ে তীব্র একটা অপমান, বিরক্তি ও আক্রোশে তার মুখটা ছেয়ে গেল। তার মুখটা আরো বেশি রুক্ষ, কর্কশ ও নির্মম হয়ে উঠল। আবোগিন যখন তার সামনে সন্ন্যাসিনীর মতো ভাবলেশহীন রূপসী এক তরুণীর ছবি দেখিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, যে মেয়ের এমন মুখ সে কি কখনো মিথ্যাচরণ করতে পারে, ডাক্তারের চোখে মুখে তখন কেমন একটা হিংস্র ভাব ফুটে উঠল। সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে প্রতিটি কথায় জোর দিয়ে রূঢ়ভাবে বলল:

'কেন আমায় এসব কথা বলছেন? এসবে আমার কোনো কৌতূহল নেই। শুনতে চাই না!' এবারে সে টেবিলে ঘুষি মেরে চিৎকার করে উঠল। 'আমার ওইসব তুচ্ছ ঘরোয়া কথায় কোনো দরকার নেই। ও সব বাজে কথা আমায় বলতে আসবেন না! বোধহয় ভাবছেন এখনো আমায় যথেষ্ট অপমান করা হয়নি, তাই না? ভেবেছেন আমি চাকর, যথেচ্ছ অপমান করে যেতে পারেন?'

আবোগিন কিরিলভের কাছ থেকে সরে এসে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

'কী জন্যে আমায় এখানে এনেছিলেন?' ডাক্তার বলে চলল, কথার সঙ্গে সঙ্গে তার দাড়িটাও দুলতে লাগল। 'অন্য কিছু করার ছিল না বলে তো বিয়ে করেছিলেন, সেই কারণেই আপনার পক্ষে ন্যাকামি ও উচ্ছ্বাস নিয়ে মশগুল হয়ে থাকা পোষায়, কিন্তু আমার তাতে কী এসে যায়? আপনার প্রেমের ব্যাপারের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? আমাকে শান্তিতে থাকতে দিন। যত ইচ্ছে, আপনাদের কেতাদুরস্ত ঘুষোঘুষি চালান গিয়ে, আপনাদের সদয় আদর্শগুলো ঘটা করে জাহির করুন গিয়ে। যত গৎ জানা আছে' (এবারে ডাক্তার চেলো বাজনার কেসটা লক্ষ্য করে বলল) 'প্রাণ ভরে বাজান, দামড়া মোরগের মতো ফেঁপেফুলে উঠুন, কিন্তু মানুষকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আসবেন না। যদি তাদের শ্রদ্ধা করতে না পারেন, তা হলে ঘাঁটাবেন না।'

'মাপ করবেন, কিন্তু আপনার এই ব্যবহারের মানে কী?' লজ্জায় লাল হয়ে আবোগিন প্রশ্ন করল।

'এর মানে মানুষকে নিয়ে এই রকম ছিনিমিনি খেলা নিচু মনের পরিচায়ক, জঘন্য এই মনোবৃত্তি। আমি ডাক্তার, আপনার মতে অবশ্য ডাক্তার ও সব মজুর আপনার চাকর ও অমার্জিত লোক, কারণ তাদের গায়ে ওডিকলোন ও

বেশ্যালয়ের গন্ধ নেই। আপনার ইচ্ছামত আপনি ভাবতে পারেন, কিন্তু শোকে কাতর একটা মানুষকে দিয়ে বাঁদর নাচ নাচানোর কোনো অধিকার আপনার নেই।'

'কোন সাহসে আপনি আমায় এসব কথা বলছেন?' মৃদুকণ্ঠে আবোগিন বলল। আবার তার সারা মুখ কাঁপছে, স্পষ্টতই এবারে রাগে।

'আমার বিপদের কথা জেনেও কোন সাহসে এখানে আমায় এনে আপনার ন্যাকামি শোনাচ্ছেন?' ডাক্তার আবার টেবিলে ঘুষি মেরে চিৎকার করে উঠল। 'অন্যের দুঃখ নিয়ে কোন অধিকারে আপনি ঠাট্টা করেন?'

'আপনি পাগল হয়ে গেছেন।' আবোগিন বলল। 'উঃ... কি নির্মম। আমার ওই দারুণ দুঃখে কী করব ঠিক পাচ্ছি না, আর... আর...'

'দুঃখ।' ডাক্তার শ্লেষের সুরে বলল। 'ও কথা উচ্চারণ করবেন না, আপনার মতো লোকের মুখে ও কথা খাটে না। ঋণের টাকা খুঁজে না পেয়ে অপদার্থগুলোও দুঃখে পড়ে। চর্বির ভারে নড়তে পারে না হোঁৎকা মোরগও দুঃখে পড়ে। বাজে লোক!'

'খেয়াল রেখে কথা বলবেন মশাই।' আবোগিন তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল। 'এইসব কথা বলার জন্যে মারই হচ্ছে ওষুধ, বুঝেছেন?'

আবোগিন তাড়াতাড়ি জামার পকেটগুলো হাতড়াতে হাতড়াতে একটা খাম বের করল। তার থেকে দুটো নোট বের করে টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল।

'এই আপনার ভিজিট,' সে বলল, রাগে তার নাকটা কাঁপছে। 'আপনার পাওনা!'

'আমাকে টাকার লোভ দেখাতে আসবেন না।' হাত দিয়ে নোটগুলো ঝেঁটিয়ে মেঝের উপর ফেলে দিয়ে ডাক্তার চিৎকার করে বলল। 'অর্থ দিয়ে অপমান শোধন করা যায় না!'

আবোগিন ও ডাক্তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাগে পরস্পরকে তীব্রভাবে অযথা অপমানে বিদ্ধ করতে লাগল। জীবনে কখনো, এমন কি প্রলাপের ঘোরেও হয়ত তারা এত নিষ্ঠুর ও নিরর্থক কটূক্তি করেনি। উভয়ের মধ্যেই আর্তের অহমিকা চাড়া দিয়ে উঠেছে। দুঃখীমাত্রেরই অহংবোধ প্রবল, তারা রাগী, নিষ্ঠুর, ন্যায়বিচারে অক্ষম, বোকাদের চেয়েও তারা পরস্পরকে কম বোঝে। দুর্ভাগ্য মানুষকে কাছে তো আনেই না, বরঞ্চ দূরে সরিয়ে দেয়। আমরা

ভেবে থাকি একই প্রকার দুর্ভাগ্যের ফলে মানুষে মানুষে ঐক্যবোধ বেড়ে যায়, যারা দুর্ভাগ্যে পড়ে তাদের ব্যবহারে কিন্তু তা প্রকাশ পায় না। যারা অপেক্ষাকৃত সুখী তাদের চেয়ে অনেক বেশি নির্মম ও অনুচিত এদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার।

'দয়া করে আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন,' ডাক্তার প্রায় নিশ্বাস রুদ্ধ করে চিৎকার করে উঠল।

আবোগিন জোরে একটা হাতঘণ্টা বাজিয়ে দিল। ঘণ্টার শব্দে যখন কেউই এল না, সে আবার বাজিয়ে রেগে সেটাকে মেঝের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঢং করে সেটা কারপেটের উপর এসে পড়ল, আওয়াজটা ক্রমশঃ একটা করুণ সুরে পরিণত হয়ে মিলিয়ে গেল। এমন সময় হাজির হল এক চাকর।

ঘুষি পাকিয়ে তার দিকে তেড়ে গিয়ে গৃহকর্তা গর্জে উঠল, 'হারামজাদা, কোথায় এতক্ষণ ডুব মেরে ছিলি? এই এক্ষুনি কোথায় ছিলি? যা এই ভদ্রলোকের জন্যে গাড়ি আনতে বলে দে, আর আমার জন্যে ঘোড়ার গাড়িটা তৈরী রাখতে বল। শোন!' চাকর যখন ফিরে যাচ্ছে তখন তাকে বলল, 'কাল পর্যন্ত এক ব্যাটা হারামিও যেন এ বাড়িতে টিঁকে না থাকে। সব দূর হয়ে যাবি। বিলকুল নতুন চাকর বহাল করব। শুয়ার কি বাচ্ছা কাঁহাকা!'

আবোগিন ও ডাক্তার দুজনেই গাড়ির জন্যে প্রতীক্ষা করছে। দুজনেই নির্বাক। আবোগিনের সূক্ষ্ম সুরুচিসম্পন্ন হাবভাব আবার ফিরে এসেছে। ঘরের মধ্যে সে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে, ভারিক্কি চালে মাথাটা ঝাঁকি দিচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে কী যেন একটা মতলব আঁটছে। এখনো তার রাগ পড়েনি কিন্তু এমন ভাব দেখাবার চেষ্টা করছে যেন শত্রুর উপস্থিতি তার নজরেই পড়ছে না। ডাক্তার টেবিলটা একহাতে ধরে একভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর আবোগিনের প্রতি এমন একটা কুৎসিত সর্বাত্মক প্রায় বিদ্রূপভরা ঘৃণার ভাব পোষণ করছে যা একমাত্র যারা দীনহীন তারা যখন ভোগবিলাসের সম্মুখীন হয় তাদেরই পক্ষে সম্ভব।

কিছু পরে ডাক্তার যখন বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতে বসল, তখনো তার চাউনি থেকে বিদ্বেষের ভাব মুছে যায় নি। চারদিকে অন্ধকার, একঘণ্টা আগেকার চেয়ে সেটা গাঢ়তর। রক্তিম বাঁকা চাঁদ পাহাড়ের আড়ালে অন্তর্হিত হয়েছে। পাহারারত খণ্ড মেঘগুলো তারার আশেপাশে কালো কালো ছোপের

মতো রয়েছে। পথের পিছন থেকে চাকার শব্দ শোনা গেল। দেখতে দেখতে লাল বাতি সমেত একটা গাড়ি ডাক্তারের গাড়ি ছাড়িয়ে গেল। গাড়িতে করে আবোগিন যাচ্ছে, সে প্রতিবাদ করবেই, মূঢ়তার পরিচয় দেবেই ...

বাড়ি ফেরার পথে ডাক্তার তার স্ত্রী, এমন কি আন্দ্রেই'এর কথাও একবার ভাবল না, তার মাথায় শুধু আবোগিন ও যে বাড়িটা সে সদ্য ত্যাগ করে এল তার বাসিন্দারা ভিড় করে রয়েছে। তার চিন্তায় দয়ামায়াও নেই, ন্যায়বিচারও নেই। মনে মনে সে আবোগিনকে, তার স্ত্রীকে, পাপচিনস্কিকে, এক কথায় অতিভোগের সুরভিত বিলাসিতায় যাদের জীবন কাটে, তাদের প্রত্যেককে সে জাহান্নমে পাঠাল। সারাটা রাস্তা সে তাদের প্রতি ঘৃণায় ও বিদ্বেষে জ্বলতে লাগল, শেষ পর্যন্ত তার বুকটা লাগল কনকন করতে। এবং এদের সম্পর্কে একটা দৃঢ় ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হল।

সময় বয়ে যাবে, কিরিলভের শোকও ম্লান হয়ে আসবে, কিন্তু মানব হৃদয়ের পক্ষে অসঙ্গত এই অন্যায় ধারণা কখনো মুছে যাবে না। ডাক্তারের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ধারণা নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকবে।

১৮৮৭

বিরস কাহিনী

(এক বৃদ্ধের নোট-বই থেকে)

১

রাশিয়ায় নিকলাই স্তেপানভিচ নামে এক ভদ্রলোক থাকেন। তিনি একজন অত্যন্ত সম্মানিত অধ্যাপক, প্রিভি কাউন্সিলর, বহু সম্মানিত নাইট। রাশিয়ায় এবং বিদেশ থেকে তিনি এতবেশি সম্মান পদক পেয়েছেন যে কোনো উপলক্ষে সবগুলি যখন একসঙ্গে পরেন তখন ছাত্ররা তাঁর নাম দেয় 'বাবাঠাকুর'। সবচেয়ে অভিজাত মহলে তাঁর যাতায়াত। অন্তত পঁচিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে রাশিয়ায় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলতে যাঁদের নাম করা যায়, তাঁদের মধ্যে এমন একজনও নেই যাঁর সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গ নন। আপাতত রাশিয়ায় এমন একজন লোকও নেই যাঁর সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব করতে পারেন। কিন্তু অতীতের দিকে তাকালে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধুদের যে লম্বা ফিরিস্তি আমরা পাই তার মধ্যে আছেন পিরগোভ, কাভেলিন এবং কবি নেক্রাসভের মতো ব্যক্তি। এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব ছিল অকৃত্রিম ও হৃদ্যতাপূর্ণ। রাশিয়ার সমস্ত এবং বিদেশের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি সম্মানিত সদস্য। তিনি অমুক, তিনি তমুক, তিনি আরও অনেক কিছু। আর এই হচ্ছে আমার পরিচয়।

আমি একজন স্বনামখ্যাত লোক। রাশিয়ায় প্রত্যেকটি শিক্ষিত লোক আমার নাম জানে। বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ার থেকে আমার নাম উচ্চারিত হয়। শুধু নামটুকু নয়, নামের আগে অবধারিত বিশেষণ থাকে বিশিষ্ট এবং মাননীয়। আমি হচ্ছি সেই অল্প কয়েকজন সৌভাগ্যবানদের একজন যাঁদের সম্পর্কে মুখের কথায় বা ছাপার অক্ষরে অসম্মানকর কিছু বলা বা কুৎসা করা কুরুচির পরিচয় বলে বিবেচিত হয়।

আর এমনটি হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কারণ আমার নাম বলতে সবাই এমন একজন মানুষকে বোঝে যার খ্যাতি আছে, প্রকৃতি যাকে দিয়েছে অজস্র প্রতিভা এবং যার প্রয়োজনীয়তা অবিসংবাদী। উট যেমন খুব বেশি পরিশ্রম করতে পারে এবং সহজে কাবু হয় না — আমিও তাই। সেটা গুরুতর গুণ। তা ছাড়াও আমি প্রতিভাবান। আমার ক্ষেত্রে সে গুণটা গুরুতর। কেউ যদি বলে যে আমি হচ্ছি একজন সৎ স্বভাবের ও সৎ বংশের নিরহংকার মানুষ — তাহলেও ভুল কিছু বলা হয় না। সাহিত্য বা রাজনীতির ব্যাপারে আমি কক্ষনো মাথা গলাই না, অজ্ঞ লোকের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করে বাহবা কুড়োই না, চায়ের আসরে বা সহযোগীদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিই না ... বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমার নাম অকলঙ্কিত। এদিক দিয়ে কোনো অভিযোগ নেই। নামের দিক থেকে আমি ভাগ্যবান।

এই নামের যিনি ধারক তাঁর—তার মানে, আমার—বয়স বাষট্টি। টাক মাথা ও নকল দাঁত। মুখের পেশীগুলো থেকে-থেকে কুঁচকে-কুঁচকে ওঠে। এটা দুরারোগ্য। আমার নাম যতো দ্যুতিমান ও মনোহর, আমার শরীর ততো অকিঞ্চিৎকর ও কুৎসিত। দুর্বলতার জন্যেই আমার মাথা ও হাত কাঁপে। তুর্গেনেভ তার এক নায়িকার গলাকে তুলনা করেছেন বাদ্যযন্ত্রের খাদের চাবির সঙ্গে—আমার গলাও তেমনি। আমার বুক ফাঁপা, পিঠ সরু। যখন আমি কথা বলি বা বক্তৃতা দিই তখন আমার মুখটা একদিকে ঝুলে পড়ে। যখন আমি হাসি তখন আমার মুখের চামড়ায় বার্ধক্যের ও আসন্ন মৃত্যুর কুঞ্চনরেখা ফুটে ওঠে। আমার এই ক্ষুদে শরীরটার মধ্যে এমন কিছু নেই যা দেখে লোকের মনে ছাপ পড়তে পারে। শুধু এইটুকু ছাড়া যখন মুখের পেশীর আক্ষেপ আর কিছুতেই চেপে রাখা যায় না তখন আমার মুখের ওপরে এমন একটা ভাব ফুটে ওঠে যা দেখে লোকের মনে নিশ্চিতরূপে এক অমোঘ ও মর্মস্পর্শী চিন্তার উদয় হয়: 'এই লোকটি সম্ভবত শিগ্‌গিরই মরবে।'

এখনো আমি মোটামুটি ভালো বক্তৃতাই দিই। পুরো দু ঘণ্টার বক্তৃতাতেও কী করে শ্রোতাদের মনোযোগ অব্যাহত রাখতে হয়, তা আগের মতোই এখনো আমার জানা। আমার উৎসাহ, ভাষার ওপরে দখল এবং সরস যুক্তিবিস্তার দেখে লোকে এত বেশি মুগ্ধ যে আমার গলার স্বরের ত্রুটি ধরা পড়ে না, যদিও

আমি জানি যে আমার গলার স্বর কর্কশ ও মাধুর্যহীন এবং মাঝে মাঝে তা হয়ে ওঠে ধর্মপ্রচারকের প্যানপ্যানানির মতো। কিন্তু লেখক হিসেবে আমি অক্ষম। গ্রন্থকার হিসেবে প্রতিভা মস্তিষ্কের যে অংশে নিয়ন্ত্রিত হয়, তা এখন আর আমার আয়ত্তাধীন নয়। আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, চিন্তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যুক্তির ধারাবাহিকতার অভাব, আর যখনই আমি আমার চিন্তাকে কাগজে কলমে প্রকাশ করবার চেষ্টা করি, আমার কেবল মনে হয়, যেভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে পারলে লেখা সংহত হয়ে ওঠে আমার লেখার মধ্যে তার অভাব ঘটেছে। আমার রচনা একঘেয়ে, শব্দনির্বাচন নীরস ও সংকুচিত। আমি যেমনটি লিখতে চাই তেমনটি কদাচিৎ লিখতে পারি। লেখার শেষে এসে টের পাই যে লেখার শুরু ভুলে বসে আছি। এক্কেবারে সাধারণ সব কথাও প্রায়ই মনে করতে পারি না। চিঠি লেখবার সময় ভাষা থেকে বাড়তি শব্দসম্ভার ও অনাবশ্যক লেজুড় বাক্যগুলোকে ছেঁটে বাদ দেবার জন্যে আমাকে প্রচুর শক্তি ব্যয় করতে হয়। আমার মানসিক সক্রিয়তার যে অবনতি ঘটছে, এটা তারই সুস্পষ্ট লক্ষণ। এটা লক্ষ্যনীয়, চিঠি যতো সহজ হয় আমার ক্ষমতার ওপরে ততো বেশি চাপ পড়ে। অভিনন্দনসূচক বাণী বা ব্যবসায়গত রিপোর্ট লেখার চাইতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে আমি অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। আরেকটা কথা—রুশ ভাষায় লেখার চাইতে জার্মান বা ইংরেজি ভাষায় লেখা আমার পক্ষে বেশি সহজ।

এখনকার জীবনের কথা বলতে হলে সবচেয়ে বড়ো ঘটনা হিসেবে এবং সবার আগে উল্লেখ করতে হবে যে অল্প কিছুদিন হল আমি অনিদ্রারোগের বলি হয়েছি। কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে আপনার জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য কী? আমি বলব—অনিদ্রারোগ। বহুকাল ধরে যে রীতি চলে আসছে সেই হিসেবে কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটার সময় আমি পোশাক খুলে বিছানায় গিয়ে শুই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু রাত দুটোর সময় ঘুম ভেঙে যায় আর মনে হতে থাকে যে একেবারেই ঘুমোইনি। বাধ্য হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে আলো জ্বালাতে হয়। তারপরে একঘণ্টা কি দুঘণ্টা কাটে ঘরের পরিচিত ফটোগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পায়চারি করে। পায়চারি করতে করতে যখন বিরক্তি আসে তখন গিয়ে বসি আমার টেবিলের সামনে। সেখানে নিশ্চল হয়ে বসে থাকি, কোনো কিছু ভাবি না, কোনো কিছু আমার চাই

বলেও মনে হয় না। যদি সামনে কোনো বই পড়ে থাকে তাহলে নিতান্তই অভ্যাসবশে সেটা টেনে নিই এবং বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ না করে পড়ে যাই। সম্প্রতি এইভাবে নিতান্তই অভ্যেসবশে একরাত্রের মধ্যে আমি পুরো একটি উপন্যাস শেষ করে ফেলেছি, ভারি অদ্ভুত নাম সেই উপন্যাসটির—'চাতকপাখি কী গান গেয়েছিল'। মন যাতে ফাঁকা না থাকে, সে চেষ্টা করি মাঝে মাঝে। হয়তো এক থেকে হাজার পর্যন্ত গুণে যাই, বা কোনো বন্ধুর মুখ স্মরণ করে ভেবে চলি কোন বছরে কী অবস্থায় বন্ধুটি ফ্যাকাল্টিতে যোগ দিয়েছিল।

শব্দ শুনতে আমার ভালো লাগে। মাঝে মাঝে আমার মেয়ে লিজা ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করে কী যেন বলে, দুটো দরজা পেরিয়ে সে শব্দ ভেসে আসে। কিংবা আমার স্ত্রী মোমবাতি হাতে ড্রয়িংরুম দিয়ে হেঁটে যায় আর যতোবার যায় ততোবারই তার হাত থেকে দেশলাইয়ের বাক্সটা মেঝেতে পড়ে। কিংবা পোশাকের আলমারির পাল্লাটা সরে গিয়ে কিঁচ কিঁচ শব্দ ওঠে। কিংবা বাতির পল্‌তে থেকে হঠাৎ শোঁ শোঁ গুঞ্জন শোনা যায়। আর এই সমস্ত শব্দ শুনে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয় আমার মনে।

রাত্রিবেলা না ঘুমনোর অর্থই হচ্ছে সব সময়ে সচেতন থাকা যে নিজের অবস্থাটা স্বাভাবিক নয়। তাই আমি অধৈর্য হয়ে সকালের জন্যে এবং দিনের জন্যে অপেক্ষা করি, কারণ তখন জেগে থাকাটাই স্বাভাবিক। অনেকগুলি ক্লান্ত প্রহর কাটবার পরে উঠোনে মোরগ ডাকতে শুরু করে। এই হচ্ছে আমার পরিত্রাণের প্রথম সংকেত। মোরগ ডাকা মানেই ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে দারোয়ানের জেগে ওঠা। আর তখন কেন জানি না, প্রচণ্ডভাবে কাশতে কাশতে সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায়। তারপরে জানলার শার্সিগুলো ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করে আর রাস্তা থেকে শোনা যায় মানুষের গলার আওয়াজ...

আমার দিন শুরু হয় শোবার ঘরে আমার স্ত্রীর আবির্ভাবে। হাত মুখ ধুয়ে স্কার্ট পরে সে আসে। তার গা থেকে ওডিকোলনের গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু তার চুল খোলা থাকে। এমন একটা ভাব দেখাতে চেষ্টা করে যেন সে এমনি এঘরে ঢুকে পড়েছে। প্রতিদিন হুবহু একই কথা শোনা যায় তার মুখে:

'এই, এমনি একটু দেখতে এলাম... রাত্রিবেলা ঘুম হয়নি বুঝি?'

তারপর সে বাতিটা নিবিয়ে টেবিলের সামনে বসে কথা বলতে শুরু করে।

যদিও আমি ভবিষ্যদ্‌বক্তা নই কিন্তু আগে থেকেই জানি, সে কী বলবে। রোজ একই কথা। সাধারণত তার কথা শুরু হয় আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন দু একটা প্রশ্ন করে। তারপরেই আচমকা তার মনে পড়ে যায় আমাদের ছেলের কথা। সে ওয়ারশ'তে সৈন্যবিভাগে অফিসার। প্রতি মাসের বিশ তারিখ পার হবার পরে আমরা ছেলের কাছে পঞ্চাশ রুবল পাঠাই — প্রধানত এ ব্যাপারটাই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

আমার স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, 'এতে আমাদের অবশ্য খুবই টানাটানি হয়। কিন্তু কী আর করা যাবে। যতোদিন পর্যন্ত নিজের পায়ে না দাঁড়াতে পারে ততোদিন ওকে টাকা দিতেই হবে। এটা আমাদের কর্তব্য। বাছা আমার বিদেশ বিভূঁয়ে পড়ে থাকে, মাইনেও খুব কম... তোমার মত থাকে তো ওকে বরং সামনের মাস থেকে পঞ্চাশ রুবল না পাঠিয়ে চল্লিশ রুবল পাঠানো যাক। কী বলো?'

প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমার স্ত্রীর অন্তত এটুকু বোঝা উচিত যে যতোই আলাপ আলোচনা করা যাক না কেন তাতে সংসারের খরচ কমে না। কিন্তু আমার স্ত্রী অভিজ্ঞতার ধার ধারে না, রোজ সকালে এসে ছেলের চাকরি আর রুটির দাম নিয়ে কথা তুলবে। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে রুটির দাম একটু কমেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার চিনির দাম দু কোপেক বেড়ে গেছে। ভাবখানা এমন যেন সে আমাকে কোনো নতুন কথা শোনাচ্ছে।

আমি শুনি, না বুঝেশুনেই সায় দিই, বোধ হয়, যেহেতু আমি সারারাত ঘুমোইনি সেজন্যে অদ্‌ভুত ও অর্থহীন কতগুলি চিন্তা আমার মন জুড়ে বসেছে। শিশুর মতো বিস্ময় নিয়ে আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকি। অবাক হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করি: এই যে স্থূলকায়া জবুথবু বুড়ী স্ত্রীলোকটি আমার সামনে বসে আছে, যার মুখে রুটির এক টুকরোর জন্য চিন্তা ও উদ্বেগ, যার চোখের দৃষ্টি সারাক্ষণ শুধু অভাব ও অনটনের দুশ্চিন্তায় নিষ্প্রভ, যার মুখে টাকা খরচ বা জিনিসপত্রের দাম কমা ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারেই হাসি ফোটে না — এও কি সম্ভব যে এই স্ত্রীলোকটিই সেই কৃশতনু ভারিয়া? এও কি সম্ভব যে এই সেই ভারিয়া যাকে আমি এত গভীরভাবে ভালোবাসতাম তার সুন্দর ও সুকুমার মনের জন্যে, নিষ্পাপ অন্তঃকরণের জন্যে, সৌন্দর্যের জন্যে (ওথেলো যেমন ভালোবাসত দেসদেমোনাকে), সে কি আমার জন্যে মমতা বোধ করত

আমার বৈজ্ঞানিক কাজের উত্থান-পতনের মধ্যে? এও কি সম্ভব যে এই স্ত্রীলোকটিই হচ্ছে আমার স্ত্রী ভারিয়া, আমার সন্তানের মা?

এই স্থূলাঙ্গিনী বৃদ্ধার মেদস্ফীত মুখের দিকে আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি, তাকিয়ে তাকিয়ে খুঁজি পুরনো দিনের আমার সেই ভারিয়াকে। কিন্তু পুরনো দিনের চিহ্ন ওর মধ্যে প্রায় কিছুই নেই, শুধু আছে আমার স্বাস্থ্যের জন্যে ওর খানিকটা উদ্বেগ, আর আমার বেতনকে 'আমাদের' বেতন, আমার টুপিকে 'আমাদের' টুপি বলে উল্লেখ করে নিজস্ব কথা বলার ধরন। ওর দিকে তাকিয়ে আমার কষ্ট হয়। ও যখন কথা বলে, আমি প্রশ্রয় দিই, যতোক্ষণ খুশি ও কথা বলুক। এমন কি অন্য লোককে যখন ও অকারণে গালমন্দ করে বা আমি পাঠ্যপুস্তক লিখছি না বা অবসর সময়ে বাড়তি আয়ের চেষ্টা করছি না বলে আমাকে অতিষ্ঠ করে তোলে তখনো আমি একটি কথাও বলি না।

আমাদের কথাবার্তা সব সময়ে একই ভাবে শেষ হয়। আমার স্ত্রীর হঠাৎ মনে পড়ে যায় যে আমাকে চা দেওয়া হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বলে, 'দেখ, কী ভুলো মন! চায়ের টেবিলে সেই কখন সামোভার দিয়ে গেছে, আর আমি কিনা বসে বসে আবোল তাবোল বকছি। কোনো কথা যদি আজকাল আর ঠিকমতো মনে থাকে!'

দুদ্দাড় করে ও দরজা পর্যন্ত হেঁটে যায়, তারপর থেমে পড়ে আবার বলে:

'ইয়েগরের পাঁচ মাসের মাইনে বাকি পড়ে গেছে। কথাটা খেয়াল আছে কি? হাজার বার তোমাকে বলেছি যে চাকরদের মাইনে জমে উঠতে দেওয়াটা ঠিক নয়! মাসে মাসে দশটা করে রুবল দিলেই তো ঝামেলা চুকে যায়। পাঁচমাসের জন্যে পঞ্চাশটা রুবল একসঙ্গে দেওয়া কি চাট্টিখানি কথা?'

তারপর দরজার বাইরে গিয়েও আরেকবার থামে আর বলে:

'আমার সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় কার জন্যে জান? আমাদের বেচারা লিজার জন্যে। বাছাকে সঙ্গীত কলেজে যেতে হয়, গণ্যমান্য ঘরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয় — কিন্তু ওর পোশাকটা দেখো! শীতের কোটের এমন দশা যে বাইরে বেরোতে মাথা কাটা যায়! ও যদি অন্য কারও মেয়ে হত তাহলে

বিশেষ কিছু যেত আসত না। কিন্তু সবাই জানে যে ওর বাবা একজন বিখ্যাত অধ্যাপক, প্রিভি কাউন্সিলর!'

এইভাবে আমার খ্যাতি ও পদগৌরব 'প্রিভি কাউন্সিলরকে' ভর্ৎসনা করে ও স্থানত্যাগ করে। এইভাবেই আমার দিনের শুরু। তারপর সারাটা দিন যেভাবে কাটে তাও এর চেয়ে ভালো কিছু নয়।

চা খাওয়ার সময়ে আমার মেয়ে লিজা এসে ঘরে ঢোকে। মাথায় টুপি, শীতের কোট পরা, হাতে বাজনার নোট, একেবারে সঙ্গীত কলেজে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে। লিজার বয়স বাইশ, কিন্তু দেখে মনে হয় আরো ছোট, মেয়েটি সুন্দরী, আমার স্ত্রী যৌবনে যেমনটি দেখতে ছিল অনেকটা তেমনি। ঘরে ঢুকে আমার রগে সস্নেহে একটা চুমু খায়, আমার হাতেও চুমু খায়, তারপর বলে:

'বাবা, সুপ্রভাত, শরীর ভালো তো?'

ছেলেবেলায় লিজা আইসক্রীমের খুব ভক্ত ছিল। তখন আমি ওকে প্রায়ই দোকানে নিয়ে গিয়ে আইসক্রীম কিনে দিতাম। আইসক্রীমই তখন ওর কাছে ছিল ভালো মন্দ বিচারের মানদণ্ড। যদি কখনো আমাকে আদর করতে চাইত তাহলে বলত, 'বাবা, তুমি ঠিক একটা আইসক্রীম।' হাতের এক একটা আঙুলের এক একরকম নাম দিয়েছিল, যেমন, পেস্তা, ক্রীম, র‍্যাস্পবেরি ইত্যাদি আইসক্রীম। সকালবেলা ও যখন আমার কাছে আসত তখন আমি ওকে কোলে বসিয়ে ওর এক একটা আঙুলে চুমু খেতাম আর নাম ধরে ধরে বলতাম, 'পেস্তা, ক্রীম, লেমন আইসক্রীম ...'

সেই পুরনো অভ্যেস এখনো রয়ে গেছে। এখনো আমি লিজার আঙ্গুলে চুমু খাই আর বিড়বিড় করে বলি, 'পেস্তা, ক্রীম, লেমন আইসক্রীম।' কিন্তু আগেকার দিনের সেই অনুভূতি আর নেই। আজকাল আমি নিজেই আইসক্রীমের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছি। ওর আঙুলে চুমু খেতে গিয়ে আমি নিজেই লজ্জা পাই। যখন ও এসে আমার রগে ওর ঠোঁট ছোঁয়ায়, তখন আমি এমনভাবে চমকে উঠি যেন আমাকে মৌমাছি হুল ফুটিয়েছে। সজোরে হেসে মুখ ফিরিয়ে নিই। যেদিন থেকে আমি অনিদ্রারোগে ভুগতে শুরু করেছি সেদিন থেকেই আমার মন একটা চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। সেটা এই— মেয়ে আমার সর্বদাই দেখে কী ভাবে আমি, একজন বয়োবৃদ্ধ লোক, চারদিকে

যার এত খ্যাতি, আর তাকে কিনা চাকরের মাইনে না দিতে পারার লজ্জা গোপন করবার জন্যে কষ্টের হাসি হাসতে হয়। চোখের ওপরে ও সব সময়ে দেখছে ছোটখাটো দেনা শোধ করতে না পারার উদ্বেগে আমি কাজ করতে পারি না, দুশ্চিন্তায় ঘরের মধ্যে পায়চারি করি, আর তা দেখার পরেও ও কখনো আমার কাছে এসে চুপিচুপি বলে না, (মা'কে লুকিয়ে অবশ্য) 'বাবা, এই আমার হাতঘড়ি, হাতের বালা, কানের দুল, পরনের পোশাক সব তুমি নিয়ে নাও, নিয়ে বাঁধা দাও, তোমার তো টাকার দরকার ...' ও দেখতে পায়, ওর মা আর আমি মিথ্যে লোকলজ্জার ভয়ে অপরের কাছ থেকে দারিদ্র্য গোপন করি। আর তা দেখার পরেও গানবাজনার পড়াশোনা করার ব্যয়বহুল বিলাসিতাটুকু ও ছাড়তে রাজি নয়। ভগবান আমাকে ক্ষমা করুন, ওর হাতঘড়ি বা হাতের বালা আমি নিতাম না, আমার জন্য কোনো ত্যাগস্বীকারের দরকার নেই। এ আমি চাই না।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমার ছেলের কথা যে ওয়ারশ'তে সৈন্যবিভাগের অফিসার। ছেলেটি বুদ্ধিমান, সৎ ও মিতাচারী। কিন্তু আমার কাছে এসব যথেষ্ট নয়। আমি তো মনে করি, আমি যদি দেখি আমার বাপ বুড়ো হয়েছে আর সেই বুড়ো বাপকে দারিদ্র্য গোপন করবার জন্যে মাঝে মাঝে মুখ লুকোতে হয়, তাহলে কী হবে আমার সৈন্যবিভাগের পদাধিকার দিয়ে, অন্যের জন্যে তা ছেড়ে দিয়ে আমি বরং মজুরি খাটব। ছেলেমেয়ের সম্পর্কে এই ধরনের চিন্তা আমার জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছে। এই চিন্তায় কী লাভ? যার মনের এতটুকু প্রসারতা নেই কিংবা যে এই সংসারের উপরে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছে, একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব সাধারণ মানুষরা বীর নয় বলে তাদের বিরুদ্ধে মনে মনে একটা উৎকট রকমের বিদ্বেষ পুষে রাখা। কিন্তু এসব কথা থাক।

প্রিয় ছাত্রদের ক্লাস নেবার জন্যে পৌনে দশটার সময় আমাকে বাড়ি থেকে রওনা হতে হয়। জামাকাপড় পরে আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। গত ত্রিশ বছর ধরে আমি এই রাস্তার সঙ্গে পরিচিত। আমার কাছে এই রাস্তার একটা ইতিহাস আছে। এখন যেখানে ছাইরঙা মস্ত বাড়িটা দাঁড়িয়ে, যার নিচের তলায় রয়েছে একটা ডাক্তারখানা, সেখানে এককালে ছিল ছোট্ট একটা বীয়ারের দোকান। সেই দোকানটিতে বসেই আমি আমার থিসিস সম্পর্কে ভেবেছিলাম আর

ভারিয়ার কাছে লিখেছিলাম আমার প্রথম প্রেমপত্র। চিঠিটা লিখেছিলাম একটা পেনসিল দিয়ে আর যে কাগজের টুকরোটা ব্যবহার করেছিলাম তার মাথায় ছাপার অক্ষরে লেখা ছিল রোগের ইতিহাস। আর সেই মুদীর দোকানটি এখনো রয়েছে। তখন এই দোকানটির মালিক ছিল একজন ইহুদি। সে আমার কাছে ধারে সিগারেট বিক্রি করত। পরে এই দোকানটির মালিক হয়েছিল শক্তসমর্থ চেহারার একজন স্ত্রীলোক। ছাত্রদের সে খুবই পছন্দ করত কারণ 'সব্বায়েরই বাড়িতে মা আছে'। দোকানের বর্তমান মালিক একজন লালচুলওলা কারবারী। লোকটি সব বিষয়ে নির্বিকার, সারাদিন দোকানে বসে বসে তামার কেটলি থেকে চা খায়। মুদীর দোকান পার হলে চোখে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার, বহুকাল সারানো হয়নি বলে চাকচিক্যহীন। তারপরে ভেড়ার চামড়ার কোট গায়ে উঠোন-তদারককারী লোকটি, উদাসীন মুখের ভাব, হাতে একটা ঝাঁটা... স্তূপীকৃত বরফ... বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারের যে অবস্থা তা দেখে জেলা-অঞ্চল থেকে সদ্য আগত ছাত্ররা হয়তো দমে যাবে, কারণ তারা ভাবে যে বিজ্ঞানের মন্দির বুঝি সত্যি সত্যিই একটি মন্দির! বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের জীর্ণ অবস্থা, এর অন্ধকার বারান্দা, কালিঝুলি মাখানো দেওয়াল, প্রয়োজনের চেয়ে কম আলো, সিঁড়ি-পোশাকঘর-বেঞ্চি ইত্যাদির দুর্দশা—হয়তো রুশদেশের নৈরাশ্যবাদের ইতিহাসে নানা কারণের মধ্যে এসবেরও একটা গৌরবময় স্থান আছে,... আর এই হচ্ছে আমাদের সেই পার্ক। মনে হয়, আমি যখন ছাত্র ছিলাম, তখনো এই পার্কটি যেমন ছিল, এখনো তেমনি আছে, ভালো মন্দ কোনো দিকেই কোনো পরিবর্তন হয়নি। পার্কটাকে আমার কোনো দিনই ভালো লাগেনি। এখানে আছে শুধু খসে খসে পড়া লাইম গাছ, হলদে অ্যাকাসিয়া, ছেঁটে দেওয়া ক্ষুদে ক্ষুদে লাইলাক ঝোপ। এর চেয়ে অনেক ভালো হত যদি এসব না থেকে থাকত মস্ত উঁচু পাইনগাছ আর শক্তসমর্থ ওক্‌গাছ। ছাত্রদের মনের গড়নের উপরে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবটা খুবই বেশি। সুতরাং তারা যেখানে পড়তে আসে সেখানকার সবকিছুই হওয়া উচিত মস্ত উঁচু উঁচু, সবকিছুই হওয়া উচিত উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং সুন্দর। ঈশ্বর করুন — মরা মরা গাছ, জানলার ভাঙা শার্সি, নোংরা দেওয়াল আর ছেঁড়া অয়েলক্লথ লাগানো দরজা, এসব যেন তাদের দেখতে না হয়।

দালানের যেদিকটায় আমার কর্মস্থান সেদিকে গিয়ে হাজির হতেই দরজাটা খুলে যায় আর একজন পুরনো সহকর্মী আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসে। এই লোকটি হলঘরের পরিচারক, আমার সমবয়সী, আমাদের দুজনের একই নাম — নিকলাই। আমাকে পথ দেখিয়ে ভিতরে এনে সে বিড়বিড় করে বলে:

'হুজুর, আজ বড়ো শীত পড়েছে!'

কিংবা আমার কোট যদি ভিজে থাকে তাহলে বলে:

'বৃষ্টি পড়ছে, হুজুর!'

তারপর আগে আগে ছুটে গিয়ে আমার গন্তব্যপথের সবকটি দরজা খুলতে খুলতে যায়। নিজস্ব আপিস কামরায় পেঁছবার পর সে সযত্নে আমার গা থেকে কোট খুলে নেয় এবং এই সময়টিতে সে প্রতিদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের খুঁটিনাটি খবরের কিছু না কিছু পেশ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে রাত-পাহারাদারদের ও দারোয়ানদের মধ্যে রীতিমতো সদ্ভাবের দরুণ এই লোকটি সমস্ত খুঁটিনাটি খবর রাখে। চারটে ফ্যাকাল্টিতে, আপিসে, রেক্টরের ঘরে, লাইব্রেরিতে—কোথায় কী ঘটছে সব জানে। সে জানে না এমন খবর নেই। হয়তো এমন ঘটনা ঘটেছে যে কোনো একজন রেক্টর বা ডীন পদত্যাগ করেছেন আর তাই নিয়ে সবাই জল্পনাকল্পনা করছে — ওকেও অল্পবয়সী রাত-পাহারাদারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে শুনতে পাই। ও আলোচনা করে, পদটির জন্যে সবচেয়ে সম্ভাব্য উমেদার কে কে হতে পারে,তারপর ব্যাখ্যা করে, কার নাম মন্ত্রীমশাই মঞ্জুর করবেন না, কে নিজেই এই পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে, আর কথাপ্রসঙ্গে উদ্ভট সব বর্ণনা দেয় যে আপিসে নাকি কী একটা গোপন দলিল এসেছে, পেট্রনের সঙ্গে মন্ত্রীমশাইয়ের এ বিষয়ে কী একটা গোপন আলোচনা হয়েছে, বা এমনি আরো সব খবর। এইসব খুঁটিনাটি বর্ণনার কথা বাদ দিলে দেখা যায় যে প্রায় সব ক্ষেত্রে ঠিক কথাই সে বলে। প্রত্যেকটি উমেদার সম্পর্কে সে যা বর্ণনা দেয় তা একেবারেই তার নিজস্ব। কিন্তু তা হলেও বর্ণনাগুলি নির্ভুল। যদি কখনো জানবার দরকার হয় যে অমুক লোক কোন্ বছরে থিসিস পেশ করেছে, বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিয়েছে বা পদত্যাগ করেছে বা মারা গেছে তাহলে অনায়াসে এই সর্বজ্ঞ লোকটির অসাধারণ স্মৃতিশক্তির ওপরে নির্ভর করা চলে। সে শুধু বছর মাস তারিখ বলেই খুশি নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিবরণ দেবে

ঠিক কোন্ কোন্ অবস্থায় কোন্ কোন্ ঘটনা ঘটেছে। প্রেমিকেরই শুধু এমন স্মৃতি শক্তি হতে পারে।

তাকে বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। তার আগে দারোয়ান হিসেবে যারা কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সে লাভ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন সম্পর্কে নানা গল্পগাথার এক সংগ্রহ। এই সংগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার নিজের ঐশ্বর্য, তার নিজস্ব সম্পদ, যা সে কর্মজীবনের বছরগুলিতে একটু একটু করে সঞ্চয় করেছে। আগ্রহ থাকলে যে কেউ তার কাছে নানা গল্প শুনতে পারে — কোনোটা দীর্ঘ, কোনোটা সংক্ষিপ্ত। তার কাছে শোনা যেতে পারে ঋষিতুল্য সেই সব মানুষের কথা যাঁরা জানার মতো সবকিছু জেনেছিলেন, শোনা যেতে পারে অনন্যসাধারণ সেইসব কর্মীর কথা যাঁরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ না ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন, শোনা যেতে পারে বিজ্ঞানের বেদীমূলে অসংখ্য জীবনদান ও আত্মত্যাগের কথা। তার গল্পগুলিতে সর্বদা ভালো মন্দকে জয় করে, দুর্বলের কাছে অবধারিত ভাবে পরাভব স্বীকার করে বলবান, নির্বোধের ওপরে ঋষির প্রাধান্য সূচিত হয়, যারা বিনীত তারা হটিয়ে দেয় গর্বোদ্ধত প্রাচীনের দলকে… তার সমস্ত গল্পগাথা ও চমকদার কাহিনীকে হুবহু বিশ্বাস করতে হবে এমন কোনো কথা নেই, কিন্তু সেগুলো যখন মনের পরতে পরতে ছাঁকা হয়ে বেরিয়ে আসে তখন তার মধ্যে একটা অপরিহার্য সত্য থেকে যায় — তা হচ্ছে আমাদের অনির্বচনীয় ঐতিহ্য, সর্বজনস্বীকৃত সত্যিকারের বীরদের নাম।

আমাদের সমাজে বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্পর্কে যেটুকু খবরাখবর লোকে রাখে তা কয়েকটি কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই কাহিনীগুলি বৃদ্ধ অধ্যাপকদের অসাধারণ অন্যমনস্কতা সম্পর্কে; বা গ্রুবের, আমার ও বাবুখিনের বলা কতগুলো হাসির গল্প। শিক্ষিত সমাজের পক্ষে এটুকু কিছুই নয়। বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও ছাত্রদের নিকলাই যেমনভাবে ভালোবাসে, আমাদের সমাজও তাদের যদি তেমনিভাবে ভালোবাসত তাহলে মহাকাব্য, গল্পগাথা ও কাহিনীর দ্বারা সমৃদ্ধ হতে পারত আমাদের সাহিত্য। দুর্ভাগ্যবশত এখন আমাদের সাহিত্যে এই জিনিসগুলিরই অভাব।

আমাকে খবর শোনানো হয়ে গেলে নিকলাইয়ের হাবভাবে একটা কাঠিন্য আসে এবং তারপর আমরা জরুরি বিষয় সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করি। যদি

কোনো বাইরের লোক এসে শোনে যে নিকলাই অনায়াসে বিজ্ঞানের সমস্ত দুরূহ শব্দ ব্যবহার করছে তাহলে তার নিশ্চয়ই ধারণা হবে যে নিকলাই হচ্ছে ফৌজী উর্দি-পরা একজন বৈজ্ঞানিক। সত্যি বলতে কি, বিশ্ববিদ্যালয়ের দারোয়ানদের জ্ঞানবুদ্ধি সম্পর্কে যেসব গল্প প্রচলিত সেগুলি সবই অতিরঞ্জিত। নিকলাইকে জিজ্ঞেস করলে সে যে শ'খানেক ল্যাতিন নাম গড়গড় করে বলতে পারবে না তা নয়। তাছাড়া সে কঙ্কালকে জোড়া লাগাতে পারে, ছাত্রদের দেখাবার জন্যে কোনো কোনো পরীক্ষাকার্যের সমস্ত উপকরণ তৈরি রাখতে পারে, মস্ত এক বৈজ্ঞানিক উদ্ধৃতি মুখস্থ বলে দিয়ে ছাত্রদের হাসাতে পারে—কিন্তু তাকে যদি খুব সহজ একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়, যেমন ধরা যাক, রক্ত চলাচলের তত্ত্বটা কী, তাহলে এ প্রশ্ন শুনে বিশ বছর আগেও সে যেমন হাঁ হয়ে থাকত, এখনো তাই থাকবে।

ব্যবচ্ছেদ কার্যে আমাকে যে সহায়তা করে তার নাম পিওতর ইগ্নাতিয়েভিচ। কোনো একটা বই বা আরকের জারের ওপরে ঝুঁকে পড়ে সে ডেস্কের সামনে বসে আছে। সে অসাধারণ পরিশ্রম করতে পারে, বিনীত, নিতান্তই মাঝারি গোছের লোক। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ, এর মধ্যেই মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে, 'সুগোল ভুঁড়িটি' রীতিমতো পরিস্ফুট। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কাজ করে সে, বই পড়ায় ক্লান্তি নেই, আর যা কিছু পড়ে মনে রাখে। ওর এই গুণের জন্যে আমার কাছে ওর দাম সোনার চেয়েও বেশি। এ ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যাপারেই ও ভারবাহী ঘোড়ার মতো, বা অন্য কথায় বলা যেতে পারে পণ্ডিত গর্দভ। এই মানুষরূপী ভারবাহী ঘোড়াটির বৈশিষ্ট্য ওর দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতা ও পেশা দ্বারা নিদারুণ সীমাবদ্ধ জ্ঞান — একজন প্রতিভাবান পুরুষের সঙ্গে এখানেই ওর পার্থক্য। নিজের বিজ্ঞানের চর্চার বাইরে ও শিশুর মতো সরল। মনে আছে, একদিন আপিসে গিয়ে ওকে বলেছিলাম, 'ভারি দুঃসংবাদ! স্কোবেলেভ নাকি মারা গেছেন!'

শুনে নিকলাই ক্রুশ চিহ্ন এঁকেছিল। কিন্তু পিওতর ইগ্নাতিয়েভিচ আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'স্কোবেলেভ কে?'

এই ঘটনার কিছুদিন আগে আরেকবার ওকে আমি বলেছিলাম যে অধ্যাপক পেরভ মারা গেছেন। শুনে বুদ্ধির ঢেঁকি পিওতর ইগ্নাতিয়েভিচ জিজ্ঞেস করেছিল, 'উনি কোন্ বিষয়ে পড়াতেন?'

আমার ধারণা হয়েছিল যে স্বয়ং পাত্তিদেবী এসেও যদি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গান গাইতে শুরু করেন বা চীনারা যদি রুশদেশ আক্রমণ করে বা ভীষণ একটা ভূমিকম্প হয়——তাহলেও ও তিলমাত্র বিচলিত হবে না, এমনি শান্তভাবে এক চোখ বুজে অনুবীক্ষণের ভিতরে তাকিয়ে থাকবে। এক কথায়, যা কিছু ঘটুক না কেন, ও একেবারে নির্বিকার। এই রসকসহীন বংশদণ্ডটি কী ভাবে বৌয়ের সঙ্গে শোয় তা দেখার আমার খুবই ইচ্ছে।

ওর আরেকটি বৈশিষ্ট্য: বিজ্ঞানের অভ্রান্ততায় ওর অন্ধ বিশ্বাস। বিশেষ করে জার্মানদের লেখা বিজ্ঞানে। নিজের সম্পর্কে এবং নিজের তৈরী জিনিস সম্পর্কে ওর মনে কোনো দ্বিধা নেই। ও জানে ওর জীবনের কী লক্ষ্য। সন্দেহ বা মোহভঙ্গ যা প্রতিভাবান পুরুষদের মাথার চুল পাকিয়ে দেয়—তা থেকে ও সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের কাছে ও দাসসুলভ নতিস্বীকার করে এবং স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। ওর মনের বদ্ধমূল ধারণাগুলিকে নাড়া দেওয়া এক দুরূহ ব্যাপার, যুক্তিতর্ক দিয়ে ওকে টলানো একেবারেই অসম্ভব। এমন লোকের সঙ্গে তর্ক করা কী করে সম্ভব যে নাকি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে যে বিজ্ঞান হিসেবে চিকিৎসাশাস্ত্র হচ্ছে সবচেয়ে নিখুঁত, মানুষ হিসেবে চিকিৎসকরা হচ্ছে সেরা মানুষ আর যা কিছু ঐতিহ্য আছে তার মধ্যে চিকিৎসার ঐতিহ্য হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য। চিকিৎসা জগতে একমাত্র খারাপ ঐতিহ্য যেটা চলে আসছে সেটা চিকিৎসকদের এখনো পর্যন্ত সাদা টাই পরাটা। বিজ্ঞানী ও শিক্ষিত মানুষের বেলায় দেখা যায়, তারা যে ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক ঐতিহ্য; পৃথক পৃথক ফ্যাকাল্‌টিতে অন্য কী কী বিদ্যার চর্চা হয়—যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র, আইনশাস্ত্র, বা অন্য কিছু—সে বিচার সেখানে আসে না। কিন্তু পিওতর ইগ্‌নাতিয়েভিচকে কিছুতেই এ ব্যাপারটা বোঝানো যায় না, পৃথিবী রসাতলে গেলেও সে এ নিয়ে তর্ক করবে।

ওর ভবিষ্যতকে আমি স্পষ্টভাবে কল্পনা করতে পারি। সারা জীবনে ও যা করবে তা হচ্ছে কয়েকশ' সন্দেহাতীত রকমের নির্ভুল প্রস্তুতকরণ, কয়েকটি নীরস ও প্রশংসনীয় লেখা, ডজনখানেক নিষ্ঠাপূর্ণ অনুবাদ—ব্যস, আর কিছু নয়, বাঁধাধরা রীতির বাইরে গিয়ে ও কক্ষনো কিছু করবে না। কারণ তা করতে গেলে প্রয়োজন কল্পনাশক্তি, উদ্‌ভাবনী মেধা ও স্বজ্ঞা, যা পিওতর

ইগ্‌নাতিয়েভিচের মধ্যে একেবারেই নেই। এক কথায়, এই লোকটি বিজ্ঞানের প্রভু নয়, ভৃত্য।

পিওতর ইগ্‌নাতিয়েভিচ, নিকলাই আর আমি কথা বলি চাপা স্বরে। কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করি আমরা। দরজার ওপাশেই, শ্রোতৃবৃন্দ সমুদ্রের মতো গুঞ্জন করছে — এই জ্ঞানটা কেমন যেন অদ্ভুত অনুভূতি জাগায়। গত ত্রিশ বছরেও এই অনুভূতির সঙ্গে নিজেকে আমি খাপ খাওয়াতে পারিনি। রোজ সকালে নতুন করে এই অনুভূতির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। বিচলিত ভাবে আমার ফ্রককোটের বোতাম লাগাই, নিকলাইকে অকারণ প্রশ্ন করতে থাকি, মেজাজ গরম করি... আমাকে দেখে যে কেউ ভাবতে পারে যে আমি ভয় পেয়েছি। কিন্তু এটা আমার ভীরুতা নয়, এ হচ্ছে অন্য ধরনের একটা কিছু — এমন কিছু যার কোনো নাম আমার জানা নেই, যার কোনো বর্ণনা আমি দিতে পারি না।

বিশেষ কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও আমি হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, তারপর বলি:

'সময় হয়ে গেছে দেখছি!'

আমরা পরপর যে ভাবে ঘর থেকে বেরোই তা এই রকম: সবার আগে আগে চলে নিকলাই, তার হাতে থাকে আরকের জার বা ব্যাখ্যাচিত্র, নিকলাইয়ের পরে আমি, আর আমার পরে খুব বিনীতভাবে মাথা নিচু করে ঠুক ঠুক করে চলে ভারবাহী ঘোড়া। 'কিংবা দরকার পড়লে একটা মড়াকে স্ট্রেচারে শুইয়ে সবার আগে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপরে পরপর আমরা তিনজন যেমন থাকি। ক্লাসঘরে আমার আবির্ভাব হলেই ছাত্ররা উঠে দাঁড়ায়, তারপর বসে, সমুদ্রের সেই গুঞ্জন থেমে যায় আচমকা, চারদিক শান্ত হয়ে পড়ে।

কী বিষয়ে বক্তৃতা দেব তা জানি। কিন্তু ঠিক কী ভাবে বক্তৃতা দেব, কী ভাবে শুরু করব, কী ভাবে শেষ করব — তা আমার জানা নেই। মনের মধ্যে একটি কথাও আগে থেকে তৈরি থাকে না। কিন্তু যে মুহূর্তে শ্রোতাদের দিকে তাকাই (যারা গ্যালারির থাকে থাকে আমার চোখের সামনে সারিবদ্ধ) এবং ধরাবাঁধা গদে শুরু করি, 'গতদিনের বক্তৃতায় আমরা যে পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম তা হচ্ছে,' সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রান্ত ধারায় আমার মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে আসতে থাকে। গড়গড় করে বলে চলি। আবেগের সঙ্গে দ্রুত কথা বলি,

স্পষ্টতই আমার সেই বাক্যস্রোতকে রুদ্ধ করতে পারে এমন ক্ষমতা তখন কারুর নেই। ভালোভাবে বক্তৃতা দিতে হলে, অর্থাৎ শ্রোতাদের যাতে ভালো লাগে এবং শ্রোতারা যাতে উপকৃত হয় এমন ভাবে বক্তৃতা দিতে হলে মেধা ছাড়া অভ্যাস ও অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন। বক্তার অতি স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার তার নিজের ক্ষমতা কতখানি এবং তার শ্রোতাদেরই বা ক্ষমতা কতখানি। সেই সঙ্গে তার থাকা দরকার বিষয়বস্তুর ওপরে পুরোপুরি দখল। এসব ছাড়াও আরো যে জিনিসটা অবশ্যই থাকা দরকার তা হচ্ছে এক ধরনের চাতুর্য ও শ্রোতাদের ওপরে সদাজাগ্রত দৃষ্টি।

একজন ভালো ঐকতান পরিচালককে সুরকারের রচনার অন্তর্নিহিত অর্থকে সঞ্চারিত করার সময় অনেকগুলি কাজ একসঙ্গে করতে হয়: স্বরলিপি পাঠ করা, হাতের লাঠি নাড়ানো, গায়কের দিকে নজর রাখা, একবার ড্রাম, একবার ফরাসী শিঙাবাদকদের দিকে ইঙ্গিত করা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। বক্তৃতা দেবার সময় আমার অবস্থাও হুবহু এই ঐকতান পরিচালকের মতোই। আমার সামনে দেড়শোটা মুখ — কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। তিনশোটা চোখ অপলক ভাবে সরাসরি তাকিয়ে থাকে আমার মুখের দিকে। এই বহুমুণ্ড দানবটাকে জয় করাই আমার কাজ। বক্তৃতার মধ্যে যতক্ষণ সম্পূর্ণ সজাগ থাকি দানবটার মনোযোগ আর বিচারশক্তি সম্বন্ধে, ততক্ষণ দানবটা থাকে আমার আয়ত্তের মধ্যে। আমার অপর শত্রুটির অবস্থান আমার নিজেরই বুকে। তা হচ্ছে রূপ, প্রপঞ্চ ও নিয়মের সংখ্যাতীত বিভিন্নতা আর এই বিভিন্নতা থেকে উদ্ভূত আমার ও অন্যদের চিন্তাধারা।

প্রতি মুহূর্তে উপকরণের এই যে বিপুল সমাবেশ তা থেকেই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আমাকে তথ্য বাছাই করতে হয়। বাছাই করি শুধু সেটুকুই যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তারপর মুখের কথার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মনের চিন্তাকে এমনভাবে পেশ করি যাতে সেই দানবটা সবচেয়ে সহজে বুঝতে পারে, সেই দানবটার কৌতূহল জাগ্রত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এ বিষয়েও খেয়াল রাখতে হয় যে চিন্তাগুলো যে-ভাবে জমছে সে-ভাবে প্রকাশ না করে, আমি বিশেষ একটা যে ছবিকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলতে চাই সেদিকে নজর রেখে প্রয়োজনীয় ধারাবাহিকভাবে সেগুলোকে প্রকাশ করতে। তাছাড়া, আমাকে এমনভাবে কথা বলতে চেষ্টা করতে হয় যেন তার মধ্যে একটা মাধুর্য

ও মার্জিত ভঙ্গী থাকে। সংজ্ঞাকে করতে হয় সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ, শব্দমালাকে করে তুলতে হয় যতোটা সম্ভব সরল ও শোভন। প্রতি মুহূর্তে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে আমার হাতে মাত্র একঘণ্টা চল্লিশ মিনিট সময়। এক কথায়, অনেক কিছু করতে হয় আমাকে। একাধারে একই সময়ে আমার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হয় বৈজ্ঞানিকের, শিক্ষকের ও বক্তার। যদি কখনো এমন হয় যে বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষকের চেয়ে বক্তার বা বক্তার চেয়ে বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষকের প্রাধান্য ঘটে যাচ্ছে — তাহলেই আমার নাকালের একশেষ।

হয়তো মিনিট পনেরো বক্তৃতা দিয়েছি, বা আধঘণ্টাও হতে পারে, এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়ে যে ছাত্ররা কড়িকাঠ গুণতে শুরু করেছে বা পিওতর ইগ্নাতিয়েভিচের দিকে তাকিয়ে আছে, কেউ কেউ পকেটে রুমাল হাতড়াচ্ছে, কেউ কেউ নড়েচড়ে বসছে, কেউ হয়তো বা হাসছে নিজের মনেই। তাহলে বুঝতে হবে, ছাত্রদের মনোযোগ শিথিল হয়ে আসছে। এক্ষুনি কিছু করা দরকার। তখন প্রথম সুযোগেই আমি যা হোক একটা তামাসার কথা বলি। সঙ্গে সঙ্গে সেই দেড়শোটা মুখে প্রাণখোলা হাসি ফুটে ওঠে, চোখগুলো চকচক করে, আর কয়েকটা সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের জন্যে শোনা যায় সেই সমুদ্রের গুঞ্জন ... সবার সঙ্গে আমিও হাসি, ছাত্রদের মনোযোগ ফিরে আসে। আমি আবার বক্তৃতা দিয়ে চলি।

ক্লাসে বক্তৃতা দিয়ে আমি যতোটা আনন্দ পেয়েছি এমন কোনো কিছুতে নয় — বিতর্কে নয়, আমোদপ্রমোদে নয়, খেলাধুলায় নয়। একমাত্র বক্তৃতা দেবার সময়েই নিজেকে আমি পুরোপুরি ছেড়ে দিতে পেরেছি আমার মধ্যেকার সবচেয়ে প্রবল আবেগের কাছে, একমাত্র তখনই আমি বুঝতে পেরেছি প্রেরণা কথাটা কবিদের একটা আবিষ্কার নয়, প্রেরণার অস্তিত্ব সত্যি সত্যিই আছে। এক একটা বক্তৃতার শেষে যে মধুর ক্লান্তির আস্বাদ পেতাম, স্বয়ং হারকিউলিসও প্রণয়ক্রীড়ার পর তা অনুভব করতে পারেননি।

এই ছিল আগেকার অবস্থা। কিন্তু এখন ক্লাসের বক্তৃতা দেবার সময়ে শুধু যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু বোধ করি না। আজকাল ক্লাস নিতে গিয়ে আধ ঘণ্টাও পার হয় কি হয় না, পায়ে ও কাঁধে একটা দুর্বহ দুর্বলতা বোধ করতে থাকি। আমি বসে পড়ি, কিন্তু বসে বসে বক্তৃতা দেবার অভ্যেস একেবারেই নেই। পরের মুহূর্তেই উঠে পড়ি এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে চলি। তারপরে আবার

পড়ি বসে। বক্তৃতা দিতে গিয়ে আমার জিভ শুকিয়ে যায়, গলা ভেঙে যায়, মাথা ঘুরতে থাকে ... শ্রোতারা যাতে আমার অবস্থা টের না পায় সেজন্যে আমি চুমুক দিয়ে দিয়ে জল খাই, কাশি, নাক ঝাড়ি যেন আমার সর্দি হয়েছে, বেপরোয়া তামাসা করি এবং শেষ পর্যন্ত সময় হবার আগেই বিরতি ঘোষণা করে বক্তৃতার পালা চুকিয়ে দিই। কিন্তু তখন সবচেয়ে বেশি করে যে জিনিসটাকে অনুভব করি তা হচ্ছে লজ্জা।

আমার বিবেক এবং মন বলে যে আমার পক্ষে এখন সবচেয়ে ভালো কাজ হচ্ছে ছাত্রদের কাছে একটি বিদায় অভিভাষণ দেওয়া, শেষ কথা তাদের বলা, তাদের আশীর্বাদ করা, এবং আমার চেয়ে অল্পবয়স্ক এবং শক্তসমর্থ অন্য কারুর জন্যে আমার এই পদটি ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, বিবেকের এই নির্দেশ মেনে চলবার সাহস আমার নেই।

দুঃখের বিষয়, আমি দার্শনিক বা ধর্মশাস্ত্রবেত্তাও নই। ভালো করে জানি, আমার আয়ু আর ছ'মাস। কাজেই, মনে হতে পারে, আমার এখন সবচেয়ে বেশি করে ভাবা উচিত পরলোকের কথা, এবং 'চিরনিদ্রায়' থাকার সময়ে আমার কাছে যে সব স্বপ্ন আসতে পারে তার কথা। কিন্তু যে কারণেই হোক, এসব সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে অনুধ্যান করতে আমার অন্তরের সায় পাই না যদিও মনে মনে খুবই বুঝি যে সমস্যাগুলি বিশেষ রকমের জরুরি। এখন, মৃত্যুর চৌহদ্দির মধ্যে এসে দাঁড়াবার পরেও একটিমাত্র বিষয়েই আমি আগ্রহ বোধ করি। গত বিশ বা ত্রিশ বছর ধরে এই একটিমাত্র বিষয়েই আমি আগ্রহ বোধ করে এসেছি। বিষয়টি হচ্ছে — বিজ্ঞান। এমন কি যখন আমি শেষ নিশ্বাস ছাড়ব তখনো পর্যন্ত আমার এই বিশ্বাস থাকবে যে বিজ্ঞান হচ্ছে মানুষের জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে অপরিহার্য বিষয়। বিজ্ঞানকে বলা যায় প্রেমের চূড়ান্ত প্রকাশ, অতীতেও চিরকাল ছিল, ভবিষ্যতেও চিরকাল থাকবে। মানুষ প্রকৃতিকে এবং নিজেকে জয় করবে একমাত্র বিজ্ঞানের সাহায্যেই। আমার এই বিশ্বাসটা হয়তো খানিকটা বোকার মতো, হয়তো এই বিশ্বাস মূলত অসত্য, কিন্তু আমি যা বিশ্বাস করি তার জন্যে দোষী আমি নই। এই বিশ্বাসকে চেপে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু আমার বক্তব্য এ নয়। আমি শুধু এটুকুই চাই যে আমার দুর্বলতাকে

সবাই ক্ষমার চোখে দেখুক। এবং সবাই বুঝুক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শেষ পরিণতি নিয়ে যে লোকটির বিশেষ মাথাব্যথা নেই বরং যার অনেক কৌতূহল — অস্থিমজ্জার ভবিষ্যৎ বিকাশ কী হবে তাই নিয়ে—তাকে তার অধ্যাপনা ও ছাত্রদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া জীবন্ত অবস্থায় তাকে কফিনে পুরে রাখার সামিল।

অনিদ্রারোগ, এবং পরবর্তী কালে যে দুর্বলতা আচ্ছন্ন করেছে তার বিরুদ্ধে আমার কঠিন সংগ্রাম, এর ফলে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ক্লাসে বক্তৃতা দিতে দিতে আমার গলা দিয়ে কান্না ঠেলে আসে, আমার চোখের পাতাদুটো জ্বালা করে আর একটা অস্বাভাবিক ও বিকারগ্রস্ত ইচ্ছা জাগে যে সামনের দিকে দু হাত বাড়িয়ে জোর গলায় আমার অভিযোগ জানাই। এমন একটা উত্তেজনা বোধ করি যে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে — দেখ, আমার মতো একজন বিখ্যাত মানুষ ভাগ্যের কাছে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে, মাস ছয়েক সময়ের মধ্যেই আরেকজন এসে দাঁড়াবে আমার জায়গায় আর আমার শ্রোতারা আরেকজনের কথা শুনে মুগ্ধ হবে। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে দেখ, আমাকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে। আর আমার শেষ জীবনের দিনগুলিকে বিষাক্ত করে তুলেছে কতগুলি নতুন নতুন চিন্তা — যা এতদিন আমার কাছে সম্পূর্ণ অজানা ছিল। এইসব চিন্তা আমার মস্তিষ্ককে পোকার মতো কুরে কুরে খাচ্ছে। আর এই রকম এক একটি মুহূর্তে নিজের অবস্থায় নিজেই এমন তীব্র আতঙ্ক বোধ করি যে ইচ্ছা করে, আমার শ্রোতারাও আতঙ্কিত হয়ে উঠুক, নিজেদের আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াক, তীক্ষ্ন কণ্ঠে চিৎকার করতে করতে ছুটে বাইরে বেরিয়ে যাক।

এই মুহূর্তগুলি দুঃসহ।

২

ক্লাস শেষ হলে আমি বাড়িতেই থাকি এবং কাজ করি। পত্রিকা ও থিসিসগুলো পড়ি বা পরের দিনের ক্লাসের জন্যে তৈরি হই। মাঝে মাঝে একটু আধটু লিখি। তবে একটানা কাজ করতে পারি না, বাইরের লোক দেখা করতে আসে।

সদর দরজার কলিং-বেল বেজে ওঠে। কোনো একটি দরকারী বিষয়ে

পরামর্শ নেবার জন্যে আসে এক সহকর্মী। টুপি ও ছড়ি হাতে নিয়ে ঢোকে এবং টুপি ও ছড়ি সমেত হাতদুটো আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'থাক, থাক, উঠতে হবে না, দুটো কথা বলেই চলে যাব। এই মিনিটখানেক সময় লাগবে, তার বেশি নয়!'

ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে শুরু হয় আমাদের কথাবার্তা। আমরা একজন অপরজনকে দেখে যে কী পরিমাণ খুশি হয়েছি তা জানাই। আমি চেষ্টা করি তাকে জোর করে একটা চেয়ারে বসাতে আর সে চেষ্টা করে আমাকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে রাখতে। সেই সঙ্গে আমরা সাবধানে পরস্পরের কোমর ও ওয়েস্টকোটের বোতামে এমন ভাবে আঙুল ঠেকিয়ে হাত বোলাই যে দেখে মনে হতে পারে পরস্পরকে অনুভব করতে চাইছি অথচ আমাদের আঙুল পুড়ে যাবার ভয়ও আছে। কোনো হাসির কথা না হওয়া সত্ত্বেও আমরা দুজনেই খুব হাসি। তারপর চেয়ারে বসে পরস্পরের দিকে ঝুঁকে পড়ি এবং চাপা স্বরে কথা বলি। আমাদের দুজনের মধ্যে যতোই হৃদ্যতার সম্পর্ক থাক না কেন আমরা আমাদের প্রত্যেকটি কথাকে চীনেদের মতো নানা ধরনের ভদ্রতার মোড়ক দিয়ে সাজিয়ে হাজির করি। যেমন, বারবার আমাদের বলতে হয়, 'আপনি ঠিকই বলেছেন', কিংবা 'আপনার কাছে একথা আমি নিবেদন করেছিলাম', ইত্যাদি। পরস্পরের সরস বাক্যবিস্তারকে তারিফ করে হাসি, যদিও আমাদের সরস বাক্যবিস্তারের মধ্যে সব সময়ে খুব যে সঙ্গতি থাকে তা নয়। দরকারী কথা শেষ হলে আমার বন্ধু আচমকা উঠে দাঁড়ায়, তারপর আমার ডেস্‌কের দিকে হাত বাড়িয়ে টুপি নেড়ে বিদায় নিতে শুরু করে। আবার আমরা পরস্পরকে স্পর্শ করি আর হাসি। তাকে হলঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিই, সেখানে তাকে কোট পরতে সাহায্য করি। তাকে এতটা সম্মান দেখানোয় সে যথাসাধ্য আপত্তি জানাতে চেষ্টা করে। তারপর ইয়েগর তার জন্যে সদর দরজাটা খুলে দাঁড়ালে বন্ধু আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায় যেন তার সঙ্গে বাইরে না যাই, কারণ আমার ঠাণ্ডা লাগতে পারে। আমি এমন ভাব দেখাই যেন তার সঙ্গে বেরিয়ে সরাসরি সদর রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াব। যখন আবার পড়বার ঘরে ফিরে আসি তখনো আমার মুখ হাসিতে ভরে থাকে, যেন এই হাসি কিছুতেই যাবার নয়।

একটু পরে আবার কলিং-বেল বেজে ওঠে। কে যেন ঢোকে হলঘরে।

অনেকক্ষণ তার সময় যায় বাইরের পোশাক খুলতে আর গলা খাঁকারি দিতে। ইয়েগর এসে জানায় একজন ছাত্র আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। বলি, 'আচ্ছা, ওকে এখানে নিয়ে এসো।' একটু পরেই সুদর্শন এক যুবক এসে ঘরে ঢোকে। বছরখানেক হল এই ছাত্রটির সঙ্গে আমার তেমন ভালো সম্পর্ক নয়। আমি যে সব বিষয়ে পরীক্ষা নিই সেগুলিতে এই ছাত্রটি নিজের যা পরিচয় দিয়েছে তা খুবই হতাশাজনক। তাকে আমি সবচেয়ে কম নম্বর দিই। প্রতি বছর এ ধরনের ছাত্র থাকে জনা-সাতেক, ছাত্রদের ভাষায় যাদের আমি 'গাড্‌ডায় ফেলে দিই' বা 'খসিয়ে দিই'। যারা যোগ্যতার অভাব বা অসুস্থতার জন্যে পরীক্ষায় ফেল করে তারা সাধারণত এ দুঃখ ধৈর্যের সঙ্গেই সহ্য করে, সেজন্যে আমার সঙ্গে দর কষাকষি করতে আসে না। একমাত্র তারাই দর কষাকষি করতে চেষ্টা করে যারা আশাবাদী, সব সময়ে আমোদ ফুর্তি নিয়ে থাকে, যাদের খাওয়াদাওয়া আর নিত্য অপেরা থিয়েটারে যাওয়ার মধ্যে পরীক্ষায় ফেল করাটা মূর্তিমান বিঘ্নের মতো এসে হাজির হয়। প্রথমোক্ত দলকে আমি প্রশ্রয় দিই কিন্তু শেষোক্ত দল সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র মমতা নেই, সারা বছর ধরেই আমি তাদের 'গাড্‌ডায় ফেলি'।

আগন্তুককে বলি: 'বোসো। বলো, কী দরকার।'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আমতা আমতা করে সে বলে 'আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি বলে কিছু মনে করবেন না স্যার। আপনাকে বিরক্ত করতে আসার সাহস আমার হত না ... কিন্তু জানেন তো ... পাঁচবার আমি আপনার কাছে পরীক্ষা দিয়েছি, আর ... এবারেও ফেল করেছি। দয়া করে আমাকে যদি পাশ করিয়ে দেন, কারণ ...'

বেহদ্দ কুঁড়েরা নিজেদের সাফাই গাইবার জন্যে যে সব যুক্তি উপস্থিত করে তা সবক্ষেত্রেই সমান। যেমন তারা নাকি অন্য সব পরীক্ষাতেই চমৎকার ভাবে পাশ করেছে শুধু আমার পরীক্ষাতেই পাশ করতে পারেনি আর আমার পরীক্ষায় পাশ করতে না পারাটা আরো বেশি আশ্চর্যের ব্যাপার, কারণ তারা নাকি আমার বিষয়টাই সবচেয়ে বেশি মনোযোগের সঙ্গে পড়েছে এবং সবচেয়ে ভালো জানে। তা সত্ত্বেও তারা যদি এই বিষয়টিতেই ফেল করে থাকে তবে বুঝতে হবে কোথাও একটা দুর্জ্ঞেয় ভুল বোঝাবুঝি আছে।

আগন্তুককে বলি, 'দুঃখিত। কিন্তু তোমাকে কিছুতেই পাশ করাতে পারি

না। যাও, ক্লাসের নোটগুলি আবার পড়ো গিয়ে। তারপর আবার এসো। তখন দেখা যাবে।'

ছাত্রটি চুপ। যে বিজ্ঞানের চেয়েও বীয়ার গেলা আর অপেরায় যাওয়া বেশি পছন্দ করে তাকে খানিকটা অস্বস্তিতে ফেলে দিতে আনন্দ পাই। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলি:

'আমার মতে তোমার পক্ষে এখন সবচেয়ে ভালো হচ্ছে মেডিক্যাল ফ্যাকাল্‌টি একেবারে ছেড়ে দেওয়া। অত বুদ্ধিশুদ্ধি তোমার আছে তবুও পরীক্ষায় একেবারেই পাশ করতে পারছ না। এর একমাত্র অর্থ, হয় তোমার ডাক্তার হবার ইচ্ছে একেবারেই নেই, নয়তো ডাক্তারি লাইনটাই তোমার জন্যে নয়।'

আশাবাদী ছাত্রটির মুখ ঝুলে পড়ে।

বিমূঢ় হাসি হেসে বলে, 'আপনি বলছেন কী স্যার? আমার পক্ষে সিদ্ধান্তটা অদ্ভুত হবে ... পাঁচ পাঁচটা বছর পড়াশুনো করলাম... তারপর কিনা হঠাৎ ... ছেড়ে দেব!'

'মোটেই তা নয়। যে পেশার সঙ্গে তোমার রুচির মিল নেই তা নিয়ে সারা জীবন থাকার চেয়ে বরং পাঁচটা বছর নষ্ট হওয়া ভালো।'

কথাটা বলেই ছাত্রটির জন্যে আমার মায়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠি:

'যাই হোক, তোমার ব্যাপার তুমিই ভালো বুঝবে। যাও, আরেকটু পড়াশুনো করো গিয়ে। তৈরি হয়ে এসো আমার কাছে।'

'কবে আসব?' বিরস গলায় বেহদ্দ কুঁড়ে প্রশ্ন করে।

'যেদিন খুশি। যদি তৈরি হতে পারো তো কালই এসো।'

ছেলেটির ভালোমানুষি-ভরা চোখদুটোতে যে ভাষা ফুটে ওঠে তা বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না। সে যেন বলতে চাইছে, 'আমি তো আসতেই পারি। কিন্তু এসেই বা কী, তুমি — জন্তু — আবার আমাকে ফেল করাবে। নির্ঘাৎ ফেল করাবে।'

আমি বলে চলি, 'অবশ্য একথা ঠিক যে বার পনেরো তুমি যদি আমার কাছে পরীক্ষা দাও তাহলেই তুমি একটা দিগ্‌গজ হয়ে উঠবে না। এতে তোমার মনের জোর খানিকটা বাড়তে পারে। তা সেটুকুও নিতান্ত তুচ্ছ করার জিনিস নয়।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। আমি উঠে দাঁড়াই, অপেক্ষা করি যে আগন্তুকও বিদায় নিতে চাইবে। কিন্তু সে তবুও জানলার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের তারুণ্যমণ্ডিত দাড়িতে হাত বুলোয় গভীরভাবে চিন্তা করে। এবার আমার বিরক্তি ধরে যায়।

আশাবাদী ছাত্রটির গলার স্বর ভারি মিষ্টি আর নরম, বুদ্ধি ও কৌতুক ভরা চোখ, কিন্তু তার হাসি খুশি মুখ মদ খেয়ে আর সোফায় নিষ্কর্মা হয়ে বসে থেকে থেকে কিছুটা ম্লান। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে অপেরা সম্পর্কে বা ওর প্রেমের ব্যাপারগুলি সম্পর্কে বা ওর বন্ধুদের (যাদের সঙ্গে ওর গভীর অন্তরঙ্গতা) সম্পর্কেও অনেক কৌতূহলোদ্দীপক খবর আমাকে শোনাতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দুজনের সম্পর্ক এমন নয় যে এসব কথা আলোচনা করা চলে। তবে ও যদি বলতে পারে আমি খুশি হয়েই শুনব।

'স্যার, আমি কথা দিচ্ছি, এবারকার মতো যদি আপনি আমাকে পাশ করিয়ে দেন তাহলে...'

কথাবার্তা যখন 'কথা দিচ্ছি' পর্যায়ে এসে পেঁছয় তখন ওকে হাতের ইঙ্গিতে চলে যেতে বলি এবং আমার ডেস্‌কের সামনে গিয়ে বসি। ছাত্রটি অনেকক্ষণ ধরে কী যেন ভাবে তারপর বিষণ্ণ স্বরে বলে:

'আচ্ছা, তাহলে চলি স্যার... কিছু মনে করবেন না।'

'আচ্ছা, এসো। তোমার সৌভাগ্য কামনা করি।'

থেমে থেমে পা ফেলে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়, হলঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কোট পরে, তারপরে শেষ পর্যন্ত যখন রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায় তখন আরেকবার হয়তো অনেকক্ষণ ধরে 'ভাবে'। 'বুড়ো শয়তান' — এই নামে আমাকে আখ্যা দিয়ে আমার চিন্তা সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়, তারপর বীয়ার গিলবার ও খাবার জন্যে সোজা গিয়ে ঢোকে একটা শস্তা রেস্তরাঁয়। তারপর বাড়ি ফিরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। তোমার আত্মা শান্তিতে থাকুক, সৎ পরিশ্রমী!

আরেকবার কলিং-বেল বেজে ওঠে। এই নিয়ে তিনবার। কালো রঙের নতুন পোশাক পরে ঘরে ঢোকে এক তরুণ ডাক্তার। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, আর যথারীতি সাদা টাই। নিজের পরিচয় দেয় সে। তাকে বসতে বলি এবং আমার কাছে কী প্রয়োজনে এসেছে জিজ্ঞেস করি। বিজ্ঞানের এই তরুণ

পণ্ডিত কিছুটা আবেগের সঙ্গেই বলে যে সে এই বছর ডক্টরের ডিগ্রি পরীক্ষায় পাশ করেছে, এখন তার শুধু থিসিস লেখা বাকি। তার ইচ্ছে, আমার সঙ্গে কাজ করে, আমার আওতায় থাকে। এবং আমি যদি তাকে তার থিসিসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু পরামর্শ দিই তাহলে সে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

আমি বলি, 'তোমাকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশিই হব। কিন্তু তার আগে এসো স্পষ্টভাবে আলোচনা করে নেওয়া যাক, থিসিস বলতে আমরা কী বুঝি। থিসিস বলতে আমরা সাধারণত বুঝি এমন একটি রচনা যা স্বাধীনভাবে গবেষণা করে কেউ লিখেছে। থিসিস শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহার করা হয়। কী বলো তুমি? কিন্তু প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু যদি অপরে বলে দেয়, আর প্রবন্ধটি যদি লেখা হয় অপরের নির্দেশে তাহলে তাকে থিসিস না বলে অন্য কিছু বলা উচিত...'

উচ্চতর ডিগ্রি আকাংক্ষাকারী যুবকটি কোনো জবাব দেয় না। আমি আর কিছুতেই বিরক্তি চেপে রাখতে পারি না, চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াই আর প্রচণ্ড রাগে চেঁচিয়ে উঠি:

'আচ্ছা, কেন তোমরা সবাই আমার কাছে আস বলো তো? আমি তো ভেবে পাই না — কেন? আমি কি দোকান খুলে বসেছি? থিসিসের বিষয়বস্তু কেনাবেচা করার ব্যবসা নেই আমার! তোমাদের হাজার বার বলেছি, আমাকে জ্বালাতে এসো না, আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও! আমার কথাগুলো হয়তো রূঢ় শোনাচ্ছে, কিছু মনে কোরো না — কিন্তু এসব আমার আর একেবারেই ভালো লাগে না!'

উচ্চতর ডিগ্রি আকাংক্ষাকারী যুবকটি তবুও নির্বাক। কিন্তু তার গালের হাড়ের ওপরে একটু লাল আভা ফুটে উঠেছে। ওর মুখের ভাব দেখে বোঝা যায় যে আমার খ্যাতি ও আমার পাণ্ডিত্যের প্রতি ওর সুগভীর শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু ওর চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে ঘৃণা। আমার গলার স্বর, আমার হতকুচ্ছিৎ চেহারা, আমার স্নায়বিক হাতের আক্ষেপ — এসবকে ঘৃণা করছে ও। ওর ধারণা আমি অদ্ভুত লোক।

রেগে আবার বলি, 'আমি দোকান খুলে বসিনি! বেশ মজার ব্যাপার যা হোক! কেন, স্বাধীনভাবে কাজ করতে চাও না কেন তোমরা? স্বাধীন কাজ সম্পর্কে কেন এত বিদ্বেষ তোমাদের?'

সমানে কথা বলে চলি আর ও শেষ পর্যন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর একসময়ে আমার রাগ পড়ে যায় এবং বলা বাহুল্য ওর প্রস্তাবেও আমাকে রাজি হতে হয়। যুবকটি এরপর আমার কাছ থেকে পাবে একটি বস্তাপচা বিষয়বস্তু, আমার নির্দেশমতো এমন একটি প্রবন্ধ লিখবে যা এই সংসারে কারও কোনো কাজে লাগবে না, এক বিরক্তিকর বিতর্কসভায় নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করে বেরিয়ে আসবে, আর তারপর পাবে বিজ্ঞানের এমন এক ডিগ্রি যা ওর দরকার নেই।

সদরের কলিং-বেল অনবরত বেজে চলে। কিন্তু আমি মাত্র প্রথম চারজন আগন্তুকের বিবরণ দেব, তার বেশি নয়। চার বারের বার যখন কলিং-বেল বাজে তখন আমার কানে আসে পরিচিত পায়ের শব্দ, পোশাকের খস্‌খসানি; আর আমার প্রিয় একটি গলার স্বর ...

আঠারো বছর আগে আমার এক বন্ধু মারা যায়। বন্ধুটি ছিল চক্ষু-বিশেষজ্ঞ। কাতিয়া নামে সাত বছরের একটি মেয়ে আর ষাট হাজার রুবলের সম্পত্তি রেখে গিয়েছিল সে। উইলে আমাকে সে মেয়েটির অভিভাবক নিযুক্ত করেছিল। দশ বছর বয়স পর্যন্ত কাতিয়া ছিল আমাদেরই বাড়িতে। তারপর তাকে একটা বোর্ডিং স্কুলে পাঠান হয়। তখন থেকে শুধু গ্রীষ্মের ছুটিতে আমাদের কাছে আসত। ও মানুষ হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর দেবার সময় আমার ছিল না, মাঝে মাঝে খুব অল্প সময়ের জন্যে শুধু ওকে চোখের দেখা দেখতাম। সুতরাং ওর ছেলেবেলা সম্পর্কে আমার প্রায় কিছুই জানা নেই।

ওর সম্পর্কে ভাবতে বসলে সবচেয়ে আগে আমার মনে যে ছবি ফুটে ওঠে, আর যা আমার কাছে খুবই প্রিয়, তা হচ্ছে আমাদের বাড়িতে ওর অন্ধবিশ্বাসের সঙ্গে অবির্ভাব আর অসুখ করলে ডাক্তারদের হাতে চিকিৎসার জন্য নিজেকে ছেড়ে দেওয়া। এই অন্ধবিশ্বাসে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠত ওর মুখ। হয়তো গাল ফুলে উঠেছে আর গালে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয়েছে, নড়াচড়া না করে বসে মনোযোগ দিয়ে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত নিজের চারপাশের জগতকে। হয়তো আমি বসে বসে লিখছি বা একটা বইয়ের পাতা ওল্‌টাচ্ছি, কিংবা আমার স্ত্রী ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিংবা পাচক রান্নাঘরে বসে বসে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে, কিংবা কুকুরটা দৌড়ঝাঁপ লাগিয়েছে — যাই

দেখুক না কেন, ওর চোখে সব সময়ে সেই একই চিন্তা ফুটে উঠত, যেন বলতে চাইত: 'এই জগতে যা কিছু ঘটে সবই অর্থপূর্ণ, সবই চমৎকার।' সব বিষয়ে প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল ওর, ভালোবাসত আমার সঙ্গে কথা বলতে। টেবিলের উল্‌টো দিকে আমার মুখোমুখি বসত এসে মাঝে মাঝে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত আমি কী করছি, নানান প্রশ্ন করত আমাকে। ও জানতে চাইত আমি কী পড়ছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আমি কী করি, মড়া দেখে ভয় পাই কিনা, আমার মাইনে দিয়ে আমি কী করি, ইত্যাদি।

'আচ্ছা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মারামারি করে?' জিজ্ঞেস করত ও।

'করে বৈকি।'

'তাহলে কি তুমি ওদের দেওয়ালের ধারে দাঁড় করিয়ে দাও?'

'দিই বৈকি!'

ছাত্ররা মারামারি করে আর আমি ওদের দেওয়ালের ধারে দাঁড় করিয়ে দিই — দৃশ্যটা কল্পনা করে এত মজা পেত ও যে হেসে উঠত। ভারি ভালো মেয়ে ছিল ও, শান্ত স্বভাব, কোনো কিছুতে অসহিষ্ণুতা ছিল না। কোনো কিছু চেয়ে না পেলে, বা ওকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হলে, বা ওর কৌতূহলকে চরিতার্থ করা না হলে আমি ওকে প্রায়ই লক্ষ্য করতাম। ও-রকম সময়ে ওর মুখের সেই অন্ধবিশ্বাসের ভাবটুকুর সঙ্গে এসে মিশত বিষণ্ণতা — আর কিছু নয়। কী করে ওর পক্ষ অবলম্বন করা যায় তা আমার জানা ছিল না। কিন্তু ওকে বিষণ্ণ দেখলেই আমার তীব্র আকাংক্ষা জাগত বুড়ী ধাইয়ের মতো ওকে বুকের কাছে টেনে নিই, আর আদর করে বলি:

'বেচারা অনাথা!'

তাছাড়া মনে আছে, সাজতে গুজতে আর গায়ে এসেন্স মাখতে খুব ভালোবাসত ও। এদিক থেকে ওর সঙ্গে আমার মিল আছে। আমিও সুন্দর পোশাক ও দামী এসেন্স ভালোবাসি।

দুঃখের বিষয়, চোদ্দ কি পনেরো বছরের পর থেকে কাতিয়ার ভাবনাচিন্তায় যে জিনিসটা প্রাধান্য পেয়েছে, তার সূচনা ও বিকাশ অনুসরণ করতে আমি পারিনি। সময়ও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। থিয়েটারের প্রতি কাতিয়ার তীব্র অনুরাগের কথাটা বলতে চাইছি। গ্রীষ্মের ছুটিতে বোর্ডিং স্কুল থেকে বাড়ি এসে সে সবচেয়ে খুশি হত আর সবচেয়ে উৎসাহ বোধ করত

নাটক ও অভিনেতাদের কথা বলতে গিয়ে। থিয়েটার সম্পর্কে কথা বলতে সে কখনো ক্লান্তি বোধ করত না। শুনে শুনে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠত। আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা ওর কথায় কর্ণপাত করত না। আমিই একমাত্র লোক যার পক্ষে ওর প্রতি মনোযোগ না দেওয়াটা সাধ্যের অতীত ছিল। নিজের উদ্দীপনার ভাগ অন্য কাউকে দেবার ইচ্ছে হলেই ও চলে আসত আমার পড়বার ঘরে এবং অনুনয় বিনয় করে বলত:

'নিকলাই স্তেপানিচ, একটু থিয়েটারের গল্প শুনবে — শোনো না!'

আমি ঘড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতাম:

'আচ্ছা বেশ, তোমাকে আমি আধঘণ্টা সময় দিচ্ছি, বলে যাও!'

কিছুকাল পরে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ডজন ডজন ফটো নিয়ে বাড়ি আসাটা ওর একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেল। এই ফটোগুলোকে ও ভক্তি করত, ভালোবাসত। তারপর কিছুকাল শখের থিয়েটারে নেমে দেখল এ বিষয়ে নিজের ক্ষমতা কতটুকু। শেষকালে স্কুলের পড়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে একদিন আমার কাছে এসে ঘোষণা করল যে সে অভিনেত্রী হবে, অভিনেত্রী হবার জন্যেই সে জন্মেছে।

থিয়েটার সম্পর্কে কাতিয়ার এই অতি উৎসাহে আমি কোনো দিন সায় দিইনি। আমার মতে, কোনো নাটক যদি সত্যিই ভালো হয় তবে তা কতটা ভালো দেখাবার জন্যে অভিনেতৃদের অতটা কষ্ট না করলেও চলে। নাটকটি পড়ে নেওয়াই যথেষ্ট। আর যদি নাটকটি খারাপ হয় তবে হাজার ভালো অভিনয় হলেও কিছু ফল হবে না।

তরুণ বয়সে আমি প্রায়ই থিয়েটারে যেতাম। এখনো আমার বাড়ির লোকেরা বছরে দু-বার থিয়েটারের বক্সের টিকিট কাটে এবং আমার গায়ে একটু বাইরের হাওয়া লাগাবার জন্যে আমাকে নিয়ে যায় সেখানে। অবশ্য আমি বলছি না যে বছরে দু-বার থিয়েটারে যাই বলেই থিয়েটার সম্পর্কে রায় দেবার অধিকার আমার আছে। সুতরাং এ বিষয়ে বেশি কথা আমি বলব না। তবে আমার মনে হয়, ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে থিয়েটারের যা অবস্থা ছিল তার চেয়ে এখন যে বিশেষ উন্নত হয়েছে তা নয়। আগের মতোই এখনো প্রেক্ষাগৃহের চৌহদ্দির মধ্যে একগ্লাস জল খাবার ইচ্ছে হলে পাবার উপায় নেই। এখনো কোট গায়ে দিয়ে গেলে পোশাক কামরার পরিচারক কুড়ি কোপেক জরিমানা

আদায় করে—যদিও শীতকালে গরম পোশাক পরে যাওয়ার মধ্যে অন্যায়টা কী হতে পারে সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না। আজকালও বিরতির সময়ে নিতান্ত অকারণেই বাজনা বাজানো হয়, ফলে, নাটক দেখে মনের মধ্যে যে ধারণা গড়ে ওঠে তা অবিমিশ্র থাকে না, তার সঙ্গে থাকে বাজনা শোনার আনকোরা ও অবাঞ্ছিত একটা প্রতিক্রিয়া। বিরতির সময়ে এখনো লোকে খাবার ঘরে ছোটে গলা ভেজাবার জন্যে। সুতরাং যেখানে এসব ছোটখাটো ব্যাপারে কোনো রকম উন্নতি হয়নি, সেখানে বড়ো ব্যাপারগুলিতে উন্নতি হচ্ছে কিনা তা দেখে আমার কোনো লাভ নেই। আর যখন কোনো অভিনেতা মাথা থেকে পা পর্যন্ত থিয়েটারী ঢঙ আর ভড়ং বজায় রেখে বক্তৃতাবাগীশের মতো 'টু বি অর নট টু বি' ধরনের কোনো একটা সহজ ও সাধারণ স্বগতোক্তি হাত পা ছুঁড়ে আবৃত্তি করে, বিন্দুমাত্র কারণ না থাকা সত্ত্বেও ফুঁসিয়ে ওঠে, কিংবা যখন সে চেষ্টা করে যে আমাকে বিশ্বাস করাবেই করাবে চাৎস্কি হচ্ছে খুব একটা চালাক লোক যদিও চাৎস্কির চলাফেরা ছিল বোকাদের সঙ্গে আর প্রেম করত একটা বোকা মেয়ের সঙ্গে কিংবা 'অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি' নাটকটা মোটেই বিরক্তিকর নয় — তখন আমার মনে হয়, চল্লিশ বছর আগে নাটক দেখতে এসে যে ধরনের উচ্চাঙ্গ হা-হুতাশ ও বুক চাপড়ানি আমাকে শুনতে হত এবং যা শুনে শুনে আমি বিরক্তি বোধ করতাম, তা আধুনিক মঞ্চেও বজায় আছে। কাজেই যতোবারই আমি নাটক দেখতে যাই ততোবারই মঞ্চ সম্পর্কে আমার ধারণা আরো বেশি রক্ষণশীল হয়ে ওঠে।

অন্ধবিশ্বাসী আবেগপ্রবণ জনতাকে অবশ্য বোঝানো চলতে পারে যে আধুনিক মঞ্চ হচ্ছে একটি শিক্ষালয়। কিন্তু শিক্ষালয় বলতে কী বোঝায় সে সম্বন্ধে যাদের সঠিক ধারণা আছে তারা এই টোপ সহজে গিলবে না। আগামী পঞ্চাশ কি একশো বছরের মধ্যে অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে কিনা জানি না, কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থা চলছে তাতে মঞ্চের অবদান আমোদপ্রমোদ ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার এই আমোদপ্রমোদ এতবেশি দুর্মূল্য যে আমাদের পক্ষে দিনের পর দিন এই আমোদপ্রমোদ উপভোগ করা অসম্ভব। আর এজন্যে রাষ্ট্রকে খোয়াতে হয় হাজার হাজার তরুণ তরুণী, যাদের স্বাস্থ্য আছে এবং যারা নানা বিষয়ে গুণী। এরা মঞ্চের কাছে নিজেদের উৎসর্গ না করলে হয়তো হতে পারত চমৎকার ডাক্তার, চাষী, শিক্ষক বা অফিসার।

আর জনসাধারণকে খোয়াতে হয় তাদের সান্ধ্য অবসরের সময়টুকু, যেটা বুদ্ধিবৃত্তিগত কাজ এবং অন্তরঙ্গ আলাপ আলোচনার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। দর্শকরা যখন দেখে যে খুন, ব্যাভিচার ও কুৎসা রটনাকে অভিনয়ের মধ্যে গৌরবমণ্ডিত করা হচ্ছে তখন তাদের নীতিবোধ যে ভাবে ক্ষুণ্ণ হয় এবং তাদের যে পরিমাণ অর্থব্যয় করতে হয়—সেসব কথা তো তোলাই হয়নি।

কাতিয়ার কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো মত। সে জোর দিয়ে বলত যে মঞ্চ বর্তমানে যে অবস্থায় আছে সেটাও বই বা বক্তৃতার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়; পৃথিবীর সবকিছু থেকে বেশি প্রয়োজনীয়। মঞ্চ এমন একটা শক্তি যার মধ্যে সংহত হয়েছে অন্য সমস্ত শিল্প। অভিনেতাদের সঙ্গে তুলনা করা চলে ধর্ম প্রচারকদের। মানুষের মনের ওপরে মঞ্চের যতোটা জোরালো ও সোজাসুজি প্রভাব ততোটা প্রভাব অন্য কোনো শিল্প বা বিজ্ঞানের নেই। এজন্যেই দেখা যায়, সেরা বৈজ্ঞানিক বা শিল্পীর চেয়েও নিতান্ত মাঝারি গোছের অভিনেতার খ্যাতি বেশি। অভিনয় করে অভিনেতারা যতোটা আনন্দ ও তৃপ্তি পায়, সমাজ উন্নয়নমূলক অন্য কোনো কাজে তা পাওয়া যায় না।

তারপর এক দিন কাতিয়া এক নাটুকে দলে যোগ দিয়ে বসল এবং, যতোদূর মনে পড়ে, চলে গেল উফা-য়। সঙ্গে নিয়ে গেল প্রচুর অর্থ, অনেক রঙিন আশা আর মঞ্চ সম্পর্কে অনেক উঁচু ধারণা।

যাবার পথে তার প্রথম দিকের চিঠিগুলো ছিল চমৎকার। পড়ে আমি মুগ্ধ হতাম। কতকগুলি টুকরো টুকরো কাগজ—কিন্তু তার মধ্যেই ফুটে উঠত বিপুল তারুণ্য, অন্তরের সৌন্দর্য আর পবিত্র সারল্য—আর সেই সঙ্গে থাকত এমন একটা সূক্ষ্ম বাস্তব বোধ যা সবচেয়ে পরিণত পুরুষের বুদ্ধির পক্ষেও কাম্য। ভল্‌গা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, ওর দেখা সমস্ত শহর, ওর সঙ্গীরা, ওর সাফল্য ও ব্যর্থতা—এসব বিষয়ে উল্লেখ থাকত ওর চিঠিতে। এমনভাবে উল্লেখ থাকত যে তাকে বর্ণনা না বলে বরং বলা চলে যেন গান। ওর মুখের যে অন্ধবিশ্বাসের ছাপটুকু দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম, ওর চিঠির প্রত্যেকটা লাইনে তার আভাস পাওয়া যেত। আর সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় ছিল ওর চিঠির অজস্র ব্যাকরণগত ভুলভ্রান্তি এবং দাঁড়ি কমার প্রায় অবলুপ্তি।

মাস ছয়েকও পার হয়েছিল কিনা সন্দেহ, এমন সময়ে ওর কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। চিঠিটা খুব কবিত্বময় ও উৎসাহভরা। চিঠিটা এই বলে

শুরু করা হয়েছিল—'আমি প্রেমে পড়েছি'। চিঠির সঙ্গে ছিল একটি যুবকের ফটো। পরিষ্কার দাড়িগোঁফ কামানো মুখ, মাথায় চওড়া কিনারওলা টুপি আর এককাঁধে ডোরাকাটা শাল। তার পরের চিঠিগুলিও একই রকমের চমৎকার তবে তফাৎ এইটুকু যে এতদিনে দাঁড়ি কমার আবির্ভাব হতে শুরু করেছিল এবং ব্যাকরণগত ভুল থাকত না। লেখার মধ্যে পুরুষালি গন্ধটা টের পাওয়া যেত ভালোভাবেই। এই সময়ের একটি চিঠিতে কাতিয়া লিখল যে ভল্‌গার ধারে কোনো এক জায়গায় মস্ত এক থিয়েটার গড়ে তোলবার ইচ্ছে তার আছে, ব্যাপারটা নাকি খুবই চমৎকার হবে। বলা বাহুল্য প্রচেষ্টাটি হবে সমবায়ের ভিত্তিতে, টাকা জোগাড় করতে হবে ধনী ব্যবসায়ী ও জাহাজ মালিকদের কাছ থেকে, সুতরাং টাকার অভাব হবে না। তাছাড়া টিকিট বিক্রি করেও নাকি প্রচুর টাকা পাওয়া যাবে। অভিনেতারা কাজ করবে যৌথলাভের ভিত্তিতে ... চিঠিটা পড়ে আমি মনে মনে ভাবলাম যে প্রস্তাবটা শুনতে খুবই ভালো কিন্তু পুরুষের মস্তিষ্ক ছাড়া আর কোথাও এ ধরনের প্রস্তাব জন্মাতে পারে না।

ব্যাপারটা যাই ঘটে থাকুক না কেন, দু-এক বছর পরেও অবস্থা দেখে মনে হল, সবকিছু ভালোভাবেই চলছে। কাতিয়া প্রেমে পড়েছিলো, নিজের উদ্দেশ্যের প্রতি ওর আস্থা অক্ষুণ্ণ ছিল, এবং ও ছিল সুখী। কিন্তু তারপর থেকেই ওর চিঠিতে যেন একটা ক্লান্তির সুস্পষ্ট আভাস টের পেতে লাগলাম। সবচেয়ে বড়ো কথা, কাতিয়া ওর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে শুরু করেছিল। লক্ষণ হিসেবে এইটিই প্রথমে দেখা দেয় এবং সবচেয়ে বেশি অমঙ্গলসূচক। যদি কোনো তরুণ বৈজ্ঞানিক বা লেখক কাজ শুরু করতে গিয়ে সহযোগী বৈজ্ঞানিক বা লেখকদের সম্পর্কে তীব্র ভাষায় অভিযোগ জানাতে শুরু করে, তাহলে বুঝতে হবে যে তার ক্লান্তি এসেছে এবং ও কাজের সে অনুপযুক্ত। কাতিয়া আমার কাছে চিঠিতে লিখেছিল যে ওর সঙ্গীরা রিহার্সালে উপস্থিত থাকে না এবং নিজেদের পার্ট সবসময়ে ভুলে যায়। যে সব উদ্‌ভট ধরনের নাটক অভিনীত হয় এবং মঞ্চে অভিনয় করতে গিয়ে অভিনেতারা যে ধরনের আচরণ করে তাতে বোঝা যায়, দর্শকদের সম্পর্কে প্রত্যেক অভিনেতাই চরম বিদ্বেষের ভাব পোষণ করে। সবাইকার নজর শুধু টিকিট বিক্রির দিকে, তাই নিয়েই যা কিছু আলাপ আলোচনা। ফলে

অভিনেত্রীরা খেলো ধরনের গান গেয়ে নিজেদের মর্যাদার হানি করে, বিয়োগান্ত নাটকের অভিনেতারা এমন সব জোড়া লাইনের গান গায় যার মধ্যে থাকে প্রতারিত স্বামীর আর অসতী স্ত্রীর গর্ভাবস্থা নিয়ে ঠাট্টাতামাসা। প্রাদেশিক থিয়েটারগুলো যে এখনো টিকে আছে এবং এত খেলো এবং দুর্নীতিপূর্ণ অবহাওয়া বজায় রেখেও এখনো পর্যন্ত যে নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছে, এটা সত্যিই অবাক হবার মতো ব্যাপার।

জবাবে কাতিয়াকে একটা দীর্ঘ বা হয়ত একঘেয়ে চিঠি লিখেছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে লিখেছিলাম: 'প্রাচীন অভিনেতাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার আলাপ আলোচনা হয়েছে। তাঁদের অন্তঃকরণ মহৎ। তাঁদের স্নেহ লাভ করে ধন্য হয়েছি। তাঁদের কথাবার্তা শুনে ধারণা হয়েছে যে তাঁদের অভিনয় নিজেদের চিন্তা ও ইচ্ছের চেয়ে বেশি করে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে দর্শকদের তৎকালীন প্রবণতা ও ঝোঁক দ্বারা। তাঁদের মধ্যে যাঁরা সেরা অভিনেতা, নিজেদের সময়কালে তাঁদের নামতে হয়েছে বিয়োগান্ত নাটকে বা ক্ষুদ্র গীতিনাট্যে, প্যারিসীয় কৌতুকনাট্যে বা নির্বাক প্রহসনে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁদের ধারণা হয়েছে যে সঠিক পথেই তাঁরা চলেছেন এবং ভালো কাজই করছেন। তাহলেই দেখছ, গলদের মূল খুঁজতে হবে অভিনেতাদের মধ্যে নয়, বরং শিল্পেরই মধ্যে, শিল্প সম্পর্কে সমাজের মনোভাবের মধ্যে।' আমার এই চিঠি পেয়ে কাতিয়া খুশি হয়নি। জবাবে সে লিখেছিল: 'আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলছি। যাঁদের অন্তঃকরণ মহৎ এবং যাঁদের স্নেহ লাভ করে তুমি ধন্য হয়েছ তাঁদের কথা তোমার কাছে লিখিনি। আমি যাদের কথা লিখেছি তারা একদল অপদার্থ, মহৎ অন্তঃকরণের ছিটেফোঁটাও নেই। তারা একদল বর্বর থিয়েটারে ঢুকেছে, কারণ অন্য কোথাও চাকরি পায়নি। নিজেদের তারা অভিনেতা বলে নেহাতই ঔদ্ধত্যের জন্যে। তাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যার প্রতিভা আছে। এমন একজনও নেই যার এতটুকু বৈশিষ্ট্য আছে। সবাই মাঝারি। তারা মাতলামি করে, চক্রান্ত করে, আড়ালে কুৎসা প্রচার করে। যখন দেখি, যে-শিল্পকে এত ভালোবাসি তা গিয়ে পড়েছে এমন একদল লোকের হাতে যাদের ঘৃণা করি, যখন দেখি যে চিন্তাজগতের অগ্রনায়করা এই অশুভ ব্যাপারটিকে দেখে শুধু দূর থেকে, আরো কাছাকাছি এসে অনুধাবন করতে চায় না এবং সহানুভূতি না দেখিয়ে মামুলি গাল-ভরা কথা বলে ও সম্পূর্ণ

অনাবশ্যক নীতিবাক্য কপচায় — তখন আমার সারা মন তিক্ত হয়ে ওঠে ...' এমনি আরো অনেক কথা ও লিখেছিল। এমনি ভাষাতেই।

আরো কিছুকাল কাটার পরে কাতিয়ার কাছ থেকে এই চিঠি পেলাম: 'আমি নির্মমভাবে প্রতারিত হয়েছি। বেঁচে থাকার সাধ আর নেই। তোমার বিবেচনায় যা ভালো মনে হয়, তেমনি ভাবে আমার টাকা খরচ কোরো। তোমাকে আমি বাপের মতো ভালোবেসেছি। তুমি আমার একমাত্র বন্ধু। বিদায়।'

সুতরাং প্রমাণ হয়ে গেল যে কাতিয়ার 'সে'-ও সেই বর্বরের দলেরই অন্তর্ভুক্ত। এই ঘটনার পরে আভাসে ইঙ্গিতে যেটুকু শোনা গেছে তাতে বুঝতে পেরেছিলাম কাতিয়া আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিল। মনে হয় বিষ খেয়ে মরতে চেয়েছিল কাতিয়া। তারপরে নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর অসুস্থ হয়ে পড়ে, কারণ পরের চিঠিটা আমি পাই ইয়াল্‌টা থেকে। সেখানে হয়তো ও ডাক্তারের নির্দেশে গিয়েছিল। ওর শেষ চিঠিতে অনুরোধ ছিল, আমি যেন ওর কাছে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এক হাজার রুবল পাঠিয়ে দিই। চিঠিটা শেষ করেছিল এই বলে: 'আমার চিঠিতে বড় বিষণ্নতার ছাপ। সেজন্যে ক্ষমা কোরো। গতকাল আমার বাচ্চাটিকে কবর দিয়েছি।' ক্রিমিয়াতে বছরখানেক কাটিয়ে সে বাড়ি ফিরে আসে।

বাড়ির বাইরে ও ছিল বছর চারেক। একথা স্বীকার করতেই হবে যে এই বছর চারেক আমি যে ভূমিকা নিয়েছিলাম তা অস্বাভাবিক এবং বিশেষ প্রশংসনীয় নয়। গোড়ার দিকে যখন ও থিয়েটারে নামার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল প্রেমে পড়েছে, মাঝে মাঝে যখন বেপরোয়া খরচ করত আর আমি বাধ্য হতাম কখনো এক হাজার কখনো দু'হাজার রুবল পাঠাতে, যখন আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল ও মরতে চায় এবং আরো কিছুদিন পরে যখন ওর সন্তানের মৃত্যু সংবাদ দিয়েছিল তখন আমি মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। ওর জীবননাট্যে তখন আমার একমাত্র ভূমিকা ছিল শুধু ওর সম্পর্কে সব সময়ে ভাবা আর লম্বা একঘেয়ে চিঠি লেখা। চিঠিগুলো হয়তো না লিখলেও চলত। কিন্তু আমার দিক থেকেও তো কর্তব্য আছে — আমি কি ওর পিতৃস্থানীয় নই? আমি কি ওকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসি না?

কাতিয়া এখন আছে আমার বাড়ি থেকে সিকি মাইল দূরে। একটা পাঁচ কামরাওলা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে ও। ফ্ল্যাটটা এমনভাবে সাজিয়েছে যে স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো ত্রুটি নেই আর সাজানোর মধ্যে আছে ওর নিজস্ব রুচিবোধ। নিজের জন্যে এমন একটি পরিবেশ ও রচনা করেছে য়্যার বর্ণনা দেবার চেষ্টা করতে হলে সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে পরিবেশের আলস্যের ওপর। অলস শরীরের জন্যে আছে নরম কৌচ আর নরম চেয়ার, অলস পায়ের জন্যে নরম কার্পেট, অলস দৃষ্টির জন্যে আবছা অস্পষ্ট অনুজ্জ্বল রং। আর আছে অলস আত্মার জন্যে দেওয়ালে দেওয়ালে অজস্র শস্তা দামের পাখা, ছোট ছোট এমন সব ছবি যেগুলোর মধ্যে বিষয়বস্তুর চেয়ে আঁকার ঢঙের বৈশিষ্ট্য বেশি প্রকট, ছোট ছোট টেবিল, তাক, ছড়ানো ছিটনো একেবারেই অদরকারী ও অকেজো জিনিস, পর্দার বদলে নানা রকমের কাপড়ের জঞ্জাল, ইত্যাদি ... এই হচ্ছে ঘরদোরের অবস্থা। তার ওপরে বোঝা যায়, ইচ্ছে করে উজ্জ্বল রং ব্যবহার করা হয়নি, চারদিক এলোমেলো ঠাসাঠাসি করে রাখা হয়েছে। সব কিছুর মধ্যে যেমন ফুটে উঠেছে মানসিক আলস্য, তেমনি স্বাভাবিক রুচির বিকৃতি। দিনের পর দিন কাতিয়া কৌচে শুয়েই কাটিয়ে দেয়, শুয়ে শুয়ে বই পড়ে—অধিকাংশ সময়েই উপন্যাস বা ছোট গল্পের বই। দুপুরের পরে প্রতি দিন মাত্র একবার ও বাইরে বেরোয় আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

আমি নিজের কাজ করে চলি আর কাতিয়া বসে থাকে কাছাকাছি একটা কৌচে। বসে বসে অনবরত শালটাকে গায়ে জড়ায়, যেন ওর শীত করছে। ও সামনে বসে থাকলেও আমার কোনো অসুবিধে হয় না, খুব মন দিয়েই কাজ করতে পারি। তার কারণ হয়তো ও আমার বিশেষ প্রিয়পাত্রী কিংবা হয়তো ছোটবেলা থেকেই আমার কাছে ওর ঘনঘন যাতায়াতে আমি অভ্যস্ত। মাঝে মাঝে আমি ওকে দু একটা অলস প্রশ্ন করি, ও সংক্ষেপে জবাব দেয়। কখনো কখনো আমার খানিকটা বিশ্রামের দরকার হয়ে পড়ে, তখন আমি মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাই। ও হয়তো অন্যমনস্কভাবে কোনো একটা খবরের কাগজ বা ডাক্তারী পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে। আর ঠিক সেই সময়ে আমার নজরে পড়ে, ওর মুখের ভাবে আগে যে অন্ধবিশ্বাসের ছাপটুকু ছিল তা আর নেই। মুখটা হয়ে উঠেছে নিস্পৃহ, বিরস, ভাবলেশহীন—বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলে ট্রেনের যাত্রীদের মুখের চেহারা যেমন হয়, তেমনি। ওর

সাজপোশাক এখনো আগের মতোই সুন্দর আর সরল, কিন্তু আগেকার সেই পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য আর নেই। ও যে সারাদিন কৌচ বা দোল-খাওয়া চেয়ারে বসে বসে কাটায় সেই চিহ্ন ফুটে থাকে ওর চুলের বা পোশাকের ভাঁজে। আগেকার কৌতূহল আর ওর নেই। আজকাল আমাকে আর কোনো প্রশ্ন করে না। মনে হয়, জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাই ওর জানা হয়ে গেছে, এর পরেও নতুন কিছু শোনার থাকতে পারে বলে ও আশা করে না।

চারটে বাজার একটু আগেই আবার বৈঠকখানায় লোকজনের সাড়া ওঠে। তার মানে, লিজা সঙ্গীত কলেজ থেকে ফিরে এসেছে এবং সঙ্গে নিয়ে এসেছে কয়েকজন বান্ধবীকে। শোনা যায়, কেউ পিয়ানো বাজাচ্ছে, কেউ গানের দু-একটা কলি গেয়ে উঠছে। হাসির শব্দ ওঠে। কাপডিশের ঝন্‌ঝনানি তুলে ইয়েগর খাবারঘরের টেবিল সাজায়।

কাতিয়া বলে, 'আচ্ছা, আমি এবার চলি। ওঘরে আজ আর যেতে ইচ্ছে করছে না। ওরা যেন কিছু মনে না করে। আমার সময় নেই। আমার বাড়িতে এসো না!'

ওর সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা পর্যন্ত যাই। তখন ও তীব্র দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে আর ধমকের সুরে বলে, 'তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ। চিকিৎসা করাও না কেন? আচ্ছা আমি সের্গেই ফিওদরভিচকে খবর পাঠিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলব। উনি এসে দেখুন তোমাকে।'

'এখন থাক কাতিয়া।'

'তোমার বাড়ির লোকজনেরও মতিগতি আমি বুঝি না বাপু। কী চমৎকার সংসার তোমার!'

শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ও কোট গায়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ওর অযত্নে বাঁধা চুল থেকে দু-একটা চুলের কাঁটা মেঝের ওপরে খসে পড়ে। কিন্তু ওর এতবেশি কুঁড়েমি আর এতবেশি তাড়া যে চুল ঠিক করবার সময় নেই। রাস্তায় পা বাড়াবার আগে শুধু দু-একটা অবাধ্য চুলকে টুপির তলায় গুঁজে দেয়।

আমি যখন খাবারঘরে যাই, আমার স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'কাতিয়া এসেছিল নাকি তোমার কাছে? কই, আমাদের সঙ্গে তো দেখা করল না? অদ্ভুত ব্যাপার ...'

লিজা মাকে শাসন করে: 'কেন মা তুমি এসব বলছ। ও যদি আমাদের কাছে আসতে না চায়, তাহলে ওর না আসাই ভালো। ওর কাছে আমাদের জোড়হাত হয়ে থাকতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই।' 'যাই বলো না কেন, একে বলে গুমোর। পড়বার ঘরে তিনঘণ্টা ধরে বসে আছে, তবুও একবারটি আমাদের কথা মনে পড়ে না। কিন্তু অবশ্যই নিজের খেয়ালখুশি মতো ও চলতে পারে।'

ভারিয়া ও লিজা দুজনেই কাতিয়াকে ঘৃণা করে। ওদের এই বিদ্বেষের কারণ বুঝি না। হয়তো আমার পক্ষে বোঝা সম্ভবও নয়, স্ত্রীলোক না হলে এই ব্যাপারটিকে হয়তো বোঝা যাবে না। প্রায় রোজই ক্লাসঘরে একশো-পঞ্চাশজন যুবককে দেখি, প্রতি সপ্তাহে নানা কাজেকর্মে কয়েক-শো মধ্যবয়স্ক পুরুষের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়। জোর করে বলতে পারি, এদের মধ্যে একজনও এই ব্যাপারটি বুঝতে পারবে না। বুঝতে পারবে না — কাতিয়ার অতীত সম্পর্কে, কাতিয়া যে বিনা বিয়েতে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে সেই ঘটনা সম্পর্কে, এমন কি কাতিয়ার জারজ সন্তানটি সম্পর্কেও কেন এই বিদ্বেষ ও ঘৃণা। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়েও নিশ্চিত যে যে-সব স্ত্রীলোক বা মেয়েকে চিনি তারা প্রত্যেকেই জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক এই মনোভাবকে সমর্থন করবে। তার মানে স্ত্রীলোকদের ধর্মভাব যে পুরুষদের চেয়ে বেশি তা নয়। সত্যি কথা বলতে কি, ঈর্ষাকে যদি না কাটানো যায় তবে পাপ আর পুণ্যের মধ্যে তফাৎ সামান্যই। আমার তো মনে হয়, স্ত্রীলোকদের মধ্যে পরিণতির অভাব আছে বলেই তারা এ ধরনের চিন্তা করে। মানুষের দুর্ভাগ্য দেখলে এ যুগের পুরুষদের মনে জাগে বিষণ্ণ সহানুভূতি ও অস্ফুট অনুশোচনা। আমার তো মনে হয়, বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা জাগার চেয়ে সহানুভূতি ও অনুশোচনার মধ্যে অনেক বেশি সংস্কৃতি ও নৈতিক উন্নতির পরিচয় আছে। এ যুগের স্ত্রীলোকরা মধ্যযুগের স্ত্রীলোকদের মতোই কথায় কথায় কাঁদতে জানে এবং মধ্যযুগের স্ত্রীলোকদের মতোই নির্বিকার। যারা বলে যে মেয়েকে বড়ো করে তুলতে হবে ছেলের মতো করে, আমার মতে তারা ঠিক কথাই বলে।

কাতিয়াকে আমার স্ত্রী যে পছন্দ করে না তার অন্য কারণও আছে। সেগুলো এই: কাতিয়া থিয়েটারে নেমেছে, কাতিয়া অকৃতজ্ঞ, কাতিয়ার বড়ো বেশি দেমাক, কাতিয়া খামখেয়ালী, এবং এ ধরনের আরো অসংখ্য সব

দোষত্রুটি যা একজন স্ত্রীলোক অন্য একজন স্ত্রীলোকের মধ্যে সব সময়েই খুঁজে পায়।

খাবার টেবিলে বাড়ির লোক ছাড়াও আমার মেয়ের দু-তিনজন বান্ধবী থাকে। আর থাকে লিজার অনুরাগী ও প্রেমাকাংক্ষী আলেক্সান্দ্র আদলফভিচ গ্নেক্কের। শেষোক্ত জন ফর্সা চেহারার যুবক, বছর ত্রিশেক বয়েস, মাঝারি লম্বা, শক্তসমর্থ গড়ন, চওড়া কাঁধ। লালচে জুল্পি ও রঙ করা মোচ সমেত মুখটাকে পুতুলের মতো মনে হয়। তার পরনে খুব খাটো জ্যাকেট, বাহারে ওয়েস্টকোট, ডোরা কাটা ট্রাউজার, ট্রাউজারটা কোমরের দিকে ঝুলঝুলে, পায়ের দিকে আঁটোসাঁটো। পায়ে হীল-বিহীন বাদামি জুতো। ঠেলে বেরিয়ে আসা চিংড়ি মাছের মতো চোখ, চিংড়ি মাছের গলার মতো টাই, এমন কি আমার মনে হয়, এই লোকটির গা থেকেও চিংড়ি মাছের ঝোলের গন্ধ বেরোয়। রোজ সে আসে আমাদের বাড়িতে কিন্তু কেউ জানে না কোন বংশে তার জন্ম, কোথায় লেখাপড়া শিখেছে, কী ভাবে তার চলে। সে গান গাইতে বা বাজাতে জানে না — কিন্তু গানবাদ্যের খবরদারি করে। কে জানে কোথায়, কে জানে কাকে বড়ো বড়ো পিয়ানো বিক্রি করে সে। গানবাজনার স্কুলে সদাসর্বদা তার যাতায়াত, বিখ্যাত লোকদের সবাইকে সে চেনে, কনসার্টের আসরে সে হয় প্রযোজক। মুখে মুখে সে বাজনার সমালোচনা করে, এবং আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, তার সমালোচনায় সবাই একবাক্যে সায় দেয়।

টাকাপয়সাওলা লোকদের চারপাশে যেমন সবসময়ে মোসাহেবের দল থাকে, বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রেও তাই। আমার ধারণায়, বিজ্ঞান ও শিল্পের এমন একটা ক্ষেত্রও পাওয়া যাবে না যেখানে গ্নেক্কের মশাইয়ের মতো 'অযোগ্য লোকেরা' হাজির নেই। আমি নিজে গানবাজনার সমঝদার নই, গ্নেক্কের সম্বন্ধে আমার ধারণা হয়তো ভুলও হতে পারে, তাছাড়া লোকটিকে আমি সামান্যই চিনি। কিন্তু কেউ যদি পিয়ানো বাজায় বা গান গায় তাহলে সে যে-রকম মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গী ও আত্মসন্তুষ্টির ভাব নিয়ে পিয়ানোর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে তা দেখে আমার মনে সন্দেহ জেগেছে।

আপনি ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা, বা প্রিভি কাউন্সিলর হোন্, আপনার ঘরে যদি মেয়ে থাকে তাহলে মধ্যবিত্তসুলভ অশ্লীলতা থেকে আপনার ঘরের আবহাওয়া কিছুতেই মুক্ত থাকবে না। আপনার ঘরের আবহাওয়ায় এবং

আপনার মেজাজে এই অশ্লীলতা এসে ঢুকবে আপনার মেয়ের প্রেমঘটিত ব্যাপার থেকে, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ও বিয়ের মধ্যে দিয়ে। আমি তো কতগুলো ব্যাপার কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। যেমন, গ্নেক্কের আমাদের বাড়িতে এলেই আমার স্ত্রীর মুখে এমন একটা ভাব ফুটে ওঠে যেন মস্ত একটা জয়লাভ হয়েছে, একমাত্র সে হাজির থাকলেই খাবার টেবিলে লাফিৎ, পোর্ট, শেরির বোতলের আবির্ভাব ঘটে — উদ্দেশ্য, তাকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দেওয়া, কী রকম বিলাসিতার মধ্যে আমরা জীবন কাটাচ্ছি। গানবাজনার স্কুলে গিয়ে লিজা যে রকম গমক দেওয়া হাসি শিখেছে, বা আমাদের বাড়িতে কোনো পুরুষ আগন্তুক এলে লিজা যে রকম চোখ কুঁচকে তাকাতে শিখেছে — তাও আমার অসহ্য মনে হয়। কিন্তু এর চেয়েও বড়ো কথা আছে। সারা জীবন মাথা খুঁড়লেও এ ব্যাপারটা আমার বোধগম্য হবে না যে কেন একটা লোক — যার সঙ্গে আমার স্বভাবের, আমার বিজ্ঞানের, আমার জীবনযাপনের সমগ্র পদ্ধতির কোনো মিল নেই, আমি যে ধরনের মানুষ পছন্দ করি তা যে একেবারেই নয় — সে কেন রোজ আমার বাড়িতে আসবে এবং আমার সঙ্গে একই টেবিলে বসে খাবে। আমার স্ত্রী এবং বাড়ির চাকরবাকররা রহস্যময় স্বরে চুপিচুপি বলাবলি করে যে এই লোকটি নাকি আমার মেয়ের 'প্রণয়ী'। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বুঝতে পারি না, এখানে কেন আসবে সে। খাবার টেবিলে একজন জুলুকে যদি আমার পাশে বসতে দেওয়া হয় তাহলে যেমন অবাক হই, এই লোকটিকে দেখেও আমার মনে সেই একই ভাব জাগে। তাছাড়া, এ ব্যাপারটাও আমার কাছে অবাক মনে হয় যে আমার মেয়ে, যাকে আমি এখনো শিশু বলে মনে করি, সে কিনা ভালোবাসবে এমন টাই, অমন চোখ, অমন থলথলে গাল ...

আগেকার দিনে দুপুরের খাওয়াকে আমি উপভোগ করতাম। উপভোগ না করতে পারলে নির্বিকার থাকতাম, কিন্তু আজকাল খেতে বসে বিরক্তি আসে, সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে যায়। যেদিন থেকে আমার নামের সঙ্গে 'মহামান্য' শব্দটি যুক্ত হয়েছে এবং আমি ফ্যাকাল্টির প্রধান হয়েছি, সেদিন থেকেই কেন জানি না আমার স্ত্রী ও মেয়ে মনে করেছে যে আমাদের খাওয়াদাওয়ার ধরন ও রীতিনীতিকে বদলে ফেলা দরকার। আমি যখন ছাত্র ছিলাম এবং পরে যখন ডাক্তার হয়েছি, তখন থেকেই সাদাসিধে খাওয়াদাওয়াতেই অভ্যস্ত।

কিন্তু এতদিনকার অভ্যেসটিকে এবার বদলাতে হয়েছে, এখন আমাকে খেতে হয় সাদা সাদা ভাসমান ফোঁটাওলা এক বিশেষ ধরনের সুপ, এবং 'মাদেরা' মদে রসানো কিড্‌নি। আগেকার দিনের সেই চমৎকার কপির পাতার সুপ, সুস্বাদু পিঠে, আপেলের সঙ্গে সেদ্ধ করা রাজহাঁসের মাংস, ব্রিম মাছ ও বাকহুইট — সে সবের দিন চলে গেছে, নতুন পদ ও পদমর্যাদা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদের হারিয়েছি। হারিয়েছি আগাশাকেও, পুরনো দিনের আমাদের বাড়ির সেই হাসিখুশি গল্পপ্রিয় বুড়ী পরিচারিকাকে। সে জায়গায় এসেছে ইয়েগর নামে একটা লোক। তার যেমন মোটা বুদ্ধি তেমনি হামবড়াই ভাব। ডানহাতে একটা সুতির দস্তানা পরে সে পরিবেষণ করে। খেতে বসে একটি পদ শেষ হলে পরের পদের জন্যে অপেক্ষা করাটা অবাস্তব রকমের দীর্ঘ বলে মনে হয়, কারণ সেই ফাঁকগুলো কোনো কিছু দিয়ে ভরাট হবার নয়। আগেকার দিনে সবাই মিলে একসঙ্গে খেতে বসাটা আমার এবং আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কাছে আনন্দের ব্যাপার ছিল। পুরনো দিনের সেই খুশি, সহজ কথাবার্তা, ঠাট্টাতামাসা, হাসি, আদরআপ্যায়ন ও উল্লাস — সে সব আর নেই। তখন আমার মতো ব্যস্ত মানুষের পক্ষে খাওয়ার ব্যাপারটা ছিল বিশ্রাম এবং সবাইকার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা। আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কাছেও তা ছিল উপভোগ্য। যতোই ক্ষণিক হোক, এই সময়টুকু আনন্দে ও উজ্জ্বলতায় ভরে থাকত, কারণ তারা জানত যে অন্তত আধঘণ্টার জন্যে আমার ওপরে পুরোপুরি তাদের অধিকার, আর কারও নয়, না ছাত্রদের, না বিজ্ঞানের। একগ্লাস মদ খেয়েই তখন একটুখানি নেশার আমেজ এসে যেত, সেই পুরনো দিন আর নেই। নেই সেই আগাশা আর ব্রিম মাছ ও বাকহুইট। আগেকার দিনে টেবিলের তলায় কুকুর আর বেড়ালের মারামারি বা সুপের বাটিতে কাতিয়ার গালের ব্যাণ্ডেজ খসে পড়া বা এমনি ধরনের অতি তুচ্ছ কোনো ঘটনাকে উপলক্ষ করে সেই সরস উল্লাস আর নেই।

আজকাল আমরা যে-ভাবে খাওয়াদাওয়া করি তার বর্ণনা দেওয়া এবং খাবারগুলোকে গলাধঃকরণ করা — দুটোই সমান বিরক্তিকর। সাধারণত চিন্তাভাবনায় আচ্ছন্ন স্ত্রীর মুখে কৃত্রিম গুরুগম্ভীর ভাব। সে কেমন একটা অস্বস্তির সঙ্গে আমাদের প্লেটের দিকে তাকায় আর বলে, 'তাই তো, মাংসটা তোমাদের ভালো লাগছে না দেখছি ... ভালো লাগছে না, বলো তো?' আমাকে

জবাব দিতে হয়, 'না গো, না! মাংস চমৎকার হয়েছে!' আমার স্ত্রী বলে, 'তোমার তো ওই রকমই কথা, আমি যা বলি তাতেই সায় দাও। সত্যিকারের মন খুলে কক্ষনো কথা বলতে চাও না। আচ্ছা, আলেক্সান্দ্র আদলফভিচের কি হল? সবই তো পড়ে আছে দেখছি!' খেতে বসে আগাগোড়া এমনি ধরনের কথাবার্তা চলে। লিজা তেমনি গমক দেওয়া হাসি হাসে আর চোখ কুঁচকে তাকায়। আমি একবার স্ত্রীর মুখের দিকে, একবার মেয়ের মুখের দিকে তাকাই, আর এই খাবার টেবিলে বসেই সবচেয়ে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে ওরা দুজনেই আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে, বহুদিন থেকেই ওদের ভেতরকার জীবনের কোনো হদিশ রাখতে পারিনি। মনে হতে থাকে, অতীতের কোনো একসময়ে এই বাড়িতে আমার সত্যিকারের পরিবার পরিজন ছিল, এখন খাবার টেবিলে বসে যাকে আমি স্ত্রী মনে করছি, সে সত্যিকারের স্ত্রী নয়, যে লিজাকে দেখছি সে সত্যিকারের লিজা নয়। ওদের দুজনের মধ্যেই একটা চমকপ্রদ পরিবর্তন এসেছে এবং যে জন্যেই হোক পরিবর্তনের এই দীর্ঘ প্রক্রিয়াটির দিকে আমি নজর দিতে পারিনি। সুতরাং এতদিন পরে সবটাই যে আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। এই পরিবর্তন এলো কেন? আমি বলতে পারব না। হয়তো আসল মুশকিল এই যে, ঈশ্বর আমাকে যতোখানি ক্ষমতা দিয়েছেন আমার স্ত্রী ও কন্যাকে তা দেননি। ছেলেবেলা থেকেই এমনভাবে চলতে শিখেছি যাতে বাইরের জগতের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারি। নিজেকে গড়ে তুলেছি এভাবে। খ্যাতি, উচ্চপদ, সাধারণ অবস্থাপন্ন জীবনের চেয়েও সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করতে যাওয়া, বিখ্যাত মানুষদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় এবং এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা যা জীবনের নানা উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে বিচিত্ররূপে প্রকাশ পায় — এগুলোর প্রভাব আমার ওপরে সামান্যই, আমার জীবনের সংহতি এতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। কিন্তু আমার স্ত্রী ও লিজা মানুষ হিসেবে দুর্বল, নিজেদের গড়ে তোলবার শিক্ষা ওরা পায়নি — সুতরাং ওদের ওপরে এসব ঘটনা এসে পড়েছে হিমানী-সম্প্রপাতের মতো। ওদের গুঁড়ো গুঁড়ো করে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। গ্নেক্কের এবং তরুণীরা আলোচনা করে সঙ্গীতের রীতিনীতি, বৈশিষ্ট্য, গায়ক, পিয়ানোবাদক, বাক্, ব্রাহ্ম্স, আর আমার স্ত্রী তারিফ করার ভঙ্গীতে হাসে, যেন কারও ধারণা না হয় সে কিচ্ছু জানে

না। আর মাঝে মাঝে মন্তব্য করে, 'বাঃ চমৎকার ... সত্যি! ভাবো তো দেখি!' গ্নেক্কের গম্ভীরভাবে খায়, গুরুগম্ভীর শব্দে বাকচাতুর্য জাহির করে আর অনুকম্পা ও প্রশ্রয়ের ভঙ্গীতে তরুণীদের কথা শোনে। যখন তখন কী খেয়াল চাপে, বিশ্রী ফরাসী ভাষায় কথা বলে ওঠে, আর তারপর কেন জানি না মাঝে মাঝে আমাকে সম্বোধন করে ফরাসী ভাষায় বলে, 'মহামান্য মহাশয়'!

কিন্তু আমি বিষণ্ন হয়ে উঠি। স্পষ্টতই ওদের উপস্থিতিতে বিব্রত হই, আমার উপস্থিতিতে ওরা হয় বিব্রত। এর আগে কোনো দিন আমার মধ্যে উন্নাসিকতার ভাব জাগেনি, কিন্তু আজকাল এ ধরনের একটা অনুভূতি আমাকে পীড়িত করে। গ্নেক্কেরের মধ্যে যা কিছু খারাপ দিক আছে, শুধু সেগুলোকেই আমি লক্ষ্য করে চলি। এটা করতে বিশেষ সময় লাগে না। তারপর এই ব্যাপারটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে থাকি, একটা উটকো লোক কিনা আমারই বাড়িতে বসে আমার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে! এই লোকটি সামনে থাকলে আরেক দিক থেকেও আমার ওপর খারাপ ফল হয়। সাধারণত আমি যখন একা বা পছন্দমতো সঙ্গীদের মধ্যে থাকি, তখন নিজের গুণাবলীর কথা মনে পড়ে না, বা যদিও মুহূর্তের জন্যে মনে পড়ে, সেগুলোকে মনে হয় তুচ্ছ — নিজেকে মনে হয় যেন আনকোরা পাশ করা একজন বৈজ্ঞানিক। কিন্তু গ্নেক্কেরের মতো লোকের সামনে বসে মনে হয় আমার গুণাবলী পর্বতের মতো সুবৃহৎ, আর সেই পর্বতের চূড়া মেঘের রাজ্য ফুঁড়ে আকাশে মিলিয়ে গেছে। সেই পাহাড়ের পাদদেশে গনেক্কেরের মতো লোকেরা ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়ায়। তারা এতই অকিঞ্চিৎকর যে তাদের প্রায় চোখেই পড়ে না।

দুপুরের খাওয়ার পরে পড়বার ঘরে গিয়ে পাইপ ধরাই। সারাদিনে এই একবার। আগে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ধূমপান করতাম, কমতে কমতে আজকাল একবারে দাঁড়িয়েছে। এই সময়ে আমার স্ত্রী এসে সামনে বসে এবং নানা কথা বলে। সকালবেলার মতো এবারেও আমি আগে থেকেই বলে দিতে পারি, আমার স্ত্রী কোন্ কথা তুলবে।

'নিকলাই স্তেপানিচ, ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের গুরুতর আলোচনা করতে হবে,' এই বলে ও শুরু করে, 'লিজার কথা বলছি, বুঝতে পারছ তো ... যাই বলো বাপু, তোমারও আরেকটু খেয়াল থাকা দরকার...'

'কী বলতে চাও?'

'এমন ভাব দেখাও যেন কিছুই তোমার নজরে পড়ে না। এটা মোটেই ভালো নয়। এভাবে গা ভাসিয়ে চলার কোনো অধিকার নেই তোমার। গ্নেক্কের লিজাকে বিশেষ চোখে দেখে... তুমি কী মনে করো?'

'লোকটা যে অপদার্থ তা বলতে পারি না, কারণ তাকে চিনি না। কিন্তু আমি তো তোমাকে হাজার বার বলেছি যে লোকটাকে পছন্দ করি না।'

'না, না, এমন কথা মুখে এনো না ... কক্ষনো না ...'

অত্যন্ত বিচলিত ভাবে আমার স্ত্রী উঠে দাঁড়ায় এবং ঘরময় পায়চারি করতে শুরু করে। তারপর বলে, 'এমন একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে এমন হাল্কাভাবে কথা বলতে তুমি পারলে কী করে? তোমার নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎ ও ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, কাজেই তোমার ব্যক্তিগত ভালো-লাগা না-লাগার কথা ছেড়ে দিতে হবে। আমি জানি, তুমি ওকে পছন্দ করো না। আচ্ছা বেশ ... মনে করো, আমরা ওকে বলে দিলাম আমাদের মত নেই, এ বিয়ে ভেঙে গেল — তুমি কি বলতে চাও, তারপরেও লিজার মন চিরকালের জন্যে আমাদের ওপরে বিষিয়ে উঠবে না? আর এমন তো নয় যে ঝুড়ি ঝুড়ি লোক এসে লিজাকে বিয়ে করতে চাইছে?! সে দিন আর নেই। এমনও হতে পারে, লিজাকে বিয়ে করতে চায় এমন দ্বিতীয় কোনো লোক কোনো দিনই হাজির হল না ... ছেলেটা লিজাকে খুবই ভালোবাসে আর আমি যতোদূর বুঝতে পারি, লিজাও পছন্দই করে ওকে ... আমি জানি, ওর এখনো কোনো স্থিতি হয়নি কিন্তু তা আর কী করা যাবে। আশা করা যাক, একদিন না একদিন ওর একটা কিছু সুরাহা হবে। ছেলেটি সৎ বংশের, টাকাপয়সাও প্রচুর আছে।'

'এ খবর জানলে কী করে?'

'ও আমাকে বলেছে। খারকভে ওর বাবার প্রকাণ্ড বাড়ি আছে। কাছাকাছি জমিদারিও আছে নাকি নিকলাই স্তেপানিচ, তোমাকে একবার খারকভে যেতে হবে। বুঝতে পারলে?'

'কী জন্যে?'

'সরেজমিনে খোঁজ নিলে ... ওখানকার কিছু কিছু অধ্যাপকের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে, তারাই তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে। আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু হাজার হোক আমি মেয়েলোক। আমি পারি না ...'

রূঢ় স্বরে আমি জবাব দিই, 'আমি খারকভে যেতে পারব না।'

আমার স্ত্রী আতঙ্কে ভেঙে পড়ে, ওর চোখেমুখে ভীষণ একটা যন্ত্রণার ভাব ফুটে ওঠে।

কাঁদতে কাঁদতে ও মিনতি করে, 'নিকলাই স্তেপানিচ, ঈশ্বরের দোহাই, এই বোঝার ভার থেকে আমাকে রেহাই দাও! এ জ্বালা আমার আর সয় না!'

ওর এই অবস্থা দেখে ব্যথা পাই। দরদভরা স্বরে বলি, 'আচ্ছা বেশ, তুমি যখন বলছ ভারিয়া, আমি যাব খারকভে। যা বলবে তাই করব।'

আমার কথা শুনে ও চোখে রুমাল চেপে কাঁদবার জন্যে নিজের ঘরে চলে যায়। আমি একা বসে থাকি।

একটু পরেই ঘরে বাতি দিয়ে যায়। দেওয়ালে দেওয়ালে আর্মচেয়ার আর বাতির ঢাকনার পরিচিত সব ছায়া পড়ে। সেগুলো দেখে দেখে অনেক দিন আগে থেকেই বিরক্ত হয়ে উঠেছি। এই ছায়াগুলো দেখে আমার মনে পড়ে যায় যে রাত্রি আসছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সেই অভিশপ্ত অনিদ্রারোগ শুরু হয়ে যাবে। একবার বিছানায় শুই, আবার উঠি। ঘরময় পায়চারি করি, আবার যাই বিছানায় ... সাধারণত দুপুরের খাওয়ার পরে সন্ধ্যাবেলা আমার স্নায়বিক উত্তেজনা চরমে ওঠে। বাহ্যত কোনো কারণ না থাকলেও বালিশে মুখ গুঁজে আমি কাঁদতে শুরু করি। আর ঠিক এই রকম সময়ে মনে হয় যে কেউ হয়তো এসে পড়বে, কিংবা আমি হয়তো হঠাৎ মরে যাব। নিজের কান্নায় নিজেরই লজ্জা হতে থাকে আর সব মিলিয়ে আমার অবস্থা বড়ো অসহ্য হয়ে ওঠে। মনে হতে থাকে, আমার ঘরের বাতি, আমার বইপত্র, মেঝের ছায়া — এসবের দিকে আর কিছুতেই তাকাতে পারব না, ড্রয়িংরুম থেকে ভেসে আসা মানুষের গলার স্বর কান পেতে কিছুতেই শুনতে পারব না। একটা অদৃশ্য ও দুর্বোধ্য শক্তি প্রচণ্ড ভাবে ঠেলা দিয়ে আমাকে ঘর থেকে বাইরে বার করে নিয়ে যাচ্ছে যেন। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াই, তাড়াহুড়ো করে পোশাক পরি, তারপর বেরিয়ে পড়ি। বেরোবার সময়ে যতো রকম ভাবে সম্ভব সতর্ক হই পাছে বাড়ির কোনো লোক আমাকে দেখে ফেলে। কোথায় যাব আমি?

এ প্রশ্নের জবাব অনেক আগে থেকেই মনের মধ্যে আছে, যাব কাতিয়ার কাছে।

৩

সাধারণত ওকে দেখি, কৌচে বা টার্কিশ সোফায় শুয়ে শুয়ে পড়ছে। আমাকে দেখে ও অলসভাবে মাথা তোলে, উঠে বসে এবং আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দেয়।

বিশ্রাম নিয়ে অল্প কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি, তারপর বলি, 'আবার শুয়ে আছো? এটা তোমার পক্ষে খুবই খারাপ হচ্ছে কিন্তু। যা হোক কিছু একটা কাজে লেগে যাও না কেন?'

'কি?'

'বলছি কি, তোমার যা হোক কিছু একটা করা উচিত।'

'তা তো বুঝলাম! কিন্তু করব কী? কারখানায় কাজ নেওয়া বা থিয়েটারে নামা — মেয়ের কাছে বাছাই করার কিছু নেই।'

'বেশ তো। কারখানায় কাজ নেবার প্রশ্ন ওঠে না। না হয় থিয়েটারেই নামলে?'

ও চুপ করে থাকে।

আধা আন্তরিকতার সুরে বলি, 'তুমি বিয়ে করছ না কেন?'

'বিয়ে করবার মতো মানুষ নেই। আর বিয়ে করতেই বা যাব কেন?'

'কিন্তু এভাবে জীবন কাটানোর তো কোনো অর্থ হয় না।'

'স্বামী না থাকার কথা বলছ? তাতে কী যায় আসে? পুরুষের তো আর অভাব নেই? ইচ্ছে করলেই পেতে পারতাম।'

'এসব ভালো নয় কাতিয়া।'

'কী সব?'

'এইমাত্র তুমি যে সব কথা বললে?'

কাতিয়া বুঝতে পারে যে ও আমাকে বিচলিত করে তুলেছে। ওর কথা শুনে আমার মনে যে খারাপ ধারণা হয়েছে তা খানিকটা কাটিয়ে তোলার জন্যে ও বলে, 'দেখে যাও, এসো আমার সঙ্গে! এসেই দ্যাখ না! এই যে, এদিকে!'

একটা ছোট্ট সুন্দর ঘরে ও আমাকে হাত ধরে নিয়ে যায় এবং একটা ডেস্‌কের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'দ্যাখ ... তোমার জন্যে তৈরি রেখেছি।

তুমি এখানে বসে কাজ করবে। তোমার কাগজপত্র নিয়ে রোজ এখানে চলে এসো। ওরা তোমাকে বাড়িতে শান্তিতে কাজ করতে দেয় না। কী বলো, কাজ করবে তো এখানে? বলো, রাজি?'

সরাসরি অস্বীকার করলে হয়তো ওর মনে কষ্ট হতে পারে, তাই ওকে বলি, নিশ্চয়ই এখানে এসে কাজ করব এবং এই ঘরটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। তারপর সেই ছোট্ট সুন্দর ঘরে আমরা দুজনেই বসি এবং গল্প করতে শুরু করি।

উষ্ণ ও আরামপ্রদ পরিবেশ এবং দরদী সঙ্গী পেলে আগে কৃতজ্ঞ বোধ করতাম। আজকাল আর তা করি না। এখন বরং এই অবস্থায় অভিযোগ ও বিক্ষোভগুলো ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়। মনে হতে থাকে, নিজের সম্পর্কে করুণা বোধ করলে এবং নিজের নালিশগুলো জানালে হয়তো খানিকটা সুস্থ বোধ করব।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করি, 'বড়ো বিশ্রী দিনকাল পড়েছে। বড়োই বিশ্রী।'

'কী হয়েছে?'

'শোনো তাহলে ব্যাপারটা। রাজার যে সব বিশেষ ক্ষমতা থাকে তার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে পবিত্র ক্ষমতা কী? তা হচ্ছে রাজার অধিকার যাকে খুশি ক্ষমা করতে পারেন। এদিক থেকে আমি চিরকাল নিজেকে রাজা বলে মনে করে এসেছি, কারণ যেখানেই সম্ভব হয়েছে এই বিশেষ ক্ষমতার ব্যবহার পুরোপুরি করেছি। ভালো মন্দ ভেবে দেখিনি, সবাইকে প্রশ্রয় দিয়েছি এবং নির্বিচারে ক্ষমা বিতরণ করেছি। যে ব্যাপারে অন্যরা প্রতিবাদ করেছে এবং ফুঁশে উঠেছে, আমি সেখানে উপদেশ দিয়েছি এবং বোঝাতে চেষ্টা করেছি। সারাটা জীবন কেটেছে শুধু এই চেষ্টায় যে বাড়ির লোকজন ছাত্র, সঙ্গী ও চাকরবাকরের সঙ্গে যেন মানিয়ে চলতে পারি। আর যারাই আমার সংস্পর্শে এসেছে তাদের সকলের ওপরেই আমার এই বিশেষ মনোভাবের প্রভাব পড়েছে। জানি, এর অন্যথা হয়নি। কিন্তু এখন আর আমি রাজা নই। এখন আমার মনের ভেতরে যে অবস্থা চলেছে তা একজন ক্রীতদাসের পক্ষেই থাকা সম্ভব: দিনরাত্রির চব্বিশ ঘণ্টা মনের মধ্যে বিষাক্ত সব চিন্তা ওঠে, বুকের মধ্যে এমন সব অনুভূতি বাসা বাঁধে যা আগে কখনো ছিল না। মন ভরে

থাকে ঘৃণায় আর বিদ্বেষে, অবজ্ঞায়, ক্রোধে আর ভয়ে। আমি হয়ে উঠেছি কল্পনাতীত রকমের কঠোর, নির্দয়, কোপন, রূঢ়, সন্দেহপ্রবণ। যে সব ঘটনা আগে গায়ে না মেখে ঠাট্টা করে হেসে উড়িয়ে দিতাম, তা দেখে এখন মনে কুটিল সব অনুভূতি জাগে। যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার করবার ক্ষমতা থাকে না। আগে যে জিনিসটাকে তুচ্ছ মনে করতাম তা টাকাপয়সা, এখন মন বিষিয়ে আছে টাকাপয়সার ওপরে নয়, টাকাপয়সাওলা লোকগুলোর ওপরে। যেন এই লোকগুলোরই যতো দোষ। আগে উৎপীড়ন ও জবরদস্তিকে ঘৃণা করতাম, এখন ঘৃণা করি সেই লোকগুলোকে যারা জবরদস্তি করে। যেন এই লোকগুলোরই যতো দোষ, এই লোকগুলোর জন্যেই পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি আনা যাচ্ছে না। এ সবের কী অর্থ হতে পারে? মনে এসব চিন্তা ও অনুভূতি জেগে ওঠার কারণ যদি এই হয় যে আমার বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি বদলে গেছে, তাহলে তারই বা কারণ কী? ব্যাপারটা কি এই যে জগৎ সংসার আরো খারাপ হয়েছে আর নিজে আরো ভালো হয়েছি, নাকি এই যে এতকাল অন্ধ ও নিরাসক্ত ছিলাম? তুমি তো জান, আমি রোগে ভুগছি, রোজ শরীরের ওজন কমছে। কাজেই এই পরিবর্তনের কারণ যদি এই হয় যে আমার শরীরের ও মনের ক্ষমতা সাধারণভাবে কমে গেছে — তাহলে বলতে হবে, অবস্থা অতি করুণ। কারণ, তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে আমার সমস্ত চিন্তা অস্বাভাবিক ও অসুস্থ। এজন্যে আমার নিজের লজ্জা পাওয়া উচিত এবং এসব চিন্তাকে অকিঞ্চিৎকর মনে করা উচিত।'

আমার কথার মাঝখানেই কাতিয়া বলে ওঠে, 'এ ব্যাপারের সঙ্গে তোমার অসুখের কোনো সম্পর্ক নেই। এতদিনে তোমার চোখ খুলেছে, এই হচ্ছে ব্যাপার, আর কিছু নয়। আগে তুমি জোর করে চোখ বন্ধ করে থাকতে, এখন চোখ মেলে তাকাচ্ছ। আমার মতে, যে কাজটি তোমার প্রথমেই করা উচিত তা হচ্ছে এক্ষুনি বাড়ির লোকজনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ওদের কাছ থেকে সরে আসা।'

'তুমি যা-তা বলছ কাতিয়া।'

'সত্যি করে বলো তো ওদের তুমি ভালোবাস কিনা? মনকে চোখ ঠেরে লাভ কী? একে কি পরিবার বলে? এমন একদল লোক যাদের থাকা না থাকা সমান! আজ যদি ওরা মরে যায়, কাল কেউ খেয়ালও করবে না ওরা নেই।'

কাতিয়া সম্পর্কে আমার স্ত্রী ও মেয়ের যতোখানি ঘৃণা, ওদের সম্পর্কে কাতিয়ারও ততোখানি অবজ্ঞা। একজন আর একজনকে ঘৃণা করার অধিকার নিয়ে আজকাল কেউই আলোচনা করতে চায় না। কিন্তু কাতিয়ার মতামতকে গ্রহণ করলে এবং এ ধরনের অধিকারকে স্বীকার করে নিলে, একথা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না যে আমার স্ত্রী ও লিজাকে অবজ্ঞা করবার যতোখানি অধিকার কাতিয়ার আছে, তেমনি কাতিয়াকে ঘৃণা করবার ততোখানি অধিকার আছে আমার স্ত্রী ও লিজার।

কাতিয়া আবার বলে, 'বাজে লোক! তোমার খাওয়াদাওয়া হয়েছে? অবাক কাণ্ড দেখছি, তোমাকে খেতে ডাকার কথা ওদের মনে ছিল? ব্যাপারটা কী, ওরা যে তোমার অস্তিত্ব এখনো মনে রেখেছে?'

কঠোর স্বরে বলি, 'কাতিয়া, আমি চাই তুমি এ ধরনের কথা এক্ষুনি বন্ধ করো।'

'তুমি কি মনে করো, ওদের কথা মুখে আনতে খুব মজা পাচ্ছি? মন থেকে ওদের কথা একেবারে মুছে ফেলতে পারলেই খুশি হই। কথাটা শোনো, এসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যাও এখান থেকে। বিদেশে যতো তাড়াতাড়ি যেতে পারো, ততোই ভালো।'

'কী যা তা বলছ? বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের কী হবে?'

'বিশ্ববিদ্যালয়কেও ছাড়তে হবে! বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে তোমার কী লাভ হয়েছে? কী পেয়েছ তুমি? ত্রিশ বছর ধরে তুমি তো ছাত্র পড়াচ্ছ, কিন্তু কোথায় গেল তারা? তাদের মধ্যে কজনের নাম শোনা যায়? মনে মনে একবার হিসেব করে দ্যাখ তো দেখি? এই ডাক্তারগুলো জানে শুধু লোকের অজ্ঞতার সুযোগ নিতে আর হাজার হাজার রুবল্ জমাতে। কাজেই এদের গড়ে তোলবার জন্যে তোমার মতো প্রতিভা ও আন্তরিকতার কোনো দরকারই নেই! তুমি না থাকলেও চলবে!'

শিউরে উঠে বলে ফেলি, 'দোহাই তোমার, থাম, কী ভীষণ শক্ত কথাই না তুমি বলতে পার! তুমি না থামলে আমি চলে যাব এখান থেকে! এ ধরনের কথার কোনো জবাব আমার জানা নেই!'

পরিচারিকা এসে খবর দেয় যে চা তৈরি। বলতে আনন্দ হচ্ছে, সামোভারের পাশে এসে বসার পর আমাদের কথাবার্তা অন্য বিষয়ে চলে আসে। মনে যা

কিছু নালিশ জমা ছিল তা প্রকাশ করেছি। এবার ইচ্ছে হচ্ছে, বুড়ো বয়সের আরেকটি দুর্বলতাকে কিছুটা প্রশ্রয় দিই, অর্থাৎ, পুরনো দিনের কথা বলতে শুরু করি। কাতিয়াকে বলি আমার অতীত জীবনের কথা। আর এমন সব ঘটনার কথা বলি যা ভুলেই গিয়েছিলাম বলে আমার ধারণা ছিল। এতদিন পরেও ঘটনাগুলো মনে পড়ছে দেখে অবাক হই। দরদভরা প্রশংসা ও গর্বের সঙ্গে রুদ্ধ নিশ্বাসে কাতিয়া আমার কথা শোনে। বিশেষ করে ভালো লাগে ওকে আমার ধর্ম স্কুলের কথা বলতে, একদিন আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হব সেই স্বপ্নের কথা বলতে।

বলে চলি, 'স্কুলের বাগানে বেড়াতাম। অনেক দূরের কোনো পানশালা থেকে গানবাজনার অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসত বাতাসে। কিংবা ঠুন ঠুন ঘণ্টা বাজিয়ে একটা ত্রয়কা গাড়ি ছুটে বেরিয়ে যেত ধর্ম স্কুলের দেওয়ালের পাশ দিয়ে। আর কিছু চাইতাম না, এতেই আনন্দ উথলিয়ে উঠত, আনন্দে ভরে যেত বুক, শুধু বুক নয় পেট, হাত, পা ... কান পেতে শুনতাম গানবাজনার বা দূরে মিলিয়ে-যাওয়া ঠুন ঠুন ঘণ্টার শব্দ আর কল্পনা করতাম যেন ডাক্তার হয়েছি। কল্পনায় অনেক রঙিন ছবি আঁকতাম, একটার চেয়ে পরেরটা ভালো। আর দ্যাখ, সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে! আমার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছে আমার জীবন। ত্রিশ বছর ধরে জনপ্রিয় অধ্যাপক হয়েছি, চমৎকার সব বন্ধু পেয়েছি, মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছি। জীবনে প্রেম এসেছে, প্রেমের আবেগে বিয়ে করেছি, আমার ছেলেমেয়ে হয়েছে। এক কথায়, অতীতের দিকে তাকালে মনে হয় আমার জীবন অতি সুন্দর এক সঙ্গীত, ওস্তাদের সৃষ্টি। আমারই ওপরে নির্ভর করছে এখন সঙ্গীতের শেষ ঝঙ্কারটি যাতে নষ্ট না হয়ে যায়। অর্থাৎ, আমাকে মানুষের মতো মরতে হবে। মৃত্যু যদি সত্যি সত্যিই একটা ভয়ঙ্কর কিছু ব্যাপার হয়, তাহলে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে মাথা উঁচু করে — আমি যে শিক্ষক, আমি যে বৈজ্ঞানিক, আমি যে এক খৃষ্টীয় রাষ্ট্রের নাগরিক সে গৌরব যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। কিন্তু এই শেষ ঝঙ্কারটিকে নষ্ট করতে বসেছি। যখন ডুবতে চলেছি আর তোমার কাছে দৌড়ে এসেছি সাহায্যের জন্যে তখন তুমি আমাকে কিনা বলছ: ডোবো, ডুবে যাওয়াই তোমার দরকার।'

হঠাৎ সদর দরজার কলিং-বেল বেজে ওঠে। কাতিয়া আর আমি দুজনেই বুঝতে পারি, কে এসেছে।

'নিশ্চয়ই মিখাইল ফিওদরভিচ এসেছে,' আমরা বলি।

আর বাস্তবিকই কিছুক্ষণের মধ্যে এসে ঢোকে আমার ভাষাতত্ত্ববিদ বন্ধু মিখাইল ফিওদরভিচ। পঞ্চাশ বছর বয়েস, লম্বা ঋজু চেহারা, ঘন পাকা চুল, কালো ভুরু, পরিষ্কার কামানো গাল। মানুষ হিসেবে সে খাঁটি, সহকর্মী হিসেবে চমৎকার। প্রাচীন এক অভিজাত বংশে তার জন্ম, এই বংশের প্রত্যেকেই কম বেশি পরিমাণে সৌভাগ্যবান ও গুণবান, আমাদের দেশের সাহিত্য শিক্ষার ইতিহাসে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু অবদান আছে। সে নিজেও বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান, উচ্চশিক্ষিত, তবে, পাগলামি যে একেবারেই নেই তা নয়। আমরা সকলেই কোনো না কোনো ব্যাপারে কিছুটা অদ্ভুত। কিন্তু এই লোকটির পাগলামির মধ্যে এমন একটা অস্বাভাবিকতা আছে যা ওর বন্ধুদের পক্ষেও সময়ে সময়ে হয়তো বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। ওর বন্ধুদের মধ্যে এমন অনেককে জানি যারা ওর এই পাগলামিকেই বড়ো করে দ্যাখে, ওর অসংখ্য গুণাবলীকে একেবারেই দেখতে পায় না। ঘরে ঢুকে সে ধীরে ধীরে হাতের দস্তানা খুলে ভারী গলায় বলে, 'শুভ সন্ধ্যা! চা খাচ্ছেন বুঝি! চমৎকার! বাইরে কী বিশ্রী ঠাণ্ডা।'

তারপর সে টেবিলের ধারে বসে নিজের জন্যে গ্লাসে চা ঢেলে নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। তার কথাবার্তার বৈশিষ্ট্য একটা সদা ঠাট্টা তামাসার সুর এবং দর্শন ও ভাঁড়ামির অদ্ভুত একটা সমন্বয়। শুনে 'হ্যামলেট' নাটকের কবর খননকারীদের কথা মনে পড়ে যায়। কথা বলে সে এমন বিষয়ে যার গুরুত্ব আছে কিন্তু তার কথার মধ্যে কোনো সময়েই গুরুত্ব থাকে না। তার সমালোচনা সদা রূঢ় ও কটু। কিন্তু তার নম্র মসৃণ ও হাসিখুশি ব্যবহারের জন্যে এই রূঢ়ভাষা ও কটূক্তির জ্বালাটুকু টের পাওয়া যায় না। তার কথার ধরনে সবাই অভ্যস্ত হয়ে যায়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণ্ডা দেড়েক কাহিনী সংগ্রহ করে আনে এবং টেবিলে বসেই সেগুলো বলতে শুরু করে। এ ব্যাপারের অন্যথা হয় না।

কৌতুকের ভঙ্গিতে ভুরুদুটোকে বাঁকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বলে, 'ঈশ্বরের কি লীলা! সংসারে কত অদ্ভুত ধরনের লোকই না আছে!'

কাতিয়া বলে, 'কী শুনি।'

'আজ ক্লাসঘর থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় আমাদের সেই হাঁদারাম এন.এন.-এর সঙ্গে দেখা ... যেমন তার অভ্যেস, খুঁজতে বেরিয়েছে — নিজের মাথাব্যথা, বা যে-সব ছাত্র তার ক্লাস থেকে পালিয়ে বেড়ায় তাদের সম্বন্ধে নালিশ জানাতে। ভাবলাম, এই সেরেছে, আমাকে তো দেখে ফেলল, আর নিস্তার নেই ...'

এমনিভাবে সে বলে চলে। কিংবা হয়তো এভাবে শুরু করে:

'গতকাল গিয়েছিলাম আমাদের জেভ্-ভায়ার বক্তৃতা শুনতে। অবাক হলাম আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে। ওই লোকটার মতো একটা নপুংসককে কিনা প্রকাশ্য বক্তৃতা সভায় দাঁড় করিয়ে দিলে! সারা ইউরোপের লোক জানে যে লোকটা একটা আস্ত গর্দভ। সারা ইউরোপ ঢুঁড়েও এ রকমটি আর পাওয়া যাবে না। আর বক্তৃতা দেবার ঢং-টাই বা কী! অপরূপ! যেন আম্ আম্ করে মিষ্টি চুষে খাচ্ছে। ব্যস্, তারপরেই ভয়ে ধুকপুক করে, নিজের পাণ্ডুলিপি ভালো করে বুঝতে পারে না (বিশপমশাই সাইকেলে চেপে যেমন পাঁই পাঁই করে ছোটেন এই লোকটির চিন্তার গতি তেমনি)। সবচেয়ে বিশ্রী, ও কী বলতে চায় তা কেউ বুঝতে পারে না। ওর বক্তৃতা শুনে ভীষণ একঘেয়ে লেগেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলঘরে কনভোকেশনের বক্তৃতার সঙ্গে শুধু তুলনীয়। এবং এর চেয়ে খারাপ কী হতে পারে?'

এই পর্যন্ত বলে সে আচমকা চলে আসে অন্য কথায়।

'নিকলাই স্তেপানিচের মনে আছে হয়তো যে তিন বছর আগে আমার ওপরে এই বক্তৃতা দেবার ভার পড়েছিল। সে কী অবস্থা আমার! যেমন গরম, তেমনি গুমোট, আর আমার পোশাকী ফ্রককোটটা বগলের তলায় আঁট হয়ে ছিল! তারপর আমি তো বক্তৃতা দিতে শুরু করলাম ... আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা, দু ঘণ্টা ... মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবলাম যে আর মাত্র দশটা পৃষ্ঠা বাকি। আর এই দশ পৃষ্ঠার মধ্যেও শেষ চার পৃষ্ঠা একেবারেই অদরকারী, কাজেই বাদ দিলেও চলে। বাকি থাকে ছ'পৃষ্ঠা। মনে মনে একটা হিসেব করে নিলাম। কিন্তু ও হরি, ভাবি এক আর হয় এক! চোখ তুলে তাকাতেই দেখি, সামনের সারিতে সম্মানচিহ্ন পরা জেনারেল ও এক আর্চবিশপ পাশাপাশি বসে আছে। বেচারাদের কী অবস্থা!

বিরক্তিতে শরীর কাঠ হয়ে রয়েছে, জোর করে চোখ খুলে রাখবার জন্যে অনবরত চোখ পিট পিট করতে হচ্ছে। আবার এমন একটা মুখের ভাব করে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে যেন তারা খুব মন দিয়ে শুনছে, আর আমি যা বলছি তা বুঝতে পারছে। ওদের এই অবস্থা দেখে ভাবলাম, আচ্ছা, মজা বোঝো বাছাধন, শুনতেই চাও তো শোনো ভালো করে। তারপর আর কি, শেষ চার পৃষ্ঠাও বাদ দিইনি।'

মনে হয় কথা বলার সময়ে শুধু তার চোখ আর ভুরুতে হাসি ফুটে ওঠে; শ্লেষপ্রবণ লোকেরা সাধারণত এমনি ভঙ্গীতে কথা বলে। এ রকম সময় তার চোখে কোনো বিদ্বেষ বা রাগের ভাব থাকে না। শুধু থাকে খানিকটা কৌতুকপ্রিয়তা এবং শৃগালসুলভ ধূর্ততা — যা দেখা যায় একমাত্র সেইসব লোকেরই মুখে যাদের তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা আছে। তার চোখের কথা যখন বর্ণনা করছি তখন তার আর একটা বৈশিষ্ট্যেরও উল্লেখ করি। যখন সে কাতিয়ার হাত থেকে গ্লাস নেয়, বা কাতিয়ার কথা শোনে, বা কাতিয়ার কোনো কারণে একবার ঘরের বাইরে যাবার দরকার হলে সে যেভাবে ওকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করে, তখন তার চোখের দৃষ্টিতে আমি লক্ষ্য করি নম্রতা, মিনতি ও সারল্য ফুটে উঠতে।

পরিচারিকা এসে টেবিল থেকে সামোভার সরিয়ে নিয়ে যায় আর সে জায়গায় রেখে যায় মস্ত একটুকরো পনীর, কিছু ফলমূল আর এক বোতল ক্রিমিয়ার শ্যাম্পেন। মদ হিসেবে ক্রিমিয়ার এই শ্যাম্পেনটি উ‍ঁচু জাতের নয়, কিন্তু ক্রিমিয়ায় থাকার সময়ে কাতিয়া এই বিশেষ জাতের মদটির প্রতি অনুরক্ত হয়েছে। তাকওয়ালা সেলফ থেকে দু-প্যাকেট তাস বার করে আনে মিখাইল ফিওদরভিচ এবং পেসেন্স খেলতে শুরু করে। বেশ জোরের সঙ্গে বলে যে কোনো কোনো পেসেন্স খেলায় নাকি বেশ পরিমাণ মনোযোগ ও অভিনিবেশ দরকার হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নিজে কিন্তু আগাগোড়া খেলার সময়ে কথা বলে চলে। কাতিয়া শুধু তাসগুলোর দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, কথা বিশেষ বলে না, বরং হাত নেড়ে বা অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করে তাসের চাল বলে দেয়। সারা সন্ধ্যা কাতিয়া মদ খায় ছোট গ্লাসের দু-গ্লাসের বেশি নয়। আমি খাই বড়ো গ্লাসের আধ গ্লাস। বাকিটা মিখাইল ফিওদরভিচের ভাগে পড়ে। এই লোকটি প্রচুর মদ খেতে পারে, কিন্তু মাতাল হয় না।

পেসেন্স খেলার ভেতর দিয়ে আমরা নানা সমস্যার সমাধান করি। সমস্যাগুলো প্রধানত উচ্চতম পর্যায়ের, এবং আমাদের অধিকাংশ শরনিক্ষেপ হয় একটিমাত্র সমস্যাকে লক্ষ্য করে, যা আমাদের সকলের কাছেই সবচেয়ে প্রিয়। অর্থাৎ, বিজ্ঞানের সমস্যা।

খেলার ফাঁকে ফাঁকে মিখাইল ফিওদরভিচ কথা বলে: 'ঈশ্বর জানেন, বিজ্ঞানের যুগ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। হ্যাঁ, ঠিক তাই... মানুষ বুঝতে পারছে যে বিজ্ঞানের জায়গায় এখন অন্য কিছুকে বসানো উচিত। বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে অন্ধবিশ্বাসের জমিতে আর বিজ্ঞান বেড়ে উঠেছে অন্ধবিশ্বাসের আবহাওয়ায়। এখন বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে অন্ধবিশ্বাসের সার-নির্যাস, ঠিক যেমনটি হয়েছিল এই বিজ্ঞানের বাতিল হয়ে যাওয়া মাতৃকুল—আল্‌কেমি, তত্ত্ববিজ্ঞান, দর্শন। আসলে মানুষের কাছে বিজ্ঞানের অবদান কতোটুকু? ধরা যাক চীনেদের কথা। চীনেরা কোনো রকম বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়াই জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। এই চীনেদের সঙ্গে শিক্ষিত ইউরোপীয়দের তফাৎ নিতান্তই বাহ্যিক। চীনেরা বিজ্ঞানের ধার ধারে না কিন্তু তাতে তাদের কী ক্ষতিটা হয়েছে শুনি?'

আমি বলি, 'একটা মাছিও বিজ্ঞানের ধার ধারে না। তাতে কী প্রমাণ হয়?'

'আপনি রাগ করবেন না নিকলাই স্তেপানিচ। অন্য কারও কাছে আমি এ ধরনের কথা বলব না ... আপনি আমাকে যতোটা অসাবধান ভাবছেন আমি তা নই। প্রকাশ্যে এ ধরনের কথা কখনো বলব তা আমি স্বপ্নেও ভাবি না। ঈশ্বর করুন, এমন অবস্থা আমার যেন না হয়! সাধারণ মানুষ এই অন্ধবিশ্বাস মনে মনে পোষণ করে যে বিজ্ঞান ও শিল্পকলা হচ্ছে কৃষি ও বাণিজ্যের চেয়েও উঁচুদরের জিনিস, শিল্পের চেয়েও বড়ো। এই অন্ধবিশ্বাস আছে বলেই আমাদের এই গোষ্ঠী টিকে আছে। কাজেই আপনি বা আমি কেন এই অন্ধবিশ্বাসকে ভেঙে দিতে চেষ্টা করব? ঈশ্বর করুন, এমন অবস্থায় যেন আমরা কক্ষনো না পড়ি!'

খেলা চলতে থাকে আর তারই মধ্যে এক সময়ে যুবক সম্প্রদায়কে প্রচণ্ডভাবে গালাগালি দেওয়া শুরু হয়ে যায়।

মিখাইল ফিওদরভিচ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, 'জনসাধারণের দিন দিন অবনতি ঘটছে। মনে করবেন না, একটা বড়ো আদর্শ বা এ ধরনের কোনো

কিছুর কথা বলছি। তারা শুধু যদি জানতো কী করে কাজ ও চিন্তা করতে হয়! অবস্থা দেখে মনে হয়, কবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও বলি — আগামী কালের মানুষদের বিষণ্ণভাবে লক্ষ্য করছি!'

কাতিয়া সায় দেয়, 'সত্যি কথা, মানুষের ভয়ংকর অবনতি ঘটেছে। গত পাঁচ দশ বছরে যতো ছাত্রকে পড়িয়েছেন তাদের মধ্যে এমন একজনও কি আছে যার নাম বিশেষভাবে করা চলে?'

'অন্য অধ্যাপকদের কথা জানি না। কিন্তু আমার নিজের ছাত্রদের মধ্যে এমন একজনকেও দেখি না।'

কাতিয়া বলে চলে, 'এককালে আমার সঙ্গে প্রচুর লোকের পরিচয় ছিল। তারা অনেকেই ছাত্র ও তরুণ বৈজ্ঞানিক, অনেকেই অভিনেতা... তাদের সম্পর্কে আমার কী ধারণা জানেন? এমন একজনের সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ হয়নি যার সম্পর্কে কিছুটা আগ্রহ হতে পারে! বীর বা প্রতিভাবান মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়ার কথা তো ছেড়েই দিলাম। সব কিছু যেন নিষ্প্রাণ, মামুলি, ফাঁপা, কৃত্রিম ...'

মানুষের অবনতি সম্পর্কে এ ধরনের কথাবার্তা শুনে সর্বদাই মনে হয়, যেন ঘটনাচক্রে আচমকা নিজের মেয়ের সম্পর্কে কোনো অপ্রিয় কথা শুনে ফেলেছি। নিতান্ত মামুলি বিষয়ের ভিত্তিতে সবাইকার উপর দোষারোপ করা, অবনতি বা আদর্শের অভাব ইত্যাদি নাম দিয়ে কতকগুলো কল্পিত ভয়কে হাজির করা বা অতীত গৌরবের কথা বলা — এসব আমাকে ব্যথিত করে। অভিযোগ যদি তুলতেই হয়, এমন কি মহিলাদের সামনেও তবে তার ভিত্তিমূলে থাকা উচিত চূড়ান্ত একটা যাথার্থ্য। নইলে অভিযোগ হয়ে ওঠে কুৎসা-রটনা — তার বেশি কিছু নয়, হয়ে ওঠে ভদ্রলোকদের অনুপযুক্ত।

আমি বৃদ্ধ হয়েছি, ত্রিশ বছর আছি আমার কাজে, কিন্তু কোনো অবনতি বা আদর্শের অভাব দেখতে পাই না এবং মনে করি না অতীতের চেয়ে বর্তমান খারাপ। এ বিষয়ে হলঘরের পরিচারক নিকলাইয়ের অভিজ্ঞতা প্রণিধানযোগ্য; সে বলে যে আজকালকার ছাত্ররা আগেকার দিনের ছাত্রদের চেয়ে কোনো দিক দিয়েই ভালোও নয়, খারাপও নয়।

যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে আজকালকার ছাত্রদের মধ্যে এমন কোন্ জিনিস আছে যা আমি পছন্দ করি না তাহলে সঙ্গে সঙ্গে হয়তো জবাব

দিতে পারব না, কিংবা বেশি কিছু বলবো না। কিন্তু অস্পষ্টভাবে নিশ্চয়ই কথা কইব না। আমার ছাত্রদের দোষত্রুটিগুলো আমার জানা আছে, সুতরাং ভাসা ভাসা কতকগুলো মামুলি কথার আড়ালে আশ্রয় নেবার কোনো প্রয়োজন আমার নেই। আমার মতে আজকালকার ছাত্রদের এতবেশি ধূমপান ও মদ্যপান করা উচিত নয় এবং এত দেরিতে বিয়ে করা উচিত নয়। আমি পছন্দ করি না তাদের ঢিলেমি ও উদাসীনতা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই উদাসীনতার ফলে সহাধ্যায়ী ছাত্রদের অভাবের দিকেও চোখ পড়ে না এবং 'দরিদ্র ছাত্র সাহায্য সমিতির' চাঁদা বাকি থেকে যায়। কোনো বিদেশী ভাষা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নেই, ভুল রুশ ভাষায় তারা বক্তব্য প্রকাশ করে। এই তো গতকালই আমার এক সহযোগী বন্ধু স্বাস্থ্যতত্ত্বের অধ্যাপক বলছিলেন, তাঁকে আগে যতগুলো ক্লাস নিতে হত এখন তার দ্বিগুণসংখ্যক ক্লাস নিতে হয়, কারণ পদার্থবিজ্ঞানে ছাত্ররা দুর্বল এবং মিটিয়ারোলজিতে তারা একেবারেই অজ্ঞ। সর্বাধুনিক লেখকদের নিয়ে তারা অতি সহজেই মাতামাতি করে, এমন কি এই সর্বাধুনিক লেখকরা যদি সেরা লেখক নাও হয় তবুও, কিন্তু শেক্‌সপীয়র, মার্কাস অরেলিয়স, এপিক্‌টেটাস বা পাস্কাল ইত্যাদির চিরায়ত সাহিত্য সম্পর্কে তারা একেবারেই উদাসীন। বড়ো আর ছোট-র মধ্যে তফাৎ করতে না পারার এই অক্ষমতা থেকেই এসেছে তাদের দৈনন্দিন সাধারণবুদ্ধির অভাব, যা পদে পদে প্রকাশ পায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে কম বেশি সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ জটিল প্রশ্নগুলোর (যেমন স্বদেশত্যাগী চাষীদের জমি বিলিবন্দোবস্ত) সমাধান করবার চেষ্টা তারা করে না। অথচ প্রশ্নগুলো তাদের হাতের কাছেই রয়েছে এবং বৃত্তিগত দিক থেকেও এই প্রশ্নগুলোর সমাধান তাদের করা উচিত। তারা কিন্তু কোনোটাই করে না, তার বদলে বসে বসে শুধু চাঁদার তালিকা তৈরি করে। খুশি হয়েই তারা হাসপাতালের চাকরি নেয়, অধ্যাপকের সহকারী বা ল্যাবরেটরি কর্মচারী বা আবাসিক চিকিৎসক হয়, এবং এ কাজেই জীবনের চল্লিশটা বছর কাটিয়ে দিতে পারলে খুশি। অথচ মনের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যতোখানি দরকার তা অন্য কোনো ক্ষেত্রের চেয়ে, যেমন ধরা যাক কলা বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রের চেয়ে, কিছুমাত্র কম দরকারী নয়। আমার ছাত্র ও শিষ্যের সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও আমার সহকারী বা উত্তরসাধক

নয়। সুতরাং, ছাত্রদের যদিও আমি ভালোবাসি বা পছন্দ করি কিন্তু তাদের সম্পর্কে আমার কোনো গর্ব নেই। ইত্যাদি, ইত্যাদি...

অবশ্য প্রচুর দোষত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু তা দেখে শুধু ভীরু আর কাপুরুষরাই হতাশ হয় ও গালিগালাজ দিতে শুরু করে। এই সমস্ত দোষত্রুটি চিরকালের নয়, কতকগুলো আকস্মিক ঘটনার যোগাযোগের ফল এবং পুরোপুরি ভাবেই পারিপার্শ্বিকের ওপর নির্ভরশীল। এগুলোর স্থায়িত্ব বড়ো জোর দশ বছর, তারপরেই হয়তো অন্য ধরনের নতুন সব দোষত্রুটি দেখা দেবে। তখন আবার সেইসব দোষত্রুটি দেখে আরেক দল দুর্বলচিত্ত আতঙ্কিত হবে। ছাত্রদের পাপাচার দেখে আমি প্রায়ই রুষ্ট হই। কিন্তু গত ত্রিশ বছর ধরে ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের পড়িয়ে, তাদের মেলামেশাকে লক্ষ্য করে এবং বাইরের পৃথিবীর লোকজনের সঙ্গে তাদের তুলনা করে যে আনন্দ পেয়েছি তার কাছে আমার এই রাগ কিছুই নয়।

মিখাইল ফিওদরভিচ উপহাস করে চলে, কাতিয়া শোনে এবং দুজনের কেউ-ই লক্ষ্য করে না যে, সঙ্গীদের সমালোচনা করার মতো এমন বাহ্যত নির্দোষ একটা আনন্দ কোন্ অতল গহ্বরের দিকে তাদের টেনে নিয়ে চলেছে। দুজনের কেউ-ই লক্ষ্য করে না যে সাধারণ কথাবার্তা দিয়ে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল তা ক্রমেই কুৎসিত হতে হতে বিদ্রূপ আর উপহাসে পর্যবসিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই তা কুৎসা-রটনরা পর্যায়ে নেমে গেছে।

মিখাইল ফিওদরভিচ বলে, 'কী সব অপরূপ লোকের সঙ্গেই না রাস্তায় ঘাটে দেখা হয়! কাল গিয়েছিলাম আমাদের ওই ইয়েগর পেত্রোভিচের সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে দেখলাম আপনার এক মেডিক্যাল ছাত্র বসে আছে, সম্ভবত থার্ড ইয়ারে পড়ে। মুখখানাকে এমন করে তুলেছে যেন মূর্তিমান দব্রলিউবভ, সারা কপালে গভীর ধ্যানের ছাপ। আমাদের মধ্যে দু একটা কথা হল। আমি বললাম, "ওহে ছোকরা, শুনেছ তো, সেদিন কোথায় যেন পড়লাম, কোন্ জার্মান, আমি তার নাম ভুলে গেছি, মানুষের মস্তিষ্ক থেকে ইডিয়োটিন নামে অ্যাল্কালয়েড নিষ্কাশন করেছে!" ওমা, দেখি কি, ছোকরা আমার কথা বিশ্বাস করেছে। সারা মুখে ভক্তি গদগদ ভাব—বিজ্ঞানের অসাধ্য কিছুই নেই — এমনি একটা ছাপ ফুটে উঠেছে চোখেমুখে। আরেকদিন গিয়েছিলাম

থিয়েটার দেখতে। বসে আছি। আর আমার ঠিক সামনেটিতে বসেছে দুটি লোক। একজনকে দেখে মনে হল আইনের ছাত্র, একজন 'কমরেড', অপর জন মেডিক্যাল ছাত্র, বুনো বুনো চেহারা। মেডিক্যাল ছাত্রটি মদে চুর হয়ে আছে। মঞ্চের ওপরে কী ঘটছে বা না ঘটছে সেদিকে একটুও মনোযোগ নেই। বসে বসে শুধু ঢুলছে আর মাথা নাড়ছে। কিন্তু যখনই কোনো অভিনেতা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে স্বগতোক্তি করে বা এমনি কোনো কারণে গলা চড়ায়, আমাদের মেডিক্যাল ছাত্রটি চমকে উঠে পাশের সঙ্গীকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কী বলল?, ভাবের কথা নাকি?" আইনের ছাত্রটি জবাব দেয়, "হ্যাঁ, মস্ত ভাবের কথা।" মেডিক্যাল ছাত্রটি চিৎকার করে ওঠে, "সা-আ-আ-বাস! সাবাস ভাবের কথা!" লক্ষ্য করবেন, মাতাল হতচ্ছাড়াটা থিয়েটারে যায় শিল্পের জন্যে নয়। তার ভাবের কথার দরকার!'

কাতিয়া শোনে আর হাসে। ওর হাসির মধ্যে কেমন একটা এলোমেলো ভাব আছে। এক ধরনের দ্রুত আর ছন্দোবদ্ধ নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতো, যেন ও কন্সের্টিনা বাজাচ্ছে আর ওর যা কিছু উল্লাস সমস্ত ফুটে উঠেছে ওর নাসারন্ধ্রে। আমি মুষড়ে পড়েছি, কী বলব বুঝতে পারছি না। হঠাৎ আমি ফেটে পড়ি, চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াই, আর চিৎকার করে বলি:

'চুপ করো! তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে, তোমরা একজোড়া কোলা ব্যাং, তোমাদের নিশ্বাসে বাতাস বিষিয়ে যাচ্ছে। অনেক কথা বলেছ! আর নয়!'

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দিকে পা বাড়াই। ওদের গালগল্প শেষ পর্যন্ত শোনবার ধৈর্য আমার আর নেই। তাছাড়া, বাড়ি যাবার সময়ও হয়েছে। রাত এগারোটা।

মিখাইল ফিওদরভিচ বলে, 'ইয়েকাতেরিনা ভ্লাদিমিরভনা, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো আমি আরেকটু বসি।'

কাতিয়া জবাব দেয়, 'নিশ্চয়ই।'

'ধন্যবাদ। তাহলে দয়া করে আরেক বোতল মদ আনতে বলুন।'

হাতে মোমবাতি নিয়ে দুজনেই আমার সঙ্গে সঙ্গে হলঘর পর্যন্ত আসে। যতোক্ষণ আমি ওভারকোট পরি, মিখাইল ফিওদরভিচ বলে:

'নিকলাই স্তেপানিচ, কিছুদিন ধরে আপনাকে ভীষণ রোগা আর বুড়োটে দেখাচ্ছে। ব্যাপার কী? আপনার কি অসুখ করেছে?'

'বিশেষ কিছু নয়।'

'তবুও ডাক্তার দেখাবে না।' রুক্ষ স্বরে কাতিয়া বলে ওঠে।

'আপনি কারও সঙ্গে পরামর্শ করেছেন না কেন? এভাবে কতদিন চলবেন আপনি? জানেন তো, উদ্যোগী পুরুষকেই ঈশ্বর সাহায্য করেন। আপনার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারিনি বলে দুঃখিত। তাদের আমার প্রীতি জানাবেন। বিদেশে চলে যাবার আগে একদিন যাব আপনার বাড়িতে। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসব। যাব নিশ্চয়ই। আগামী সপ্তাহেই রওনা হচ্ছি।'

মনের মধ্যে একটা জ্বালা নিয়ে, আমার অসুখের আলোচনায় আতঙ্কিত হয়ে এবং নিজের ওপরে একটা রাগ পুষে রেখে কাতিয়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করি, যাই হোক না কেন, একজন সহকর্মীর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করলে কী এমন ক্ষতি? সঙ্গে সঙ্গে সহকর্মীর অবস্থাটা কল্পনা করে নিতে পারি। তিনি প্রথমে আমাকে পরীক্ষা করবেন, তারপর নিঃশব্দে চলে যাবেন জানলার কাছে, কিছুক্ষণ চিন্তা করবেন, তারপর আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে এমন একটা মুখের ভাব করবেন যাতে তাঁর মুখ দেখে সত্যি কথাটা বুঝতে না পারি, তারপর যেন কিছুই হয়নি এমনি সুরে বলবেন, 'আমি যতোদূর বুঝতে পারছি, বিশেষ কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। তবুও আমার উপদেশ যদি শোনেন তো বলব, আপনি এবার অবসর নিন ...' এবং এই কথার সঙ্গে সঙ্গে শেষ আশা থেকে আমি বঞ্চিত হব।

কোনো রকম আশা পোষণ করে না, এমন লোক আমাদের মধ্যে কে আছে? যতোক্ষণ নিজেই নিজের রোগ নির্ণয় করি এবং নিজেই নিজের চিকিৎসা করি, ততোক্ষণ মাঝে মাঝে এই আশা থাকে যে আমার অজ্ঞতা হয়তো আমাকে প্রতারিত করেছে এবং কতকগুলো ব্যাপারে আমি ভুল করেছি — যেমন, আমার প্রস্রাবে অ্যাল্‌বুমেন ও শর্করা যেটা আবিষ্কার করেছি, আমার হৃৎপিণ্ডের অবস্থা, আর ইতিমধ্যেই একদিন সকালে দু-দুবার আমার শরীরে যে শোথরোগের লক্ষণ টের পেয়েছিলাম সে সম্বন্ধে। স্নায়বিক রোগাক্রান্ত লোকের মতো উৎসাহ নিয়ে আমি যখন চিকিৎসা পুস্তকের পাতা ওল্টাই, প্রতিদিন বদলাই ওষুধ, তখন ক্রমাগত ভাবি এমন একটা কিছু চোখে পড়বে যাতে সান্ত্বনা পাবো। আগাগোড়া ব্যাপারটা কী তুচ্ছ!

আকাশ মেঘে ঢাকা থাক্ বা আকাশে চাঁদ ও তারা ফুটে উঠুক,

আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি, আমার জীবনে কত শীঘ্রই না মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। মনে হতে পারে, এই অবস্থায় আমার চিন্তাও হয়ে ওঠে আকাশের মতোই প্রগাঢ়, প্রত্যক্ষ ও গভীর... কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই হয় না। ভাবি নিজের কথা, আমার স্ত্রী, লিজা, গ্নেক্কের ও ছাত্রদের কথা, এক কথায়, সমস্ত মানুষের কথা। অতি তুচ্ছ, অতি অকিঞ্চিৎকর চিন্তা আমার, নিজেই নিজেকে চোখ ঠেরে ভুল বোঝাতে চেষ্টা করি। জীবন সম্পর্কে আমি যে মনোভাব সব সময়ে পোষণ করি তা বোঝানো যেতে পারে স্বনামখ্যাত আরাক্‌চেয়েভের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে আরাক্‌চেয়েভ লিখেছিলেন, 'সংসারে যা কিছু ভালো আছে, তার মধ্যে খানিকটা মন্দ থাকবেই, আর সব সময়েই দেখা যায় যে ভালোর চেয়ে মন্দেরই প্রাধান্য বেশি।' অন্য কথায়—সব কিছুই ঘৃণাজনক, জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই, এবং আমার জীবনের যে বাষট্টিটা বছর কেটে গেছে তা ব্যর্থ হয়েছে বলতে হবে। এই ধরনের চিন্তার মধ্যেও মাঝে মাঝে আমি সজাগ হয়ে উঠি এবং নিজেই নিজেকে বোঝাই যে এই চিন্তাগুলো নিতান্তই আকস্মিক, নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, আমার সত্তার গভীরে এসব চিন্তার কোনো গভীর মূল নেই। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবি, 'তাই যদি হবে তবে রোজ রাত্রে ওই কোলা ব্যাঙদুটোর কাছে যাও কেন?'

তখন নিজের মনে মনেই প্রতিজ্ঞা করি যে আর কোনো দিন কাতিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাব না। কিন্তু যতোই প্রতিজ্ঞা করি না কেন, খুব ভালো করেই জানি যে ঠিক পরের দিনই আবার কাতিয়ার বাড়িতে যাব।

যখন সদর দরজার কলিং-বেল টিপি এবং ওপরে উঠে যাই তখন মনে হতে থাকে, আমার পরিবার পরিজন বলতে কেউ নেই, এবং পরিবার পরিজনকে ফিরে পাবার ইচ্ছেও নেই আমার। স্পষ্টই আরাক্‌চেয়েভের উক্তির মধ্যে যে নতুন চিন্তার ইঙ্গিত রয়েছে সেগুলো আমার সত্তার মধ্যে আকস্মিক বা ক্ষণস্থায়ী নয়, সেগুলো শাসন করছে আমার সমস্ত অস্তিত্বকে। বিবেক আমাকে পীড়িত করে, আমি যন্ত্রণা ভোগ করি, শরীর অসাড় হয়ে আসে, হাত পা নাড়তে পারি না। যেন সাতাশমণী একটা বোঝা আমার ওপরে চেপে বসেছে। এই অবস্থায় বিছানায় গিয়ে শুই এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ি।

তারপর সেই ঘুমের শেষে আছে... অনিদ্রারোগ...

৪

গ্রীষ্মকাল শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ধারা বদলে যায়।

একদিন চমৎকার এক সকালে লিজা আমার ঘরে ঢুকে উচ্ছল সুরে বলে, 'হুজুর, আসুন! সব তৈরি।'

তারপর হুজুরকে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে ওঠান হয় একটা ভাড়া গাড়িতে। গাড়ি চলতে শুরু করে। গাড়িতে বসে বসে আমি অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি আর রাস্তার বিজ্ঞাপনগুলো উলটো দিক থেকে পড়ে যাই। এক জায়গায় লেখা আছে—'ত্রাক্‌তির' (পানশালা)। শব্দটাকে আমি উলটো দিক থেকে পড়ি—'রতিক্‌ত্রা'। এটা কোনো ব্যারনেসের চমৎকার নাম হতে পারে—ব্যারনেস রতিক্‌ত্রা। শহরের বাইরে খোলা জায়গায় গিয়ে পড়ার পরে আমরা একটা কবরখানার পাশ দিয়ে যাই। কবরখানাটাকে দেখেও মনে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হয় না, যদিও অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমাকে এখানে এসে স্থান নিতে হবে। একটা বনের ভেতর দিয়ে আমাদের যেতে হয়, তারপর আবার উন্মুক্ত গ্রামাঞ্চল। কোনো কিছুতেই আগ্রহ বোধ করি না। ঘণ্টা দুয়েক গাড়ি চলার পরে 'হুজুর' এসে হাজির হন এক গ্রীষ্মাবাসের সামনে, তাঁর জন্যে স্থান নির্দিষ্ট হয় নিচের তলার একটি ঘরে, নীল দেওয়াল-কাগজ-মোড়া ছোট্ট ঝলমলে ঘরটি।

রাত্রি কাটে যথারীতি অনিদ্রারোগে। কিন্তু সকালবেলা বিছানাতেই শুয়ে থাকি, জেগে উঠে অন্য দিনের মতো আমার স্ত্রীর কথাবার্তা শুনতে হয় না। ঠিক যে ঘুমিয়ে থাকি তা নয়, কেমন যেন একটা অর্ধঅচেতন তন্দ্রার ভাব; ঠিক ঘুম নয় অথচ স্বপ্ন দেখাও চলে। দুপুরবেলা বিছানা ছেড়ে উঠি এবং নিতান্ত অভ্যাসবশেই গিয়ে বসি আমার ডেস্‌কের সামনে। যদিও কোনো কাজ করি না, কিন্তু বসে বসে কাতিয়ার পাঠানো হলদে মলাটের ফরাসী উপন্যাসের পৃষ্ঠা উলটিয়ে যাই। অবশ্য আমি যদি রুশ লেখকদের লেখা পড়তাম তাহলে আরো বেশি দেশপ্রেমের পরিচয় দেওয়া হত। কিন্তু আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে রুশ লেখকদের লেখা আমার তেমন পছন্দ

নয়। কয়েকজন সর্বজনস্বীকৃত সেরা লেখকদের রচনাবলীর কথা বাদ দিলে, আধুনিক সাহিত্য আমার কাছে সাহিত্য বলে মনে হয় না, বরং মনে হয় আধুনিক সাহিত্য যেন এক ধরনের কুটির-শিল্প, এই কুটির-শিল্পটি বেঁচে আছে সম্পূর্ণভাবে সাধারণ মানুষের মৌন সম্মতির ওপরে ভিত্তি করে। কুটির-শিল্পজাত সামগ্রী সহজে বিকোয় না। কুটির-শিল্পজাত সামগ্রী যতো ভালোই হোক না কেন, তাকে অনবদ্য আখ্যা কিছুতেই দেওয়া চলে না এবং মন খুলে প্রশংসাও করা যায় না—একটা 'কিন্তু' থেকেই যায়। গত দশ পনেরো বছরে আমি যে কটি নতুন ধরনের সাহিত্য পড়েছি, তার প্রত্যেকটি সম্পর্কেই এই উক্তি প্রযোজ্য। একটি বইও উল্লেখযোগ্য নয়, আর সেই 'কিন্তু' শব্দটিও থেকেই যায়। যেমন, 'দক্ষ, ভাবসমৃদ্ধ, কিন্তু খুব চমৎকার নয়; খুব চমৎকার, ভাবসমৃদ্ধ, কিন্তু দক্ষ নয়, কিংবা, সব শেষে—খুব চমৎকার, দক্ষ, কিন্তু ভাবসমৃদ্ধ নয়।'

তার মানে এই নয় যে ফরাসী বইমাত্রই আমার কাছে খুব চমৎকার, দক্ষ ও ভাবসমৃদ্ধ। ফরাসী বই পড়েও আমি খুশি হই না। কিন্তু রুশ বইয়ের মতো ফরাসী বই নীরস নয় এবং মোটামুটি সমস্ত ফরাসী বইতেই একটা বৈশিষ্ট্যসূচক গুণ আছে, যাকে বলা যায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ। রুশ লেখকদের মধ্যে এই গুণটি অবর্তমান। সাম্প্রতিক কালে লেখা এমন একটি বইয়ের নামও আমার মনে পড়ে না, যে-বইয়ে লেখক একেবারে প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই প্রচলিত রীতি ও আপোস-নীতির আড়ালে গা বাঁচাতে চেষ্টা করেনি। কোনো লেখক হয়তো উলঙ্গ দেহের উল্লেখ করতে ভয় পায়, কারুর হাত পা বাঁধা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, কেউ হয়তো 'মানবজাতির প্রতি আবেগোচ্ছ মনোভাবকে' আঁকড়ে ধরে আছে, আরেকজন ইচ্ছে করেই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নিসর্গ-বর্ণনা দিয়ে চলে যাতে কারও সন্দেহ না হয় যে তার 'বিশেষ কোনো পক্ষপাত' আছে... কেউ চায় যেন-তেন প্রকারে নিজেকে আসল পেটি বুর্জোয়া বলে ফুটিয়ে তুলতে, কেউ চায় আভিজাত্যের ঠাট বজায় রাখতে, এবং এমনি কত কি। অর্থাৎ, লেখার মধ্যে কারিকুরি আছে, সতর্কতা আছে, অবহিত দৃষ্টি আছে — কিন্তু খুশিমতো লেখার নেই স্বাধীনতা, নেই সাহস। সুতরাং মৌলিকতার অভাব থেকে যায়। তথাকথিত রম্যরচনা সম্বন্ধেও এ-সব কথা খাটে।

রুশ লেখকদের লেখা চিন্তাশীল প্রবন্ধের কথা যদি ওঠে—যেমন ধরা যাক, সমাজতত্ত্ব, শিল্প, বা এ-ধরনের কোনো বিষয়ের ওপরে প্রবন্ধ—তাহলে আমি ভয় পাই এবং নিছক ভয় থেকেই তা পড়ি না। ছেলেবেলায় এবং তরুণ বয়সে দু-ধরনের লোককে ভয় করতাম—হলঘরের পরিচারক এবং প্রেক্ষাগৃহের তত্ত্বাবধায়ক। এই ভয় এখনো থেকে গেছে। লোকে বলে, যা আমরা বুঝি না, তাই নিয়েই আমাদের ভয়। আমি সত্যিই বুঝতে পারি না কেন হলঘরের পরিচারক ও প্রেক্ষাগৃহের তত্ত্বাবধায়কদের এতবেশি ঠাটঠমক, এমন ঔদ্ধত্য, এমন রাজোচিত মেজাজ। যখন চিন্তাশীল প্রবন্ধ পড়ি তখন ঠিক এমনি ধরনের একটা অস্পষ্ট ভয় আমাকে পেয়ে বসে। এই সমস্ত প্রবন্ধের অনন্যসাধারণ ঠাটঠমক, হিমালয় সমান বাচালতা, বিদেশী গ্রন্থকারদের নিয়ে এমন অনায়াস নাড়াচাড়া, কোনো কিছু মালমশলা ছাড়াই এমন উল্লেখযোগ্য দক্ষতার সঙ্গে মস্ত একটা কিছু গড়ে তোলার ক্ষমতা—এসবের মর্ম বুঝি না এবং এতে আতঙ্কিত হই। আমি অভ্যস্ত সম্পূর্ণ অন্য ধরনের লেখার সঙ্গে, যার মধ্যে আছে একটা বিনীত ও ভদ্রোচিত সুর। চিকিৎসক ও প্রাণিতত্ত্ববিদ গ্রন্থকারদের রচনাবলী যখন পড়ি, তখন লেখার এই বিশেষ সুরের সঙ্গেই আমার পরিচয় ঘটে। চিন্তাশীল রুশ লেখকদের মৌলিক রচনা পড়া আমার পক্ষে যেমন কষ্টকর, তেমনি কষ্টকর তাদের অনূদিত বা সম্পাদিত লেখা পড়া। এই শেষোক্ত ধরনের লেখায় থাকে পিঠ-চাপড়ানো দম্ভের সুরভরা একটি ভূমিকা এবং অজস্র অনুবাদকের টীকা—এই দুটি জিনিস থাকার জন্যে মূল পাঠে আমি মনঃসংযোগ করতে পারি না। তাছাড়া গোটা প্রবন্ধে বা বইয়ে ছড়ানো-ছিটনো থাকে প্রশ্নচিহ্ন ও sic চিহ্ন। চিহ্নগুলোর প্রত্যেকটিকে আমার মনে হয় গ্রন্থকারের স্বাতন্ত্র্যের ওপরে এবং পাঠক হিসেবে আমার স্বাধীনতার ওপরে অসংখ্য আক্রমণ।

একবার আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল জেলা আদালতে বিশেষজ্ঞের মতামত দেবার জন্যে। বিরতির সময়ে আমার একজন সহযোগী বিশেষজ্ঞ জিজ্ঞেস করলেন, আসামীদের মধ্যে দুজন শিক্ষিতা মহিলা থাকা সত্ত্বেও সরকারী উকিল আসামীদের সঙ্গে যে ধরনের রূঢ় ব্যবহার করেছে, তা আমি লক্ষ্য করেছি কিনা। তাঁকে বলেছিলাম যে চিন্তাশীল প্রবন্ধের লেখকরা একজন আরেকজনের লেখা সম্পর্কে যতোখানি রূঢ়, সরকারী উকিলের রূঢ়তা তার

চেয়ে বেশি কিছুতেই নয়। আমি মনে করি না যে আমার এই মন্তব্যের মধ্যে কিছুমাত্র অত্যুক্তি আছে। সত্যি কথা বলতে কি, লেখকদের মধ্যে এই রূঢ়তা এতবেশি প্রকট যে এ-সম্পর্কে কথা বলতে গেলে মনের স্থৈর্য বজায় রাখা চলে না। একজন লেখক আরেকজন লেখকের সঙ্গে যে ধরনের ব্যবহার করে বা একজন লেখক আরেকজন লেখকের লেখাকে যে-ভাবে সমালোচনা করে, তার মধ্যে থাকে একটা বাড়াবাড়ি রকমের শ্রদ্ধা যা প্রায় দাসত্বেরই নামান্তর কিংবা একেবারে বিপরীত ধরনের কথা, আমি আমার ভবিষ্যৎ জামাতা সম্পর্কে এই ডায়েরিতে যে-সব কথা লিখেছি বা মনে মনে যে ধারণা পোষণ করি, তার চেয়েও অনেক বেশি শক্ত কথা সেগুলো। সচরাচর দেখা যায়, চিন্তাশীল প্রবন্ধের ভূষণ হচ্ছে বাতুলতা, উদ্দেশ্যের অনিশ্চয়তা এমন কি সব ধরনের অপরাধ। আর এ সমস্ত কিছুকেই উপস্থিত করা হয় চরম যুক্তি হিসেবে—আমাদের অল্পবয়স্ক ডাক্তাররা 'প্রবন্ধ' লিখতে বসে যেমনটি করে। এই মনোভাব দেশের তরুণ লেখকদের নীতিবোধকে প্রভাবিত না করে পারে না। সুতরাং আমি বিন্দুমাত্র অবাক হই না যখন দেখি, গত দশ বা পনেরো বছরে উল্লেখযোগ্য রম্যরচনা হিসেবে যে-সব বই প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোতে নায়করা বড়ো বেশি ভদ্‌কা খায়, নায়িকারা যথেষ্ট অকলঙ্ক নয়।

ফরাসী উপন্যাস পড়তে পড়তে খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাই। আমার বাড়ির সামনের দিকে বাগান, বাগানের চারদিকে খুঁটি দেওয়া বেড়া, জানলা দিয়ে তাকিয়ে খুঁটির মাথাগুলোকে দেখি, আর দেখি দু-তিনটে মরা মরা গাছ, বেড়া পেরিয়ে খোলা মাঠ, মাঠের শেষে পাইনগাছের নিবিড় সারি। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে, সোনালী চুলওয়ালা ও ছেঁড়া জামাকাপড় পরা একটি ছেলে ও একটি মেয়ে খুঁটি বেয়ে ওপরে উঠে আর আমার টাকমাথার দিকে তাকিয়ে হি-হি করে হাসছে। ওদের উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারি, ওরা আমার সম্পর্কে কী ভাবছে। ওরা যেন বলতে চায়: 'ওরে দ্যাখ্, দ্যাখ্, টেকো লোকটার কাণ্ড দ্যাখ্!' আমার খ্যাতি ও পদাধিকার সম্পর্কে ওদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই,এদিক থেকে ওরা প্রায় অনন্য।

আজকাল দর্শনার্থীরা রোজ আসে না। আমি শুধু নিকলাই ও পিওতর ইগ্‌নাতিয়েভিচের কথা বলব। নিকলাই সাধারণত দেখা করতে আসে ছুটির দিনে। একটা কিছু দরকারী কাজ সারবার উপলক্ষেই আসে বটে কিন্তু মুখ্য

উদ্দেশ্য থাকে আমার সঙ্গে দেখা করে যাওয়া। মদে ওর বড়ো বেশি বেসামাল অবস্থা। এ রকম অবস্থায় শীতকালে ওকে কক্ষনো দেখা যায় না।

ওকে দেখে বারান্দায় বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করি, 'তারপর, খবর কী, সব ভালো তো?'

'হুজুর,' বুকের ওপরে হাত রেখে এবং প্রেমিকের মতো গদগদ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ও বলে, 'হুজুর, ভগবান আমার সাক্ষী! ভগবানের শাস্তি যেন মাথা পেতে নিতে হয়! যৌবনে ফুর্তি করব!'

এই বলে সে আবেগের সঙ্গে আমার কাঁধে, জামার আস্তিনে এবং কোটের বোতামের ওপরে চুম্বন করতে থাকে।

আমি জিজ্ঞেস করি, 'ওখানকার সব খবর ভালো তো?'

'হুজুর, ভগবান সাক্ষী...'

এমনিভাবে ভগবানের দোহাই পেড়ে অনবরত কথা বলে চলে। শুনতে শুনতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তখন ওকে পাঠিয়ে দিই রান্নাঘরের দিকে, ওখানে গেলে ওকে খাবার দেওয়া হবে। পিওতর ইগ্‌নাতিয়েভিচও আসে ছুটির দিনে। উদ্দেশ্য নিয়েই আসে। উদ্দেশ্যটা আমাকে দেখা আর কোনো কোনো বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করা। সাধারণত সে টেবিলের কাছে বসে। লোকটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বিনয়ী, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন; পায়ের ওপরে পা তুলে বসার বা টেবিলের ওপরে দু হাতের ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ার সাহস তার নেই। কথা বলে অবিশ্রান্ত; নম্র চৌরস গলার স্বর, পুঁথিগত মার্জিত ভাষা। বিভিন্ন পত্রিকা ও বই থেকে সে যে-সব রসালো খবর সংগ্রহ করেছে এবং যেগুলোকে মনে করেছে খুবই চিত্তাকর্ষক, সেগুলো আমায় বলে। এ সমস্ত টুকরো খবর সবই হুবহু একরকম, সবই এক ধরনের। যেমন, ফ্রান্সের কে একজন কী একটা আবিষ্কার করেছে, অন্য একজন—এক জার্মান, প্রমাণ করেছে যে ব্যাপারটা ভুয়ো, অনেক আগে ১৮৭০ সালেই একজন আমেরিকান এই আবিষ্কারটি করেছিল, তৃতীয় আরেকজন লোক—সেও জার্মান, দুজনকেই বোকা বানিয়ে দিয়ে প্রমাণ করেছে যে আগাগোড়া ব্যাপারটাই ভ্রান্তিবিলাস, ওরা দুজনেই অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ভেতর দিয়ে যা দেখেছে তা বাতাসের বুদ্বুদ, কিন্তু ওরা দুজনেই ধরে নিয়েছে যে জিনিসটা গাঢ় রঞ্জক। এমন কি, আমাকে খানিকটা আনন্দ দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে

যখন সে কথা বলে তখনো এইভাবেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এসবের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়। তার কথাবার্তা শুনে মনে হয় যেন সে একটা থিসিসের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থিত করছে। খবরগুলো সে কোন্ কোন্ পত্রিকা ও বই থেকে সংগ্রহ করেছে তার একটা দীর্ঘ তালিকা পেশ করে, আপ্রাণ চেষ্টা করে, যেন তারিখ বা পত্রিকার যে বিশেষ সংখ্যা থেকে সে খবরগুলো সংগ্রহ করেছে সেই সংখ্যাটি বা নাম উল্লেখ করার ব্যাপারে কোনো রকম ভুল না হয়। নাম বলতে গিয়ে পুরো নামটি বলে—যেমন, কক্ষনো বলবে না পেতি, বলবে জ্যাঁ জ্যাক পেতি—এ দিকে তার খুবই সতর্কতা। মাঝে মাঝে এখানেই খেয়ে যায়। আর খেতে বসেও আগাগোড়া সময়ে তার মুখে সেই এক কথা। শুনতে শুনতে আমাদের এত বিরক্তি ধরে যে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠি। গ্নেক্কের বা লিজা যদি কখনো অন্য কোনো প্রসঙ্গ তোলে যেমন, সঙ্গীতের কোনো বিশেষ রীতিনীতির কথা বা ব্রাহ্ম্স, বা বাক্-এর কথা, তাহলে সে অকপটভাবেই অবাক হয় আর মাথা নিচু করে থাকে। এই ভেবে সে লজ্জা পায় যে আমার মতো বা তার মতো গুরুগম্ভীর লোক যেখানে বসে আছে সেখানে কিনা এত তুচ্ছ সব বিষয়ের অবতারণা!

আজকাল মনের যা অবস্থা তাতে যদি মিনিট পাঁচেক সময়ও এই লোকটির সঙ্গে আমাকে থাকতে হয় তাহলে মনে হয় যেন যুগ যুগ ধরে এই লোকটিকে দেখছি যা এই লোকটির কথা শুনছি। বেচারাকে একেবারেই সহ্য করতে পারি না। ওর নম্র চৌরস গলা, পুঁথিগত মার্জিত ভাষা, আর বিচিত্র সব কাহিনী শুনলেই ভীষণভাবে দমে যাই, মন বিষণ্ণ হয়ে যায়। ও আমার কাছে আসে খুব বেশি রকমের সহানুভূতি ও দরদের মনোভাব নিয়ে। কথা বলার একমাত্র উদ্দেশ্য আমি যেন একটু আনন্দ পাই। এসবের পুরস্কার হিসেবে শুধু ওর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি, যেন ওকে সম্মোহিত করতে চাইছি আর তা করতে গিয়ে নিজের মনেই বারবার বলছি, 'যাও, যাও, যাও...' কিন্তু যতোই বলি না কেন, ওর দিক থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায় না, ও নড়ে না, নড়ে না, নড়ে না...

যতোক্ষণ ওকে আমার সামনে থাকতে দেখি, ততোক্ষণ কিছুতেই মন থেকে এই চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলতে পারি না: আমি মরে গেলে খুব সম্ভব এই লোকটিই আমার জায়গায় কাজ করবে। সঙ্গে সঙ্গে হৃতগৌরব ক্লাসঘরের

ছবিটা মরূদ্যানের মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যেখানকার সমস্ত জলধারা গেছে শুকিয়ে। তখন পিওতর ইগ্‌নাতিয়েভিচের ওপরে মন বিরূপ হয়ে ওঠে, চুপ করে থাকি, দুর্ব্যবহার করি। ভাবখানা এমন যেন আমার মনের এসব চিন্তার জন্যে ওই লোকটিই দায়ী, আমি নই। ও যখন যথারীতি জার্মান বৈজ্ঞানিকদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে, আমি আর তখন ওর কথার জবাবে ঠাট্টাতামাসাটুকুও করতে পারি না, বিমর্ষ মনে বিড়বিড় করে বলি, 'তোমার এই জার্মানগুলো হচ্ছে এক দঙ্গল গাধা...'

বুঝতে পারছি, আমার আচরণটা হয়ে যাচ্ছে অনেকটা সেই পরলোকগত অধ্যাপক নিকিতা ক্রিলভের মতো। তিনি একবার রেভাল্‌-এ স্নান করছিলেন, সঙ্গে ছিলেন পিরগোভ। স্নান করতে গিয়ে যেই দেখলেন জলটা ঠাণ্ডা, অমনি ভীষণ চটে বলে উঠলেন,' 'এই হতচ্ছাড়া জার্মানগুলোর জ্বালায় আর পারা গেল না!' পিওতর ইগ্‌নাতিয়েভিচের সঙ্গে আমি দুর্ব্যবহার করি। কিন্তু যখন ও আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় আর জানলা দিয়ে তাকিয়ে আমার চোখে পড়ে, বাগানের বেড়ার ধার দিয়ে ও হেঁটে যাচ্ছে আর ওর মাথার টুপিটা এক-একবার বেড়ার ওপরে ভেসে উঠছে, আবার ডুবে যাচ্ছে, তখন ভয়ানক একটা ইচ্ছে হয় যে ওকে ডেকে পাঠাই আর বলি, 'মাপ কোরো ভাই!'

দুপুরের খাওয়া শীতকালে যতোটা না বিরক্তিকর ছিল, এখন তার চেয়ে অনেক বেশি বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। আজকাল প্রায় রোজই সেই গ্‌নেক্কের লোকটা আমাদের সঙ্গে খায়। লোকটাকে এখন দু-চোখে দেখতে পারি না, রীতিমতো ঘৃণা করি। আগে লোকটার উপস্থিতি চুপ করে সহ্য করতাম। এখন আমার ক্ষুরধার বুদ্ধির সমস্ত তীর ওকে লক্ষ্য করেই নিক্ষেপ করি। আমার আচরণ দেখে আমার স্ত্রী ও লিজা দুজনেই লজ্জা পায়। মাঝে মাঝে রাগে এমন গা জ্বালা করে যে একেবারে উদ্‌ভট সব কথা বলতে শুরু করি। কেন যে বলি তা নিজেই জানি না। যেমন ধরা যাক একদিনের কথা। বিদ্বেষ-ভরা দৃষ্টিতে গ্‌নেক্কেরের দিকে তাকিয়ে সেদিন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলেছিলাম:

মুর্গি-ছানার চাইতে নিচে উড়তে পারে ঈগল,
আকাশ ছুঁতে মুর্গি-ছানা হবে না কিন্তু সফল।

কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সেই মুর্গির ছানা গ্নেক্কের ঈগল অধ্যাপকের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। ও ভালো করেই জানে যে আমার স্ত্রী ও কন্যা ওর পক্ষে; কাজেই ও এই কৌশল ধরে চলে: আমি যতোই ঠাট্টাবিদ্রূপ করি না কেন, ও প্রশ্রয় দেবার মতো মুখের ভাব করে চুপচাপ থাকে (ভাবটা এই যে বুড়ো লোকটার বকবক করা স্বভাব, কাজেই তর্ক না করাই ভালো), কিংবা ভালোমানুষি ভাব দেখিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে। মানুষ যে কত নীচ হতে পারে তা দেখে অবাক হতে হয়। আমার তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, তবুও খেতে বসে সারাক্ষণ দিবাস্বপ্নে মশগুল থাকতে পারি, কল্পনা করি, গ্নেক্কের যে একটা ঠগ্ তা সবাই জেনে ফেলেছে, আমার স্ত্রী ও লিজা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে আর আমি ওদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করছি।

যে-সব ঘটনা ঘটে বলে আগে লোকের মুখে শুনতাম তা এখন নিজের চোখের ওপরে দেখতে পাচ্ছি। এসব ঘটনা আমার কাছে যদিও খুব যন্ত্রণার ব্যাপার কিন্তু তবুও একটি ঘটনার কথা বলব। ঘটনাটি ঘটেছিল কয়েক দিন আগে খাওয়াদাওয়ার পরে।

সেদিন আমার ঘরে বসে আছি, বসে বসে পাইপ টানছি, এমন সময়ে রোজকার মতো আমার স্ত্রী এসে ঢোকে আমার ঘরে, আমার সামনে বসে, তারপর বলে যে গরম থাকতে থাকতেই এবং আমার ছুটি ফুরিয়ে যাবার আগেই আমি যদি খারকভ যাই তাহলে খুবই ভালো হয়, আর খারকভে গিয়ে আমাকে খোঁজ নিতে হবে আমাদের এই গ্নেক্কের লোকটি সত্যি সত্যিই কী দরের লোক।

'বেশ, ঠিক আছে, যাব।' রাজী হয়ে যাই।

শুনে আমার স্ত্রী খুবই খুশি হয়, তারপর ঘরের বাইরে যেতে যেতে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে বলে:

'হ্যাঁ, আর একটা কথা, আমি জানি কথাটা শুনলেই তোমার মেজাজ খারাপ হবে। কিন্তু তবুও বলব। তোমাকে সাবধান করাটা আমার কর্তব্য... নিকলাই স্তেপানিচ, আমার দোষ নিও না, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে কাতিয়ার কাছে তোমার ঘন ঘন যাতায়াতটা পাড়াপড়শী বন্ধুবান্ধব সবার চোখে পড়তে শুরু করেছে। কাতিয়া বুদ্ধিমতী, অনেক লেখাপড়া শিখেছে, সঙ্গিনী

হিসেবেও চমৎকার — সবই ঠিক। কিন্তু তোমার যা বয়েস এবং সমাজে তোমার যা প্রতিষ্ঠা তাতে তুমি যদি এখন সঙ্গসুখ পাবার জন্যে ওর কাছে গিয়ে বসে থাক, সেটা খুব ভালো দেখায় না... তাছাড়া, ওর কাণ্ডকারখানা কে না জানে!'

আমার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন হৃৎপিণ্ডে গিয়ে জড়ো হয়, দু-চোখ দিয়ে আগুন ঝরতে থাকে, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াই, তারপর মেঝের ওপরে পা দাপাতে দাপাতে রগ দুটো চেপে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠি:

'সরে যাও! সরে যাও আমার সামনে থেকে! একা থাকতে দাও আমাকে!'

আমার মুখের চেহারা নিশ্চয়ই খুব ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল, গলার স্বর নিশ্চয়ই হয়ে উঠেছিল, খুব অস্বাভাবিক, কারণ সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রী ফ্যাকাশে হয়ে যায়, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সেও তারস্বরে আর্ত চিৎকার করে ওঠে। আমাদের চিৎকার শুনে ছুটে এসে হাজির হয় লিজা ও গ্নেক্কের, পেছনে পেছনে ইয়েগর ...

আমি আবার বলি, 'সরে যাও! সরে যাও আমার সামনে থেকে! একা থাকতে দাও আমাকে!'

আমার পা দুটো একেবারে অবশ হয়ে যায়, মনে হতে থাকে পা দুটোর কোনো অস্তিত্বই নেই, আমি পড়ে যাচ্ছি। বুঝতে পারি কে যেন আমাকে ধরে ফেলে, অস্পষ্টভাবে শুনি কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তারপরে মূর্ছা যাই, দু-তিন ঘণ্টার আগে জ্ঞান হয় না।

কাতিয়ার কথায় ফিরে আসা যাক। রোজ ঠিক সন্ধ্যে হবার আগে ও আসে আমার কাছে। কাজেই এ-ব্যাপারটা বন্ধুবান্ধব পাড়াপড়শীদের চোখে না পড়ে পারে না। ও আসে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে, আমাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। নিজের ঘোড়া আছে ওর, আর এই গ্রীষ্মে একটা নতুন 'বারুশ' গাড়ি কিনেছে। সব মিলিয়ে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই আছে ও। মস্ত বাগানওলা এক ব্যয়বহুল গ্রীষ্মাবাস ভাড়া নিয়েছে শহরের বাইরে। সমস্ত আসবাবপত্র সরিয়ে নিয়ে এসেছে পুরনো বাড়ি থেকে। দুজন ঝি ও একজন সহিস রেখেছে। আমি প্রায়ই ওকে জিজ্ঞেস করি, 'বাপের রেখে যাওয়া টাকা খরচ হয়ে যাবার পরে তুমি কী করবে, কাতিয়া?'

'সে দেখা যাবে,' কাতিয়া জবাব দেয়।

'আরেকটু বুঝেশুনে তোমার টাকা খরচ করা উচিত। তোমার বাবার কত কষ্টের জমানো টাকা!'

'তা জানি। একথা তুমি আমাকে আগেও বলেছ।'

আমাদের গাড়ি প্রথমে চলে খোলা মাঠের ওপর দিয়ে, তারপর পাইনবনের ভেতর দিয়ে, যে পাইনবনকে আমি আমার ঘরের জানলা দিয়ে দেখতে পাই। প্রকৃতির সৌন্দর্য এখনো আমাকে মুগ্ধ করে, যদিও কে যেন আমার কানে কানে বলে যায় যে এই পাইন ও ফার-গাছ, এই পাখি আর আকাশের এই সাদা মেঘ — সবই এমনি থাকবে, কিন্তু মাস তিনেকের মধ্যে যখন মরে যাব তখন আমার কথা কেউ মনে রাখবে না। ঘোড়ার লাগাম ধরতে কাতিয়া ভালোবাসে। আবহাওয়াটা ভালো, আর আমি ওর পাশটিতে বসে আছি—সব মিলিয়ে ও খুশি হয়ে ওঠে। মনে মনে ওর খুবই আনন্দ হয়, কথার মধ্যে কোনো রকম তিক্ততা থাকে না।

ও বলে, 'নিকলাই স্তেপানিচ, লোক হিসেবে তুমি খুবই ভালো। তোমার মতো লোক সচরাচর দেখা যায় না। কোনো অভিনেতার সাধ্য নেই তোমাকে অভিনয়ের মধ্যে মূর্ত করে তোলে। আমাকে বা মিখাইল ফিওদরভিচকে যে-কোনো নিচু দরের অভিনেতাও মূর্ত করে তুলতে পারে। কিন্তু তোমাকে মূর্ত করতে কেউ পারবে না। তোমাকে আমার হিংসে হয়, ভয়ানক হিংসে হয়। কিন্তু নিজেকে আমি কী মনে করি? আমি কে?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবে, তারপর আবার জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, নিকলাই স্তেপানিচ, আমি অবাঞ্ছিত ধরনের মানুষ — তাই না?'

'তাই বটে।'

'তাহলে... তাহলে কী করি বলো তো?'

কী জবাব দেব ওকে? আমি বলতে পারি, 'কাজ করো' বা 'তোমার যা কিছু আছে গরীবদের দিয়ে দাও' বা 'নিজেকে জানো'। এসব কথা বলা খুবই সহজ, আর সহজ বলেই জবাবে আমি ওকে একটিও কথা বলতে পারি না।

আমার চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ সহকর্মীরা ছাত্রদের বলে যে চিকিৎসা করার সময় প্রথমে 'প্রত্যেকটি রোগীকে আলাদা করে নেবে'। এই উপদেশ মেনে নিয়ে স্বতন্ত্র করবার চেষ্টা করলেই টের পাওয়া যায়, চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ মান হিসেবে পাঠ্যপুস্তকে যে সব প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে তা কী অকিঞ্চিৎকর।

তেমনি শরীরের অসুখ না হয়ে যদি মনের অসুখ হয় তাহলে ব্যাপারটা একই রকম দাঁড়ায়।

যাই হোক, কাতিয়াকে কিছু বলা দরকার। সুতরাং আমি বলি:

'তোমার ব্যাপারটা কী জান? তোমার হাতে এখন অঢেল সময়। তোমাকে যা হোক কিছু একটা করতে হবে। আচ্ছা, তুমি আবার মঞ্চেই ফিরে যেতে পারো তো? অভিনয় করাটাই তো তোমার বৃত্তি।'

'না, ফিরে যেতে পারি না।'

'এমনভাবে কথা বলছ যেন সর্বস্ব দান করে বসে আছ, নয় কি? এভাবে কথা বললে আমার ভালো লাগে না। আসলে দোষ তোমার নিজের। কিন্তু মনে আছে তো, গোড়ার দিকে তুমি শুধু মানুষ আর সমাজের খুঁত খুঁজে বেড়াতে। মানুষ আর সমাজকে নিখুঁত করে তোলার জন্যে তুমি কিছুই করোনি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারনি তুমি। নিজেকে ক্লান্ত করে তুলেছ শুধু। তোমার হার হয়েছে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে নয়, তোমার নিজের ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার কাছে। কিন্তু তখন তোমার বয়েস কম ছিল, অভিজ্ঞতাও ছিল না। কিন্তু এখন হয়তো ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়াবে। আরেকবার চেষ্টা করে দ্যাখ দিকি — আবার তুমি কাজ করবে, আবার তুমি শিল্পের গৌরবময় উদ্দেশ্যে নিজেকে নিয়োজিত করবে ...'

আমাকে বাধা দিয়ে কাতিয়া বলে, 'নিকলাই স্তেপানিচ, ভণ্ডামি কোরো না! চিরকালের জন্য একটা পাকাপাকি সিদ্ধান্ত করে নেওয়া যাক: আমরা কথা বলব অভিনেতা-অভিনেত্রী আর লেখকদের সম্পর্কে। কিন্তু শিল্পকে রেহাই দাও। মানুষ হিসেবে তুমি চমৎকার, তোমার মতো লোক সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু শিল্প সম্পর্কে তোমার এমন কিছু জ্ঞান নেই যাতে স্থির বিশ্বাস নিয়ে তাকে তুমি পবিত্র বলতে পারো। আসলে শিল্পের সমঝদার তুমি নও, শিল্পবোধ তোমার নেই। সারা জীবন তোমার নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলে, কাজেই শিল্পের সমঝদার হবার মতো অবসর তোমার হয়নি। আর তাই পুরোপুরি ভাবেই ... দূর, শিল্প নিয়ে এসব কথা আমার ভালো লাগে না!..' ওর গলার স্বরে আক্রোশ ফেটে পড়ে, 'গা জ্বালা করে আমার! এমনিতেই সবাই শিল্পকে যথেষ্ট খেলো করেছে, সব দিক থেকেই!'

'শিল্পকে কে খেলো করেছে?'

'কেউ কেউ খেলো করেছে একটানা মদ খেয়ে, কাগজওয়ালারা খেলো করেছে ছ্যাবলামি করে, পণ্ডিতরা খেলো করেছে দার্শনিকতা করে।'

'দর্শনের সঙ্গে এ ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক নেই।'

'আছে বৈকি। কোনো লোক যখন দার্শনিকতা করতে শুরু করে তখন বোঝা যায় যে সে কিছুই জানে না।'

কথাবার্তা ক্রমেই কটু মন্তব্যের দিকে যাচ্ছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলাতে চেষ্টা করি, তারপর বহুক্ষণ কোনো কথাই বলি না। বন থেকে বেরিয়ে গাড়ি কাতিয়ার বাড়ির দিকে চলতে শুরু করলে আমি আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে আসি এবং বলি:

কিন্তু কেন তুমি মঞ্চে ফিরে যেতে চাও না সে-কথা তো আমাকে বললে না?'

'নিকলাই স্তেপানিচ, মানুষের সহ্যক্ষমতারও একটা সীমা আছে!' চিৎকার করে বলে ও, আর হঠাৎ ওর সারা মুখ লাল হয়ে ওঠে, 'তুমি কি চাও, যা সত্যি তাকে আমি প্রকাশ করে বলি? বেশ তাই হোক, তাই তো তুমি চাও। কথাটা কী জান, আমার প্রতিভা নেই! কোনো প্রতিভাই নেই ... আছে শুধু দেমাক, শুনলে তো!'

এই স্বীকারোক্তি করার পরে ও আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ওর হাতের কাঁপুনিকে চাপা দেবার জন্যে প্রচণ্ড জোরে লাগাম আঁকড়ে ধরে।

কাতিয়ার গ্রীষ্মাবাসের কাছাকাছি যখন গাড়ি এসে পেঁছয় তখন দূর থেকেই আমরা দেখতে পাই, মিখাইল ফিওদরভিচ সদরের সামনে পায়চারি করছে। অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।

বিরক্তিভরা স্বরে কাতিয়া বলে, 'আবার সেই মিখাইল ফিওদরভিচ! ওকে যে করে হোক আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। ও সামনে থাকলেই আমি হাঁপিয়ে উঠি। ওর মধ্যে পদার্থ বলে কিছু নেই, একেবারে একটা শুকনো কাঠি। দেখে দেখে আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে!'

মিখাইল ফিওদরভিচের বহু আগেই বিদেশে যাবার কথা। কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ যাত্রার দিন পিছিয়ে দিচ্ছে। সম্প্রতি ওর মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে লক্ষ্য করা যায়। মুখটা ঝুলে পড়েছে, আর আগে যা কোনো দিন ওর মধ্যে দেখা যায়নি আজকাল তাই হয় — মদ খেয়ে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারে না। চোখের কালো ভুরুতে পাক ধরেছে। সদরের সামনে গাড়িটা

এসে যখন থামে তখন ও আর নিজের আনন্দ ও অস্থিরতা চেপে রাখতে পারে না। কাতিয়াকে ও আমাকে হাত ধরে গাড়ি থেকে নামাতে গিয়ে একটা হৈচৈ কাণ্ড বাধিয়ে বসে, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, হাসে আর হাত কচ্‌লায়। আগে দেখতাম, শুধু ওর চোখের দৃষ্টিতে নম্র বিনীত ও নিরীহ একটি ভাব, এখন তা ছড়িয়ে পড়েছে ওর সর্ব অবয়বে। ওর খুবই আনন্দ হয়, সঙ্গে সঙ্গে নিজের আনন্দের জন্যে লজ্জা পায়, লজ্জা পায় প্রতি সন্ধ্যায় কাতিয়ার সঙ্গে দেখা করতে আসাটা ওর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে বলে, মনে মনে ভাবে, এভাবে ওর দেখা করতে আসার কৈফিয়ৎ হিসেবে কিছু একটা বলা দরকার, আর যা-ই বলুক না কেন তা যে কত উদ্‌ভট তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না। যেমন ও বলে, ‘একটা দরকারী কাজে এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম, মনে হল কয়েক মিনিটের জন্যে একটু দেখা করে যাই।’

আমরা তিনজনেই বাড়ির মধ্যে ঢুকি। প্রথমে আমরা চা খাই, তারপর এতদিন ধরে যে-সব জিনিসের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এসেছি সেগুলো একে একে টেবিলের ওপরে হাজির হতে থাকে। জিনিসগুলো হচ্ছে—দু-প্যাকেট তাস, মস্ত একদলা পনীর, ফল আর ক্রিমিয়ার শ্যাম্পেনের বোতল। আমরা যে-সব বিষয়ে কথাবার্তা বলি সেগুলোও নতুন নয়। শীতকালে যা আলোচনা করেছি এখনো তাই। বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যার্থী, সাহিত্য, মঞ্চ — সব কিছুকেই একে একে নস্যাৎ করে ফেলা হয়। কুৎসাপূর্ণ গালগল্পে আবহাওয়া ঘোলাটে ও বদ্ধ হয়ে ওঠে। শুধু তফাৎ এই যে, গত শীতে ছিল দুটো বুনো ব্যাঙ, এবারে তিনটে, আর তাদের নিশ্বাসে বাতাস বিষিয়ে উঠছে। আজকাল যে পরিচারিকা আমাদের পরিবেশন করতে আসে সে আগেকার মতোই যেমন শোনে মখমলের মতো নরম আর গভীর হাসি, একর্ডিয়ন বাজনার মতো দমকা হাসি, তেমনি শোনে মঞ্চের কমিক জেনারেলদের মতো ভাঙা ভাঙা স্বরের বিশ্রী হাসি।

৫

মাঝে মাঝে এক-একটি রাত্রি আসে যা বজ্র বিদ্যুতে আর অজস্র বৃষ্টিপাতে ভয়ংকর। রুশদেশের গ্রামের লোকেরা বলে, ‘চড়ুইপাখিদের রাত’। এমনি একটি রাত্রি একবার আমার জীবনে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

মধ্যরাত্রি পার হতেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার। লাফিয়ে নেমে এসেছিলাম বিছানা থেকে। কী করে জানি আমার মাথার মধ্যে এমনি একটা ধারণা এসে গিয়েছিল যে সেই মুহূর্তেই আমার মৃত্যু হবে। কেন এই ধারণা এসেছিল? আমার শরীরের মধ্যে এমন কোনো অনুভূতি ছিল না যা থেকে মনে হতে পারত, আমার মৃত্যু আসন্ন। শুধু ছিল একটা আতঙ্ক — যেন ঠিক সেই মুহূর্তেই আকাশের গায়ে মস্ত একটা অশুভ ঝলক চোখে পড়েছে আমার।

তাড়াতাড়ি বাতি জ্বালিয়ে নিলাম। টেবিলের ওপর থেকে জলের বোতল তুলে নিয়ে জল খেলাম খানিকটা, তারপর ছুটে গেলাম খোলা জানলার দিকে। ভারি সুন্দর রাত, বাতাসে নতুন-কাটা খড়ের সুবাস আর কিসের যেন মিষ্টি গন্ধ। খুঁটি দেওয়া বেড়ার ওপরের দিকটা দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি জানলার ধারে গজিয়ে-ওঠা রুগ্ন গাছগুলোর ঝিমধরা চূড়ো, পথ, বনের গাঢ় রেখা। নির্মেঘ আকাশ, প্রশান্ত উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে চাঁদ জ্বলছে। গাছের পাতায় এতটুকু কম্পন নেই। মনে হতে লাগল, সবকিছু যেন উৎকর্ণ হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, প্রতীক্ষা করছে আমার মৃত্যুর মুহূর্তটির জন্যে ...

চারদিকে ভীষণ এক অশুভ ইঙ্গিত। জানলা বন্ধ করে আবার ছুটে এলাম বিছানায়। চেষ্টা করলাম নিজের নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করতে। কব্জিতে নাড়ীর স্পন্দন না পেয়ে রগের চারদিকে হাতড়াতে লাগলাম, সেখানেও না পেয়ে চিবুকের নিচে, আবার কব্জিতে। সারা শরীর ঘামে ঠাণ্ডা চটচটে হয়ে গেছে। আমার নিশ্বাস ক্রমেই দ্রুততর হয়ে উঠল। সারা শরীরটা কাঁপছে। শরীরের ভেতরে সবকিছু চঞ্চল হয়ে উঠে মনে হতে লাগল, আমার মুখ এবং মাথার টাক-পড়া অংশটুকু মাকড়সার জালে ছেয়ে গেছে।

কী করতে পারি আমি? বাড়ির লোকজনকে ডাকব? না, কক্ষনো না। আমার স্ত্রী বা লিজা যদি আসেও তো কতটুকু তারা করতে পারে আমার জন্যে?

চোখ ঢেকে বালিশের তলায় মাথা লুকিয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম ... পিঠটা হিম হয়ে গেছে, আমার শিরদাঁড়াকে ভেতর থেকে চুষছে কে যেন। মনে হতে লাগল, অনিবার্য মৃত্যু যেন গুঁড়ি মেরে মেরে এগিয়ে আসছে আমার পেছন থেকে ...

হঠাৎ রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে একটা শব্দ উঠল। কী-ভী, কী-ভী! বুঝতে পারলাম না কোথা থেকে এই শব্দ আসছে, আমার বুকের ভেতর থেকে না বাইরে থেকে।

'কী-ভী, কী-ভী!'

ঈশ্বর, এ কী ভয়ঙ্কর অবস্থা! আরেক ঢোক জল খেতে ইচ্ছে করছে কিন্তু চোখ খুলতে বা বালিশ থেকে মাথা তুলতে ভয় পাচ্ছি আমি। যেন একটা বোবা জান্তব যন্ত্রণা গ্রাস করেছে আমাকে, বুঝতে পারছি না কেন এই ভয়। আরো বেঁচে থাকতে চাই — এজন্যে? নাকি একটা নতুন অজানা যন্ত্রণা অপেক্ষা করছে আমার জন্যে?

ওপরতলার ঘরে কে যেন গোঙাচ্ছে, কিংবা হয়তো হাসছে ... আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। একটু পরেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কে যেন দ্রুত পায়ে নেমে আসছে। আবার তর তর করে ওপরে উঠে গেল। আবার শোনা গেল নেমে আসার শব্দ। কে যেন আমার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আর কান পেতে শুনছে।

'কে? কে?' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

দরজা খুলে গেল। সাহসে ভর করে চোখ খুলে ফেললাম। আমার স্ত্রী। ওর মুখটা ফ্যাকাশে, কান্নায় চোখ লাল।

'তুমি কি জেগে আছ?' ও জিজ্ঞেস করল।

'কেন, কী হয়েছে?'

'দোহাই তোমার। একবারটি এসে লিজাকে দেখে যাও। ওর বড়ো ভয়ানক অবস্থা ...'

'এক্ষুনি যাচ্ছি।' বিড়বিড় করে বললাম। আর একা থাকতে হবে না, এইটুকু ভেবেই খুশি: 'একটু দাঁড়াও ... এই এলাম বলে।'

আমার স্ত্রীর পেছনে পেছনে আমি চললাম, স্ত্রী আমাকে উদ্দেশ করে কথা বলছে আর আমি শুনছি। কিন্তু এত উত্তেজিত হয়ে রয়েছি যে ওর কথাগুলো বুঝতে পারছি না। ওর হাতে মোমবাতি, মোমবাতির আলো সিঁড়ির ওপরে নাচানাচি করছে। লম্বা ছায়া পড়েছে আমাদের দুজনের, ছায়াদুটো কাঁপছে। ড্রেসিং গাউনের ঝুলঅংশে পা আটকে গিয়ে আমি প্রায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম আর কি। মনে হচ্ছে, কে যেন পেছন থেকে তাড়া

করেছে আমাকে, কে যেন পেছন থেকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। মনে মনে বললাম, 'এই মুহূর্তেই, এই সিঁড়ির ওপরেই মৃত্যু হবে আমার ... আর দেরি নেই ...' কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিঁড়িটা শেষ হল। তারপরে অন্ধকার বারান্দা, বারান্দার শেষে ইতালীয় ধরনের একটা চওড়া জানলা। বারান্দা দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম লিজার শোবার ঘরের দিকে। বিছানার ধারে জুতো খুলে পা ঝুলিয়ে লিজা বসে আছে, পরনে একটা শেমিজ ছাড়া আর কিচ্ছু নেই, কাঁদছে।

মোমবাতির দিকে চোখ পিটপিট করতে করতে লিজা বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'হা ভগবান, আর পারি না আমি, আর পারি না ...'

আমি বললাম, 'লিজা, সোনা, কী হয়েছে তোমার?'

আমাকে দেখে লিজা চিৎকার করে উঠল, তারপর জড়িয়ে ধরল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'বাবা গো ... বাবা আমার ...লক্ষ্মী সোনা বাবা ... কি জানি কী হল আমার ... কিচ্ছু ভালো লাগছে না আমার ...'

দু হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমাকে চুমু খেল ও। ছোট বয়সে ওর মুখ থেকে যে সব আদরের কথা শুনতাম, সেইসব আদরের কথা বলতে লাগল আমাকে।

বললাম, 'শান্ত হও! ভগবান আছেন! কেঁদো না! আমারও কষ্ট হচ্ছে।'

ওকে আড়াল দিয়ে রাখতে চেষ্টা করলাম। আমার স্ত্রী কী যেন পান করতে দিল ওকে। বিছানার চারদিকে এলোপাথারি ঘুরে বেড়ালাম দুজনে। আমার কাঁধের সঙ্গে ওর কাঁধের ঘষা লাগতে লাগল। মনে পড়ল সেইসব দিনের কথা যখন আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে স্নান করিয়ে দিতাম।

'মেয়েটাকে সাহায্য করো। কিছু একটা করো, কিছু একটা করো!' আমার স্ত্রী কাকুতি মিনতি করতে লাগল।

কিন্তু আমি কী করতে পারি? কিছু করার নেই আমার। মেয়েটার মনের ওপরে একটা কিছু ভার চেপে আছে। কিন্তু সে-সম্বন্ধে আমার কোনোই ধারণা নেই, আমি কিছুই জানি না। আর কিছু করতে না পেরে বিড়বিড় করে শুধু বলতে লাগলাম, 'কেঁদো না, কেঁদো না ... সব ঠিক হয়ে যাবে ... এবার একটু ঘুমোও ...'

বাইরে কোথা থেকে একটা কুকুর তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল। কুকুরটা

প্রথমে ডাকছিল নরম সুরে এবং থেমে থেমে, তারপরে গলা চড়িয়ে। গলার স্বর প্রথমে ছিল ধারালো সরু, তারপরে হয়ে উঠল গমগমে মোটা। কুকুরের ডাক বা পেঁচার চিৎকার বা এ ধরনের কিছুতে যে অশুভ কোনো ইঙ্গিত থাকতে পারে তা আগে কোনো দিন মনে হয়নি। কিন্তু এবারে আমার বুকের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা মোচড় দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে, কুকুরের ডাকের কারণটা নিজেই নিজের কাছে ব্যাখ্যা করতে লাগলাম।

নিজেকে বললাম, 'দূর! দূর! এ হচ্ছে একজনের ওপরে আরেকজনের প্রভাব, তা ছাড়া আর কিচ্ছু নয়। আমার মধ্যে ভয়ানক একটা স্নায়বিক উত্তেজনা ছিল — সেটাই সংক্রামিত হয়েছে আমার স্ত্রীর মধ্যে, লিজার মধ্যে, কুকুরটার মধ্যে। এই হচ্ছে আসল কথা ... এ-ধরনের সংক্রমণের মধ্যেই অমঙ্গলাশঙ্কা, স্বপ্ন, ইত্যাদির আসল ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ...'

অল্প কিছুক্ষণ পরে লিজার জন্য একটা প্রেসক্রিপশন লিখতে আমি যখন নিজের ঘরে ফিরে আসি তখন আর নিজের আকস্মিক মৃত্যুর কথা ভাবছিলাম না। এত মুষড়ে পড়েছি, এত বেশি বিশ্রী লাগছে যে এই মুহূর্তে মরে যেতে পারলেই ভালো হোতো। ঘরের ঠিক মাঝখানটিতে অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম, লিজাকে কী ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ওপরের ঘর থেকে গোঙানি আর শোনা যাচ্ছে না। তখন ঠিক করলাম যে লিজাকে আর কোনো ওষুধ দেবার দরকার নেই। তারপরেও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম ...

ঘরের মধ্যে মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধতা। কোনো কোনো লেখকের ভাষায় — এমন নিস্তব্ধতা যে কান ঝাঁ ঝাঁ করে। ধীরে ধীরে সময় পার হয়ে চলল। জানলার শার্সির ওপরে চাঁদের আলোর টুকরোটাকে দেখে মনে হয়, ওটার আর কোনো নড়চড় নেই ... ভোর হতে এখনো অনেক দেরি।

হঠাৎ সদর থেকে গেট খোলার কিঁচ কিঁচ শব্দ শোনা গেল। কে যেন পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে। মরা একটা গাছ থেকে একটা ডাল ভেঙে নিল লোকটি, তারপর খুব সাবধানে সেই ডাল দিয়ে জানলার শার্সিতে টোকা দিতে লাগল।

শুনলাম চাপা স্বরে কে যেন ডাকছে, 'নিকলাই স্তেপানিচ! নিকলাই স্তেপানিচ!'

জানলাটা খুলে তাকিয়ে মনে হল, স্বপ্ন দেখছি। জানলার ঠিক নিচেই দেওয়ালের সঙ্গে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি স্ত্রীলোক। তার পরনের কালো পোশাক চাঁদের আলোয় চক্‌চক করছে। বড়ো বড়ো চোখ মেলে তাকিয়ে আছে সে আমার দিকে। চাঁদের আলোয় তার মুখটাকে দেখাচ্ছে ফ্যাকাশে, থমথমে আর অবাস্তব — যেন পাথর কুঁদে তৈরি, আর চিবুকটা কাঁপছে থরথর করে।

সে বলল, 'আমি ... আমি কাতিয়া।'

চাঁদের আলোয় সব মেয়েরই চোখকে বড়ো বড়ো আর কালো কালো দেখায়, সব লোকেই হয়ে ওঠে আরো লম্বা এবং আরো ফ্যাকাশে। বোধ হয় এজন্যেই আমি ওকে প্রথমে চিনতে পারিনি।

'ব্যাপার কী?'

ও বলল, 'আমার ওপরে রাগ কোরো না। হঠাৎ কেন জানি ভারি বিশ্রী লাগছিল। অসহ্য মনে হওয়াতে গাড়িতে চেপে এখানে চলে এসেছি... দেখলাম তোমার ঘরে আলো জ্বলছে। ভাবলাম, ডেকেই দেখা যাক না ... কিছু মনে কোরো না ... আমার যে কী খারাপ লাগছিল তা যদি জানতে! আচ্ছা, তুমি এখন কী করছিলে?'

'কিচ্ছু না... ঘুম আসছিল না ...'

'আমার কেমন জানি মনে হচ্ছিল, কিছু একটা অমঙ্গলের ব্যাপার ঘটবে। অবিশ্যি এসব ভাবনার কোনো অর্থ হয় না।'

ভুরু উঁচিয়ে ও তাকিয়ে রইল। চোখদুটো জলে চকচক করছে। উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে সারা মুখ, যেন উজ্জ্বল কোনো আলো পড়েছে মুখে। সব মিলিয়ে সেই পুরনো দিনের মতো একটা অন্ধবিশ্বাসের ছাপ ওর মুখে। এমনটি আমি বহুদিন দেখিনি।

'নিকলাই স্তেপানিচ,' আমার দিকে দু হাত বাড়িয়ে ও মিনতি করতে লাগল, 'তোমার দুটি পায়ে পড়ি, যদি তুমি আমাকে সত্যিকারের আপনজন বলে ভাবো ও সম্মান করো তাহলে আমার একটি কথা রাখতে হবে...'

'কী কথা?'

'আমার যা টাকা আছে সব তুমি নিয়ে নাও!'

'এসব কী পাগলামি ঢুকেছে তোমার মাথায়? তোমার টাকা নিয়ে আমি কী করব?'

'টাকাটা নিয়ে তুমি এখান থেকে চলে যাও। চিকিৎসা করাও নিজের। তোমার চিকিৎসা দরকার। নেবে তো? নেবে তো টাকাটা? নাও না!'

আগ্রহভরা চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার ও বলল, 'নেবে তো? একবার বলো নেবে।'

বললাম, 'না, আমি নেব না। তুমি আমাকে টাকা দিতে চাইছ এতেই খুশি।'

আমার দিকে পেছন ফিরে মাথা নিচু করে ও দাঁড়িয়ে রইল। হয়ত টাকাটা নিতে অস্বীকার করে এমন স্বরে কথা বলেছি যে তারপরে আর টাকার প্রসঙ্গ তোলার প্রশ্নই ওঠে না।

বললাম, 'বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ো। কাল দেখা হবে।'

ক্লিষ্টস্বরে ও বলল, 'তাহলে তুমি আমাকে আপনজন বলে মনে করো না!'

'আমি তো তা বলিনি। কিন্তু এখন তোমার টাকায় আমার কোনো লাভ নেই।'

'ঠিক আছে, মাপ করো আমাকে,' গলার স্বর একেবারে নিচু পর্দায় নামিয়ে ও বলল, 'আমি বুঝতে পারছি ... আমার কাছ থেকে তুমি টাকা নেবে কেন? এককালে আমি অভিনেত্রী ছিলাম, এই তো আমার পরিচয় ... আচ্ছা, চলি।'

এই বলে এত তাড়াতাড়ি ও চলে গেল যে বিদায় জানাবার অবসরটুকুও পেলাম না।

৬

আমি খারকভে এসেছি।

আমার মনের বর্তমান অবস্থায় কিছু করার চেষ্টা করা বা লড়াই করতে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। তেমন ক্ষমতাও আমার নেই। ঠিক করলাম এই পৃথিবীতে জীবনের শেষ কটা দিন এমনভাবে চলব যেন কারও কিছু বলার না থাকে, অন্তত বাইরের চালচলনের দিক থেকে। ভালো করেই জানি, বাড়ির

লোকজনের কাছে যেমনটি হওয়া উচিত ছিল তা হতে পারিনি। তাই অন্তত ওরা যা চায় তাই করব। যদি খারকভে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে খারকভেই যাব। তাছাড়া, হালে সবতাতেই এমন নির্লিপ্ত হয়ে উঠেছি যে কোথাও যাওয়া-আসার ব্যাপারে আমার কিছু যায় আসে না, তা সে খারকভেই হোক বা প্যারিসেই হোক বা বের্দিচেভেই হোক।

দুপুর নাগাদ এসে পৌঁছেছি। উঠেছি গির্জার কাছাকাছি একটা হোটেলে। যতোক্ষণ চলন্ত ট্রেনে ছিলাম ততোক্ষণ অসুস্থ মনে হচ্ছিল নিজেকে। কামরার মধ্যে বাতাস বইছিল এলোমেলো। এখন আমি বসে আছি বিছানার ধারটিতে, আঙুল দিয়ে কপালের রগ টিপে ধরেছি। অপেক্ষা করছি কখন মুখের মাংসপেশীর মধ্যে দপ্‌দপানি শুরু হবে। আমার উচিত এক্ষুনি বেরিয়ে পড়া, এখানকার পরিচিত অধ্যাপকদের সঙ্গে দেখা করা। কিন্তু সে ইচ্ছা আমার নেই, সে সামর্থ্যও নেই।

বুড়ো ওয়েটার খোঁজ নিতে আসে আমি সঙ্গে বিছানার চাদর এনেছি কিনা। ওকে মিনিট পাঁচেক আটকে রাখি, এবং যেজন্যে আমি এখানে এসেছি, অর্থাৎ গ্নেক্কের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করি। ভাগ্যক্রমে লোকটি এই খারকভ শহরেরই বাসিন্দা, শহরের নাড়িনক্ষত্র তার জানা। কিন্তু এ শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে গ্নেক্কের নামে কেউ আছে বলে তার স্মরণে আসে না। আশেপাশের জমিদারি সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়েও তার কাছ থেকে সেই একই জবাব পাওয়া গেল।

বারান্দার ঘড়িতে একটা বাজে, তারপর দুটো, তিনটে ... বসে বসে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে জীবনের এই যে শেষ কটি মাস কাটছে এই সময়টুকু কী দীর্ঘ! আমার এতদিনকার মোট জীবনের চেয়েও দীর্ঘ বলে মনে হয়। আগে কখনো সময়ের মন্থর গতি এমন ধৈর্য ধরে সহ্য করিনি। আগে স্টেশনে এসে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করতে হলে বা পরীক্ষার সময় বসে থাকতে হলে পনেরো মিনিট সময়কেও মনে হত যেন অনন্তকাল। আর এখন এই বিছানার ধারটিতে সারা রাত আমি নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে পারি এবং এমনি ঔদাস্যের সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারি যে আগামী কাল বা তার পরের দিনেও রাত্রি হবে এমনি দীর্ঘ ও ঘটনাশূন্য ...

বারান্দার ঘড়িতে পাঁচটা বাজে ... ছ'টা ... সাতটা ... রাত্রি আসছে।

গালে একটা ভোঁতা যন্ত্রণা হচ্ছে। এবার সেই দপ্‌দপানি শুরু হবে। যা হোক কিছু একটা চিন্তা করবার জন্যে পুরনো দিনের চিন্তাধারায় ফিরে গেলাম — জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে উঠবার আগে যে সব চিন্তা আমি করতাম। নিজেকেই প্রশ্ন করি: আমি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি এবং প্রিভি কাউন্সিলর, আমি কেন হোটেলের এই ছোট্ট কামরায় এমন একটা অদ্ভুত ছাইরঙা কম্বল মুড়ি দিয়ে বিছানার ধারটিতে পা ঝুলিয়ে বসে আছি? কেন তাকিয়ে আছি শস্তা লোহার ওয়াশ-স্ট্যাণ্ডটার দিকে? কেন কান পেতে শুনছি বারান্দার ঘড়ির টিক টিক শব্দ? আমার মতো বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে এই কি উপযুক্ত কাজ? এসব প্রশ্নের জবাবে মুখটা বিদ্রূপে কুঁচকে যায়। মনে পড়ে, অল্প বয়সে কী অকপট সারল্যেই না বিশ্বাস করতাম যে বিখ্যাত হতে পারার মতো বড়ো কাজ আর নেই, বিখ্যাত ব্যক্তিদের কী অসামান্য প্রতিষ্ঠা! আমি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। সবাই আমাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। 'নিভা' ও বিশ্ব-সচিত্র' পত্রিকায় আমার ফটো ছাপা হয়েছে। একটি জার্মান পত্রিকায় সত্যি সত্যিই নিজের জীবনী নিজে পাঠ করেছি। কিন্তু এতসব কাণ্ডের ফল কী হয়েছে। এই তো আমি এক অদ্ভুত শহরে এক অদ্ভুত বিছানার ওপরে একা একা বসে আছি, আমার গালের মাংসপেশীতে যন্ত্রণা হচ্ছে আর বসে বসে হাতের তালু দিয়ে গাল ঘষছি... পারিবারিক বিপর্যয়, পাওনাদারদের নির্মমতা, রেলওয়ে কর্মচারীদের নির্দয় ব্যবহার, পাসপোর্ট ব্যবস্থার অসুবিধে, স্টেশনের খাবার-ঘরে চড়া দাম ও অস্বাস্থ্যকর খাবার, চারদিকের অজ্ঞতা ও রূঢ়তা, এবং আরো অনেক কিছু যা বলতে গেলে মস্ত লম্বা একটি ফিরিস্তি দিতে হয় — এসব ব্যাপারে আমি যতোখানি নাড়া খাই তেমনি নাড়া খায় নিতান্ত মামুলি একজন লোক যাকে পাড়ার বাইরে কেউ চেনে না। তাহলে আমি যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তার বিশেষত্বটুকু কোথায়? মনে করা যাক, পৃথিবীতে আমার মতো বিখ্যাত আর কেউ নেই, আমি এমন সব বীরত্বপূর্ণ কাজ করেছি যা নিয়ে আমার দেশ গর্ব করতে পারে, সমস্ত খবরের কাগজে আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে বুলেটিন প্রকাশিত হয়, প্রত্যেকটি ডাকে আমার কাছে আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে, ছাত্রদের কাছ থেকে, ও সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে সহানুভূতিসূচক চিঠি আসে। তবুও এতসব কাণ্ডের পরেও আমার মৃত্যু হতে পারে অপরিচিত পরিবেশে বিষণ্ণতার মধ্যে ও

সম্পূর্ণ নির্বান্ধব অবস্থায়, কেউ তা ঠেকাতে পারবে না ... একথা ঠিক যে এজন্যে কারুর ওপরে দোষ চাপানো চলবে না। আমার নিতান্তই পাপ মন, তাই জনপ্রিয়তা পছন্দ নয়। মনে হয়, জনপ্রিয় হতে গিয়ে মস্ত একটা ফাঁকির মধ্যে পড়ে গেছি।

রাত দশটার কাছাকাছি ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার গালের মাংসপেশীতে যন্ত্রণা হওয়া সত্ত্বেও গাঢ় ঘুম এলো। কেউ না তুললে হয়তো অনেকক্ষণ ধরেই ঘুমতে পারতাম। একটার একটু পরেই দরজায় টোকা দেবার শব্দ শোনা গেল।

'কে?'

'টেলিগ্রাম।'

'টেলিগ্রামটা কি সকাল পর্যন্ত রেখে দেওয়া চলত না?' পোর্টারের হাত থেকে টেলিগ্রামটা নিয়ে রাগত স্বরে বললাম, 'এখন আমার আর কিছুতেই ঘুম আসবে না।'

'মাপ করবেন। আপনার ঘরের আলো জ্বলছিল। ভেবেছিলাম, আপনি হয়তো জেগে আছেন।'

টেলিগ্রামটা খুলে প্রেরকের নামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। টেলিগ্রাম করেছে আমার স্ত্রী। ব্যাপারটা কী?

'গতকাল গ্নেক্কের ও লিজা গোপনে বিয়ে করেছে। ফিরে এসো।'

টেলিগ্রামটা পড়ে মুহূর্তের জন্যে একটা আতঙ্ক হল। আতঙ্ক এই ভেবে ততোটা নয় যে গ্নেক্কের ও লিজা গোপনে বিয়ে করেছে, আতঙ্ক এজন্যে যে ওদের বিয়ের খবর শুনেও আমি নির্বিকার রয়েছি। লোকে বলে, দার্শনিক ও সাধুরাই নাকি নির্বিকার হতে পারে। কথাটা ঠিক নয়। নির্বিকারত্ব হচ্ছে অসাড় আত্মার লক্ষণ, অকাল মৃত্যুর লক্ষণ।

আবার বিছানায় শুয়ে যা হোক কিছু ভেবে অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করলাম। কী ভাবব আমি? মনে হতে লাগল, সবকিছু ভাবা হয়ে গেছে, এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে আমার কৌতূহল জাগ্রত হতে পারে।

যখন ভোরের আলো ফুটে উঠতে লাগল তখন বিছানায় উঠে বসলাম এবং দু হাতে হাঁটু বেড় দিয়ে বসে থাকতে থাকতে আর কিছু করবার না পেয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেকেই বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। নিজেকে চেনো — এই

উপদেশটি খুবই চমৎকার, খুবই কাজের। কিন্তু এই উপদেশটিকে কী ভাবে মেনে চলতে হবে সেই নির্দেশটি দিতে প্রাচীনরা ভুলে গেছেন।

আগে আগে যখন নিজেকে বা অন্য কাউকে বোঝবার ইচ্ছে হত তখন আমি মনোযোগ নিবদ্ধ করতাম কাজের দিকে নয়, কারণ কাজের উপর ব্যক্তিবিশেষের হাত নেই, মনোযোগ নিবদ্ধ করতাম আকাংক্ষার ওপরে। একজন মানুষের আকাংক্ষা কী, সেটুকু জানতে পারলেই বলে দেওয়া যায় মানুষটি কী রকম।

তারপর নিজেই নিজেকে জেরা করলাম: কী আমার আকাংক্ষা?

স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, বন্ধুবান্ধব এবং ছাত্ররা যদি আমাদের ভালোবাসে, সাধারণ মানুষ হিসেবে ভালোবাসে, আমাদের খ্যাতিকে নয় বা কোনো একটা প্রতিষ্ঠান বা ছাপকে নয়, তাহলে আমি খুশি হই। আর কী? জনকয়েক সহকারী ও শিষ্য পেলে আমি খুশি হই। আর কী? আজ থেকে একশো বছর পরে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে চোখ মেলে দেখবার, শুধু একবার চোখের দেখা দেখার সুযোগ যদি পাই তাহলে খুশি হই। আরো দশ বছর পরমায়ু লাভ করলে আমি খুশি হই... আর কী?

আর কিছু নয়। অনেক ভেবেও আর কিছু মনে পড়ল না। তবে যতোই ভাবি না কেন এবং আমার চিন্তা যতোই দূরপ্রসারী হোক না কেন, একথাটা আমার কাছে পরিষ্কার যে আমার আকাংক্ষার মধ্যে একটা ফাঁক রয়ে গেছে। অভাব রয়ে গেছে এমন কিছুর যা না থাকলে চলে না, যা আসল জিনিস। এই যে বিজ্ঞানের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা, আমার আরো বেঁচে থাকার ইচ্ছে, এক অপরিচিত শয্যায় এভাবে আমার বসে থাকা, নিজেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা, আমার এ সমস্ত চিন্তা, অনুভূতি ও ধারণার মধ্যে একটির সঙ্গে অপরটির কোনো সম্পর্ক নেই। এবং নেই বলেই সব মিলিয়ে একটা সামগ্রিকতায় গাঁথা হয়ে ওঠেনি। আমার চিন্তা ও অনুভূতিগুলো ছাড়া ছাড়া। বিজ্ঞান, মঞ্চ ও সাহিত্যের সমালোচনা যেভাবে করি, আমার ছাত্রদের সম্পর্কে যে ধরনের কথা বলি, কল্পনায় যে সব ছবি আঁকি তার মধ্যে দক্ষতম মনোবিজ্ঞানীও এমন কিছু খুঁজে পাবেন না যাকে বলা চলে মূলসূত্র, বা যাকে জীবন্ত মানুষ ঈশ্বরজ্ঞানে মাথায় তুলে রাখে।

এ জিনিসটি না থাকার অর্থ কোনো কিছুই না থাকা।

চিত্তবৃত্তির এই দারিদ্র্য আছে বলেই গুরুতর রকমের কোনো পীড়া, মৃত্যুভয়, পরিবেশ ও মানুষের প্রভাব আমার জীবনে বিপর্যয় আনে। যা কিছু আগে আমি মনন দিয়ে উপলব্ধি করতাম, যা কিছুর মধ্যে আমি জীবনের তাৎপর্য ও আনন্দ খুঁজে পেতাম — সবই হয়ে যায় এলোমেলো, গুঁড়িয়ে রেণু রেণু হয়ে যায়। কাজেই আমার জীবনের শেষ কটি মাস যে দাসোচিত বা বর্বরোচিত কতগুলো চিন্তা দ্বারা কালিমালিপ্ত হয়ে থাকবে এবং নব প্রভাতের দিকে তাকিয়ে দেখবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার থাকবে না তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কোনো মানুষের জীবনে যদি সেই বিশেষ জিনিসটি না থাকে যা বাইরের প্রভাবের চেয়েও জোরালো, যার স্থান বাইরের প্রভাবের চেয়েও উঁচুতে, তাহলে জোরাল সর্দি লাগলেই তার সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়, যে কোনো পাখি দেখলেই পেঁচা মনে করে, যে কোনো শব্দ শুনলেই মনে করে কুকুর ডাকছে। লোকটির সমস্ত আশা নিরাশা, তার সমস্ত ছোট বড়ো চিন্তার কোনো দামই থাকে না — নিতান্তই কতকগুলো লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমি হেরে গেছি। তাই যদি হয় তাহলে এত চিন্তা করেই বা কী হবে, এত কথা বলারই বা কী অর্থ। তার চেয়ে বরং নিশ্চুপ হয়ে বসে থেকে ভবিতব্যের জন্যে অপেক্ষা করাই ভালো।

পরদিন সকালে হোটেলের লোকটি আমাকে চা ও দেশীয় খবরের কাগজ দিয়ে গেল। যন্ত্রচালিতের মতো চোখ বুলিয়ে দেখলাম প্রথম পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন, সম্পাদকীয়, অন্যান্য সংবাদপত্র ও পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি, সংবাদ... সংবাদের স্তম্ভে আরো অনেক কিছুর সঙ্গে বিশেষ করে এই খবরটিও আছে: 'বিখ্যাত বিজ্ঞানী এবং কৃতী অধ্যাপক নিকলাই স্তেপানভিচ এন ... গতকল্য এক্স্প্রেস ট্রেনে খারকভে আসিয়াছেন এবং ন. হোটেলে অবস্থান করিতেছেন।'

ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, নামডাকওলা মানুষের নামের আলাদা একটা অস্তিত্ব আছে, আসল মানুষটির জীবনের সঙ্গে সেই অস্তিত্বের কোনো যোগ নেই। খারকভের পথেঘাটে এখন আমার নামটি অকুণ্ঠ ভাবে বিচরণ করছে এবং আর তিনমাসের মধ্যেই সমাধি ফলকের ওপরে সোনালী অক্ষরে সূর্যের মতো ঝক্‌মক করবে। ততোদিনে আমার শরীর শ্যাওলায় ঢেকে যাবে।

দরজায় টোকা দেবার শব্দ, কে যেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

'কে? ভেতরে আসুন।'

দরজা খুলে যে ভেতরে ঢুকল তাকে দেখে বিস্ময়ে এক পা পিছিয়ে গেলাম। পরনের ড্রেসিং গাউনের ভাঁজগুলোকে টানাটানি করে ঠিক করে নিলাম। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কাতিয়া।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এসে কাতিয়া হাঁপাচ্ছে। জোরে একটা নিশ্বাস টেনে বলল, 'এই যে, খুব অবাক হয়ে গেছ, না? ... আমিও এখানে এসেছি।'

এই বলে ও বসল এবং অনর্গল কথা বলতে লাগল। অল্প অল্প তোত্‌লাচ্ছে, একবারও আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে না।

'কী, কথা বলছ না কেন? আমিও এখানে এসেছি ... এই আজই। শুনলাম, তুমি এই হোটেলে আছে। তাই দেখা করতে এলাম।'

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'তোমাকে দেখে আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু অবাক না হয়েও পারছি না। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো মনে হচ্ছে ব্যাপারটাকে। তোমার এখানে কী দরকার?'

'আমার? এই, এমনি চলে এলাম।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। আচমকা ও উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এল আমার দিকে।

'নিকলাই স্তেপানিচ,' ওর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, হাত চেপে ধরেছে বুকের ওপরে। ও বলতে লাগল, 'নিকলাই স্তেপানিচ! এ জীবন আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে! আমি আর পারছি না! আমাকে বলে দাও, আমি কী করব —ভগবানের দোহাই, এক্ষুনি বলো, দেরি কোরো না! বলে দাও আমি কী করব!'

অবাক হয়ে বললাম, 'আমি কী বলতে পারি? আমার কিছু বলার নেই।'

হাঁপাতে হাঁপাতে আর থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে ও বলতে লাগল, 'তোমার পায়ে পড়ছি, তুমি বলো। এভাবে জীবন কাটাতে আর পারছি না! কিছুতেই পারছি না। এ জীবন আমার পক্ষে অসহ্য!'

একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে ও কাঁদতে লাগল। ঝাঁকুনি দিয়ে মাথাটা সরিয়ে দিল পেছন দিকে, হাত কচ্‌লাতে লাগল, পা ঠুকতে লাগল মেঝের ওপরে। মাথা থেকে খসে গিয়ে টুপিটা ঝুলতে লাগল দড়ির প্রান্তে। খসে পড়ল চুল।

'আমাকে দয়া করো! দয়া করো আমাকে!' কাকুতি-মিনতি করে ও বলতে লাগল, 'আমি আর পারছি না!'

হাতের থলে থেকে ও একটা রুমাল টেনে বার করল। রুমালটা টেনে বার করতে গিয়ে বেরিয়ে এল খানকয়েক চিঠি। কোলের ওপর থেকে চিঠিগুলো পড়ে গেল মেঝের ওপরে। চিঠিগুলো কুড়িয়ে তুলে দিতে গিয়ে একটি চিঠির হাতের লেখা চিনতে পারলাম। চিঠিটি মিখাইল ফিওদরভিচের লেখা। আচমকা চিঠির একটা কথা খানিকটা আমার নজরে পড়ে গেল। কথাটি — 'আবেগময়'...

বললাম, 'কাতিয়া, আমি কী বলব! আমার কিছু বলার নেই।'

'আমাকে দয়া করো!' আমার হাতটা চেপে ধরে এবং হাতের ওপরে চুমু খেতে খেতে ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, 'তুমি আমার বাবার মতো। আমার একমাত্র হিতৈষী! তুমি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছ তুমি। তোমার কাছ থেকে অনেকে শিক্ষা পেয়েছে! আমাকে বলে দাও — আমি কী করব!'

'তোমাকে সত্যিই বলছি কাতিয়া, আমি কিছু জানি না।'

আমি কী করব বুঝতে পারছি না, কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছি। ওর কান্না আমার মন স্পর্শ করেছে। ঠিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতাও আমার আর নেই।

'কাতিয়া, এসো প্রাতরাশে বসি,' জোর করে মুখের ওপরে হাসি টেনে এনে বললাম, 'আর কেঁদো না।'

তারপর একটু পরে বাধো বাধো স্বরে বললাম, 'কাতিয়া, আমি আর কদিন? আমি শিগ্‌গিরই বিদায় নেব!'

কাঁদতে কাঁদতে আমার দিকে দু হাত বাড়িয়ে ও বলে উঠল, 'শুধু একটা কথা, শুধু একটা কথা। আমাকে বলে দাও আমি কী করব!'

বিড়বিড় করে বললাম, 'ভারি অদ্ভুত মেয়ে তুমি, কাতিয়া! আমি তো ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার মতো এমন চালাকচতুর মেয়ে, হঠাৎ এমনভাবে কাঁদতে বসলে কেন!'

কিছুক্ষণ দুজনেই নির্বাক। কাতিয়া চুল ঠিক করে নিল, টুপিটা পরল, চিঠিগুলো দুমড়িয়ে দলা পাকিয়ে ঢুকিয়ে দিল থলের মধ্যে একটিও কথা না বলে, এবং কিছুমাত্র তাড়াহুড়ো না করে। ওর মুখ, ওর পোশাকের সামনের দিকটা, ওর হাতের দস্তানা চোখের জলে ভিজে গেছে। কিন্তু ওর মুখের ভাবে স্থির নিরুদ্বেগ কাঠিন্য... আমি ওর চেয়ে সুখী এ কথা বুঝতে পেরে ওর

দিকে তাকিয়ে কেমন লজ্জা করতে লাগল। আমার দার্শনিক বন্ধুরা যাকে বলে ভূয়োদর্শন—সে জিনিসটি আমার মধ্যে নেই। আর তা আমি বুঝতে পেরেছি একেবারে আমার মৃত্যুর প্রাক্‌কালে, আমার জীবনের সায়াহ্নে। কিন্তু এই হতভাগিনীর হৃদয় সারা জীবনে আশ্রয় খুঁজে পাবে না, সমস্ত জীবনে না।

বললাম, 'চলো কাতিয়া, প্রাতরাশে বসি।'

নিরুত্তাপ গলায় কাতিয়া জবাব দিল, 'না, দরকার নেই।'

আরো কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।

বললাম, 'খারকভ শহরটাকে আমার ভালো লাগে না। ভারি নোংরা দেখতে। ভারি একঘেয়ে শহর।'

'আমারও তাই মনে হয়। বিশ্রী। এখানে আমি বেশিক্ষণ থাকব না... যাবার পথে খানিকক্ষণ কাটিয়ে গেলাম আর কি। আমি আজই চলে যাচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'ক্রিমিয়ায়... মানে, ককেসাসে।'

'সত্যি? অনেক দিন থাকবে নাকি?'

'জানি না।'

কাতিয়া উঠে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মুখের ওপরে একটুখানি শীর্ণ হাসি ফুটিয়ে হাত বাড়িয়েছে আমার দিকে।

ইচ্ছে হল ওকে জিজ্ঞেস করি: 'তাহলে কাতিয়া, আমাকে সমাধি দেবার সময়ে তুমি থাকবে না?' কিন্তু ও আমার দিকে ফিরে তাকাল না। ওর হাতের ছোঁয়ায় এতটুকু আবেগ নেই, যেন অপরিচিত লোকের হাত। নিঃশব্দে আমি ওর সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এলাম। এবার ও আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, লম্বা বারান্দা পার হয়ে ও চলে যাচ্ছে, একবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না। ও জানে, আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি। বারান্দার শেষে ও যখন বাঁক নেবে তখন নিশ্চয়ই একবার ফিরে তাকাবে।

কিন্তু ও ফিরে তাকাল না। ওর পরনের কালো পোশাক চোখের আড়াল হয়ে গেল, ওকে আর দেখা গেল না...

বিদায়, সোনামণি আমার!

১৮৮৯

প্রজাপতি

১

ওলগা ইভানভ্‌নার বিয়েতে ওর বন্ধু বান্ধব ও পরিচিত সবাই এসেছে।

'ওকে দেখ, ওর মধ্যে কিছু একটা আছে, তাই না?' স্বামীকে দেখিয়ে ওলগা ইভানভ্‌না বন্ধুদের বলল। অখ্যাত অতি সাধারণ একটি লোককে বিয়ে করতে রাজী হল কেন, এই কথাটা বোঝানর জন্য ও স্পষ্টই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ওর স্বামী ওসিপ স্তেপানিচ দীমভ একজন ডাক্তার। পদ 'টিটুলার কাউন্সেলার'। কাজ করে দু'টো হাসপাতালে—একটাতে অনাবাসিক ওয়ার্ডের চিকিৎসক, এবং আর একটাতে শব ব্যবচ্ছেদের কাজ করে। সকাল ন'টা থেকে দুপুর পর্যন্ত বহির্বিভাগের রোগী দেখা ও ওয়ার্ডে ঘোরা; তারপর বিকেলে ঘোড়ায় টানা ট্রামে চড়ে চলে যাওয়া অন্য হাসপাতালে; সেখানে কাজ শব ব্যবচ্ছেদ করা। নিজস্ব 'প্র্যাকটিস্'খুব অল্পই — বছরে শ'পাঁচেক রুবল। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। এর বেশি ওর সম্পর্কে বলার কিছুই নেই। ওলগা ইভানভনা এবং তার বন্ধু বান্ধব ও পরিচিতরা কিন্তু কেউই সাধারণ লোক নয়। ওদের মধ্যে প্রত্যেকেরই কোন না কোন ব্যাপারে বৈশিষ্ট্য আছে, এবং একেবারে অখ্যাতও বলা চলে না। প্রত্যেকেই কিছুটা নাম ও খ্যাতি অর্জন করেছে, সেটা যদি পুরোদস্তুর নাও মিলে থাকে, ওদের সকলের সামনেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। একজন হলেন অভিনেতা, এঁর নাট্য প্রতিভা ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি পেয়েছে;মার্জিত রুচি, চতুর ও বিচক্ষণ, সুন্দর আবৃত্তি করতে পারেন। ইনি ওলগা ইভানভনাকে বাচনভঙ্গী শেখান। আর একজন অপেরা গায়ক—মোটাসোটা, ভাল মানুষ ধরনের ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন, ওলগা ইভানভনা নিজেকে নষ্ট করে ফেলছে, এত অলস না হয়ে একটু শক্ত হতে

পারলে ও একজন সুগায়িকা হতে পারত। এছাড়া আরও কয়েকজন শিল্পী আছেন, তার মধ্যে প্রধান রিয়াবোভস্কি। সাধারণ জীবনের ছবি আঁকেন, জীবজন্তু ও প্রাকৃতিক দৃশ্যও এঁকে থাকেন। বছর পঁচিশ বয়সের অপূর্ব সুদর্শন যুবক। চুলগুলো তার সোনালী। প্রদর্শনীতে এঁর ছবিগুলো অত্যন্ত সমাদর পেয়েছে—শেষ ছবিখানি বিক্রী হয়ছে পাঁচশ রুবলে। ইনি ওলগা ইভানভনার আঁকা স্কেচ্‌গুলোতে শেষ টান দিয়ে দেন, আর সব সময়ই বলেন যে ওলগা ইভানভনার ছবিগুলোর মধ্যে একটা সম্ভাবনা আছে।এ ছাড়া আছেন একজন বেহালা বাদক—ইনি বেহালাকে ঠিক কাঁদাতে পারেন। ভদ্রলোক খোলাখুলিভাবেই বলেন যে ওঁর জানাশোনা মেয়েদের মধ্যে একমাত্র ওলগা ইভানভনাই হল বাজনার যোগ্য সঙ্গী। আর আছেন সেই লোকটি—বয়সে তরুণ, কিন্তু ছোট উপন্যাস, নাটিকা ও গল্প লিখে ইতিমধ্যেই নাম করে ফেলেছেন। আর কে বাকি রইলেন? ও, হ্যাঁ, আর আছেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ—মার্জিত-রুচি জমিদার, শখের বইয়ের ছবি-আঁকিয়ে ও নক্সাকারী—অতীত রুশীয় স্টাইল, পুরাণ কথা ও মহাকাব্যের প্রতি এঁর সত্যিকারের আকর্ষণ ছিল। কাগজ, চিনামাটি ও ধূমায়িত পাত্রের গায়ে ইনি অদ্‌ভুত অদ্‌ভুত সৃষ্টি করতে পারেন। উদারপন্থী, শিল্পীসমাজের সভ্যভব্য এইসব ভাগ্যবানেরা ডাক্তারদের কথা মনে করতেন শুধু অসুস্থ হয়ে পড়লে। দীমভ নামটা এঁদের কানে সিদরভ, তারাসভ প্রভৃতি অতি সাধারণ নামের মতোই মনে হয়। যথেষ্ট দীর্ঘকায় ও প্রশস্ত বক্ষ হওয়া সত্ত্বেও দীমভ এঁদের কাছে ছিল অপরিচিত, অনাবশ্যক ও অকিঞ্চিৎকর। ওর ফ্রককোটটা দেখে মনে হয় ওটা বুঝি অন্যের জন্য তৈরি হয়েছিল; ওর দাড়িটা ঠিক ব্যবসাদারদের মতো। অবশ্য ও যদি লেখক কিংবা শিল্পী হত, তাহলে ঐ দাড়িতেই ওকে 'জোলার' মতো দেখাচ্ছে একথা প্রত্যেকেই স্বীকার করত। অভিনেতা ওলগা ইভানভনাকে বললেন যে, 'রেশমের মতো চুল আর বিয়ের পোষাকে তাকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন বসন্তের সাদা সাদা নরম ফুলে ঢাকা কৃশাঙ্গী চেরিগাছ।'

'না, না শোন,' ওলগা ইভানভনা ওর হাত ধরে বলল, 'কী করে এটা ঘটল? শোনই না আমার কথা... জানত, আমার বাবা আর দীমভ একই হাসপাতালে কাজ করত। বাবার অসুখের সময় দীমভ দিনরাত ওঁর বিছানার পাশে বসে থাকত। সে কী আত্মত্যাগ! রিয়াবোভস্কি শুনছ! লেখক তুমিও শোন, খুব মজার

ব্যাপার। সরে এস। সে কী আত্মত্যাগ, কী আন্তরিক দরদ! আমিও রাতে ঘুমোতাম না, বাবার পাশে বসে থাকতাম। হঠাৎ—হ্যাঁ হঠাৎ এই বলিষ্ঠ তরুণের হৃদয় জয় করে ফেললাম। এই হল ব্যাপার! আমার দীমভও প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগল। ভাগ্যের কী বিচিত্র লীলা! বাবা মারা যাওয়ার পর দীমভ মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। মাঝে মাঝে আমরা বাইরেও দেখা করতাম। হঠাৎ এক শুভ সন্ধ্যায়—শুনছ তোমরা! একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে ও বিয়ের প্রস্তাব করে বসল। সেদিন সারা রাত আমি কেঁদেছি। আমিও প্রেমে পাগল। আর দেখতেই পাচ্ছ, আজ আমি বিবাহিতা মহিলা। ওর মধ্যে একটা সুদৃঢ় বলিষ্ঠতা, একটা ভাল্লুকে ভাব আছে, তাই না? এখন ওর মুখের তিনভাগ দেখা যাচ্ছে—মুখ ফেরালে ওর কপালের দিকে তাকিও। এরকম কপাল সম্বন্ধে তোমার কী মত রিয়াবোভস্কি? দীমভ, আমরা তোমার কথাই বলছি,' ওলগা ইভানভনা ওর স্বামীকে চেঁচিয়ে বলল। 'এদিকে এস, রিয়াবোভস্কির সঙ্গে হাত মেলাও... হ্যাঁ ঠিক হয়েছে, তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়া উচিত।'

অকপট খুশিমাখা হাসির সঙ্গে রিয়াবোভস্কির দিকে হাত বাড়িয়ে দীমভ বলল, 'আনন্দিত হলাম, কলেজে আমার সঙ্গে রিয়াবোভস্কি নামে একটি ছেলে পড়ত। সে বোধহয় আপনার কোন আত্মীয় তাই না?'

২

ওলগা ইভানভনার বয়স বাইশ, দীমভের একত্রিশ। বিয়ের পর ওদের দিন কাটছিল খুব চমৎকার। ড্রয়িংরুমের দেয়ালগুলো ওলগা ইভানভনা নিজের ও বন্ধুদের আঁকা বাঁধানো অবাঁধানো ছবি দিয়ে ঢেকে দিয়েছে, বড় পিয়ানো ও আসবাবপত্রের চারিদিকে আর্টিস্টিক ভঙ্গীতে ছড়িয়ে রেখেছে চীনা ছাতা, ছবি আঁকার ফ্রেম, রং বেরং-এর ঢাকনা, ছোরা, ছোট ছোট আবক্ষ মূর্তি, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি নানান জিনিস। খাবার ঘরে ঝুলিয়ে দিয়েছে সস্তা দরের ছাপান ছবি, লাপ্তি ও কাস্তে আর কোণের দিকে জড় করে রাখা হয়েছে একখানা বড় কাস্তে ও একটা আঁচড়া, রুশীয় গ্রাম্য কায়দায় সাজানো দস্তুরমত একখানা খাবারঘর। শোওয়ার ঘরের ছাদ ও দেয়ালগুলো গাঢ় রংএর কাপড়ে এমনভাবে ঢেকে দেওয়া

হয়েছে যে দেখে মনে হয় যেন একটা গুহা, বিছানার উপর ঝুলছে একটা ভেনিশীয় লন্ঠন, আর দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে টাঙ্গি হাতে একটা মূর্তি। দেখে সবাই বলত যে এই তরুণ দম্পতি একটা চমৎকার বাসা বেঁধেছে। ওলগা ইভানভনা রোজ ঘুম থেকে ওঠে এগারটায়। উঠে পিয়ানো বাজায় কিংবা সূর্যোজ্জ্বল দিনে তেল রঙা ছবি আঁকে। বারটার একটু পরেই ও চলে যায় ওর দর্জির কাছে। ওর আর দীমভের সামান্য যা টাকা আছে তাতে শুধু প্রয়োজনটুকুই মেটে, কাজেই নিত্য নতুন পোষাকে মানানসইভাবে বেরোতে হলে ওকে আর ওর দর্জিকে হরেক রকম মাথা খাটাতেই হয়। শুধু একটা পুরোনো রঙীন ফ্রক আর টুকরো টাকরা পাতলা কাপড় ও লেশ দিয়ে বারে বারেই স্রেফ ভোজবাজির মতো অপূর্ব মনোমুগ্ধকর যে জিনিষটি তৈরি হত, সেটা শুধু পোষাক নয়, যেন একটা স্বপ্ন। দর্জির কাছ থেকে ওলগা ইভানভনা যায় ওর কোন অভিনেত্রী বান্ধবীর বাড়ি থিয়েটারের খবর নেবার আর কোন 'প্রথম রজনী' বা কারও 'সাহায্য রজনী'র টিকিট সংগ্রহের চেষ্টায়। অভিনেত্রীর বাড়ি থেকে ওকে যেতে হয় কোন শিল্পীর স্টুডিওতে কিংবা কোন ছবির প্রদর্শনীতে, তারপর কোন নামকরা লোকের কাছে—হয় তাঁকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে, না হয় ত পাল্টা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে কিংবা শুধুই গল্প করতে। যেখানেই যাক সবাই ওকে খুশি মনে হৃদ্যতার সঙ্গে সম্ভাষণ জানায়, আর ও যে খুব ভাল, মিষ্টি ও অসাধারণ এ আশ্বাস মেলে। ও যাদের বিখ্যাত ও উচ্চস্তরের লোক বলে ভাবে, তারা সবাই ওকে নিজেদের সমপর্যায়ের একজন হিসাবেই গ্রহণ করে। সবাই একবাক্যে স্বীকার করে যে হাজার রকম কাজে প্রতিভার অপচয় না করলে ওর যা ক্ষমতা, রুচি ও মন আছে, তাতে ও বড় দরের কেউ একজন হয়ে উঠবে। ও গান গায়, পিয়ানো বাজায়, তেল রঙের ছবি আঁকে, মাটি দিয়ে মডেল গড়ে, সখের থিয়েটারে অভিনয় করে। যেমন তেমন ভাবে নয়, সবেতেই ওর প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। আলোক সজ্জার জন্য লণ্ঠন তৈরি, প্রসাধন, কিংবা শুধু কারও টাইটা বেঁধে দেওয়া—যাই ও করুক না কেন, সবই বেশ একটা শিল্পীসুলভ, মার্জিত ও মনোলোভা হয়ে ওঠে। তবে বন্ধুত্ব পাতাতে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে হৃদ্যতা জমাতে ওর প্রতিভার বিকাশ হয় সব থেকে বেশি। কোন লোক সামান্যতম বৈশিষ্ট্য অর্জন করার কিংবা আলোচ্য হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওলগা ইভানভনা তার সঙ্গে পরিচয়

জমিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলে এবং বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে বসে। নতুন কারও সঙ্গে পরিচয় হওয়ার দিনটি প্রতিবারই ওর কাছে অনন্য। খ্যাতিমানদের ও পূজা করে, তারা ওর গর্ব, প্রতিরাতে তাদের স্বপ্ন দেখে। বিখ্যাতদের দিকে ওর ভারি ঝোঁক — কিছুতেই সে আকাংক্ষা তৃপ্ত হয় না। পুরোনো বন্ধুরা অদৃশ্য ও বিস্মৃত হয়ে যায়, তার জায়গায় আসে নতুনেরা, ক্রমে এদের সম্পর্কেও আসে ক্লান্তি কিংবা হতাশা, অধীর আগ্রহে ও খোঁজে নূতনতর বন্ধু, নূতনতর খ্যাতিমান ব্যক্তি, তাদের পাবার পর অন্যদের সে খোঁজে। কিন্তু কেন?

চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে ও বাড়িতে স্বামীর সঙ্গে ডিনার খায়। দীমভের সারল্য, সাধারণ বুদ্ধি ও হাসিখুশি ভাব ওলগা ইভানভনার মনে শ্রদ্ধা ও হর্ষ জাগায়। অনবরতই ও লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে আর স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে চুম্বনবৃষ্টি করে যায়।

'তুমি বুদ্ধিমান, উন্নতমনা — কিন্তু দীমভ, একটা ভীষণ দোষ আছে তোমার। আর্ট সম্পর্কে তোমার কোনরকম আকর্ষণ নেই। গান ও ছবি আঁকাকে তুমি উপেক্ষা করো।'

'আমি যে ওগুলো বুঝি না,' দীমভ সবিনয়ে বলে, 'আমি সারা জীবন কাজ করেছি প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে, আর্টের দিকে নজর দেওয়ার সময়ই পাইনি।'

'এটা কিন্তু খুবই অন্যায় দীমভ।'

'কেন? তোমার বন্ধুরা কেউ প্রকৃতি-বিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানেন না, আর সেটা তাঁদের দোষ বলে তুমি মনে করো না। প্রত্যেকেই নিজের নিজের বিষয় নিয়ে থাকবে। ছবি আঁকা বা অপেরা আমি বুঝি না, তবে আমি তাদের দেখি এইভাবে যে যেহেতু কিছু বুদ্ধিমান লোক এইসবের জন্য তাঁদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন, এবং আর একদল বুদ্ধিমান লোক যখন এ সবের জন্য অঢেল অর্থ ব্যয় করছেন, তখন নিশ্চয় এগুলোর প্রয়োজন আছে। আমি বুঝি না সত্যি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি এগুলোকে উপেক্ষা করি।'

'তোমার সৎ হাতগুলোর সঙ্গে হাত মেলাতে দাও!'

ডিনারের পর ওলগা ইভানভনা পরিচিতদের বাড়িতে যায় তারপর যায়

থিয়েটারে কিংবা কনসার্টে। বাড়ি ফিরতে সেই মধ্যরাত্রি। প্রতিদিনই এরকম চলতে থাকে।

বুধবার সন্ধ্যাবেলা ও নিজের বাড়িতে লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে। সেদিন তাস খেলা বা নাচ হয় না—সেদিন ওরা শিল্পচর্চার আনন্দ উপভোগ করে। খ্যাতিমান অভিনেতাটি আবৃত্তি করেন, গায়ক গান করেন, শিল্পীরা ওলগা ইভানভনার অসংখ্য অ্যালবামে ছবি আঁকেন, বেহালা বাদক বাজনা বাজান, এবং গৃহকর্ত্রী নিজেও আঁকে, মডেল তৈরি করে, গান গায়, বাজনা বাজায়। গান বাজনার মাঝে মাঝে বিরতির সময় ওরা শিল্প, সাহিত্য ও অভিনয় নিয়ে আলোচনা ও তর্ক চালায়। দলের মধ্যে মহিলা আর কেউ থাকেন না, কারণ ওলগা ইভানভনার কাছে অভিনেত্রীরা এবং ওর দর্জি ছাড়া অন্য সব মেয়েরাই তুচ্ছ ও বিরক্তিকর। প্রতিটি বুধবার সন্ধ্যায় প্রতিবার দরজায় ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ত্রী সচকিত হয়ে উৎফুল্ল মুখে বলে ওঠেন: 'ঐ উনি এলেন!' উনি বলতে আমন্ত্রিত নতুন বিখ্যাত লোকটিকেই বোঝায়। দীমভকে কিন্তু ড্রয়িংরুমে পাওয়া যায় না, আর তার কথা কারুর মনেও থাকে না। ঠিক সাড়ে এগারটার সময় খাবার ঘরের দরজাটা খুলে যায়, আর দরজার উপর দেখা যায় দীমভকে, ভালমানুষি মাখা হাসি হাসি মুখে দুহাত কচলে ডাক দিচ্ছে, 'ভদ্রমহোদয়গণ, খাবার প্রস্তুত।'

সবাই খাবার ঘরে ঢোকে, প্রত্যেকবারই দেখা যায় সেই একই জিনিস: এক ডিস গুগুলি এক পদ শুকর কিংবা বাছুরের মাংস, সার্ডিন মাছ, পনীর, ক্যাভিয়ার, ব্যাঙের ছাতার আচার, ভদকা ও দুই ডিকাণ্টার মদ।

খুশিতে হাত কচলে ওলগা ইভানভনা বলে ওঠে, 'আমার মেত্র দ্য' তেল। সত্যিই তুমি অপূর্ব! ওর কপালের দিকে চেয়ে দেখ! দীমভ মুখখানা আমাদের দিকে ঘোরাও ত। দেখ, সবাই দেখুন — ঠিক যেন বাংলার বাঘ, আর ভাবখানা দেখছেন, কেমন হরিণের মত মিষ্টি আর করুণ! ডার্লিং!'

অতিথিরা খেতে খেতে দীমভের দিকে চেয়ে ভাবে, 'লোকটি সত্যিই ভাল।' একটু পরেই ওরা কিন্তু ওকে ভুলে যায় এবং অভিনয়, গান বাজনা ও শিল্পের আলোচনায় যায় ডুবে।

তরুণ দম্পতিটি সুখেই ছিল, ওদের জীবনও কাটছিল স্বচ্ছন্দে। অবশ্য মধুচন্দ্রিকার তৃতীয় সপ্তাহটি ওদের বিশেষ ভাল যায়নি—বলতে গেলে

মনোকষ্টেই কাটে। হাসপাতালে ইরিসিপেলাসের ছোঁয়াচ লেগে দীমভকে ছ'দিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়। ওর সুন্দর কাল চুলগুলি একেবারে গোড়া থেকে ছেঁটে ফেলতে হয়। ওলগা ইভানভনা এই সময় ওর বিছানার পাশে বসে ভীষণ কাঁদত। অবশ্য একটু ভাল হতেই ও দীমভের কদমছাঁট চুলের উপর একটা রুমাল বেঁধে দিয়ে ওর ছবি আঁকতে লাগল, যেন ও একটা বেদুইন। দু জনেই এতে খুব মজা পেত।

সম্পূর্ণ সেরে উঠে হাসপাতালে যাওয়া শুরু করার তিনদিন পরেই নতুন আর এক ফ্যাসাদ বাধল।

একদিন ডিনারে বসে দীমভ বলল, 'আমার ভাগ্যটাই খারাপ, বুঝলে? আজ চারটে মড়াকাটা ছিল, শুরুতেই দুটো আঙুল কেটে গেল। তাও দেখতে পেলাম বাড়িতে এসে।'

ওলগা ইভানভনা ভয় পেয়ে গেল। দীমভ অবশ্য হেসে বলল যে ঘটনাটা তেমন কিছু নয়, মড়া কাটতে গিয়ে আগেও অনেকবার ওর হাত কেটে গিয়েছে। 'কী রকম যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলি আর অন্যমনস্ক হয়ে যাই।'

রক্তদুষ্টির আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে ওলগা ইভানভনা দিন গুনতে থাকে। প্রতিরাত্রেই ও প্রার্থনা করে যেন কিছু না ঘটে। ব্যাপারটা অবশ্য নিরুপদ্রবেই কেটে গেল, দুঃখ ও উদ্বেগের স্পর্শমুক্ত সেই পুরোনো শান্তিপূর্ণ জীবন আবার এল ফিরে।

বর্তমানটা চমৎকার। বসন্ত আসন্ন, দূর থেকে দেখা যায় তার স্মিত হাসি, কত শত আনন্দের ইশারা। সুখ যেন চিরন্তন। এপ্রিল, মে ও জুন এই তিনটে মাস ওরা যাবে মস্কো থেকে বহুদূরে, বাগানবাড়িতে; সেখানে থাকবে বেড়ান, ছবি আঁকা, মাছধরা, নাইটিঙ্গেলের গান। এরপর জুলাই থেকে পুরো শরৎকাল পর্যন্ত শিল্পীদল ভলগায় প্রমোদ-ভ্রমণ করবে এবং স্থায়ী সদস্য হিসাবে ওলগা সেই দলে যোগ দেবে। ও ইতিমধ্যেই দুটো হালকা বেড়ানর পোষাক তৈরি করে নিয়েছে; রং, তুলি, ক্যানভাস্ ও নতুন একটা রংএর পাত্রও কিনে ফেলেছে। রিয়াবোভস্কি প্রায় প্রতিদিনই ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে—উদ্দেশ্য, ওলগা ইভানভনার পেণ্টিং কী রকম চলছে, দেখা। সে যখন ছবিগুলো দেখায়, প্যাণ্টের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে, জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে রিয়াবোভস্কি বলে:

'বেশ, বেশ ... কিন্তু মেঘটা মনে হচ্ছে চেঁচাচ্ছে ... ওটা কিন্তু গোধূলির আলো হয়নি। সামনের পটভূমিটা একটু জবড়জং হয়ে গেছে; কী যেন একটা ... আমার কথা বুঝতে পারছ বোধহয়, কিসের যেন একটা অভাব রয়ে গিয়েছে ... তোমার কুটিরটা মনে হচ্ছে যেন চেপ্টে গিয়ে করুণভাবে গোঙাচ্ছে ... ঐ কোনাটা আর একটু গাঢ় করে দাও। মোটের ওপর খুব খারাপ হয়নি ... খুশি হয়েছি।'

ওর কথাগুলো যত অস্পষ্ট হয়, ওলগার কাছে তত বেশি হয়ে ওঠে বোধগম্য।

৩

হুইটমনডে-তে বিকেলে স্ত্রীর জন্য খাবারদাবার মিঠাই-মণ্ডা কিনে দীমভ বেরিয়ে পড়লো বাগানবাড়ির উদ্দেশে। প্রায় পক্ষকাল দেখা হয় না — বিরক্তিকর বিরহ। রেলগাড়িতে এবং তারপর ঝোপজঙ্গলের মধ্যে কুটির খুঁজে বার করতে করতে ওর ভীষণ ক্ষিদে পেয়ে গেল। ও মনে মনে কল্পনা করতে থাকল, স্ত্রীর সঙ্গে বসে বেশ আয়েস করে রাতের খাওয়া খাবে, তারপর বিছানায় গড়িয়ে পড়বে। ক্যাভিয়ার, পনীর ও শুঁটকী মাছ ভরতি পার্সেলটার দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে বেশ খুশি খুশি লাগল।

বাড়িটা যখন খুঁজে বের করতে পারল, সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। বুড়ো চাকরটা জানাল কর্ত্রী বাড়ি নেই, তবে সম্ভবত শীগ্‌গিরই ফিরবেন। গ্রীষ্মাবাসটার কাঠামো মোটেই আকর্ষণীয় নয়। নিচু ছাদগুলোয় কাগজ লাগান, এবড়োখেবড়ো মেঝেটার মাঝে মাঝে ফাঁক। মাত্র তিনখানা ঘর। একটাতে বিছানা পাতা; পরেরটাতে ক্যানভাস্, রংয়ের তুলি, একটা ময়লা কাগজের টুকরো এবং চেয়ারের উপর কতকগুলো পুরুষদের কোট ও টুপি; আর তৃতীয়টাতে ঢুকতেই দেখা গেল জনতিনেক অপরিচিত লোক বসে আছে। তার মধ্যে দুজন দাড়িওলা, চুলের রং কাল আর তৃতীয়জন পরিষ্কার দাড়িগোঁফ কামানো, বেশ মোটা, মনে হল অভিনেতা ভদ্রলোক। টেবিলের উপর সামোভারে জল ফুটছে।

'কী চাই?' অপ্রীতিকর দৃষ্টি হেনে দরাজ গলায় অভিনেতা জিজ্ঞাসা করলেন। 'ওলগা ইভানভনার সঙ্গে দেখা করতে চান? একটু অপেক্ষা করতে হবে। এখনি এসে পড়বে।'

দীমভ বসে পড়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কালচুলওলা লোক দুটির মধ্যে

একজন ওর দিকে অবসন্ন নিদ্রালু চোখে তাকিয়ে নিজের জন্য খানিকটা চা ঢেলে বলল, 'একটু চা চলুক?'

দীমভের ক্ষিদে এবং তৃষ্ণা দুইই পেয়েছিল, কিন্তু ক্ষিদের তীব্রতা নষ্ট হওয়ার ভয়ে ও চা খেল না। অচিরেই পদশব্দ ও পরিচিত হাসি শোনা গেল। একটা দরজা খুলে গেল, চওড়া কিনারওলা টুপি মাথায় ও হাতে একটা বাক্স নিয়ে ঘরে ঢুকল ওলগা ইভানভনা। ওর পিছু পিছু ঢুকল রিয়াবোভস্কি — বগলে একটা বড় ছাতা ও একটা গোটান টুল, খুশি মেজাজ, গালদুটো টকটক করছে।

'দীমভ!' খুশিতে রাঙা হয়ে ওলগা ইভানভনা চেঁচিয়ে উঠল। দীমভের বুকে মাথা আর হাত দু খানা রেখে আবার বলল, 'দীমভ! তুমি! এতদিন আসনি কেন? কেন? কেন?'

'কখন আসি, জান তো কীরকম ব্যস্ত থাকি। তাছাড়া যখন ফুরসৎ পাই, ঘটনাক্রমে সে সময় ট্রেন পাওয়া যায় না।'

'ওঃ তোমায় দেখে কী খুশিই যে হয়েছি! সারা রাত, সারাটা রাত তোমায় স্বপ্ন দেখি। মাঝে মাঝে ভয় হত কি জানি হয়ত তোমার অসুখ করেছে। ওঃ তুমি যে কত ভাল তা যদি জানতে! কী সৌভাগ্য তুমি এসে পড়েছ! তুমিই আমার ত্রাতা হবে। একমাত্র তুমিই আমায় বাচাঁতে পার। আগামীকাল এখানে সব থেকে চমকপ্রদ বিয়ে হচ্ছে,' হেসে হেসে স্বামীর টাইটা নতুন করে বাঁধতে বাঁধতে ওলগা ইভানভনা বলে চলল, 'স্টেশনের টেলিগ্রাফ অপারেটর চিকেল্‌দেয়েভের কাল বিয়ে। দেখতে বেশ সুন্দর, চালাকচতুর যুবক, চোখে মুখে একটা দৃঢ় ভাল্লুকে ভাব আছে ওর। যৌবনদৃপ্ত কোনো ভারাঙ্গিয়ানের মডেল হতে পারে। আমরা গ্রীষ্মের বাসিন্দারা সবাই ওকে ভালবাসি, কথা দিয়েছি ওর বিয়েতে যাব। বেচারা একটু মুস্কিলে আছে — ধনী নয়, একা, তাছাড়া লাজুক, আমাদের পক্ষ থেকে কিছু না করাটা অন্যায় হবে। ভেবে দেখ, বিয়ে হবে ঠিক দুপুরের উপাসনার পর, সবাই গীর্জা থেকে সোজা কনের বাড়ি যাব ... ঝোপঝাড়, পাখীর গান, ঘাসের উপর সূর্যের ছোপ এবং আমরাও যেন ঝকঝকে সবুজ আস্তরণের উপর রঙীন ছোপ — ভাবটা কেমন মৌলিক বলত! ঠিক ফরাসী এক্সপ্রেসোনিস্টদের মতো। কিন্তু আমি কী পরে গীর্জায় যাব দীমভ?' মুখখানা

কর্ণ করে ওলগা ইভানভনা বলল, 'এখানে ত আমার কিছুই নেই — পোষাক, ফুল, দস্তানা কিছুই নেই। তোমাকে আমায় বাঁচাতেই হবে। এক্ষুনি তোমার আসার মানে নিয়তি, তুমি আমাকে বাঁচাও। লক্ষ্মী সোনা আমার, চাবিটা নিয়ে একবার বাড়ি চলে যাও, আলমারি থেকে আমার গোলাপী রং-এর পোষাকটা নিয়ে এস। দেখেছ ত, ঠিক সামনেই ঝুলছে! ... আর যে ঘরে বাক্সগুলো আছে, তার মেঝের উপর ডান দিকে দুটো কার্ডবোর্ডের বাক্স পাবে। ওপরেরটা খুললেই দেখবে অনেক টুকরো টুকরো রেশমের লেস, লেস আর লেস এবং নানান ধরনের টুকিটাকি জিনিস, সেগুলোর তলায় আছে ফুল। সব ফুলগুলো বের করে নিয়ে এস, খুব সাবধানে কিন্তু, দুমড়ে ফেল না যেন, আমি ও থেকে পরে কিছু বেছে নেব'খন। আর এক জোড়া দস্তানা কিনে এন আমার জন্যে।'

'বেশ,' দীমভ বলল, 'আমি কাল ফিরে গিয়ে সব পাঠিয়ে দেব।'

'কাল?' ওলগা ইভানভনা বিহ্বল চোখে তার দিকে তাকিয়ে পুনরুক্তি করল, 'কিন্তু কাল তো তুমি সময়মত এসে পৌঁছাতে পারবে না! কাল প্রথম ট্রেন ছাড়বে ন'টায় আর বিয়ে হচ্ছে এগারটায়। না না লক্ষ্মী, তোমায় আজই যেতে হবে, আজই! কাল যদি তুমি নিজে না আসতে পার, অন্য কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও। নাও চল, এখনি ট্রেন এসে পড়বে। লক্ষ্মীটি, দেরী কোরো না।'

'বেশ!'

'তোমাকে ছেড়ে দিতে কী খারাপই যে লাগছে,' বলতে বলতে ওলগা ইভানভনার চোখে জল উথলে ওঠে, 'ওঃ, টেলিগ্রাফ অপারেটরকে কথা দিয়ে কী বোকামীই যে করেছি!'

এক গ্লাস চা গিলতে গিলতে আর একটা বিস্কুট তুলে নিতে নিতে নম্র ক্ষীণ হাসি হেসে দীমভ স্টেশনে চলে গেল। ক্যাভিয়ার, পনীর ও শুঁটকী মাছ খেল কালচুলওলা লোকদুটি আর মোটা অভিনেতাটি।

৪

জুলাই-এর এক নিথর চাঁদনী রাত। ভলগা স্টীমারের ডেকে দাঁড়িয়ে ওলগা ইভানভনা একবার জল আর একবার অপূর্ব তটরেখার দিকে চেয়ে আছে। পাশে দাঁড়িয়ে রিয়াবোভস্কি বলে চলেছে যে ঐ যে জলের উপর

কালো ছায়া, ছায়া নয় যেন স্বপ্ন ... এই কুহকী ঝকঝকে জল, এই অনন্ত আকাশ, বিষণ্ণ ধ্যানমগ্ন নদীতট যেন বলছে, অসার এই জীবন আমাদের, মনে করিয়ে দেয় এসবের ঊর্ধ্বে এমন কিছু আছে যা শাশ্বত, সানন্দ ... এমন ক্ষণটিতে ইচ্ছা হয় সবকিছু ভুলে যাই, মনে হয় আসুক মৃত্যু, ভাল লাগে শুধু স্মৃতিপটে জেগে থাকতে, মনে হয় অতীতটা কী তুচ্ছ, কী নীরস, আর কী নিরুদ্দিষ্ট অনাগত ভবিষ্যৎ! এমনকি আজকের এই রাতটি, যা আর কোনদিনই ফিরে আসবে না, এও শেষ হবে, মিশে যাবে অনন্ত কালসমুদ্রে— কেন তবে বেঁচে থাকা?

ওলগা ইভানভনা কান পেতে শুনছে। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে রিয়াবোভস্কির কণ্ঠস্বর, কখনো কান পাতছে রাত্রির নিস্তব্ধতার দিকে আর নিজের মনে মনে বলছে, আমি অমর, আমার মৃত্যু নেই। এই অদৃষ্টপূর্ব রঙীন মণির মতো জলরাশি, এই আকাশ, নদীতট, কালোছায়া, আর এই হৃদয়-ভরা দুর্জ্ঞেয় সুখ — সবকিছুই যেন বলছে, একদিন সে হবে মস্ত বড় এক শিল্পী, যেন বলছে, দূর দূরান্তরে, চাঁদনী রাতের ওপারে অনন্ত শূন্য স্থানে অপেক্ষা করে আছে ওর সাফল্য, ওর যশ, ওর প্রতি দেশবাসীর ভালোবাসা ... অনেকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে দূরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় ও যেন প্রত্যক্ষ করছে জনতা, আলোকমালা, পবিত্র সঙ্গীত, উৎসাহের উল্লাস। যেন ওর পরিধানে রয়েছে শুভ্র পরিধেয়, আর চারিদিক থেকে ওর উপর ঝরে পড়ছে পুষ্পবৃষ্টি। মনে মনে নিজেকে ও বলে চলেছে যে ওর পাশে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রতিভাশালী, ঈশ্বর মনোনীত সত্যিকারের এক মহান পুরুষ ... এতকাল যা কিছু সে করেছে সবই অপূর্ব, নতুন, অসাধারণ— ভবিষ্যতে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ওর অনন্যসাধারণ প্রতিভা পরিণত হলে ও যা সৃষ্টি করবে তা হবে চমকপ্রদ, অপরিমেয়; ওর মুখচোখ, ওর প্রকাশ ভঙ্গিমা আর প্রকৃতি সম্পর্কে ওর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। ছায়া, সন্ধ্যার রং, কিংবা জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য বর্ণনায় ওর একটা বিশেষ স্বকীয়ভাষা আছে, প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারে ওর মোহিনী শক্তি প্রায় অদম্য। তাছাড়া, সুন্দর ও অসাধারণ ওর জীবনটা মুক্ত স্বাধীন পাখীর মতো ইহজগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য।

'ঠাণ্ডা লাগছে,' ওলগা ইভানভনা কেঁপে উঠল।

রিয়াবোভস্কি নিজের কোটটা ওকে জড়িয়ে দিয়ে বিষণ্ণ সুরে বলল, 'মনে হচ্ছে আমি যেন তোমার অধীন, তোমার গোলাম। আজ তোমাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে কেন?'

ওলগা ইভানভনার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ও রইল। ওর চোখে দুর্নিবার কী যেন একটা আছে। ওর দিকে তাকাতে ওলগা ইভানভনার ভয় হচ্ছে।

'আমি তোমায় ভীষণ ভালোবাসি,' রিয়াবোভস্কি ফিসফিস করে বলল। ওলগা ইভানভনার গালের উপর পড়ল ওর নিঃশ্বাস। 'তুমি একটা কথা বললেই আমি জীবনকে থামিয়ে দেব, ছুঁড়ে ফেলে দেব আমার শিল্পকলা ... আমায় ভালোবাস, ভালোবাস আমায় ...' অসীম উত্তেজনায় ও বলে চলল।

'অমন করে বোলো না,' ওলগা ইভানভনা চোখ বুজে বলল, 'আমার ভয় করে। দীমভের কী হবে?'

'দীমভ? দীমভের কথা কেন? দীমভের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? এই ভলগা, ঐ চাঁদ, এই সৌন্দর্য, আমার প্রেম, আমার আনন্দ, কিন্তু দীমভ নয় ... কিছু জানতে চাই না আমি, প্রয়োজন নেই অতীতে। আমাকে দাও শুধু একটি মুহূর্ত। শুধু ছোট্ট একটি মুহূর্ত।' ওলগা ইভানভনার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে উঠল। স্বামীর কথা ভাবতে চেষ্টা করল, কিন্তু সমস্ত অতীত — ওর বিয়ে, দীমভ, বুধবারের সন্ধ্যাগুলো মনে হল সব ছোটো, তুচ্ছ, একঘেয়ে, নিরর্থক, সব চলে গেছে দূরে, বহুদূরে... তাছাড়া কিসের দীমভ? কেন দীমভ? কী সম্পর্ক দীমভের সঙ্গে? সত্যিই কি ছিল এমন কেউ, না কি সব স্বপ্ন?

মুখে হাত চাপা দিয়ে নিজের মনকে ও বলল, 'যতটুকু সুখ দীমভ পেয়েছে, তার মতো সাধারণ লোকের পক্ষে তাই যথেষ্ট। ওরা বিচার করুক ওখানে বসে, দিক ওরা অভিশাপ, আমি ধ্বংস হয়ে যাব, হ্যাঁ, ওদের তাচ্ছিল্য করে চলে যাব ধ্বংসের সীমান্তে। জীবনে সব কিছু অনুভব করা দরকার। ওঃ ভগবান, কী ভীষণ অথচ কী সুন্দর!'

'বল বল,' শিল্পী ওকে জড়িয়ে ধরে হাত সতৃষ্ণভাবে চুম্বন করল। ওর হাত দুটো দিয়ে দুর্বল ভাবে সে চেষ্টা করল তাকে সরিয়ে দিতে। শিল্পী মৃদুস্বরে বলে চলল, 'বল তুমি আমায় ভালোবাস! কী অপরূপ, কী মধুর রাত!'

'সত্যি কী অদ্ভুত রাত!' শিল্পীর জলভরা চোখের দিকে চেয়ে ওলগা ইভানভনা ফিসফিস করে বলল। চটপট চারদিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই ওকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটের উপর গভীর চুম্বন দিলো এ'কে।

ডেকের ওপর দিক থেকে কে যেন বলে উঠল, 'আর এক মিনিটের মধ্যে আমরা কিনেশ্‌মা পে'ছে যাব।' সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল ভারি পদশব্দ। খাবার ঘরের লোকটি চলে যাচ্ছিল।

'শোন,' ওলগা ইভানভনা সানন্দে হাসতে হাসতে কাঁদতে কাঁদতে লোকটিকে ডেকে বলল, 'কিছু মদ আনতো আমাদের জন্যে।'

উত্তেজনায় বিবর্ণ শিল্পী একটা বেঞ্চের উপর বসে পড়ে মুগ্ধ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ওলগা ইভানভনার দিকে তাকাল, তারপর চোখ বুজে ক্লান্ত হাসি হেসে বলল, 'আমি শ্রান্ত।'

ধীরে ধীরে তার মাথাটা রেলিংএর উপর নেমে এলো।

৫

সেপ্টেম্বর মাসের দোসরা ছিল গরম ও শান্ত, অথচ কুয়াশাচ্ছন্ন। ভোরের দিকে একটা পাতলা কুয়াশা নেমে এসেছে ভলগার উপর। ন'টার পর ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হল। পরিষ্কার হওয়ার বিন্দুমাত্র আশা নেই। চা খাবার সময় রিয়াবোভস্কি ওলগা ইভানভনাকে বলেছে যে পেণ্টিং হল সব থেকে অকৃতজ্ঞ ও একঘেয়ে আর্ট, সে শিল্পী নয়, একমাত্র নির্বোধরাই ওর প্রতিভায় বিশ্বাস করে। তারপর একেবারে আচমকা একটা ছুরি দিয়ে ওর সব থেকে ভাল স্কেচটা কেটে ফেলেছে। চা খাবার পর ও মনমরা হয়ে জানলার ধারে বসে নদীর দিকে চেয়ে রইল। ভলগা তখন দীপ্তিহীন, ম্লান, নীরস, দেখতে ঠাণ্ডা। চারিদিকে বিষণ্ণ কনকনে শরতের আগমনীর সংকেত। নদীতটের সুন্দর সবুজ আস্তরণ, সূর্যরশ্মির হিরকদ্যুতি, স্বচ্ছ নীল দিগন্ত — প্রকৃতির যা কিছু রম্যদৃশ্য মনে হচ্ছে সবই যেন ভলগা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা সিন্দুকে পুরে রেখে দেওয়া হয়েছে আগামী বসন্ত পর্যন্ত। কাকগুলো নদীর উপর উড়ে উড়ে চিৎকার করে ওকে জ্বালিয়ে মারছে: 'ফাঁকা! ফাঁকা!' রিয়াবোভস্কি ওদের ডাক শুনছে আর মনে মনে বলছে, ওর আঁকা চিরকালের

মতো নিঃশেষ হয়ে গেছে, ওর প্রতিভার মৃত্যু হয়েছে। এ জগতে সবকিছুই নেহাৎ মামুলি, আপেক্ষিক, বুদ্ধিহীন, এই মেয়েটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া ওর উচিত হয়নি। এককথায়, ওর মধ্যে এসেছে নিরুৎসাহ ও অবসাদ।

দেয়ালের অপর পারে বিছানার উপর বসে আছে ওলগা ইভানভনা। সুন্দর রেশমী চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাতে চালাতে কল্পনায় ও নিজেকে দেখছে ওদের ড্রয়িংরুমে, শোবার ঘরে, স্বামীর পড়ার ঘরে। মনে মনে ও চলে যাচ্ছে ওর দর্জির ঘরে, খ্যাতিমান বন্ধুদের কাছে। কী করছে তারা এখন? ওরা কি ওর কথা কখনো ভাবে? 'সীজন' শুরু হয়ে গিয়েছে, বুধবারের সন্ধ্যাগুলোর কথা ভাবার সময় হয়েছে। আর দীমভ? প্রিয় দীমভ! কী বিনম্র শিশুসুলভ অনুযোগের সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে চিঠি লিখছে ও। প্রতিমাসে পঁচাত্তর রুবল করে পাঠাচ্ছে। তাছাড়া ওলগা ইভানভনা যখন জানাল যে শিল্পী বন্ধুদের কাছ থেকে ওকে একশ রুবল ধার করতে হয়েছে, দীমভ আরও একশ রুবল পাঠিয়ে দিয়েছিল। কী সৎ ও উদার মানুষ। এই ভ্রমণ ওলগা ইভানভনাকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। একঘেয়ে লাগছে ওর। এইসব কৃষক আর নদীর ভ্যাপ্‌সা গন্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য ও ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কৃষকদের কুটিরে থাকার আর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াবার সময় সর্বদাই যে শারীরিক অপরিচ্ছন্নতা সে বোধ করে এসেছে সেটাকে ঝেড়ে ফেলার জন্য সে হয়ে উঠেছে আকুল। রিয়াবোভস্কি যদি শিল্পীদের কাছে বিশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থেকে যাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি না দিত, ওলগা ইভানভনা সেইদিনই যেত চলে। কী ভালই না হত!

'ওঃ ভগবান!' রিয়াবোভস্কি গুমরে উঠল, 'সূর্য কি উঠবে না? সূর্য না উঠলে সূর্যোজ্জ্বল ল্যান্ডস্কেপগুলো আঁকব কী করে?'

'মেঘলা আকাশের স্কেচ তো একটা আছে তোমার,' দেয়ালের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে ওলগা ইভানভনা বলল, 'মনে নেই, সেই যে ডানদিকে একটা বন আর একপাল গরু আর হাঁস। সেইটা এখন শেষ করে ফেল না।'

'ঈশ্বরের দোহাই,' বিরক্তিকর মুখভঙ্গী করে শিল্পী বলে উঠল, 'শেষ করে ফেল না! তুমি কি মনে কর আমি এতই বোকা যে কী করতে হবে তাও জানি না?'

'তুমি কী রকম বদলে গেছ।' ওলগা ইভানভনা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'ভালই হয়েছে।'

ওলগা ইভানভনার সারা মুখ উঠল কেঁপে। স্টোভের পাশে সরে গিয়ে ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

'শুরু হল কান্না! চুপ কর! আমারও কাঁদার মতো হাজারটা কারণ আছে, কই আমি তো কাঁদি না।'

'হাজারটা কারণ,' ওলগা ইভানভনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, 'সব থেকে বড় কারণ হল আমার উপর বিতৃষ্ণা এসে গেছে তোমার। হ্যাঁ তাই!' ওর কান্না, বেড়ে চলল, 'আসল কথাটা আমাদের প্রেম নিয়ে তুমি লজ্জা পাচ্ছ। শিল্পীরা পাছে জেনে ফেলে, তাই তুমি ভয় পেয়েছ, অথচ এর মধ্যে লুকোচুরির কিছুই নেই, তাছাড়া ওরা অনেকদিন ধরেই একথা জানে।'

বুকের উপর হাত রেখে অনুনয়ের সুরে শিল্পী বলল, 'ওলগা, আমি শুধু একটা অনুরোধ করছি, আমাকে একা থাকতে দাও, তোমার কাছে আর কিছুই চাই না আমি।'

'কিন্তু শপথ কর যে আমাকে ভালোবাসবে!'

'ওঃ, কী যন্ত্রণা!' দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিস করে কথাগুলো বলে রিয়াবোভস্কি লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'হয় ভলগায় ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন শেষ করে দেব, নয়ত পাগল হয়ে যাব। চলে যাও এখান থেকে।'

'মেরে ফেল, মেরে ফেল আমাকে,' চিৎকার করে উঠল ওলগা ইভানভনা, 'মেরে ফেল আমাকে!'

কান্নায় ফেটে পড়ে দেয়ালের পিছনে চলে গেল ও। খড়ের চালের উপর ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে। দুহাতে মাথা চেপে ধরে রিয়াবোভস্কি কিছুক্ষণ পায়চারি করতে লাগল। খানিক পরে ওর মুখে স্থির সংকল্পের আভাস ফুটে উঠল যেন কারুর সঙ্গে তর্কের জবাব দিচ্ছে। টুপিটা মাথায় দিয়ে, বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে কুটির থেকে বেরিয়ে পড়ল।

ও চলে যাওয়ার পর ওলগা ইভানভনা অনেকক্ষণ ধরে বিছানায় পড়ে পড়ে কাঁদল। প্রথমটা ঠিক করল বিষ খেলে ভালো হত, রিয়াবোভস্কি ফিরে এসে দেখবে ও মরে গেছে। কিন্তু একটু পরে ওর কল্পনা ওকে নিয়ে গেল ওদের ড্রয়িংরুমে, স্বামীর পড়ার ঘরে, সেখানে ও যেন দীমভের পাশে বসে বসে শারীরিক শান্তি ও পরিচ্ছন্নতা উপভোগ করছে, পরক্ষণেই, যেন থিয়েটারে

বসে ম্যার্জিনির গান শুনছে। সহরের সভ্যতা, সহরের কোলাহল খ্যাতিমানদের প্রতি আকর্ষণে ওর বুকটা টন টন করে উঠল।

একটি গ্রাম্য মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল, মন্থর গতিতে স্টোভ ধরিয়ে সে ডিনার তৈরি করতে লেগে গেল। পোড়া কাঠের গন্ধ আসছে, ধোঁয়ায় বাতাস নীল হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে কাদাভরা উঁচু বুট পায়ে বৃষ্টিতে মুখ ভিজিয়ে শিল্পীরা আসতে লাগল। পরস্পরের স্কেচগুলো পরীক্ষা করে ওরা নিজেদের এই বলে সান্ত্বনা দিল যে খারাপ আবহাওয়াতেও ভলগার নিজের সৌন্দর্য আছে। সস্তা দেয়ালঘড়িটা বেজে চলেছে টিক্-টিক্-টিক্। বিগ্রহগুলির ওপাশে কোনের দিকে কতকগুলো মাছির ভন্ভনানি শোনা যাচ্ছে। তাদের শীত করছে। কয়েকটা আরশোলা বেঞ্চের তলায় মোটা মোটা ফাইলগুলোর চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রিয়াবোভস্কি ফিরল সূর্যাস্তের সময়—ক্লান্ত, বিবর্ণ হয়ে। টুপিটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে কাদামাখা বুট পরেই বেঞ্চে বসে চোখ বুজল।

'আমি ক্লান্ত! চোখের পাতা খোলার চেষ্টায় ওর ভুরুদুটো উঠল কুঁচকে।

সহানুভূতি আকর্ষণের আকাংক্ষায় এবং ও যে সত্যি সত্যি রাগ করেনি এইটা দেখানর জন্য ওলগা ইভানভনা রিয়াবোভস্কির দিকে এগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে তাকে চুম্বন করল। তারপর একটা চিরুণী দিয়ে শাদা রেশমের মতো চুল একবার স্পর্শ করল। চুল আঁচড়ানোর ইচ্ছাটা হঠাৎ তার মনে জেগেছে।

'ব্যাপার কী?' রিয়াবোভস্কি চম্‌কে চোখ খুলল, যেন কী একটা ঠাণ্ডা জিনিস তাকে ছুঁয়ে ফেলেছে। 'কী হচ্ছে কী? দয়া করে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।'

ওলগা ইভানভনাকে ঠেলে দিয়ে ও সরে গেল, মনে হল চোখে মুখে বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার ছাপ। ঠিক সেই সময় গ্রাম্য মেয়েটি সাবধানে দু'হাতে বাঁধাকপির সুপের পাত্র নিয়ে এসে দাঁড়াল। ওলগা ইভানভনা দেখল ওর মোটা মোটা আঙ্গুলগুলো সুপে ভিজে গিয়েছে। পেটের উপর শক্ত করে বাঁধা স্কার্ট পরা এই নোংরা মেয়েটা, বাঁধা কপির সুপ, সেই সুপের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়া রিয়াবোভস্কি, এই কুটির, সব মিলে এই যে জীবন, যে জীবনের সরলতা, আর্টিস্টিক অগোছালো ভাব প্রথম প্রথম কী ভালই না লেগেছিল, আজ মনে হল ভয়ংকর। হঠাৎ অপমানিত বোধ করে নীরস কণ্ঠে ওলগা ইভানভনা বলল:

'কিছুদিনের জন্য আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে, তা নাহলে স্রেফ্‌ একঘেয়েমির ফলে আমরা দারুণ ঝগড়া করব। বিরক্তি ধরে গেছে আমার। আমি আজই চলে যাব।'

'কী করে যাবে? ঝাঁটায় চেপে?'

'আজ বৃহস্পতিবার, তাই সাড়ে ন'টার সময় স্টীমার আসবে।'

'তাই নাকি? ও, হ্যাঁ ...বেশ যাও,' ন্যাপকিনের অভাবে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মৃদুস্বরে রিয়াবোভস্কি বলল, 'এখানে তোমার একঘেয়ে লাগছে এবং করার কিছু নেই, আর আমিও এত স্বার্থপর নই যে তোমায় আটকে রাখব। আচ্ছা, কুড়ি তারিখের পর আবার দেখা হবে।'

ওলগা ইভানভনা হালকা মনে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে লাগল। এমন কি খুশিতে ওর গাল দুটো চক্‌চক্‌ করছে। 'সত্যিই কি আবার নিজের ড্রয়িংরুমে বসতে পারবো? আঁকতে পারবো? নিজের শোয়ার ঘরে ঘুমোতে পারবো, পারবো কাপড়ে ঢাকা টেবিলে বসে খেতে?' মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করে। মনে হচ্ছে ওর কাঁধ থেকে যেন একটা ভার নেমে গেছে। রিয়াবোভস্কির উপর আর কোন রাগ ওর নেই।

'রিয়াবুসা, আমার রং আর তুলিগুলো রেখে গেলাম,' ও হাঁক দিয়ে বলল, 'যদি কিছু বাকি থাকে তুমি ফিরিয়ে আনতে পার ... আমি চলে গেলে আলসেমি কোরো না যেন, কাজ করবে কিন্তু; আকাশের দিকে চেয়ে থেকো না, বুঝলে লক্ষ্মী ছেলে, রিয়াবুসা।'

ন'টার সময় রিয়াবোভস্কি ওকে বিদায় চুম্বন দিল। ওলগা ইভানভনা বুঝল, ডেকের উপর শিল্পীদের সামনে এ কাজটি ও করতে চায় না। স্টীমারঘাট পর্যন্ত ওলগা ইভানভনাকে ও পেঁৗছেও দিল। একটু পরেই স্টীমার দেখা গেল। ওলগা ইভানভনা গেল চলে।

আড়াই দিনেই ও বাড়ি পেঁৗছল। টুপি বর্ষাতি না খুলেই উত্তেজনায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে নিতে ড্রয়িংরুমে ঢুকল, সেখান থেকে গেল খাওয়ার ঘরে। দীমভ টেবিলে বসেছিল—সার্ট পরা, ওয়েস্টকোটের বোতাম খোলা, একটা কাঁটায় ছুরি শান দিচ্ছে, সামনে প্লেটের উপর একটা রোস্টকরা বন মোরগ।

বাড়িতে ঢোকার সময় ওলগা ইভানভনা স্থির সংকল্প করেছিল যে স্বামীর কাছে সব চেপে যাবে। এ কাজ যে সে পারবে, সে বিশ্বাসও ওর ছিল।

কিন্তু দীমভের সরল, বিনম্র ও সানন্দ হাসি আর খুশিতে জ্বলজ্বলে চোখ দেখে ওর মনে হল, এরকম একটা মানুষকে ছলনা করা কুৎসা, চুরি বা খুন করার মতো শুধু জঘন্য নীচতা নয়, অসম্ভব, ওর শক্তির বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে ও ঠিক করল, যা কিছু ঘটেছে সব দীমভকে বলবে। দীমভ ওকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করার পর ওলগা ইভানভনা ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দুহাতে মুখ ঢাকল।

'একি! কী হয়েছে, আমাকে ছেড়ে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছিল?' সস্নেহে দীমভ তাকে জিজ্ঞেস করল।

লজ্জায় লাল হয়ে মুখ তুলে দীমভের দিকে অপরাধীর অনুনয় ভরা দৃষ্টিতে সে তাকাল। কিন্তু ভয় ও লজ্জায় সত্যকথা বলতে পারল না।

'না, কিছু না ... আমি একটু ...'

'এস আমরা বসি,' দীমভ ওকে তুলে টেবিলে বসিয়ে দিল। 'হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে... নাও, একটু খাও, তোমার খিদে পেয়েছে।'

ওলগা ইভানভনা সাগ্রহে পরিচিত আবহাওয়ায় নিশ্বাস টানল, তারপর খানিকটা বন মোরগ খেল। আনন্দে হাসতে হাসতে দীমভ ওর দিকে সস্নেহে রইল তাকিয়ে।

৬

শীতের প্রায় মাঝামাঝি একসময় দীমভ বুঝতে পারল ও প্রতারিত হচ্ছে। স্ত্রীর চোখে চোখে ও আর তাকাতে পারে না—যেন ওর নিজের বিবেকই পরিচ্ছন্ন নয়। দেখা হলে সেই আনন্দের হাসিও আর আসে না। ওলগা ইভানভনার সঙ্গে একলা থাকা যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রায়ই ডিনারের সময় ওর বন্ধু করস্তেলেভকে ও বাড়ি নিয়ে আসে। লোকটি ছোট্টখাট্ট, কদমছাঁট চুল, কুণ্ঠিত মুখ। ওলগা ইভানভনা কথা বললেই বেচারা লজ্জায় কোটের বোতামগুলো একবার খোলে একবার বন্ধ করে, আর ডান হাত দিয়ে বাঁ দিকের গোঁফ পাকায়। ডিনারের সময় দুই ডাক্তারে আলোচনা হয়—ডায়াফ্রামটা বেশি উঁচু হলে সময় সময় কীরকম বুক ধড়ফড় করে, সম্প্রতি স্নায়বিক রোগ কীরকম বেড়ে গিয়েছে, কিংবা আগের দিন একটি 'পারনিসাস্ এ্যানিমিয়া' রোগীর শব ব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে দীমভ কেমন করে আবিষ্কার করেছে যে আসলে রোগীটির হয়েছিল প্যাঙক্রিয়াসের ক্যানসার। ওরা

এমনভাবে চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা চালায় যাতে ওলগা ইভানভনা কোন কথা বলার, অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলার সুযোগ না পায়। ডিনারের পর করস্তেলেভ পিয়ানোর কাছে গিয়ে বসে, আর দীমভ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে:

'কই হে বন্ধু, দেরী করছ কেন? একটা বিষণ্ণ মধুর কিছু শোনাও!'

কাঁধটা উঁচু করে আঙুলগুলো খেলিয়ে কয়েকটা ঝঙ্কার তুলে চড়া সুরে করস্তেলেভ গাইতে থাকে: 'আমাদের দেশে এমন একটা জায়গা দেখাও যেখানে রুশী চাষীরা আর্তনাদ করে না!'

আর আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের মুঠিতে মাথা রেখে দীমভ চিন্তায় ডুবে যায়।

ওলগা ইভানভনা ইতিমধ্যে অত্যন্ত অসাবধান হয়ে উঠেছে। রোজ সকালে ঘুম ভাঙে বিশ্রী মেজাজে। মনে হয় রিয়াবোভস্কিকে বুঝি আর ভালবাসে না, ওদের মধ্যে সম্পর্ক বুঝি চুকে গেছে। কিন্তু এক কাপ কফি খাওয়ার পর হঠাৎ মনে পড়ে যায় রিয়াবোভস্কি ওর স্বামীকে কেড়ে নিয়েছে, এখন ওর স্বামীও নেই, রিয়াবোভস্কিও নেই। আবার মনে পড়ে যায় ওর বন্ধুরা বলছিল রিয়াবোভস্কি নাকি প্রদর্শনীর জন্য একটা অপূর্ব ছবি আঁকছে, ছবিখানা পলেনভ্ স্টাইলের দৃশ্যপট ও সমস্যামূলক অংকনের সংমিশ্রন, যারাই স্টুডিওতে যাচ্ছে, সবাই নাকি মুগ্ধ! ওলগা ইভানভনা ভাবে রিয়াবোভস্কি এ ছবি আঁকতে পেরেছে শুধু ওর প্রভাবে, ওরই প্রভাবে রিয়াবোভস্কির এই উন্নতি। সে প্রভাব এত কল্যাণময়, এত বাস্তব যে এখন ওলগা ইভানভনা ওকে পরিত্যাগ করলে ও হয়ত চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তাছাড়া মনে পড়ে যায় গতবার ও যখন দেখা করতে এসেছিল, ওর পরনে ছিল রুপোলি সুতোর কাজ করা ছাই রংএর কোট আর একটা নতুন টাই এবং ক্লান্ত গলায় ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে?' সত্যিই ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল, চমৎকার কোট, লম্বা লম্বা কোঁকড়া চুল, নীল চোখ (অন্তত ওর তাই মনে হয়েছিল)। ওলগা ইভানভনার প্রতি সে অনুরাগও দেখিয়েছিলো।

এইসব এবং আরও অনেককিছু মনে করে, এবং তাই থেকে সিদ্ধান্ত টেনে ওলগা ইভানভনা সাজসজ্জা করে উত্তেজিত অবস্থায় রিয়াবোভস্কির স্টুডিওতে হাজির হল। শিল্পীকে প্রায়ই খোস্‌মেজাজে নিজের ছবি সম্পর্কে গর্ব

করতে দেখা যায়। ছবিখানা চমৎকার। মেজাজ ভাল থাকলে ও ভাঁড়ামি করে হাসিঠাট্টা করে গুরুতর প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। ওলগা ইভানভনা কিন্তু ছবিখানাকে হিংসা করে, দু চক্ষে দেখতে পারে না। তা সত্ত্বেও প্রতিবারই মিনিট পাঁচেক ধরে নীরব বিনয়ে ছবিখানার সামনে দাঁড়িয়ে দেবমূর্তির সামনে মানুষ যেভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেইরকম দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলে:

'তুমি আগে কখনো এমনটি আঁকনি। আমার কেমন যেন ভয় ভয় করে।'

তারপরই রিয়াবোভস্কির কাছে মিনতি জানায় সে যেন ওকে ভালোবাসে, যেন ওকে পরিত্যাগ না করে, যেন ওর মত অসুখী বেচারার প্রতি অনুকম্পা দেখায়। ও কাঁদে, রিয়াবোভস্কির হাত ধরে চুম্বন করে, ওকে ভালবাসার প্রতিশ্রুতি আদায়ের করে চেষ্টা, প্রমাণ করে যে ওর প্রভাব না থাকলে রিয়াবোভস্কি পথচ্যুত হবে, হারিয়ে যাবে। এইভাবে শিল্পীর মেজাজটা খারাপ করে দিয়ে এবং নিজেকে হীন করে ও চলে যায় দর্জির কাছে কিংবা কোন অভিনেত্রী বান্ধবীর কাছে থিয়েটারের টিকিটের খোঁজে।

যেদিন স্টুডিওতে রিয়াবোভস্কির দেখা পাওয়া যায় না, ও ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখে রেখে আসে, রিয়াবোভস্কি যদি সেইদিনই ওর সঙ্গে দেখা না করে ও তাহলে বিষ খাবে। ভয় পেয়ে রিয়াবোভস্কিকে যেতে হয়, ডিনার পর্যন্ত হয় থাকতে। দীমভের উপস্থিতি গ্রাহ্য না করে ওরা পরস্পরকে অপমানসূচক কথা বলে। দুজনেই অনুভব করে, ওরা পরস্পরের পথের কাঁটা, উৎপীড়ক, শত্রু। ফলে ওরা রাগে এমনি জ্বলে যে নিজেদের অশিষ্টাচার সম্পর্কে জ্ঞান থাকে না। এমনকি কদমছাঁট করস্তেলেভের কাছেও ওদের ব্যাপারটা আর চাপা থাকে না। ডিনারের পর রিয়াবোভস্কি তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে যায় চলে।

'কোথায় যাচ্ছ?' হলঘরে এসে ঘৃণাভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে ওলগা ইভানভনা জিজ্ঞাসা করে।

ভুরুটা কুঁচকে চোখ দুটো ছোট করে রিয়াবোভস্কি হয়ত এমন কোন মহিলার নাম করে যাকে ওরা দুজনেই চেনে। স্পষ্টই বোঝা যায় ওলগার ঈর্ষা নিয়ে ও মজা করছে, ওকে চটাবার চেষ্টা করছে। ও চলে গেলে ওলগা ইভানভনা শোবার ঘরে গিয়ে এলিয়ে পড়ে। রাগে, ঈর্ষায়, লজ্জায়, অপমানে ও বালিশ কামড়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ফোঁপাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত করস্তেলেভকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে দীমভ বিব্রত ও লজ্জিত মুখে ঘরে ঢোকে।

'কে'দ না। কী লাভ বল? এসব ব্যাপারে চুপচাপ থাকাই ভাল... জানাজানি হওয়া উচিত নয় ... যা হয়ে গেছে, তা ত আর ফিরবে না,' দীমভ মৃদুস্বরে বলে।

দারুণ ঈর্ষা দমন করতে না পেরে ওলগা ইভানভনার রগদুটো দপ্ দপ্ করতে থাকে। হয়ত সবকিছু এখনো আয়ত্তের বাইরে চলে যায়নি এই ভেবে ও উঠে মুখ ধুয়ে অশ্রুসিক্ত মুখে পাউডার দেয়, এবং পরক্ষণেই রিয়াবোভস্কি যে মেয়েটির নাম বলেছিল তার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। সেখানে রিয়াবোভস্কিকে না পেয়ে যায় অপর কারও বাড়ি, সেখান থেকে অন্য কোথাও। প্রথম প্রথম এইভাবে ঘোরাঘুরি করতে ওর লজ্জা করত, কিন্তু ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে গেল। সময় সময় এমনও হয় যে হয়ত এক সন্ধ্যায় ওর জানাশোনা সব মেয়ের বাড়িই রিয়াবোভস্কির খোঁজে ঘোরে এবং তারা সকলেই ওর উদ্দেশ্য পারে বুঝতে।

একদিন ওলগা ইভানভনা রিয়াবোভস্কির কাছে ওর স্বামীর সম্পর্কে বলল, 'এই লোকটি উদারতা দেখিয়ে আমার উপর নির্যাতন করে।'

কথাটা বলতে ওর এত ভাল লাগে যে শিল্পী মহলে যারা ওর আর রিয়াবোভস্কির গোপন ব্যাপারটা জানত তাদের সঙ্গে দেখা হলেই খুব জোরের সঙ্গে হাত নেড়ে ও স্বামীর সম্পর্কে বলে:

'এই লোকটি উদারতা দেখিয়ে আমার উপর নির্যাতন করে।'

ওদের জীবন যাত্রা আগের মতোই চলতে থাকে। বুধবার সন্ধ্যায় বাড়িতেই অতিথি সমাগম হয়। অভিনেতা আবৃত্তি করেন, শিল্পীরা আঁকেন, বেহালা বাদক বাজনা বাজান, গায়ক গান গান, এবং ঠিক সাড়ে এগারটার সময় খাওয়ার ঘরের দরজা খুলে যায় আর হাসি হাসি মুখে দীমভ ডাক দেয়, 'ভদ্রমহোদয়গণ! খাবার প্রস্তুত।'

আগের মতোই ওলগা ইভানভনা বিখ্যাত বিখ্যাত লোকদের খুঁজে বের করে এবং তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে অন্যদের সন্ধান করে। একইভাবে প্রতিরাতেই ও দেরী করে বাড়ি ফেরে, কিন্তু আগের মতো দীমভ আজকাল আর ঘুমিয়ে পড়ে না, পড়ার ঘরে বসে কিছু একটা কাজ করে। রাতে তিনটায় সে শুতে যায় আর ওঠে আটটার সময়।

একদিন সন্ধ্যায় থিয়েটারে যাওয়ার আগে ওলগা ইভানভনা শেষবারের মতো আয়নায় মুখ দেখে নিচ্ছে, এমন সময় ফ্রককোট ও সাদা টাই পরে দীমভ ঘরে ঢুকল। ক্ষীণ হেসে ও সোজা ওলগা ইভানভনার চোখের দিকে তাকাল, যেমন করে আগে তাকাত। মুখখানা বেশ উজ্জ্বল।

'আমার থিসিসটা এইমাত্র পেশ করে এলাম,' বসে পড়ে হাঁটুর কাছে ট্রাউজারে হাত বোলাতে বোলাতে ও বলল।

'ভাল হয়েছে?' ওলগা ইভানভনা জিজ্ঞাসা করল।

'হয়নি?' হেসে গলাটা বাড়িয়ে আয়নায় স্ত্রীর মুখ দেখার চেষ্টা করে দীমভ বলল। ওলগা ইভানভনা তখনো পর্যন্ত পিছন ফিরে শেষবারের মতো চুলটা ঠিক করে নিচ্ছিল। 'হয়নি?' সে আবার বলল। 'খুব সম্ভব ওরা আমাকে জেনারেল প্যাথলজির 'ডোসেণ্ট' করে নেবে। মনে হয় তাই হবে।'

ওর আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে ওলগা ইভানভনা যদি ওর বিজয় সুখের অংশভাগিনী হত, দীমভ ওকে ক্ষমা করত, বর্তমান ভবিষ্যৎ সবকিছু ভুলে যেত। কিন্তু ওলগা ইভানভনা কিছুই বুঝল না, না বুঝল 'ডোসেণ্ট', না 'জেনারেল প্যাথলজি'র অর্থ। শুধু তাই নয়, থিয়েটারে দেরী হয়ে যাওয়ার ভয়ে ও কোন কথাই বলল না।

কয়েক মিনিট বসে থেকে মার্জনা চাওয়ার ভঙ্গীতে ক্ষীণ হেসে দীমভ উঠে চলে গেল।

৭

দিনটা ভীষণ অশান্ত।

দীমভের প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। সকালে চা খায়নি, হাসপাতালেও যায়নি, সারাদিন পড়ার ঘরের সোফায় শুয়েছিল। ওলগা ইভানভনা যথারীতি বারটার একটু পরেই রিয়াবোভস্কির কাছে চলে গেল, নিজের আঁকা 'nature morte,' স্কেচ দেখাতে এবং কেন ও আগেরদিন আসেনি জিজ্ঞাসা করতে। ওর মতে স্কেচটা ভাল হয়নি, বেরুনো ও দেখা করার একটা অজুহাত হিসাবেই ওটা এঁকেছে।

ঘণ্টা না বাজিয়েই ও বাড়ি ঢুকে হলঘরে গালোশ খুলতে লাগল। হঠাৎ মনে হল, স্টুডিওর মধ্যে মৃদু পদধ্বনির সঙ্গে মেয়েলি পোষাকের খস্ খস্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। চকিতে ভিতরের দিকে চোখ ফেরাতেই একটা বাদামী রং এর

স্কার্ট মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়ে পরক্ষণেই আভূমি কাল কাপড়ে ঢাকা একটা ক্যানভ্যাসের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওলগা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারল ওখানে একটি মেয়ে লুকিয়ে আছে। ও নিজেই কতবার ঐ ক্যানভাসের পিছনে লুকিয়েছে!

বিব্রত রিয়াবোভস্কি যেন ওকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে এইভাবে ওর দিকে দুই হাত মেলে দিল, তারপর কষ্টকৃত হাসি হেসে বলল, 'ও, তুমি! খুশি হলাম। তারপর, কী খবর?'

ওলগা ইভানভনার চোখে জল এসে গেল, লজ্জায় ও দীনতায় ভরে গেল ওর মন। কিন্তু অন্য একটি মেয়ের সামনে, ক্যানভাসের পিছনে লুকিয়ে-থাকা এই প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে, ঐ মিথ্যাবাদিনীর সামনে লাখ টাকা দিলেও কোনো কথা বলতে রাজী হতে পারত না ও। নিশ্চয় মেয়েটা ওখানে দাঁড়িয়ে মনে মনে হাসছে।

'আমার স্কেচটা দেখাতে এনেছিলাম, একটা nature morte,' করুণ ক্ষীণ গলায় ও বলল। ওর ঠোঁটদুটো কাঁপতে লাগল।

'ও, স্কেচ ...'

শিল্পী স্কেচটা হাতে নিয়ে চোখ দুটো ছবির উপর নিবদ্ধ করে যেন অন্যমনস্কভাবে পাশের ঘরে ঢুকল। ওলগা ইভানভনা অনুগতভাবে ওর অনুসরণ করল।

'Nature morte ... পোর্ট...' যন্ত্রের মত মৃদুস্বরে শিল্পী মিল আউড়াতে থাকে, 'স্পোর্ট ... কুরোর্ট ...'

স্টুডিও থেকে ভারী পদধ্বনি ও পোষাকের খস্ খস্ শব্দ ভেসে এল। অর্থাৎ মেয়েটি চলে গেল। ওলগা ইভানভনার মনে হল চিৎকার করে ওঠে, ইচ্ছা হল ভারী একটা কিছু দিয়ে শিল্পীর মাথায় আঘাত করে, তারপর দৌড়ে পালায়। কিন্তু চোখের জলে ও যে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না, অপমানে ও যে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। মনে হল ও শিল্পী নয় আর ওলগা ইভানভনাও নয়, অতি দীন, অতি ক্ষুদ্র জীব।

'আমি ক্লান্ত,' ছবিটার দিকে চোখ রেখেই অবসন্নকণ্ঠে শিল্পী বলল। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ঝাঁকিয়ে ঝিমোন ভাব দূর করার করল চেষ্টা। 'ভালই হয়েছে ... কিন্তু, আজও স্কেচ, গতবছরেও স্কেচ, একমাস পরেও সেই স্কেচ্ ... আচ্ছা,

তোমার বিরক্তি লাগে না? আমি হলে আঁকা ছেড়ে গান বাজনা কিংবা অন্য কোন বিষয় নিতাম। তুমি তো জান, তুমি আর্টিস্ট নও, তুমি বাজিয়ে কিন্তু, উঃ, কী ক্লান্ত হয়ে পড়েছি! দাঁড়াও একটু চা দিতে বলি, কেমন?'

রিয়াবোভস্কি পাশের ঘরে চলে গেল। ওলগা ইভানভনা শুনতে পেল ও চাকরকে কী যেন বলছে। বিদায় নেওয়া এবং কেলেঙ্কারী এড়ানোর জন্য, বিশেষ করে, ঠেলে-আসা কান্না চাপার জন্য রিয়াবোভস্কি ফিরে আসার আগেই ও দৌড়ে হলঘরে ঢুকে পড়ল, তারপর গালোশ পরে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় এসে ও আরামের নিঃশ্বাস ফেলল। যাক্, শেষ পর্যন্ত রিয়াবোভস্কি, আর্ট, আর যে দারুণ লজ্জা স্টুডিওতে ও অনুভব করেছিলো তাকে চিরকালের মতো ঝেড়ে ফেলা গিয়েছে। সব শেষ।

প্রথমে ও গেল দর্জির কাছে। সেখান থেকে বারনাই-এর বাড়ি। বারনাই সদ্য ফিরেছে। তারপর গেল বাজনার দোকানে। সারাক্ষণ ও ভাবছে, রিয়াবোভস্কিকে একখানা নীরস, নির্মম অথচ আত্মমর্যাদাপূর্ণ চিঠি লিখতে হবে, আগামী বসন্তে কিংবা গ্রীষ্মে দীমভের সঙ্গে চলে যাবে ক্রিমিয়ায়, তারপর সমস্ত অতীত ধুয়ে মুছে সাফ্ হয়ে যাবে, শুরু হবে নতুন জীবন।

অনেক রাত করে ও বাড়ি ফিরল। অন্যদিনের মতো নিজের ঘরে গিয়ে জামা কাপড় না খুলে সোজা ড্রয়িংরুমে ঢুকল। চিঠিখানা লিখতে হবে। রিয়াবোভস্কি বলেছে ও নাকি আর্টিস্ট নয়। ও পাল্টা জবাব দেবে যে রিয়াবোভস্কিও বছরের পর বছর একই ধরনের ছবি আঁকছে, প্রতিদিনে একই কথা বলছে, জানাবে যে ও আর এগুচ্ছে না, যতটুকু সাফল্য পেয়েছে তার বেশি আর কিছু ওর হবে না। আরও জানিয়ে দেবে যে ওলগা ইভানভনার কল্যাণকর প্রভাবের জন্য ওর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এবং এখন যে রিয়াবোভস্কি বেচালে চলেছে, তার কারণ কতকগুলো কুখ্যাত জীবের কাছে, যাদের মধ্যে একজন আজ ছবির পিছনে লুকিয়ে ছিল, ওলগা ইভানভনার প্রভাব ভোঁতা হয়ে গেছে।

'ওগো,' পড়ার ঘর থেকে দরজা না খুলেই দীমভ ডাক দিল, 'ওগো!'

'কী চাই?'

'আমার কাছে এস না, দরজার কাছে দাঁড়াও। শোন, আমার ডিপথিরীয়া

হয়েছে, দু একদিন আগে হাসপাতাল থেকেই ধরেছে... খুব খারাপ লাগছে এখন। একবার করস্তেলেভকে ডেকে পাঠাও।'

ওলগা ইভানভনা ওর স্বামীর কুলনাম ধরেই ডাকত। বন্ধু বান্ধবদেরও ও ঐ নামে ডাকত। দীমভের নাম ছিল ওসিপ। নামটা ওলগা ইভানভনার ভাল লাগত না, কারণ সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পরে যেত গোগলের ওসিপের কথা, ওসিপ আর আরখিপ এই দুটো নামের উপর বোকা বোকা ছড়ার কথা। আজ কিন্তু দীমভের কথা শুনে ও চেঁচিয়ে উঠল:

'বল কি ওসিপ! না না, এ হতেই পারে না!'

'ওকে ডেকে পাঠাও, আমার খুব খারাপ লাগছে,' ঘরের মধ্য থেকে দীমভ বলে উঠল। ওলগা ইভানভনা শুনতে পেলো দীমভ সোফার কাছে হেঁটে গিয়ে শুয়ে পড়ল। 'করস্তেলেভকে ডেকে পাঠাও একবার,' দীমভের গলার স্বর ভাঙ্গা।

ভয়ে হিম হয়ে গিয়ে ওলগা ইভানভনা ভাবল, 'সত্যিই কি এটা হতে পারে? এ যে ভয়ঙ্কর!'

মোমবাতিটা যে ও কেন জবালল তা নিজেই জানে না। কী করবে ভাবতে ভাবতে শোবার ঘরে ঢুকে হঠাৎ আয়নাতে ও নিজেকে দেখতে পেল। মুখখানা ভয়ার্ত, বিবর্ণ, পরনের জ্যাকেটের হাতদুটো উঁচু, ফোলা ফোলা, সামনের দিকে হলদে রং-এর ঝালর লাগান, খামখেয়ালীভাবে আড়াআড়ি লাইন টানা স্কার্ট — একটা অদ্ভুত আতঙ্কজনক, বিতৃষ্ণাকর চেহারা। দীমভের প্রতি অসীম অনুকম্পা জেগে উঠল ওলগা ইভানভনার মনে, ওর অচঞ্চল প্রেম, ওর তরুণ জীবন, এমন কি ওর নিঃসঙ্গ শয্যার প্রতি। কতকাল সে শয্যায় ও ঘুমোয়নি। মনে পড়ে গেল সব সময় ওর মুখে লেগে-থাকা বিনম্র, বিনীত হাসিটুকু। অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে ওলগা ইভানভনা করস্তেলেভকে আসার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখল। রাত তখন দুটো।

৮

পরদিন সকাল সাতটার পরে ওলগা ইভানভনা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল, অনিদ্রায় মাথাটা ভারী, চুল আঁচড়ান হয়নি, সাদাসিধে মুখে অপরাধীর ছাপ। হলঘরে ঢুকতেই কাল দাড়িওলা এক ভদ্রলোক, মনে হল ডাক্তার, ওর পাশ

দিয়ে চলে গেলেন। ওষুধের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। পড়ার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে করস্তেলেভ ডান হাত দিয়ে বাঁ দিকের গোঁফ পাকাচ্ছিল। ওলগা ইভানভনাকে দেখে ও বিষণ্ণ স্বরে বলল, 'খুবই দুঃখিত, কিন্তু আপনাকে ওর কাছে যেতে দিতে পারব না, তাতে আপনার ছোঁয়াচ লাগতে পারে। তাছাড়া আপনার যাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই, ওর বিকার হয়েছে।'

'ওর কি সত্যিই ডিপথিরীয়া হয়েছে?' ওলগা ইভানভনা ফিস্‌ফিস্‌ করে জিজ্ঞাসা করল।

'যারা বিপদকে ডেকে আনে, তাদের জেল হওয়া উচিত,' ওলগা ইভানভনার কথার জবাব না দিয়ে করস্তেলেভ বিড়বিড় করে বলল। 'জানেন ও কী করে অসুখটা বাধিয়েছে? একটা ছোট ছেলের ডিপথিরীয়া হয়েছিল, মঙ্গলবারে ও মুখ দিয়ে তার গলা থেকে পুঁজ টেনে নিয়েছিল। কী চূড়ান্ত বোকামি! কী পাগলামি!'

'খুব ভয়ের ব্যাপার?' ওলগা ইভানভনা জিজ্ঞেস করল।

'ওরা তো বলছে রোগ খুব খারাপ। আমাদের উচিত একবার স্রেককে ডাকা।'

এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন, তাঁর চেহারাটা ছোট্টখাট্ট, লাল চুল, লম্বা নাক, ইহুদীর মত উচ্চারণ ভঙ্গী। তারপর দীর্ঘকায়, একটু নুয়ে-পড়া, লোমশ, বেশ হোমরাচোমরা ধরনের আর একজন, সবশেষে একজন অল্পবয়সী লোক, মোটা মুখখানা লাল, চোখে চশমা। এরা সবাই ডাক্তার, রুগ্ন বন্ধুর কাছে পালা করে ডিউটি দিতে এসেছে। করস্তেলেভের পালা শেষ হওয়া সত্ত্বেও ও বাড়ি যায়নি, ভূতের মতো ঘরের ভিতর পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। পরিচারিকা ডাক্তারদের জন্য চা তৈরি করে দিচ্ছে, আর অনবরত ডাক্তারখানায় দৌড়চ্ছে। ফলে ঘরদোর পরিষ্কার করার কেউ নেই। বাড়িটা ভীষণ নিস্তব্ধ, ভীষণ বিষণ্ণ।

শোবার ঘরে বিছানায় বসে ওলগা ইভানভনা ভাবে স্বামীকে ছলনা করার জন্য ঈশ্বর ওকে শাস্তি দিচ্ছেন। নীরব, অভিযোগহীন, দুর্বোধ্য, ভালমানুষির জন্য ব্যক্তিত্বহীন, আত্মসমর্পণকারী, অত্যধিক দয়ায় দুর্বল মানুষটা সোফায় শুয়ে নীরবে যন্ত্রণা ভোগ করছে। ও যদি ওর কষ্টের কথা বলত, এমনকি বিকারে ভুলও বকত, ওর পাশে পাহারারত ডাক্তাররা বুঝতে পারত যে ওর যন্ত্রণার জন্য দায়ী শুধু ডিপথিরীয়া নয়। করস্তেলেভকে জিজ্ঞাসা করলেও

ওরা ব্যাপারটা ধরতে পারত, কারণ ও সবই জানে। আর ঠিক সেইজন্যই করস্তেলেভ বন্ধুপত্নীর দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যাতে মনে হচ্ছিল, ও যেন বলতে চায়, আসল আসামী হচ্ছে ওলগা ইভানভনা, ডিপথিরীয়া তার সহযোগী মাত্র। ভলগার চাঁদনী রাত, ভালোবাসার সেই সব প্রতিশ্রুতি, কৃষক কুটিরের সেই কাব্যময় জীবন — সব ও ভুলে গেল, শুধু মনে হল যেন খামখেয়ালী তুচ্ছ আনন্দের জন্য ওর সারা দেহ পূতিগন্ধময় চট্‌চটে কিসের মধ্যে ডুবে গিয়েছে — ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হওয়ার কোন উপায় নেই।

‘ওঃ কী মিথ্যাবাদী আমি,’ রিয়াবোভস্কি আর নিজের মধ্যে অশান্ত প্রেমের কথা স্মরণ করে ও মনে মনে বলল, ‘চুলোয় যাক্‌...’

চারটের সময় ও করস্তেলেভের সঙ্গে ডিনারে বসল। করস্তেলেভ কিছুই খেল না, শুধু খানিকটা লাল মদ খেল আর বসে বসে ভুরু কোঁচকাল। ওলগা ইভানভনাও কিছু খেল না। ও শুধু নীরবে প্রার্থনা জানাল আর ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করল যে দীমভ যদি সেরে ওঠে, এরপর থেকে ওলগা ইভানভনা ওকে ভালোবাসবে, বিশ্বস্তা স্ত্রী হয়ে থাকবে। তারপর মুহূর্তের জন্য সবকিছু ভুলে গিয়ে করস্তেলেভের দিকে চেয়ে ভাবল, ‘এইরকম কোঁচকান মুখ আর অভদ্র ব্যবহার নিয়ে এইরকম নগণ্য অখ্যাত লোক হওয়া সত্যিই কী বিরক্তিকর!’ পরক্ষণেই ওর মনে হোল ও যে সংক্রমণের ভয়ে স্বামীর ঘরে গেল না, এর জন্য ঈশ্বর এক্ষুনি ওকে মেরে ফেলবেন। ওর মনের মধ্যে ছিল একটা বিষণ্ণ দুঃখবোধ আর সেই সঙ্গে একটা দৃঢ় ধারণা যে নিজের জীবনটা ধ্বংস হয়ে গেল, কোনো দিন তার সংস্কার হবে না।

ডিনার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে এল। ড্রয়িংরুমে গিয়ে ওলগা ইভানভনা দেখল করস্তেলেভ সোনালী কাজ করা কুশনে মাথা দিয়ে সোফার উপর নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

যে সব ডাক্তাররা রোগীর কাছে যাতায়াত করছিলেন তাঁরা অবশ্য এইসব বিশৃঙ্খলার কিছুই দেখলেন না। ড্রয়িংরুমে এই বাইরের লোকটির নাকডাকা, দেয়ালের ছবিগুলো, খামখেয়ালী আসবাবপত্র, গৃহকর্ত্রীর অগোছাল চুল ও অবিন্যস্ত পোষাক — এর কোনকিছুই এখন আর বিন্দুমাত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করছে না। ডাক্তারদের মধ্যে একজন কী একটা ব্যাপারে হেসে উঠলেন। হাসিটা এমন অদ্ভুত, ক্ষীণ যে সবাই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করল।

পরেরবার ড্রয়িংরুমে গিয়ে ওলগা ইভানভনা দেখল করস্তেলেভ জেগে সোফায় বসে সিগারেট খাচ্ছে।

'ডিপথিরীয়াটা নাকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে,' করস্তেলেভ মৃদুস্বরে বলল, 'হার্টের উপরেও চাপ পড়ছে। খুব খারাপ মনে হচ্ছে।'

'স্রেক্‌কে ডেকে পাঠাচ্ছেন না কেন?' ওলগা ইভানভনা জিজ্ঞাসা করল।

'তিনি এসেছিলেন। তিনিই তো দেখলেন, নাক পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে। তাছাড়া স্রেক্ কে? সত্যি কথা বলতে গেলে স্রেক্ বলে কিছুই নেই, ওঁর নাম স্রেক্, আর আমার নাম করস্তেলেভ — এই যা।'

যন্ত্রণাদায়ক মন্থরগতিতে সময় কাটতে লাগল। ওলগা ইভানভনা জামাকাপড়-পরা অবস্থাতেই বিছানার উপর তন্দ্রাভিভূতা। সকাল থেকে বিছানাটা পরিষ্কার করা হয়নি। তন্দ্রার মধ্যে ওলগা ইভানভনার মনে হোল সারা বাড়িটা মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত যেন একটা বিরাট লৌহপিণ্ডে ভরাট হয়ে আছে।

যদি কোন রকমে এই লৌহপিণ্ডটা সরান যায়, সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। চম্‌কে জেগে উঠে ও বুঝতে পারল ব্যাপারটা লৌহপিণ্ড নয়, দীমভের অসুস্থতা।

আবার তন্দ্রাভিভূতা হয়ে ও মনে মনে আওড়াতে লাগল 'nature morte... পোর্ট, স্পোর্ট, কুরোর্ট ... স্রেক্ ... কে স্রেক? স্রেক, ট্রেক ...রেক... ক্রেক। আর এখন আমার বন্ধুরা সব কোথায়? তারা কি জানে আমাদের বিপদের কথা? ওঃ ভগবান, দয়া কর, রক্ষা কর আমাদের ... স্রেক, ট্রেক ...'

তারপর আবার সেই লৌহপিণ্ড ...

সময় যেন কাটে না। নীচের তলায় ঘড়িটা অবশ্য প্রায় বাজছে। মাঝে মাঝে দরজায় ঘণ্টা বাজছে — ডাক্তাররা আসছেন দীমভের কাছে ... ট্রের উপর কয়েকটা খালি গ্লাস নিয়ে পরিচারিকা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, 'মাদাম, বিছানাটা করে দেব?'

সাড়া না পেয়ে সে চলে গেল। একতলার ঘড়িটা বেজে উঠল। ওলগা ইভানভনা স্বপ্ন দেখছে ভলগার উপর বৃষ্টি হচ্ছে ... আবার কে একজন ঘরে ঢুকল, মনে হচ্ছে অপরিচিত কেউ।

তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসে ও চিনতে পারল করস্তেলেভকে।

‘ক’টা বেজেছে?’ ওলগা ইভানভনা জিজ্ঞাসা করল।

‘প্রায় তিনটে।’

‘ও কেমন আছে?’

‘কেমন আছে? আপনাকে খবর দিতে এলাম দীমভ মারা যাচ্ছে ...’

ঠেলে-আসা কান্না গিলে ফেলে করস্তেলেভ বিছানায় বসে পড়ল, তারপর জামার হাতায় চোখের জল ফেলল মুছে। ওলগা ইভানভনা প্রথমটা বুঝতে পারেনি, কিন্তু পরক্ষণেই হিম হয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে ক্রুশচিহ্ন আঁকতে লাগল।

‘হ্যাঁ, মারা যাচ্ছে,’ আবার কান্না গিলে ফেলে ক্ষীণ গলায় করস্তেলেভ বলল, ‘মারা যাচ্ছে, কারণ জীবনকে ও আহুতি দিয়েছে। বিজ্ঞানের কী প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে গেল।’ তিক্তভাবে সে বলে চলল, ‘আমাদের সবাইকার তুলনায় ও ছিল মহান অসাধারণ মানুষ! কী প্রতিভা! কত আশাই না ও আমাদের সবাইকার মধ্যে জাগিয়েছিল!’ হাত মোচড়াতে মোচড়াতে করস্তেলেভ বলে চলল, ‘ওঃ ভগবান, কত বড়, কী অসামান্য বিজ্ঞানী ও হতে পারত! ওসিপ দীমভ, কী করলে তুমি! ওঃ ভগবান!’

হতাশায় দুহাতে মুখ ঢাকল ও।

‘কী নৈতিক শক্তি!’ যেন কারুর উপর ক্রমেই রেগে রেগে উঠছে এইভাবে বলতে লাগল করস্তেলেভ, ‘দয়ালু, স্নেহার্দ্র, নিষ্কলুষ হৃদয় — স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। বিজ্ঞানের সেবা করতে করতে বিজ্ঞানের জন্যই প্রাণ দিল। দিনরাত বলদের মতো পরিশ্রম করেছে, কেউ ওর উপর মমতা দেখায়নি। তরুণ বিদ্বান, ভবিষ্যৎ অধ্যাপক প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ করে, রাত জেগে অনুবাদ করে যতসব হতভাগাদের জন্য খরচ জোগাত।’

ঘৃণা ভরা দৃষ্টিতে ওলগা ইভানভনার দিকে চেয়ে করস্তেলেভ দুহাতে বিছানার চাদরটা ধরে রেগে টান মারল, যেন চাদরটাই দোষী।

‘কেউ ওর প্রতি মমতা দেখায়নি, ও নিজেও না। কিন্তু বলে লাভ কী?’

‘হ্যাঁ, অসাধারণ মানুষ!’ বসার ঘর থেকে কার যেন গভীর গলা শোনা গেল।

ওলগা ইভানভনার মনে পড়ে গেল দীমভের সঙ্গে ওর সমস্ত জীবনের কথা, সেই প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি খুঁটিনাটি ওর চোখের সামনে

ভেসে উঠল। আর হঠাৎ ওর মনে হল সত্যিই দীমভ ছিল একজন অসাধারণ, বিশিষ্ট এবং ওর জানাশোনা যত লোক তাদের তুলনায় মহান। ওলগা ইভানভনার স্বর্গগত বাবা এবং দীমভের সহকর্মীরা ওকে যেভাবে দেখতেন সে সব ঘটনা মনে করে ও বুঝতে পারল যে ওঁরা সবাই দীমভের মধ্যে একজন খ্যাতিমান পুরুষের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। ওলগা ইভানভনার মনে হল যেন দেয়াল, ছাদ, বাতি, এমনকি কার্পেটটা পর্যন্ত ওর দিকে চোখ টিপে ঠাট্টা করে বলছে, 'তুমিই সুযোগ হারিয়েছ!'

কাঁদতে কাঁদতে ও ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ড্রয়িংরুমে অপরিচিত কে একজনের সঙ্গে প্রায় ধাক্কা খেতে গিয়ে ও স্বামীর পড়ার ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। সোফার উপর দীমভ শুয়ে আছে, স্থির, নিশ্চল, কোমর পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা। মুখখানা অসম্ভব লম্বাটে, পাতলা, ফ্যাকাশে হলদে, জীবন্ত মানুষের এমন চেহারা হয় না। শুধু কপাল, কাল ভুরু, আর চিরপরিচিত হাসিটুকু থেকে চেনা যায়, হ্যাঁ ঐ ত দীমভ! ওলগা ইভানভনা দ্রুতগতিতে ওর কপাল, বুক ও হাতের উপর হাত রাখল। বুকটা তখনো গরম আছে, কিন্তু কপাল আর হাত বিশ্রী ঠাণ্ডা। আধবোজা চোখদুটো স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওলগা ইভানভনার দিকে নয়, কম্বলের দিকে।

'দীমভ!' ওলগা ইভানভনা চিৎকার করে ডেকে উঠল, 'দীমভ, দীমভ!' ওলগা ইভানভনা বোঝাতে চাইল, এসব ভুল, এখনও সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি, আবার জীবন হতে পারে সুখী ও সুন্দর। ও বলতে চাইল, দীমভ অসাধারণ, বিশিষ্ট, মহান, সারা জীবন তাকে সে পুজো করবে, তার সামনে নতজানু হয়ে থাকবে, তাকে সে শ্রদ্ধা করবে ...

'দীমভ!' ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল ওলগা ইভানভনা, 'দীমভ, শোন! দীমভ!' ও বিশ্বাস করতে পারল না, দীমভ আর কোনোদিন সাড়া দেবে না।

ড্রয়িংরুমে করস্তেলেভ তখন পরিচারিকাকে বলছে, 'জিজ্ঞাসা করার আর কী আছে? গির্জায় গিয়ে খবর নাও ভিখারিণীরা কোথায় থাকে। ওরাই মৃতদেহ স্নান করিয়ে যা যা দরকার সব ঠিক করে দেবে।'

১৮৯২

৬ নং ওয়ার্ড

১

হাসপাতাল প্রাঙ্গণের সংলগ্ন একটি ছোট বাড়ি। তার চতুর্দিকে বার্ডক, বিছুটি ও বুনো পাট গাছের রীতিমতো জঙ্গল। ছাতের টিনগুলো মরচে পড়া, চিমনির চোঙ্গাটা ভেঙে পড়ছে। বাড়ির সামনে ক্ষয়ে-যাওয়া সিঁড়িগুলো ঘাসে ঢাকা। ইঁট বার-করা দেওয়ালে আস্তর বলতে আছে তার ক্ষীণতম অবশেষ। বাড়িটা হাসপাতালের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তার পিছনে মাঠ। পেরেক লাগানো রঙ চটে-যাওয়া একটা বেড়া বাড়িটা থেকে জায়গাটাকে পৃথক করে রেখেছে। শূলের মতো খোঁচা খোঁচা পেরেকের সার, বেড়া, আর ওই বাড়িটা — এগুলোর চেহারায় যে ছন্নছাড়া বিষণ্ণতা মাখানো তা আমাদের জেলখানা ও হাসপাতালগুলোর বিশেষত্ব।

বিছুটির যদি ভয় না থাকে তা হলে এসো ওই সরু পথ ধরে বাড়িটার মধ্যে। উঁকি মেরে দেখা যাক ভিতরটা। সামনের দরজাটা খুললেই একটা দরদালানে গিয়ে পেঁছোব। দুদিকের দেওয়ালের পাশে পাশে, চুল্লীঘরের ধারে হাসপাতালের রাশি রাশি আবর্জনা স্তূপাকার করা। ছেঁড়াখোঁড়া যত বাজে জঞ্জাল — তুলো বার-করা গদি, পুরনো আঙরাখা, জাঙ্গিয়া, নীল ডোরাকাটা সার্ট, অব্যবহার্য বুট — সব গাদা করা রয়েছে, আর পচে সেগুলো থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

এই জঞ্জালের স্তূপের উপর আরামে বসে রয়েছে নিকিতা, এখানকার দারোয়ান, আগে ছিল সিপাই। সব সময় সে দাঁতে চেপে থাকে একটা পাইপ। তার পরনের কোটের আস্তিন দুটোয় রঙ চটে যাওয়া স্ট্রাইপ। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ভুরুগুলো মদে-চুর তার মুখটাকে আরো বেশি থমথমে করে তুলেছে, মুখের

ভাবটা যেন ভেড়ার পাল পাহারারত রুশী কুকুরের মতো। নাকটা টকটক করছে লাল। লোকটার চেহারা যদিও বেঁটেখাটো, দেখতে রোগা, মাংসপেশীবহুল তার চালচলনে কিন্তু বেশ একটা কেউকেটা ভাব। মস্ত তার হাতের মুঠিদুটো। সে তাদেরই একজন যারা সরল, বিশ্বাসী, কাজে দড় অথচ বুদ্ধিতে খাটো, যাদের কাছে দুনিয়ায় সেরা পদার্থ হচ্ছে নিয়মশৃংখলা আর সবচেয়ে ফলপ্রদ ব্যবস্থা বেদম প্রহার। বুকে পিঠে মুখে সে বেপরোয়া ঘুষি চালায়, তার দৃঢ় বিশ্বাস শৃংখলা বজায় রাখতে এখানে এ ছাড়া উপায় নেই।

এখান থেকে আমরা প্রবেশ করি প্রশস্ত একটা কামরায়। বাড়িটার প্রায় সবটা জুড়েই কামরাটা, শুধু দরদালানের অংশটা ছাড়া। দেয়ালগুলোর ম্যাড়মেড়ে নীল রঙ, চালটা ঝুলে কালো, চিমনি নেই, সেকেলে কুঁড়েঘরের চালের মতো; এতেই বোঝা যায় শীতকালে চুল্লীর ধোঁয়া সম্পূর্ণভাবে বের হতে পারে না, বিষাক্ত বাষ্প ঘর ভরে থাকে। ভেতর দিকে লোহার গরাদ দেওয়া জানালাগুলো বিকট। মেঝেটা রঙ-চটা, চোকলা-ওঠা। সমস্ত জায়গাটা টকানো কপি, ধোঁয়াটে বাতি, ছারপোকা আর এ্যামোনিয়ার বিচিত্র গন্ধে ভরপুর। প্রথম এখানে ঢোকার সময় এই তীব্র গন্ধের দরুন মনে হয় যেন চিড়িয়াখানায় ঢুকছি।

খাটগুলো মেঝের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে আটকানো। নীল রঙের হাসপাতালি আঙরাখা ও রাতে পরার সেকেলে টুপি পরে জনকতক লোক সেগুলোয় শুয়ে বসে রয়েছে। এরা সবাই মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত।

এরা মোট পাঁচজন। এদের মধ্যে একজন মাত্র সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর, আর সবাই সাধারণ স্তরের। দরজার সবচেয়ে কাছে রোগা লম্বাটে গোছের একটা লোক হাতের উপর মাথা রেখে স্থিরদৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে বসে থাকে। গোঁফজোড়া তার চকচক করছে লাল। চোখদুটোও তার কেঁদে কেঁদে লাল। দিনরাত সে দুঃখে কাতরায়, তারই মধ্যে কখনো মাথা নাড়ে কখনো দীর্ঘশ্বাস ফেলে কখনো বা বিষণ্ণ হাসি হাসে, কদাচিৎ সে অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তায় যোগ দেয়, আর তার সঙ্গে কথা কইলে কখনোই সে উত্তর দেয় না। খাদ্য বা পানীয় তার কাছে নিয়ে এলে যন্ত্রের মতো গ্রহণ করে। অবিরাম কষ্টকর কাশি আর কাশতে কাশতে যে ভাবে মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে তা থেকে বোঝা যায় তাকে ক্ষয়রোগে ধরেছে এবং রোগের এই সূত্রপাত।

পাশের বিছানায় ছুঁচলো দাড়ি ও নিগ্রোর মতো কালো কোঁকড়ানো চুলওয়ালা ছোটখাটো দেখতে দারুণ ছটফটে ফুর্তিবাজ এক বুড়ো। সারাটা দিন হয় সে এ জানলা থেকে ও জানলায় ঘুরে বেড়ায় কিংবা বিছানার উপর পা মুড়ে বাবু হয়ে বসে থাকে। কখনো সে বুলফিঞ্চের মতো অনর্গল শিস দিয়ে চলে, কখনো গুনগুন করে গান গায়, কখনো শুধু খিলখিল করে হাসে। রাত্রেও তার কার্যকলাপ এইরকমই শিশুর মতো আমুদে ও দিলখোলা। উঠে বসে প্রার্থনা করে অর্থাৎ দুহাত দিয়ে বুকে ঘুষি মেরে চলে, কিংবা দরজা হাতড়াতে লেগে যায়। লোকটা ইহুদি, টুপি-বানিয়ে মসেইকা। কুড়ি বছর, তার দোকান পুড়ে যাওয়া অবধি সে পাগল।

৬ নং ওয়ার্ডের একমাত্র তাকেই বাড়ির বাইরে, এমনকি হাসপাতালের মাঠ পার হয়ে রাস্তায় যেতে দেওয়া হয়। অনেক বছর ধরে সে এই সুবিধা ভোগ করে আসছে। তার কারণ বোধহয় লোকটা বোকা-হাবা নিরীহ গোছের, কারও কোনো অনিষ্ট করে না। তাছাড়া বহুকাল হাসপাতালেও আছে। সারা শহর তাকে নিয়ে মজা করে, ছোট ছোট ছেলে ও কুকুর পরিবৃত হয়ে তার আবির্ভাব শহরের একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। হাসপাতালের আঙরাখা গায়ে, অদ্ভুত টুপি মাথায় ও চটি পরে, কখনো কখনো খালি পায়ে আর আঙরাখার তলায় কিছুই না পরে রাস্তায় রাস্তায় সে ঘুরে বেড়ায় আর ছোট ছোট দোকানের ও বাড়ীর সদরদরজার সামনে দাঁড়িয়ে কোপেক ভিক্ষা করে। কোথাও বা একটু ক্ভাস পায়, কোথাও এক টুকরো রুটি, কেউ বা একটা কোপেক দেয় তাই নিয়ে পরম পরিতৃপ্ত হয়ে সে ফিরে আসে আস্তানায়। সে যা কিছু নিয়ে আসে নিকিতা কেড়ে নেয়। কেড়ে নেয়, চিৎকার চেঁচামেচি ও রাগারাগি করে, লোকটার জামার পকেটগুলো উলটে ফেলে, ভগবানের নামে প্রতিজ্ঞা করে যে ইহুদিটাকে আর কখনো সে রাস্তায় বার হতে দেবে না, অনিয়ম অনাচারের মতো জঘন্য আর কিছু নেই।

মসেইকা সবাইকে খুশি করতে ভালোবাসে। ঘরের সঙ্গীদের মধ্যে কারুর তেষ্টা পেলে সে জল এনে দেয়, তারা ঘুমোলে গায়ে দেয় ঢাকা দিয়ে, কথা দেয় প্রত্যেককে একটা করে কোপেক এনে দেবে আর সবাইকার জন্যে বানিয়ে দেবে নতুন টুপি। তার বাঁ পাশের পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে সে-ই চামচে করে খাইয়ে দেয়। প্রাণের টান বা দয়া দেখাবার জন্যে যে সে এই সব করে তা মোটেই

না। তার ডান দিকের সঙ্গী গ্রোমভের উদাহরণ সে অনুসরণ করে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রোমভ করে তাকে প্রভাবান্বিত।

তেত্রিশ বছর বয়সের যুবক ইভান দ্‌মিত্রিচ গ্রোমভ ভালো পরিবারের ছেলে। এককালে সে প্রাদেশিক সরকারী আফিসে বেলিফ ও সেক্রেটারীর কাজ করত। সে নিগ্রহাতঙ্কে ভুগছে। হয় সে বিছানায় গুঁড়িসুঁড়ি মেরে পড়ে থাকে, নয়ত সামনে পেছনে এমনভাবে পায়চারি করে যে দেখে মনে হয় স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করছে। বসে থাকা অবস্থায় তাকে প্রায় দেখাই যায় না। সব সময়ে সে একটা দারুণ উত্তেজনা ও উদ্বেগের মধ্যে থাকে। অজানা অনিশ্চিত আতঙ্কে বিহ্বল। দরদালানে সামান্য একটু খসখস শব্দ, সামনের মাঠে একটু কিছুর আওয়াজ হল, অমনি সে মাথা উঁচু করে কান খাড়া করে শোনে, ওরা কি তার জন্যে এসেছে? ওরা কি তাকেই খুঁজছে? এইসব সময়ে তার মুখেচোখে তীব্র ঘৃণা ও উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে।

আমার ভালো লাগে তার চওড়া ফ্যাকাশে গোল বিষণ্ণ মুখখানা। আয়নার মতো তাতে প্রতিফলিত হচ্ছে অবিরাম দ্বন্দ্ব ও ভয়ে বিপর্যস্ত তার মনটা। তার মুখভঙ্গী অদ্ভুত ও অসুস্থ, তা সত্ত্বেও যথার্থ যন্ত্রণার গভীর আলোড়নের ফলে তার মুখে যে সুক্ষ্ম রেখাগুলো পড়েছে তাতে বুদ্ধি ও অনুভূতির একটা ছাপ রয়ে গেছে। তার চোখে সুস্থ ও দরদী মনের দীপ্তি। লোকটাকে সত্যিই আমার ভালো লাগে, একমাত্র নিকিতা ছাড়া সবাইকার সঙ্গে ব্যবহারে সে অমায়িক, সদয় ও সহানুভূতিশীল। কারুর হাত থেকে একটা বোতাম বা চামচ পড়ে গেলে সে এক লাফে বিছানা থেকে নেমে সেটা তুলে দেয়। সকালে ঘুম ভেঙে উঠে প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানায়, রাত্রেও প্রত্যেকের কাছে বিদায় নিয়ে যায় শুতে। মুখভঙ্গী ও সর্বদা মানসিক উৎকণ্ঠা ছাড়া তার পাগলামি এইভাবে প্রকাশ পায়: সন্ধ্যের দিকে কোনো সময়ে সে আঙরাখাটা গায়ে জড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। সেই কাঁপুনির চোটে তার দাঁতে দাঁত ঘষা লাগে। তখন সে ঘরময় খাটগুলোর আশেপাশে যত দ্রুত সম্ভব পায়চারি করে। তখন যেন ভীষণ জ্বর এসেছে। যে ভাবে সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে তার সঙ্গীদের দিকে তাকায় তাতে মনে হয় তাদের কাছে খুব জরুরী কিছু তার বলার আছে কিন্তু পরক্ষণে যেই বোঝে তার কথা শোনার মতো বুদ্ধি বা ধৈর্য এদের কারুর নেই, অস্থিরভাবে মাথা নাড়াতে নাড়াতে সে আবার হাঁটতে থাকে। শীঘ্রই কিন্তু তার

কথা বলার প্রবল ইচ্ছা সব বিচার বিবেচনাকে ছাপিয়ে ওঠে। তার মুখের আগল খুলে যায়, আবেগভরে সাগ্রহে অনর্গল সে বকে চলে। রোগীর প্রলাপের মতো তার কথা উদ্দাম ও অসংলগ্ন। বেশির ভাগ সময় কী বলছে বোঝাই যায় না। কিন্তু তার কথায় ও সুরে এমন কিছু একটা থাকে যা মনকে রীতিমত নাড়া দেয়। কথাগুলো কান দিয়ে শুনলে তার ভিতরকার প্রকৃতিস্থ ও অপ্রকৃতিস্থ দুটো মানুষের কথাই যায় শোনা। তার প্রলাপ কাগজে লিখে প্রকাশ করা কঠিন। বলে যেতে থাকে মানবিক নীচতা ও সর্বব্যাপী অত্যাচার সম্পর্কে যার কবলে পড়ে সত্য মারা পড়ছে, বলে — পৃথিবীতে একদিন কী সুন্দর জীবনের আবির্ভাব ঘটবে। জানলার ওই লোহার শিকগুলো সর্বদা তাকে মনে করিয়ে দেয় যারা নির্যাতন করে তারা কী মূঢ় কী নির্মম। এর ফলে যা সৃষ্টি হয় তা যেন অনেকগুলো অসংলগ্ন বাজে গানের জগাখিচুড়ি, গানগুলো সব পুরনো, অথচ আজ পর্যন্ত কোনোটা পুরো গাওয়া হয়নি।

২

বছর বারো বা পনেরো আগে শহরের সদর রাস্তায় নিজের বাড়িতে গ্রোমভ নামে এক সরকারী কর্মচারী বাস করত। সের্‌গেই ও ইভান তার দুই ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনবছর শিক্ষা শেষ করার পর সেরগেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। তার মৃত্যুর সঙ্গে গ্রোমভ-পরিবারে শুরু হল একটার পর একটা বিপদ। সেরগেইকে সমাধিস্থ করার এক সপ্তাহ পরে বৃদ্ধের বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও তহবিল তছরুপের মামলা রুজু হল এবং তার কিছু পরে জেল হাসপাতালে টাইফাস রোগে সে মারা গেল। তার বাড়িঘর সম্পত্তি নিলামে বিক্রী হয়ে গেল। ইভান দ্‌মিত্রিচ ও তার মার জীবনধারণের কোনো উপায়ই রইল না।

পিতার জীবিত কালে ইভান দ্‌মিত্রিচ পিটার্সবুর্গে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করত। নিজের খরচের জন্যে বাড়ি থেকে মাসে মাসে ৬০ — ৭০ রুবল করে পেত। অভাব যে কী সে জানত না। এখন এই দুর্বিপাকে পড়ে তার জীবনধারার আমূল পরিবর্তন করতে সে বাধ্য হল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাকে খাটতে হত। সামান্য অর্থের বিনিময়ে কাউকে পড়িয়ে কিংবা

কারও দলিল-পত্র নকল করে দিয়ে যা জুটত তাতেও সে পেট পুরে খেতে পেত না, কারণ তার উপার্জনের সবটাই পাঠিয়ে দিত মাকে। এই ধরনের জীবন যাপন ইভান দ্মিত্রিচের ধাতে সইল না, মন ভেঙে গেল, অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং পড়াশুনা ছেড়ে সে দেশে ফিরে গেল। দেশে তার প্রভাবশালী বন্ধুবান্ধবের মারফৎ জেলা ইস্কুলে একটা শিক্ষকের কাজ পেল, কিন্তু কিছুদিন যেতে বুঝল, সহকর্মীদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছে না, তার ছাত্রদেরও মন পাচ্ছে না। অতএব সে-চাকরীও সে ছেড়ে দিল। ইতিমধ্যে তার মা মারা গেল। প্রায় ছ মাস তাকে বেকার অবস্থায় কাটাতে হল, এইসময় শুধু রুটি আর জল খেয়ে কাটাতে হয়েছে। এরপর সে আদালতের কেরানির কাজটা পেল। অসুস্থতার জন্যে বরখাস্ত না হওয়া পর্যন্ত এই কাজই সে করছিল।

বলিষ্ঠ জোয়ান সে কোনোকালেই ছিল না, এমনকি ছাত্রাবস্থাতেও নয়। বরাবরই সে রোগা রোগা, ফ্যাকাশে, একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে, খায় সে যৎসামান্য। ভালো ঘুম হয় না। একপাত্র মদ খেয়েই সে টলতে থাকে ও কাঁদতে চেঁচাতে থাকে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সে মিশত ঠিকই কিন্তু তার রগচটা স্বভাব ও সন্দেহবাতিকের জন্যে কারুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হত না, বন্ধু বলতে তার কেউ ছিল না। শহুরে লোকদের সে দুচক্ষে দেখতে পারত না। বলত, তাদের আকাট মুর্খামি ও জানোয়ারদের মতো অনায়াস জীবনযাত্রা তার মনপ্রাণ বিষিয়ে দেয়। তার গলার আওয়াজ তীক্ষ্ণ ও কর্কশ, সে কথা কইত চিৎকার করে আবেগের সঙ্গে, হয় রেগে না-হয় উচ্ছ্বসিত বা বিস্মিত হয়ে, এবং সর্বদাই আন্তরিকভাবে। যে-কোনো বিষয়েই তার সঙ্গে কথা কও না, আলোচনার ধারাটা সে ঠিক তার মনোমত বিষয়ে ঘুরিয়ে আনবে: এই শহুরে আবহাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে, জীবনটা একঘেয়ে, সমাজে উঁচু আদর্শ বলে কিছু নেই, সমাজটা তার নিরানন্দ নিরর্থক অস্তিত্ব টেনে টেনে চলেছে — মারপিট কুৎসিত লাম্পট্য ও ভণ্ডামিতেই এই অস্তিত্ব জীবন্ত হয়ে ওঠে; পাজি বদমাসগুলোর খাওয়া পরার অভাব নেই, যারা সৎ তাদেরই শুধু ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। দরকার ইস্কুল, স্থানীয় প্রগতিশীল খবরের কাগজ, থিয়েটার, সাধারণের জন্যে নিয়মিত বক্তৃতা ও সেইসঙ্গে জ্ঞানী গুণী সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা, সমাজকে জানিয়ে দিতে হবে তার এই সব গলদ, তাকে দেখাতে হবে কী ভয়ংকর এই অবস্থা। দেশবাসী

সম্পর্কে তার মতামতটা একটু বেশি উগ্র, তার রঙের পাত্রে সাদা আর কালো ছাড়া অন্য রঙ নেই, নেই রঙের কোনো সূক্ষ্ম প্রকার-ভেদ, তার মতে কেবল দু'রকমের মানুষ আছে — সৎ আর অসৎ, মাঝামাঝি স্তর বলে কিছু নেই। নারী ও প্রেম সম্পর্কে কথা কইতে তার উৎসাহের অভাব হত না যদিও নিজে কখনো প্রেমে পড়েনি।

তীব্র যুক্তি প্রকাশ করা ও রগচটা মেজাজ সত্ত্বেও শহরে সবাই তাকে পছন্দ করত এবং অসাক্ষাতে তাকে সস্নেহে 'ভানিয়া' বলে উল্লেখ করত। তার মার্জিত রুচি, সেবাপরায়ণতা, উচ্চাদর্শ ও ন্যায়নিষ্ঠা, সেই সঙ্গে তার পুরনো কোট, রুগ্ন চেহারা ও পারিবারিক দুর্দৈব — এই সবের জন্যে তার প্রতি সবাইকার ছিল প্রীতি ও সহানুভূতি, তাতে কিছুটা করুণাও মিশে থাকত, তা ছাড়া সে ছিল সুশিক্ষিত, তার পড়াশুনাও ছিল অগাধ। সবাই বলত সে জানে না এমন বিষয় নেই। তাকে এক ধরনের জীবন্ত বিশ্বকোষ বলে মনে করা হত। বই সে খুব ভালোবাসত। ক্লাবে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজের ছোট দাড়িটায় অস্থিরভাবে হাত বুলোতে বুলোতে যে বই ও পত্রিকাগুলোর পাতা ওলটাতো, তার মুখ দেখেই বোঝা যেত যতটা না পড়ছে তার বেশি গ্রাস করছে। সেগুলো মনে মনে একটু তলিয়ে দেখতেও তার তর সইছে না। পড়াটা তার কাছে প্রায় একটা ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কারণ যা সামনে পেত, গতবছরের কাগজ বা পাঁজির মতো নীরস পদার্থও সে সমান আগ্রহের সঙ্গে পড়তে লেগে যেত। বাড়িতে সে সবসময় শুয়ে শুয়ে পড়ত।

৩

শরতের এক সকালে ইভান দ্‌মিত্রিচ কোটের কলারটা তুলে কাদা ঠেলে ঠেলে অলিগলি দিয়ে চলছিল কোনো এক ব্যক্তির কাছে আদালতের পরোয়ানা জারি করতে। সকালের দিকে সাধারণত তার মেজাজ ভালো থাকে না। সেদিনও ছিল না। একটা গলিতে সে দেখতে পেল হাতকড়া দেওয়া দুজন লোক চারজন সিপাইয়ের পাহারায় চলেছে। ইভান দ্‌মিত্রিচ এরকম দৃশ্য প্রায়ই দেখে এবং তার ফলে প্রতিবারই করুণা ও অস্বস্তি বোধ করে। এবারে কিন্তু এ দৃশ্য তার মনে সম্পূর্ণ আলাদা ও অদ্ভুত ধরনের ভাব জাগাল। কী জানি কেন হঠাৎ তার মাথায় এল এই কয়েদীদের মতো তাকেও হাতকড়া

দিয়ে কাদাভর্তি পথ দিয়ে ঠেলে নিয়ে জেলখানায় পুরলে কেউ ঠেকাতে পারবে না। পরোয়ানাটা জারি করে ফেরার পথে পোস্টাফিসের কাছাকাছি তার সঙ্গে দেখা হল পরিচিত এক পুলিস ইনস্পেকটারের। ইনস্পেকটার ভদ্রলোক শুভেচ্ছা জানিয়ে তাকে কয়েক পা এগিয়ে দিল। এই ব্যাপারটা গ্রোমভের কাছে কেন জানি ভালো ঠেকল না। বাড়ীতে ফিরে যাবার পর কয়েদীদের ও রাইফেলধারী সিপাইদের চিন্তা সারাদিন সে কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারল না, এবং অদ্‌ভুত ধরনের একটা মানসিক অশান্তি বোধ করতে লাগল। ফলে সে কিছুতেই পড়তে বা মনস্থির করতে পারল না। সন্ধ্যেবেলায় সে আলো জ্বালাল না। কী ভাবে তাকেও গ্রেপ্তার করে, হাতকড়ি পরিয়ে জেলে পোরা হবে সেই ভাবনায় রাত্রেও তার ঘুম এল না। সে জানত কোনো অপরাধ সে করেনি আর তার দ্বারা যে চুরি ডাকাতি বা খুনখারাপি সম্ভব নয় তা সে হলপ করে বলতে পারত, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও দৈবাৎ কোনো অপরাধ করে ফেলা কি অসম্ভব? তাছাড়া প্রতারিত হওয়া বা বিচারের ভুলে শাস্তি পাওয়া? এমন ঘটনাও তো বিচিত্র নয়। লোকে বলে: 'জেলখানা বা গরীবখানা থেকে কেউই নিরাপদ নয়' — নিশ্চয় অনেক কালের অভিজ্ঞতা থেকে এই প্রবাদের চল হয়েছে। আর আজকাল যেভাবে মামলা মোকদ্দমা চালান হচ্ছে তাতে বিচারের ভুল হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিচারক, পুলিশ-কর্মচারী আর ডাক্তার — এই তিন শ্রেণীর লোকেরা মানুষের দুঃখকষ্টকে এমন বাঁধাধরা ছকে ফেলে দেখে যে কিছুকাল পরে এইভাবে দেখতে অভ্যস্ত তাদের মনে অনুভূতির লেশমাত্র থাকে না, তখন ইচ্ছে থাকলেও তারা মক্কেলদের সঙ্গে কেতায় যা নেই এমন কোনো ব্যবহার করতে পারে না। এ দিক থেকে তাদের সঙ্গে সেই সব কিসানদের কোনো তফাৎ নেই যারা আঙ্গিনায় বসে গরুছাগল বেমালুম জবাই করে, রক্তপাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না। এইরকম নির্বিকার ছকে-বাঁধা মনোভাব একবার যখন পাকাপোক্ত দাঁড়িয়ে গেছে কোনো নিরপরাধ লোকের সমস্ত অধিকার হরণ করে কঠিন শাস্তি দিতে বিচারকের প্রয়োজন শুধু একটি জিনিস — কিছু সময়। যে কটা বাঁধাধরা নিয়মকানুন পালিত হল কিনা দেখার জন্যে বিচারক মাসে মাসে মাইনে পায়, সে কটা পালন করতে যতটুকু সময় লাগে — তারপরেই সব খতম। তারপরে আপিল বা ন্যায়বিচারের জন্যে যদি উপরওয়ালার

শরণাপন্ন হতে চাও, হতে পার। তারপর রেল-স্টেশন থেকে দুশ ভের্স্ট দূরে ছোট্ট নোংরা শহরটায় ন্যায়বিচার খুঁজতে পারো। আর এ সমাজে ন্যায়বিচারের কথা ভাবাই তো হাস্যকর যেখানে প্রতিটি অত্যাচার যুক্তিসঙ্গত ও প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হয়, যেখানে করুণার বিনিময়ে লাভ হয় প্রতিহিংসার বিক্ষোভ ও ঘোরতর অসন্তোষ: বিচারে কেউ ছাড়া পেলেই তা বোঝা যায়।

পরের দিন সকালে ইভান দ্‌মিত্রিচ আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় ঘুম থেকে উঠল, তার কপাল দিয়ে গলগল করে ঘাম গড়াচ্ছে। তার দৃঢ়বিশ্বাস যে কোনো মুহূর্তে তাকে ধরে নিয়ে যাবে। গতদিনের দুর্ভাবনাগুলো এখনো টিকে থাকায় সে নিজেকে বোঝাল দুর্ভাবনার নিশ্চয়ই কোনো বাস্তব ভিত্তি আছে। যাই হোক না কেন, উপযুক্ত কোনো কারণ না থাকলে তার মনে এই সব ভাবনা ঢুকবে কেন?

একটা পুলিস ধীরেসুস্থে তার জানলার পাশ দিয়ে চলে গেল, কেন গেল? দুজন লোক তার বাড়ির উলটো দিকে দাঁড়িয়ে পড়ল, চুপচাপ তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

এরপর দিনরাত চলল ইভান দ্‌মিত্রিচের মানসিক অশান্তি। জানলার পাশ দিয়ে কেউ গেলেই কিংবা বাড়ির উঠোনের মধ্যে কেউ ঢুকলেই সে ভাবত পুলিশের স্পাই কিংবা ডিটেকটিভ এসেছে। জেলার পুলিশ ইনস্পেকটার রোজ নিয়মিত তার জুড়ি গাড়িতে চেপে রাস্তা দিয়ে যেত। সে যেত তার জমিদারি থেকে পুলিশ আফিসে, কিন্তু ইভান দ্‌মিত্রিচের মনে হত সে যেন বড় তাড়াতাড়ি চলেছে আর তার মুখের ভাবটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, হয়ত সে ছুটে চলেছে খবর দিতে যে শহরে একটা সাংঘাতিক আসামী আস্তানা গেড়েছে। প্রতিবার দরজার ঘণ্টাটা বেজে ওঠার কিংবা দরজা ধাক্কার শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ইভান দ্‌মিত্রিচ অমনি চমকে ওঠে। আগে দেখেনি এমন কোনো লোককে বাড়িওয়ালীর কাছে আসতে দেখলে অস্বস্তি বোধ করে। পুলিসের লোক বা সিপাই-শান্ত্রী কাউকে দেখলে সে হাসিমুখ করে শিস দিয়ে সুর ভাঁজতে থাকে, ভাবটা সে বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করছে। ধরা পড়ার ভয়ে সারা রাত সে জেগে শুয়ে থাকে কিন্তু জেগে জেগেই নাক ডাকায় আর ভারী ভারী নিশ্বাস ফেলে যাতে বাড়িওয়ালী বোঝে সে ঘুমিয়ে আছে, কারণ না ঘুমোন মানেই তো তার মনে কিছু একটা চাপা আছে, এই সূত্র ধরে কত

কী-ই না আবিষ্কার করা যায়। সাধারণ বুদ্ধিতে ঘটনার বিচার করে বুঝতে পারে তার ভয়ের কোন ভিত্তি নেই। এটা উদ্ভট একটা মানসিক বিকার, উদারভাবে দেখলে জেল খাটার বা ধরা পড়ার ভয় কিসের যতক্ষণ মনে গলদ নেই? কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় যতই সে যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার করে ততই প্রবল হয়ে ওঠে তার অস্থিরতা। তার অবস্থা হয়ে উঠল অনেকটা সেই মুনির মতো যে জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে নিতে গিয়ে দেখে কুড়ুল দিয়ে যত কাটা যাচ্ছে গাছপালা ঝোপঝাড় তত হয়ে উঠছে ঘন। যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝানোর ব্যর্থতা বুঝতে পেরে ইভান দ্মিত্রিচ শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে আতঙ্ক ও হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ করল।

পাঁচজনের সংসর্গে এবারে সে পারতপক্ষে থাকে না, একা একা থাকতে চেষ্টা করে। তার কাজটা কোনোকালেই প্রীতিপ্রদ ছিল না, এবারে সেটা অসহ্য হয়ে উঠল। ভয় হল কেউ হয়ত সুযোগ পেয়ে তাকে বেকায়দায় ফেলবে, হয়ত সে জানতে পারবে না তার পকেটে কেউ ঘুষ পুরে রেখে পরে তাকে ধরিয়ে দেবে, হয়ত সে-ই সরকারী নথীপত্রে এমন কিছু ভুল করে রাখবে যা প্রায় জালিয়াতি বলে গণ্য হবে, হয়ত তার কাছ থেকে অপরের টাকা খোয়া যাবে। কেন তাকে স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষার জন্যে সর্বদা সশঙ্কিত থাকতে হবে সেটার এখন দৈনিক হাজার কারণ আবিষ্কার করার দরুণ তার মনের উদ্‌ভাবনী ও চিন্তাশক্তি যে কী রকম বেড়ে গেল ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। অপরপক্ষে বহির্জগৎ সম্পর্কে তার কৌতূহল ও সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনাও কমে আসতে লাগল, স্মৃতিশক্তিও যথেষ্ট হ্রাস পেল।

বসন্তকাল আসতে, বরফ গলা শেষ হবার পর কবরখানার বাইরের নালাটায় একটা বুড়ীর ও আরেকটা ছোট ছেলের শব পাওয়া গেল। দুটো লাশেই পচ ধরেছে এবং দুটোতেই বলপ্রয়োগে মৃত্যুর চিহ্ন। সারা শহরে একমাত্র আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল এই লাশ দুটো ও তাদের যারা মেরেছে সেই অজানা খুনীরা। ইভান দ্মিত্রিচ হাসি-হাসি মুখ করে রাস্তায় ঘাটে ঘুরে বেড়াতে লাগল যাতে লোকে না সন্দেহ করে যে সে-ই খুনী। পরিচিত কারুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে পর্যায়ক্রমে লজ্জায় লাল ও ভয়ে বিবর্ণ হয়ে তাকে সে বোঝাতে চেষ্টা করে দুর্বল ও নিরস্ত্র ব্যক্তিকে হত্যা করার মতো গর্হিত কাজ আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু ক্রমাগত এইরকম অভিনয়

করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সে স্থির করল তার মতো অবস্থার লোকের পক্ষে সবচেয়ে সমীচীন হবে বরফ রাখার কুঠরিতে গিয়ে লুকিয়ে থাকা। একটা পুরো দিন, পরের রাত, তারপরের দিনটাও কুঠরিতে সে কাটাল, তারপর অন্ধকার হয়ে আসতে ঠাণ্ডায় আধমরা হয়ে চোরের মতো চুপিসারে নিজের ঘরে এসে ঢুকল। ভোর পর্যন্ত সে ঘরের মাঝখানটায় স্থির হয়ে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। ভোরের একটু আগে বাড়িওয়ালীর কাছে কয়েকটা লোক চুল্লী মেরামত করতে এল। ইভান দ্মিত্রিচের বিলক্ষণ জানা ছিল লোকগুলো চুল্লী মেরামত করতেই এসেছে, তা সত্ত্বেও ভয় তাকে চুপিচুপি বোঝাল, আসলে ওরা পুলিসের লোক, চুল্লী মেরামত করার ছল করে এসেছে। টুপী বা কোটটা পর্যন্ত না নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে এল এবং রাস্তায় পড়েই পড়ি-কি-মরি করে ঊর্ধ্বশ্বাসে দিল ছুট। ঘেউ ঘেউ করতে করতে কুকুরগুলো তার পিছু তাড়া করল। একজন লোক পেছনে চেঁচাল। তার কানে বাজছে শুধু বাতাসের সাঁই সাঁই শব্দ। ইভান দ্মিত্রিচের ধারণা দুনিয়ার যাবতীয় অত্যাচার তার পিছনে এসে জোট পাকিয়েছে এবং তাকে তাড়া করছে।

তাকে জোর করে থামিয়ে বাড়ি নিয়ে আসা হল। বাড়িওয়ালী ডাক্তারকে খবর দিল। ডাক্তার আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ (তার সম্পর্কে পরে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারব) এসে ঠাণ্ডা কমপ্রেস ও কয়েক ফোঁটা ওষুধের ব্যবস্থা করে বিষণ্নভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল, যাবার সময় বাড়িওয়ালীকে জানিয়ে গেল, সে আর আসতে পারবে না, আর এসেই বা কী হবে, যে পাগল হবেই তাকে ঠেকিয়ে রেখে বা লাভ কী? বসে খাবার ও চিকিৎসার খরচ চালাবার টাকা তার ছিল না। তাই ইভান দ্মিত্রিচকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হল যৌন ব্যাধির ওয়ার্ডে। রাত্রে সে ঘুমোত না, চেঁচামেচি রাগারাগি করে অন্য রোগীদের বিরক্ত করত। শীঘ্রই আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের আদেশ অনুযায়ী তাকে ৬ নং ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হল।

বছর না ঘুরতে শহরের কারো মনে রইল না ইভান দ্মিত্রিচের কথা। তার বইগুলো বাড়িওয়ালী দাওয়ার নিচে একটা শ্লেজগাড়ির উপর গাদা করে রাখল, পাড়ার ছেলেরা কিছুদিনের মধ্যে তা সাফ করে দিল।

৪

আগেই বলা হয়েছে ইভান দ্মিত্রিচের বাঁ দিকে ছিল ইহুদি মসেইকা। তার ডান দিকে এক চাষী, মোটা হাঁদা জরদ্গবের মত দেখতে, মুখটা ভাবলেশহীন, নোংরা, পেটুক যেন জানোয়ার একটা। গা দিয়ে বিকট দমবন্ধ-করা দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। বহুদিন সে ভুলে গেছে চিন্তা বা অনুভব করতে।

এই লোকটাকে দেখাশোনার ভার ছিল নিকিতার উপর: সে তা পালন করত অমানুষিকভাবে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে প্রহার করে। ঘুষি মারতে মারতে হাত ব্যথা হয়ে গেলেও সে রেহাই দিত না। লোকটাকে এই রকম বেদম প্রহার লাগানো ততটা ভয়াবহ নয় (অনেকেরই তা ধাতস্থ হয়ে যায়), যতটা ভয়াবহ, এই প্রহারের বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়াও নির্বোধ জানোয়ারটার মধ্যে দেখা যেত না গলার আওয়াজে বা অঙ্গভঙ্গীতে, কিছুতেই নয়। এমনকি তার চোখের পাতাটা পর্যন্ত কাঁপত না। শুধু একটা ভারী পিপের মত এধার ওধার দুলতে থাকত।

৬ নং ওয়ার্ডের পঞ্চম ও শেষ বাসিন্দা এক শহুরে ব্যক্তি। কিছুদিন আগে সে পোস্টাফিসে চিঠি বাছাইয়ের কাজ করত। লোকটা রোগা ছিপছিপে। মাথা ভর্তি বাহারি চুল, মুখটায় একটা ভালোমানুষি ভাব। তারই আড়াল থেকে একটু ধূর্তামির ছাপ ফুটে বেরুচ্ছে। তার চতুর চাহনির প্রফুল্লতা ও প্রশান্তি দেখে বোঝা যায় নিজেকে সামলিয়ে চলতে জানে, আরও বোঝা যায় খুব জরুরী অথচ গোপন একটা মজার কথা মনে মনে সে পোষণ করছে। সে তার বালিশের বা বিছানার তলায় কী যেন লুকিয়ে রাখে, কাউকে দেখায় না। কেউ তা কেড়ে নেবে বা চুরি করবে বলে নয়, দেখাতে তার লজ্জা করে। সময়ে সময়ে সে জানলার কাছে গিয়ে আর সবার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। বুকের উপর কী একটা ঝুলিয়ে দিয়ে নিচু হয়ে দেখতে থাকে। এই সময়ে তার কাছে কেউ এসে পড়লে ভীষণ থতমত খেয়ে সেই জিনিসটা বুক থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে। এত সত্ত্বেও তার গোপন কথাটা কী বুঝতে খুব কষ্ট হয় না।

‘আপনি আমাকে অভিনন্দন জানাতে পারেন,’ সময় সময় সে ইভান

দ্মিত্রিচকে বলে, 'স্তানিস্লাভের যে দ্বিতীয় পর্যায়ের খেতাব, যার সঙ্গে তারার পদক দেওয়া হয়, সেই খেতাবের জন্যে আমার নাম গেছে। তারার পদকওয়ালা দ্বিতীয় পর্যায়ের এই খেতাব সাধারণত বিদেশীদেরই দেওয়া হয়, কিন্তু কোনো কারণে আমার বেলায় সে নিয়মের ব্যতিক্রম করতে ওরা চায়।' তারপর একটু হেসে কাঁধটায় একটু ঝাঁকি দিয়ে বলে, 'বলতেই হবে এটা আমার আশার অতীত!'

'এ সব ব্যাপার আমার কিছুই জানা নেই,' ইভান দ্মিত্রিচ গম্ভীরভাবে জবাব দেয়।

'কিন্তু আগে হোক পরে হোক আরও একটা কী পাচ্ছি জানেন?' প্রাক্তন পোস্টাফিসের কর্মচারী চোখ ছোট করে ধূর্তের মতো বলতে থাকে। 'সুইডেনের 'মেরু-তারকা' পদক নিশ্চয় পাব। এমন একটা সম্মান পেতে গেলে সামান্য যদি কষ্ট স্বীকার করতে হয় সেও ভি আচ্ছা। কালো ফিতেয় বাঁধা একটা সাদা ক্রুশ। চমৎকার দেখতে।'

হাসপাতাল-সংলগ্ন বাড়িটায় জীবন যে রকম একঘেয়ে সম্ভবত সেরকম আর কোথাও নয়। সকাল হলেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটা ও মোটা চাষীটা ছাড়া আর সবাই দরদালানটায় গিয়ে সেখানে রাখা মস্ত কাঠের গামলাটায় মুখ হাত ধোয় আর পরনের আঙরাখার প্রান্তভাগ দিয়ে গায়ের জল মুছে ফেলে। তারপর নিকিতা প্রধান হাসপাতাল থেকে টিনের মগে করে চা নিয়ে আসে। তারা সেই মগ থেকে চা পান করে। প্রত্যেককে এক মগ করে দেওয়া হয়। দুপুরে জোটে টকানো কপির সুপ আর একটা মন্ড। এই মন্ডের যা বাকি থাকে তাই রাতের খাওয়া হিসেবে চলে। আহারপর্বের মধ্যবর্তী সময়ে তারা বিছানায় শুয়ে থাকে, ঘুমোয়, জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকায় কিংবা ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। এই ভাবে কেটে চলে দিনের পর দিন। এমনকি পোস্টাফিসের সেই প্রাক্তন কর্মচারী সর্বক্ষণ একই খেতাবের কথা বলে চলে।

৬ নং ওয়ার্ডে নতুন লোকের মুখ সহজে দেখা যায় না। বহুদিন হল ডাক্তার মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগী নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বাইরের জগতের কম লোকই পাগলা-গারদে রোগী দেখতে আসে। দুমাসে একবার আসে নাপিত সেমিয়ন লাজারিচ। কী ভাবে সে রোগীদের চুল ছাঁটে, কী ভাবেই বা নিকিতা

তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করে, কিংবা হাসি-হাসি মুখ এই মাতাল নাপিতটাকে দেখামাত্র রোগীদের মধ্যে কীরকম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, সে সব বর্ণনা এখন থাক।

নাপিতটা ছাড়া হাসপাতালের এই অংশে আর কেউ আসে না। দিনের পর দিন রোগীদের এক মাত্র সঙ্গী নিকিতা।

ইদানীং অবশ্য হাসপাতালময় একটা অদ্ভুত গুজব ছড়াচ্ছে। সবাই বলাবলি করছে ডাক্তার নাকি ৬ নং ওয়ার্ডে নিয়মিত যাচ্ছে।

৫

সত্যিই অবাক হবার মতো গুজব!

ডাক্তার আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ রাগিন লোকটাও কিঞ্চিৎ অসাধারণ। শোনা যায় প্রথম যৌবনে তার ধর্মে খুব মতি ছিল। সে ঠিকই করেছিল ১৮৬৩ সালে হাই ইস্কুলের পড়া শেষ করে যাতে ধর্মযাজকের পেশা গ্রহণ করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ধর্ম আকাডেমিতে যোগ দেবে। কিন্তু তার বাবা এতে বাদ সাধল। তার বাবার বিজ্ঞানের ডিগ্রি 'ডক্টর অফ মেডিসিন', সে ছিল অস্ত্রচিকিৎসক। ছেলের ইচ্ছা জানতে পেরে তাকে শুধু ঠাট্টাই করল না, জানিয়ে দিল যদি সে যাজক-বৃত্তি নেয় তবে তাকে সে ছেলে বলে স্বীকারই করবে না। কথাটা কতটা সত্যি আমার জানা নেই। তবে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচকে অনেকবার বলতে শুনেছি চিকিৎসা বিজ্ঞান বা যে-কোনো বিজ্ঞান আয়ত্ত করার একটা প্রবল স্পৃহা কোনো কালে তার ছিল না।

যাই হোক না, চিকিৎসা বিদ্যা শেষ করেও সে যাজক-বৃত্তি গ্রহণ করেনি। তার ধর্মানুরাগ যে প্রবল ছিল তা নয়। ডাক্তারী পেশার গোড়ার দিকে যেমন আজও তেমনি তার আচরণে ধর্মযাজকত্ব বিন্দুমাত্র নেই।

লোকটা মোটাসোটা, রুক্ষ চাষাড়ে গোছের। তার মুখ, দাড়ি, খোঁচা খোঁচা মাথার চুল, কুৎসিত চেহারা দেখে মনে হয় কোনো সরাইখানার উদর-সর্বস্ব মালিক বুঝি, যেমন গোঁয়ার তেমনি চোয়াড়ে তার গম্ভীর মুখটায় ভর্তি নীল শিরা, চোখদুটো ছোট ছোট, নাকটা লাল। দৈর্ঘে প্রস্থে দু দিক থেকেই সে বিরাটকায়। হাত পা অস্বাভাবিক রকম লম্বা। দেখে মনে হয় খালি হাতে ঘুষির

জোরে একটা মোষকে ধরাশায়ী করতে পারে। সে কিন্তু পা টিপে টিপে সন্তর্পণে হাঁটে, সংকীর্ণ দরদালানটা দিয়ে যেতে যেতে কাউকে যদি আসতে দেখে সেই প্রথমে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে বলে, 'দুঃখিত'। ভাবছেন গম্ভীর ভারী গলায় বলে, তা কিন্তু মোটেই না। তার গলার আওয়াজ অত্যন্ত মিহি ও শান্ত। তার গলার ওপরে একটা ছোট আব আছে, ফলে কড়া ইস্ত্রী-করা উঁচু কলার পরতে পারে না। সেইজন্যে সে নরম সুতীর ও লিনেনের জামা পরে বাইরে বেরোয়। তার সাজ ডাক্তারের মতো মোটেই নয়। একটা স্যুট তার দশ বছর চলে। আবার যখন নতুন একটার দরকার হয় সাধারণতঃ সে এক ইহুদির তৈরি-পোশাকের দোকান থেকে কিনে আনে। যেটা কেনে সেটাও দেখতে পুরণো স্যুটটার মতই জীর্ণ ও কোঁচকানো। একই কোট গায়ে দিয়ে সে রোগীও দেখছে, খেতেও বসছে, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতেও যাচ্ছে। এ যে তার কঞ্জুষ স্বভাবের জন্যে তা মোটেই নয়। ব্যক্তিগত সাজপোশাকের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই বলেই তার এমন চালচলন।

আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ আমাদের ছোট শহরটায় যখন চাকরি নিয়ে এল, দাতব্য চিকিৎসালয়টির অবস্থা তখন ভয়াবহ। ওয়ার্ড, করিডর বা হাসপাতালের উঠোনে নিঃশ্বাস নেয় কার সাধ্য—এমন দুর্গন্ধ। হাসপাতালের পরিচারক ও নার্সরা সপরিবারে তাদের পরিবার-পরিজনদের নিয়ে শুত ওয়ার্ডে রোগীদের মধ্যেই। প্রত্যেকেই অনুযোগ করত আরশুলা ছারপোকা ও ইঁদুরের জ্বালায় টিঁকে থাকা দুঃসাধ্য। অস্ত্রচিকিৎসা বিভাগে ইরিসিপেলাস রোগী লেগেই থাকত। সারা হাসপাতালে ডাক্তারী ছুরি ছিল মাত্র দুটি, আর থার্মোমিটার বলতে একটিও না। স্নানের টবগুলো আলু রাখার কাজে ব্যবহার হত। হাসপাতালের সুপারিন্টেনডেন্ট, মেট্রন ও সহকারী ডাক্তার রোগীদের খাবার চুরি করত। আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের আগে যে বুড়ো ডাক্তার ছিল সে নাকি হাসপাতালের বরাদ্দ নিয়ে কারবার চালাত আর মেয়েরোগী ও নার্সদের নিয়ে নিজের জন্যে রীতিমতো একটা হারেম তৈরি করে ফেলেছিল। শহরের অধিবাসীরা এই লজ্জাকর অবস্থার কথা ভালোই জানত, এমনকি বাড়িয়েও বলত। কিন্তু এই নিয়ে বাস্তবিক কেউ বিচলিত হত বলে মনে হত না। কেউ কেউ এই বলে উড়িয়ে দিত হাসপাতালে তো কেবল চাষাভুষো ছোটলোকেরা চিকিৎসার জন্যে যায়। তাদের আপত্তির কোনেই কারণ থাকতে পারে না, কারণ

হাসপাতালের চেয়ে নিজেদের বাড়িতে তারা অনেক বেশি দুঃস্থ অবস্থার মধ্যে থাকতে অভ্যস্ত। হাসপাতালে কি তাদের জন্যে পাখীর মাংসর ব্যবস্থা করতে হবে? কেউ কেউ বলত জেমস্তভোর সাহায্য না পেলে ভালোভাবে একটা হাসপাতাল চালানো সম্ভব নয়। খারাপ হোক, যাই হোক, হাসপাতাল তো আছে, এতেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। জেমস্তভোও তো মাত্র সেদিন খুলল। এখানে একটা হাসপাতাল আছে বলে জেমস্তভো এই শহরে বা এর আশেপাশে নিজস্ব হাসপাতাল খোলেনি।

প্রথমবার হাসপাতাল পরিদর্শন করে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ নিশ্চিত বুঝল এ একটা জঘন্য জায়গা। সারা সমাজের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তার মনে হল সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে রোগীদের ছেড়ে দিয়ে হাসপাতালটা বন্ধ করে দেওয়া। কিন্তু সে বুঝল সেটা করতে হলে তার ইচ্ছের চেয়েও বেশি আরো কিছুর প্রয়োজন। তাছাড়া তাতেও কিছু লাভ হবে না। নৈতিক বা শারীরিক নোংরা এক জায়গা থেকে ঝেঁটিয়ে বার করে দিলে অন্য জায়গায় নির্ঘাৎ গিয়ে জমবে। নিজে থেকে যতদিন তা সাফ না হয়ে যায় ততদিন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। তাছাড়া, জনসাধারণ যে হাসপাতাল খুলেছে এবং এই অবস্থা সহ্য করছে, তার মানে এটা তাদের দরকার। অন্ধ কুসংস্কার আর নিত্যনৈমিত্তিক জঘন্য নোংরামি নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ যথাসময়ে এইগুলোই উপকারী পদার্থে পরিণত হবে, যেমন গোময় সারে পরিণত হয়। জগতে এমন কোনো ভালো জিনিস নেই নোংরামিতে যার জন্ম হয়নি।

আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ কাজে লাগবার পর এইসব বিশৃংখলা নিয়ে তেমন কিছু হট্টগোল করল না। সে শুধু হাসপাতালের পরিচারক ও নার্সদের রাত্রে ওয়ার্ডে কাটাতে বারণ করে দিল, আর অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি রাখার জন্যে দুটো আলমারি আমদানি করল। সুপারিণ্টেনডেণ্ট, মেট্রন ও ইরিসিপেলাস রোগ যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল।

আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ বিদ্যাবুদ্ধি ও সততাকে দারুণ শ্রদ্ধা করে, কিন্তু অভাব তার চারিত্রিক দৃঢ়তার আর নিজের অধিকার সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসের। এর ফলে তাকে কেন্দ্র করে যে জীবনধারা বইত তার সুষ্ঠু ও সঙ্গতরূপ সে দিতে পারত না। হুকুম দেবার, বারণ বা জোর করার লোক সে নয়। মনে হত সে

প্রতিজ্ঞা করেছে চড়া গলায় বা আদেশের সুরে কথা বলবে না। 'দাও' বা 'নিয়ে এস' বলা তার পক্ষে রীতিমত কষ্টসাধ্য। ক্ষিধে পেলে একটু কেশে সংকোচের সঙ্গে সে তার পাচিকাকে বলে 'একটু চা হবে কি?' কিংবা 'খাবার কি হয়েছে?' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে যে চুরি বন্ধ করতে বলবে, কিংবা তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করবে অথবা অপ্রয়োজনীয় এই পদটাই লোপ করে দেবে —এ তার সাধ্যের অতীত। আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের কাছে যখন কেউ মিথ্যা কথা বলে, তাকে খোসামোদ করে কিংবা নিছক মিথ্যা হিসেব তাকে দিয়ে সই করাতে নিয়ে আসে, লজ্জায় লাল হয়ে নিতান্ত অপরাধীর মতো সে তা সই করে দেয়। রোগীরা যখন তার কাছে অভিযোগ করে তারা খেতে পাচ্ছে না বা তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে, সে অস্বস্তি বোধ করে ও তাদের কাছে মাপ চাইতে থাকে:

'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি খোঁজ নিয়ে দেখব... নিশ্চয় কোনো গোলমাল হয়েছে ...'

প্রথম প্রথম আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করত। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রোগীদের দেখত। অপারেশন করত, এমনকি প্রসবের ব্যাপারেও সাহায্য করত। মেয়েরা বলত ডাক্তার সবাইকার কথা মন দিয়ে শোনে আর তার রোগ-নির্ণয়ের ক্ষমতা, বিশেষ করে মেয়েদের ও শিশুদের, অসাধারণ। দিনে দিনে কাজের একঘেয়েমি ও অসার্থকতার দরুণ তার উৎসাহও পড়ে এল। একদিন হয়ত সে ৩০টা রোগী দেখল, পরের দিন দেখে ৩৫টা রোগী এসে হাজির হয়েছে, তার পরের দিন ৪০টা। এইভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, শহরে মৃত্যুর হার ও নতুন রোগীর সংখ্যা কমল না। একটা সকালে যদি ৪০ জন বাইরের রোগী আসে, তাদের প্রত্যেককে ভালোমত দেখে ব্যবস্থা করা অসম্ভব। অতএব সে যাই করুক তার কাজটা প্রতারণা হতে বাধ্য। যদি কোনো বছরে সে ১২০০০ বাইরের রোগী দেখে থাকে, তার মানে সহজ হিসাবে ১২০০০ মেয়েপুরুষ প্রতারিত হয়েছে। মারাত্মক রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করে নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যে চিকিৎসা করবে তাও সম্ভব নয়, কারণ হাসপাতালে নিয়মকানুন অজস্র থাকলেও বিজ্ঞান বলে কিছুই নেই। অতশত তত্ত্বের কথা ছেড়ে দিলেও অপরাপর ডাক্তারদের মতো শুধু নিয়মকানুনগুলো যথাযথ পালন করতে হলেও তো সবপ্রথমে দরকার

নোংরামির বদলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ও আলো হাওয়ার, টক দুর্গন্ধ কপির সুপের বদলে পুষ্টিকর খাদ্যের, চোর জুয়াচোরের বদলে সেবাপরায়ণ পরিচারকদের।

তাছাড়া মৃত্যু যখন জীবনের স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তখন মানুষকে না মরতে দিয়ে লাভ কী? একটা কেরানীর বা দোকানীর আয়ু পাঁচ বা দশ বছর বাড়লেই বা কী? চিকিৎসার উদ্দেশ্য যদি ওষুধ দিয়ে যন্ত্রণা লাঘব করা হয়, স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে: যন্ত্রণা লাঘব করা হবে কেন? প্রথমত, যন্ত্রণা তো মানবজাতির মোক্ষলাভের সহায়ক, দ্বিতীয়ত, পুরিয়া আর বড়ির সহায়তায় মানুষ যদি যন্ত্রণা দূর করতে শেখে, তাহলে এতদিন যার মধ্যে তারা শুধু দুঃখকষ্ট থেকে রেহাই নয়, যথার্থ সুখের সন্ধান পেয়েছিল সেই ধর্ম ও দর্শন যে বরবাদ হয়ে যাবে। পুশকিন তাঁর মৃত্যুশয্যায় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে গেছেন, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে হাইনে মৃত্যুর আগে কত বছর পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন; তাই যদি, তবে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ বা মাত্রিয়োনা সাভিশনার মতো লোক, যাদের নগণ্য জীবন বিনা যন্ত্রণায় এ্যামিবার মতোই নিরর্থক ও তাৎপর্যহীন হতে পারত, তারাই বা রোগ যন্ত্রণা ভোগ করবে না কেন?

এইসব যুক্তিতর্কের জালে পড়ে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের উৎসাহ উবে গেল এবং প্রতিদিন হাসপাতালে যাওয়া ছেড়ে দিল।

৬

তার প্রাত্যহিক কর্মপদ্ধতি এইরকম। সাধারণত সে সকাল আটটায় ঘুম থেকে উঠে পোষাকআষাক পরে চা পান করে। তারপরে হয় পড়ার ঘরে গিয়ে পড়াশুনা করে, নয়ত হাসপাতালে চলে যায়। হাসপাতালের সংকীর্ণ অন্ধকার করিডর দিয়ে যাবার সময় তার নজরে পড়ে বাইরের রোগীরা ভর্তি হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে। হাসপাতালের পরিচারক ও পরিচারিকা ইটের মেঝেতে জুতোর খটাখট শব্দ করতে করতে তাদের পাশ দিয়ে দ্রুত চলে যায়, আলখাল্লা গায়ে হাসপাতালের রুগ্ন রোগীরা চলাফেরা করে। মড়া লাশ ও মলমূত্রের আধারগুলো বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চেঁচাতে থাকে, করিডরে তীব্র বাতাস বয়, আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ জানে যারা

জ্বর বা ক্ষয়রোগ এমনকি স্নায়বিক ব্যাধিতে ভোগে তাদের কাছে এই অবস্থাটা দুঃসহ। কিন্তু জেনেই বা উপায় কী? বসার ঘরে তাকে অভ্যর্থনা জানায় তার সহকারী সেরগেই সেরগেইচ। সেরগেই সেরগেইচ মানুষটা ছোটখাটো, নধরকান্তি, মুখখানা গোলগাল, পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো, ব্যবহার স্বচ্ছন্দ ও নম্র, পরনে নতুন ঢিলাঢালা স্যুট। দেখে সহকারী চিকিৎসকের চাইতে আইনসভার সভ্য বলে মনে হয়। সহরে তার বেশ পসার, ডাক্তারদের সাদা টাই পরে আর মনে করে হাসপাতালের ডাক্তারের চেয়ে, যার পসার বলতে কিছু নেই, সে অনেক বেশি জানে। বসার ঘরে এক কোণে কুলুঙ্গীমতো জায়গায় মস্ত এক আইকন। তার সামনে একটা প্রদীপ। তার কাছে সাদা পর্দায় আড়াল করা ভক্তদের মোমবাতি রাখার জায়গা। দেওয়ালের শোভা বর্ধন করছে বিশপদের ছবি, স্ভিয়াতগরস্ক মঠের দৃশ্য আর মেঠো ফুলের শুকনো স্তবক। সেরগেই সেরগেইচ ধর্মপ্রবণ এবং ধর্মসংক্রান্ত অনুষ্ঠান যথাযথ পালন করে। সে-ই আইকন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে। প্রতি রবিবারে তারই নির্দেশে কোনো না কোনো রোগী প্রার্থনা পাঠ করে। পাঠ হয়ে গেলে সেরগেই সেরগেইচ নিজে ধূপদানি হাতে করে দোলাতে দোলাতে হাসপাতালের প্রতি ওয়ার্ডে ধূপের ধোঁয়া দিয়ে আসে।

রোগী অসংখ্য আর সময় অত্যল্প। অতএব প্রতিটি রোগী সম্পর্কে ডাক্তারকে সামান্য কয়েকটি প্রশ্নে এবং বাঁধাধরা কয়েকটি ওষুধে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মালিশ বা ক্যাষ্টর অয়েলে, সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ গালে হাত দিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে বাঁধা গতে প্রশ্ন করে চলে। সেরগেই সেরগেইচও পাশে বসে হাত কচলায় আর মাঝে মাঝে এক আধটা কথা বলে।

‘আমরা রোগে ভুগি, দারিদ্র্যে ধুঁকি,’ সে বলে, ‘কারণ দয়াময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি না। মূল কারণ এই।’

রোগী দেখার সময় আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ অপারেশন করে না, বহুদিন হল ছুরি চালানোর অভ্যাস সে ত্যাগ করেছে। এখন রক্ত দেখলে তার মাথা ঝিমঝিম করে। গলার ভিতরটা দেখার জন্যে যখন কোনো বাচ্চার মুখ হাঁ করতে হয়, আর বাচ্চাটা আর্তনাদ করতে করতে তার ছোট ছোট হাত দিয়ে ডাক্তারকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে, তখন সেই আর্তনাদে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের মাথা ঘুরে ওঠে। তার এত কষ্ট হয় যে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। সে

তাড়াতাড়ি একটি প্রেসক্রিপশন লিখে ইশারায় বাচ্চার মাকে বলে বাচ্চাকে নিয়ে যেতে।

রোগীদের ভীরুতা ও মূঢ়তা, ধর্মের ধ্বজাধারী সেরগেই সেরগেইচের উপস্থিতি, দেওয়ালের ছবিগুলো এবং গত বিশ বছর বা তারও বেশিদিন ধরে বাঁধা ছকের প্রশ্নে ডাক্তারের মনে ক্লান্তি আনে। পাঁচ ছ'জন রোগীকে দেখে সে বাড়ি চলে যায়। বাকী সবাইকে তার সহকারী দেখে।

ডাক্তার হিসেবে বহুদিন কোনো পসার নেই বলে সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়। তাকে কেউ বিরক্ত করবে না জেনে সে বাড়িতে ফিরেই নিশ্চিন্ত মনে বই নিয়ে বসে। সে বিস্তর পড়াশোনা করে এবং পড়াশোনা করে তৃপ্তিও পায়। তার মাইনের অর্ধেকই যায় বই কিনতে। তার ছ'টা ঘরের তিনটে ঘরই ঠাসা বই-এ ও পুরনো পত্রিকায়। ইতিহাস ও দর্শন পড়তে সে খুব ভালোবাসে। চিকিৎসা-সংক্রান্ত একটিমাত্র পত্রিকা সে নেয় — 'দি ফিজিসিয়ান'। সব সময় শেষ থেকে সেটা সে পড়তে শুরু করে। অনেক সময়ে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিন্দুমাত্র ক্লান্তি বোধ না করে সমানে পড়ে চলে। ইভান দ্‌মিত্রিচ যেমন তাড়াতাড়ি হুড়মুড় করে পড়ে যেত, সে তেমনভাবে পড়ে না। ধীরে ধীরে মর্ম গ্রহণ করে পড়ে। যে জায়গাগুলো ভালো লাগে কিংবা সহজবোধ্য নয় প্রায়ই সে-জায়গাগুলো থেমে থেমে পড়ে। তার বইয়ের পাশে সর্বদা একটা কাঁচের পাত্রে ভদকা থাকে আর তার ডেস্কের ওপরে থাকে নুন দেওয়া শসা কিংবা জরানো আপেলের টুকরো। প্রতি আধঘণ্টা অন্তর বইয়ের পাতা থেকে চোখ না সরিয়ে সে মদের গেলাসে ভদকা ঢেলে নেয়। তারপর হাতড়ে হাতড়ে শসাটা নিয়ে দেয় একটা কামড়।

তিনটের সময় রান্নাঘরের দোরগোড়ায় সন্তর্পণে গিয়ে একটু গলা ঝেড়ে বলে :

'দারিয়া, খাবার কতদূর?'

যেমন তেমন রান্না, প্রায়-বিস্বাদ খাদ্য গলাধঃকরণ করে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ বুকের উপর হাত ভাঁজ করে চিন্তিত মনে এঘর ওঘর পায়চারি করে। ঘড়িতে চারটে বাজে, তারপরে পাঁচটা। তখনো আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের চিন্তা ও পায়চারি করা থামে না। থেকে থেকে রান্নাঘরের দরজা খোলার শব্দ শোনা যায়। আর দারিয়ার লাল ঘুমে ঢুলুঢুলু মুখের আবির্ভাব ঘটে।

‘আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ, আপনার বিয়ার খাবার সময় হয়নি?’ উৎকণ্ঠিতভাবে সে জিজ্ঞাসা করে।

‘এখনো হয়নি,’ ডাক্তার বলে। ‘আরেকটু পরে, আরেকটু ...’

সন্ধ্যে নাগাদ আসে পোস্টমাস্টার মিখাইল আভেরিয়ানিচ। সারা শহরে এই একটিমাত্র লোকের সঙ্গ আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের কাছে বিরক্তিকর ঠেকে না। মিখাইল আভেরিয়ানিচ এক কালে বেশ অবস্থাপন্ন জমিদার ছিল, অশ্বারোহী সৈনিক হিসেবেও কাজ করেছে। কিন্তু সমস্ত সম্পত্তি সে উড়িয়ে দেওয়ায় দায়ে পড়ে বৃদ্ধ বয়সে পোস্টাফিসের এই চাকরি নিতে বাধ্য হয়। তাহলেও তার দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অটুট। তার পাকা জুলপী দেখবার মতো, ব্যবহার অমায়িক এবং কণ্ঠস্বর চড়া হলেও কর্কশ নয়। সহজে রেগে উঠলেও তার মনটা কিন্তু দরদী ও স্নেহপ্রবণ। জনসাধারণের মধ্যে কেউ যদি পোস্টাফিসের কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রতিবাদ করে কিংবা দ্বিমত হয় বা কোনো কিছু নিয়ে বিতর্ক করে, মিখাইল আভেরিয়ানিচ রেগে লাল হয়ে কাঁপতে থাকে, বাড়ি ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে: ‘চোপরাও!’ এর ফলে সাধারণের কাছে পোস্টাফিস একটা ভয়ংকর জায়গা বলে সুবিদিত। মিখাইল আভেরিয়ানিচ আন্দ্রেই ইয়েফিমিচকে তার উন্নত মন ও পাণ্ডিত্যের জন্যে শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে। কিন্তু আর সবাইকে সে নিজের থেকে হেয় মনে করে, মিশবার যোগ্য বলেই মনে করে না।

‘আমি হাজির!’ ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে সে চিৎকার করে বলে। ‘বন্ধুবরের খবর কী? আমার জ্বালায় পাগল হয়ে উঠলেন, তাই না?’

‘না, না, সে কি?’ ডাক্তার জবাব দেয়। ‘নিজেই তো জানেন, আপনার দেখা পেলে আমি সর্বদা খুশিই হই।’

দুই বন্ধুতে পড়ার ঘরের সোফায় গিয়ে বসে, বসে বসে কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান করে।

‘দারিয়া, একটু বিয়ার দিলে কেমন হয়?’ ডাক্তার প্রশ্ন করে।

তেমনি নীরবে প্রথম বোতলটা শেষ হয়ে যায়। ডাক্তারকে চিন্তামগ্ন মনে হয় আর মিখাইল আভেরিয়ানিচকে দেখে মনে হয় ফূর্তিতে বুঝি ফেটে পড়বে। মনে হয় খুব মজার একটা খবর সে চেপে রয়েছে। সাধারণত ডাক্তারই প্রথমে মুখ খোলে।

শান্ত ও ধীরভাবে মাথাটা একটু নেড়ে বন্ধুর মুখের দিকে না তাকিয়ে (কখনো সে কারুর মুখের দিকে তাকায় না) সে বলতে শুরু করে, 'কত বড় দুঃখের কথা বলুন তো মিখাইল আভেরিয়ানিচ, আমাদের এই শহরে এমন একটাও প্রাণী নেই যে মনের উৎকর্ষ হয় এমন ধরনের আলোচনা করতে পারে বা শুনতে চায়। এ আমাদের কত বড় দীনতা। যারা শিক্ষিত তারাও দেখি তুচ্ছ ব্যাপারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি তাদের মনের বিকাশ নিম্নশ্রেণীর লোকদের থেকে কোনো অংশেই উন্নত নয়।'

'যা বলেছেন। আপনার সঙ্গে একেবারে একমত।'

'আপনাকে নিশ্চয় বলে বোঝাতে হবে না,' ডাক্তার তেমনি ধীর শান্তকণ্ঠে বলে চলে, 'মানব মনের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও তার স্ফুরণ ছাড়া এ জগতে সব কিছুই অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ। এই মনই মানুষ ও জন্তুর মাঝখানে সীমারেখা টানে, এরই দয়ায় মানুষের স্বর্গীয় সত্তার আভাস পাই। অমর বলে কিছু নেই জানি, যদি কিছু থাকে তা এই মানব মন। এই থেকে শুরু করলে দেখতে পাই যাবতীয় আনন্দের মূলে রয়েছে এই মন। আমরা আমাদের চারদিকে এইরকম একটা মন দেখিও না, শুনিও না, তার অর্থ আমাদের ভাগ্যে সুখ জোটে না। বলবেন, কেন বই তো আছে; আছে সত্যি, কিন্তু ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও আলোচনার স্থান বইয়ে পূরণ হয় না। একটা উপমা দিয়ে যদি আমাকে বোঝাতে দেন, হয়ত উপমাটা তেমন মনোমত হবে না তা হলেও, আমার মতে বই হচ্ছে ছাপানো স্বরলিপি। আর আলাপ আলোচনা — গান।'

'যা বলেছেন।'

আবার চুপচাপ। একটা বোবা দুঃখের ভাব মুখে নিয়ে দারিয়া রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজার কাছটিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গালে হাত দিয়ে শুনতে থাকে ওদের কথা।

'হায়রে,' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মিখাইল আভেরিয়ানিচ বলে। 'আজকালকার দিনে আবার মানুষের মন!'

তারপর সে বলে চলে সেকালের কথা, জীবন যখন ছিল আনন্দে পরিপূর্ণ, জীবনে যখন ছিল আগ্রহ। বলে চলে সেকালের রাশিয়ার শিক্ষিত শ্রেণীর কথা যারা জানত মানুষকে সম্মান করতে, বন্ধুকে ভালোবাসতে। সে

স্বর্ণযুগে একজন আরেকজনকে বিনা রসিদে টাকা ধার দিত, দুঃস্থ বন্ধুকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে না আসা লজ্জাকর ব্যাপার বলে গণ্য হত। এইসঙ্গে ছিল দেশজয়ের বড় বড় অভিযান, নানা ধরনের অসমসাহসিকতা, লড়াই দাঙ্গা, বন্ধুত্ব আর নারী। আহা, আর ককেশাস! কী দেশ! সেই ব্যাটেলিয়ান অধিনায়কের স্ত্রীর কথা মনে পড়ে, ভদ্রমহিলার মাথায় ছিট ছিল, অফিসারের পোষাক পরে প্রতি সন্ধ্যায় সঙ্গে কাউকে না নিয়ে ঘোড়ায় চেপে যেত পাহাড়ে। লোকে বলতে পাহাড়ী গ্রামে কোনো রাজপুত্রের সঙ্গে তার গোপন প্রণয় ছিল।

'রক্ষে কর মা!' দারিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে।

'আর কী রকম ঢালাও মদ চলত! তেমনি খাওয়া! দরাজ দিলে যা খুশি তাই বলেছি, কাউকে তোয়াক্কা করিনি।'

আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ তার কথাগুলো কানে শুনছে, মনে শুনছে না। বিয়ারে অল্প চুমুক দিতে দিতে সে ভাবছে অন্য কথা।

'প্রায়ই আমি বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের স্বপ্ন দেখি, স্বপ্নে তাদের সঙ্গে কথা বলি,' মিখাইল আভেরিয়ানিচের কথার স্রোতে বাধা দিয়ে হঠাৎ সে বলে। 'আমার বাবা আমাকে আদর্শ শিক্ষাই দিয়েছিলেন, তবে এই শতাব্দীর সপ্তম দশকের ধ্যানধারণায় প্রভাবিত হয়ে আমাকে পাঠালেন ডাক্তারী পড়তে। এখন মাঝে মাঝে ভাবি তাঁকে যদি অমান্য করতাম, ইতিমধ্যে হয়ত আমি আধ্যাত্মিক আন্দোলনের মধ্যে পড়ে যেতাম। হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীতে আমার স্থান হত। যদিও মন পদার্থটা অমর নয়, সব কিছুর মতোই নশ্বর, তা সত্ত্বেও কেন আমি মনন চিন্তনকে এত উচ্চস্থান দিই আপনাকে আগেই তা বুঝিয়ে বলেছি। জীবনটা একটা দুর্ভোগের জাল। যখনই কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তির বুদ্ধির পরিণতি ঘটে, যখনই সে তার চিন্তাশক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয় তখনই অনুভব না করে পারে না যে এমন একটা জালে সে আটকা পড়েছে যার থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। যখন ভাবা যায় তাকে অবিদ্যমান অবস্থা থেকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডেকে আনা হয়েছে সম্পূর্ণ আকস্মিক কারণে... কীসের জন্য? যদি সে জানতে চেষ্টা করে জীবনের আদর্শ বা উদ্দেশ্য কী, হয় সে কোনো জবাবই পায় না, নয় তো যত উদ্ভট তত্ত্বকথা শোনে। দ্বারে সে করাঘাতই করে যায়, কেউ খোলে না। তারপরে একদিন মৃত্যু আসে — তাও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কয়েদীরা যেমন

একই দুঃখের ভাগীদার বলে যখন একসঙ্গে থাকার সুযোগ পায় তখন কিছুটা সুখে থাকে, তেমনই যে-সব ব্যক্তির মনের গঠন বিশ্লেষণী ও দার্শনিক তারাও পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়। তাদের খেয়াল থাকে না তারা জালে আটকা পড়েছে। উন্নত চিন্তার অবাধ চর্চায় ও বিনিময়ে তারা দিন কাটিয়ে দেয়। এদিক দিয়ে মন অতুলনীয় পরিতৃপ্তির উৎস।'

'সত্যিই তাই।'

অপর পক্ষের চোখের দিকে না তাকিয়ে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ থেমে থেমে শান্তভাবে বলে চলে মননশীল ব্যক্তিদের কথা এবং তাদের সঙ্গে আলাপ করার আনন্দ। মিখাইল আভেরিয়ানিচ মন দিয়ে তার কথা শোনে আর থেকে থেকে 'সত্যিই তাই' বলে ওঠে।

'আপনি কি বিশ্বাস করেন না আত্মা অবিনশ্বর?' পোস্টমাস্টার হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে।

'না মশায়, আমি বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস তো করিই না, বিশ্বাস করার কোনো কারণও পাই না।'

'সত্যি কথা বলতে কি, এ সম্পর্কে আমিও তেমন স্থিরনিশ্চিত নই। অথচ জানেন, আমার কেমন যেন মনে হয় কখনো মরব না। মাঝে মাঝে নিজেকে বলি, এই বুড়ো, আর কেন, এবার মরার জন্যে তৈরী হও! কিন্তু কে যেন চুপিচুপি বলে: ও সব কথায় কান দিও না। তুমি কখনো মরবে না ...'

ন'টার পরেই মিখাইল আভেরিয়ানিচ চলে যায়। হলে দাঁড়িয়ে ভারী কোটটায় হাত গলাবার চেষ্টা করতে করতে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে:

'সত্যি নিয়তি আমাদের কী এক অতল খাদের মধ্যে ফেলেছে! সবচেয়ে মর্মান্তিক, এখানে আমাদের মরতেও হবে। হা কপাল ...'

৭

বন্ধুকে বিদায় দেবার পর আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ ডেস্কের পাশে গিয়ে বসে আবার পড়াশোনায় মন দেয়। নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করার মতো সামান্যতম শব্দও নেই, মনে হয় সময়ের গতি থেমে গেছে। সময় যেন থমকে দাঁড়িয়ে ডাক্তার

ও তার বইকে লক্ষ্য করছে। মনে হয় এই বইখানা আর ওই সবুজ ঢাকা-দেওয়া বাতিটা ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু নেই। ডাক্তারের রুক্ষ চাষাড়ে চেহারা মানব-মনের অভিব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় ধীরে ধীরে হাসির ছটায় ভরে ওঠে। 'কেন, আহা, কেন মানুষ অমর হয় না?' সে আপন মনে ভাবে। 'মস্তিষ্কের এই কোষ ও কুণ্ডলীগুলো, এই দৃষ্টি, এই বাচনশক্তি, এই আত্মচেতনা, এই প্রতিভা — এরা কি শুধু পৃথিবীর মাটির সঙ্গে মিশে যাবে? পৃথিবীর মাটির মতোই লক্ষ কোটি বর্ষের সূর্য পরিক্রমার ফলে শুধু কি তারা নিস্তাপ জড়পিণ্ডে পরিণত হবে? শুধু এই অকারণ উদ্দেশ্যহীন ঘূর্ণীচক্রে জড়ত্ব প্রাপ্তির জন্যে কী প্রয়োজন ছিল অনস্তিত্বের অন্ধকার থেকে মানুষের, — এই দেবদুর্লভ মানস সম্পদের অধিকারী মানুষের আবির্ভাব ঘটানো, তারপর নির্মম রসিকতা ছলে তাকে কাদার ঢেলায় পরিণত করা?'

বিপাক! অমরতার এই প্রতিভূতে কাপুরুষ ছাড়া কে সান্ত্বনা পেতে পারে? প্রাকৃতিক জগতে জীবনীশক্তির অচেতনতা মানবিক জড়বুদ্ধিরও নিম্নস্তরের, কারণ জড়বুদ্ধির মধ্যেও কিছুটা ইচ্ছাশক্তি, কিছুটা চেতনা থেকে যায়। প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে সেটুকুও থাকে না। যে ভীরুর আত্মমর্যাদাবোধের থেকে মৃত্যুভীতি প্রবলতর সে-ই এই ভেবে সান্ত্বনা পেতে পারে যে তার দেহ একটা ঘাসের শীষে, একটুকরো পাথরে বা একটা ব্যাঙাচির মধ্যে টিঁকে থাকবে ... বেহালাখানা ভেঙ্গে যাবার ও অকেজো হবার পর কেউ বেহালার খাপটা দেখিয়ে যদি বলে তার কী উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, তা যেমন হাস্যকর শোনায়, তেমনি হাস্যকর বিপাকের মধ্যে অমরতার সন্ধান করা।

ঘড়িতে ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে আর আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ চোখ বুজে প্রতিবার তার ইজিচেয়ারটায় হেলান দিয়ে শোয় নিবিষ্ট মনে আরো কিছুক্ষণ চিন্তা করার জন্যে। এইমাত্র যে বইখানা পড়ছিল সেটার উন্নত ভাবাদর্শ তার মনে প্রভাব বিস্তার করে। অজ্ঞাতভাবে সেই আদর্শের নিরিখে নিজের জীবনকে, তার অতীত ও বর্তমানকে বিশ্লেষণ করতে থাকে। অতীতের চিন্তা তার কাছে বিরক্তিকর মনে হয়, অতীতের দিকে তাকায় না। বর্তমানও অতীতের মতোই। সে জানে সূর্যের চারপাশে পার্থিব জড়পিণ্ডের সঙ্গে তার চিন্তাগুলো যখন ঘুরে চলেছে তখন এই বড় বাড়িটায় ডাক্তারের কামরার কয়েক পা দূরে

মানুষ নোংরা আবর্জনার মধ্যে রোগে ধুঁকছে, হয়ত ঠিক এই মুহূর্তে ছারপোকার জ্বালায় কেউ জেগে রাত কাটাচ্ছে, কারুর হয়ত ঘাটা ইরিসিপেলাসে সংক্রামিত হয়ে উঠছে, কারুর বা ক্ষতস্থানে এমন জোরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে যে তার চাপে সে পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে, হয়ত বা রোগীদের মধ্যে কেউ কেউ নার্সদের নিয়ে তাস খেলছে আর ভদকা খাচ্ছে। গত বৎসর বারো হাজার মেয়ে পুরুষকে ঠকানো হয়েছে। সমস্ত হাসপাতালটার কর্মকাণ্ডের গোড়ায় রয়েছে চুরি, ঝগড়া, গালগল্প, দলাদলি, আত্মীয়পোষণ আর চিকিৎসার নির্লজ্জ অব্যবস্থা। কুড়ি বছর আগে যা ছিল আজও তাই। হাসপাতালটা এখনও পর্যন্ত দুর্নীতির ঘাঁটি, জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অনেক বেশি হানিকর। আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ জানে, ৬ নং ওয়ার্ডের গরাদের ওধারে নিকিতা রোগীদের নিয়মিত প্রহার করে, জানে, মসেইকা প্রতিদিন ভিক্ষা চাইতে রাস্তায় বেরিয়ে আসে।

সেই সঙ্গে এও জানে, গত পঁচিশ বছরে চিকিৎসা বিজ্ঞানে আশাতীত উন্নতি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় তার মনে হত চিকিৎসাবিদ্যার পরিণতি হবে অল-কিমিয়া ও অধ্যাত্মশাস্ত্রের মতো। কিন্তু এখন রাতের পর রাত যতই সে পড়ে ততই এই চিকিৎসাবিদ্যা তাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে, এর ভবিষ্যত কল্পনায় এখন তার সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগে। কী আশাতীত এর সাফল্য, বিজ্ঞানের রাজ্যে কী বিপ্লব এনে দিয়েছে! পচন-নিবারক সব ওষুধের দয়ায় আজকাল এমন অপারেশন স্বচ্ছন্দে সম্ভব হচ্ছে যা পিরগোভের মত বিশ্ববিশ্রুত সার্জেনের পক্ষে এককালে কল্পনাতীত ছিল। জেমস্তভো হাসপাতালের সাধারণ ডাক্তাররা পর্যন্ত জানুসন্ধি ব্যবচ্ছেদ করতে আর ভয় পায় না, উদরান্ত্র অপারেশনের পর একশটায় খুব জোর একজন মারা যায়, আর পাথুরী তো উল্লেখযোগ্য বলেই বিবেচিত হয় না। সিফিলিস থেকে পুরোপুরি আরোগ্যলাভ সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়াও আছে সংবেশন ও বংশগতি সম্পর্কে নতুন সব মতবাদ, পাস্তুর ও কচের আবিষ্কার, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, সংখ্যাতত্ত্ব আর আমাদের রুশীয় চিকিৎসা ক্ষেত্রে জেমস্তভো হাসপাতালগুলি। মানসিক ব্যাধির বিজ্ঞান, তার আধুনিক শ্রেণীবিভাগ, রোগ নির্ণয়ের ও চিকিৎসার নতুন পদ্ধতি — অতীতের তুলনায় এ সবই যুগান্তরকারী।

মানসিক রোগীদের আর ঠাণ্ডা জলে চোবানো বা আঁটসাঁট করে বেঁধে রাখা হয় না, তাদের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করা হয়। কাগজে আজকাল প্রায়ই দেখা যায় তাদের আনন্দ দেবার জন্যে থিয়েটার ও বল নাচের ব্যবস্থাও হয়ে থাকে। আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ জানে যে আধুনিক রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী থাকা সত্ত্বেও ৬ নং ওয়ার্ডের মতো একটা নরককুণ্ড যে টিঁকে থাকা সম্ভব তার কারণ এই সহর থেকে রেল স্টেশন দু শ' ভের্স্ট দূরে, তার কারণ সহরের মেয়র ও কাউন্সিলরদের বিদ্যাবুদ্ধি তেমন কিছুই নেই। তারা ডাক্তারকে বিশ্বাস করে যেন গুরুঠাকুর। যদি ডাক্তার সীসে গলিয়ে রোগীর মুখে ঢেলে দেয় তবুও তারা উচ্চবাচ্য করবে না। অন্য জায়গায় হলে খবরের কাগজের ও জনমতের আক্রোশে ছোটখাটো এই জেলখানাটা কবে ধূলিসাৎ হয়ে যেত।

'কিন্তু তাতেই বা লাভ কী হত?' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ চোখদুটো বিস্ফারিত করে নিজেকে প্রশ্ন করে। 'এত কিছু তো হয়েছে, তার সুফলটা কী? পচন-নিবারক ওষুধ বল, কচ বল, পাস্তুর বল, গোড়ায় যে গলদ সে-ই রয়ে গেছে। রোগ ও মৃত্যুর হার যেমন ছিল তেমনি আছে। মানসিক রোগীদের জন্যে থিয়েটার কর বা বল নাচের ব্যবস্থা কর, কিন্তু বন্দীদশা থেকে তাদের আজও মুক্তি নেই। অতএব এসব অর্থহীন আড়ম্বর বই কিছু নয়। ভিয়েনার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাগারের থেকে আমার এই হাসপাতালের মূলত কোনো পার্থক্য নেই।'

নিজেকে এত বোঝানো সত্ত্বেও সে নির্বিকার থাকতে পারে না, ঈর্ষামিশ্রিত একটা বিষণ্ণতা তার মনকে ভারী করে তোলে। সম্ভবত এটা ক্লান্তির জন্য। ভারী মাথাটা বইয়ের পাতার দিকে নেমে যায়, গালের নিচে হাতখানা রেখে সে আপন মনে ভাবতে থাকে:

'আমি এক অশুভ শক্তির সেবা করছি, যাদের আমি ঠকাচ্ছি তাদেরই কাছ থেকে আমার মাসোহারা নিচ্ছি। আমি অসৎ। কিন্তু আলাদাভাবে আমি তো কিছুই না, অনিবার্য যে পাপের পাঁকে সমস্ত সমাজটা ডুবে রয়েছে আমি তারই সামান্য একটা কণিকামাত্র: জেলার খারাপ অফিসাররা সবাই কোনো কাজ না করে মাইনে নেয় তাই আমার মধ্যে যদি সততার অভাব ঘটে থাকে

তার জন্যে দায়ী আমি নই, দায়ী এই যুগ। আমি যদি দু শ' বছর পরে জন্মাতাম, নিশ্চয় অন্যরকম হতাম।'

ঘড়িতে তিনটে বাজলে সে আলো নিভিয়ে শুতে যায়। ঘুম কিন্তু একটুও আসে না।

৮

বছর দুয়েক আগে হঠাৎ এক ঔদার্যের আবেগে জেমস্তভো প্রতিষ্ঠান সংকল্প গ্রহণ করে বসে যে হাসপাতালের ডাক্তার ইত্যাদির সংখ্যা বাড়ানোর জন্যে প্রতি বৎসরে তিনশ রুবল দান করে যাবে যতদিন পর্যন্ত না জেমস্তভোর নামে পুরোদস্তুর একটা হাসপাতাল গড়ে ওঠে। এরই ফলে জেলা চিকিৎসক ইয়েভগেনি ফিওদরিচ খোবতভকে মিউনিসিপ্যালিটি আমন্ত্রণ জানাল আন্দ্রেই ইয়েফিমিচকে কাজে সাহায্য করতে। নবাগত ডাক্তার বয়সে নিতান্তই তরুণ, ত্রিশও পার হয়নি, দীর্ঘ দেহ, কাল চুল, গালের হাড়গুলো চওড়া, চোখদুটো ছোট ছোট, তার পূর্বপুরুষেরা সম্ভবত ছিল অরুশীয়। একটা কোপেকও না নিয়ে সে শহরে এসে হাজির হল, সঙ্গে আনল ছোটখাটো একটা ট্রাঙ্ক আর বাচ্চা কোলে সাদাসিধে এক তরুণী নারী। তাকে নিজের পাচিকা বলে পরিচয় দিল। ইয়েভগেনি ফিওদরিচ মাথায় সূক্ষ্মাগ্র টুপি, পায়ে হাঁটু পর্যন্ত বুটজুতো, আর শীতকালে ভেড়ার চামড়ার একটা জামা পরে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। ডাক্তারের সহকারী সেরগেই সেরগেইচের ও কোশিয়ারবাবুর সঙ্গে চট করে সে খাতির জমিয়ে নেয়, কিন্তু হাসপাতালের আর সব কর্মচারীদের সঙ্গ সে পরিহার করে চলে, কে জানে কেন তাদের সে বলে অভিজাত। তার সমগ্র কামরাটায় বই বলতে মাত্র একখানি—'১৮৮১ সালের জন্য ভিয়েনার চিকিৎসাগারে ব্যবহৃত আধুনিকতম প্রেসক্রিপশন তালিকা'। এই বইটি সঙ্গে না নিয়ে সে কখনো কোনো রোগী দেখতে যায় না। সন্ধ্যেবেলায় সে ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলে, কিন্তু তাস খেলায় একদম নেশা নেই। 'সোনার পাথর বাটি', 'আরে, হেসে লও দুদিন বইতো নয়', এই ধরনের মামুলী রসিকতা করতে সে ভালোবাসে।

সপ্তাহে দুদিন সে হাসপাতালে যায়, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘোরে এবং বাইরের রোগীদের দেখে। এ্যান্টিসেপটিকের ব্যবস্থা নেই অথচ রক্তমোক্ষণের গাদা গাদা

বাটি আমদানি হচ্ছে দেখে তার অনেক কিছু মনে হয়, কিন্তু পাছে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ অসন্তুষ্ট হয় সেই ভয়ে নতুন কোনো প্রক্রিয়ার প্রচলন করে না। তার দৃঢ়বিশ্বাস তার সহযোগী আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ বুড়ো জোচ্চোর। সন্দেহ হয় সে একটা টাকার কুমীর। মনে মনে তাকে ঈর্ষাও করে। তার জায়গাটা দখল করতে পারলে সে খুশিই হয়।

৯

বসন্তকালের এক সন্ধ্যাবেলা। মার্চ মাস তখন শেষ হয়ে আসছে। মাটিতে আর বরফের চিহ্নমাত্র নেই। হাসপাতাল প্রাঙ্গণে পাখীর কূজন শুরু হয়েছে। ডাক্তার তার বন্ধু পোস্টমাষ্টারকে হাসপাতালের সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। সেই মুহূর্তে ইহুদী মসেইকা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল। তার মাথায় টুপী নেই, জুতোর বদলে শুধু পায়ে পরে রয়েছে একজোড়া গালোশ। হাতে একটা ছোট ব্যাগ। ভিক্ষে করে যা পেয়েছে তাই তার মধ্যে।

'একটা কোপেক দাও,' শীতে কাঁপতে কাঁপতে সামান্য হেসে সে ডাক্তারকে বলল।

আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ কাউকে ফিরিয়ে দিতে জানে না, অতএব তার হাতে একটা দশ-কোপেক মুদ্রা তুলে দিল।

.'কী সর্বনাশ!' লোকটার মোজাবিহীন পা দুটো আর রোগা রোগা গাঁটগুলো দেখে ডাক্তারের মনে হল। 'এই ঠাণ্ডায় জলে ...'

করুণা ও বিরক্তিমিশ্রিত একটা মনোভাব নিয়ে সে লোকটাকে অনুসরণ করে তার ওয়ার্ড পর্যন্ত গেল। যেতে যেতে তার টাক মাথা থেকে পায়ের গাঁট পর্যন্ত দেখতে লাগল। ডাক্তারকে প্রবেশ করতে দেখে নিকিতা আবর্জনাস্তূপ থেকে এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে স্থির হয়ে রইল।

'কী খবর নিকিতা?' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ শান্তস্বরে বলল। 'ইহুদীটাকে একজোড়া বুট বা অন্য কোন জুতো দেওয়া যায় না? দেখতে পাচ্ছ না, লোকটার যে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

'আচ্ছা হুজুর, সুপারিণ্টেনডেণ্টকে বলব।'

'হ্যাঁ বলবে, আমার নাম করে বলবে, বুঝলে বলবে আমি দিতে বলেছি।'

দরদালান থেকে ওয়ার্ডে প্রবেশের দরজাটা খোলা ছিল। অপরিচিত

কণ্ঠস্বরের আভাস পেয়ে এক হাতের কনুইয়ে মাথাটা ভর করে ইভান দ্মিত্রিচ বিছানায় শুয়ে শুয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল। হঠাৎ সে ডাক্তারের গলার আওয়াজ চিনতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে লাফিয়ে উঠল, তার মুখটা লাল হয়ে যেন ফেটে পড়ছে, চোখদুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসছে। সে আর স্থির থাকতে পারল না, এক দৌড়ে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল।

'ডাক্তার এসেছে!' সে চিৎকার করে উঠল, পরক্ষণেই হো হো শব্দে হেসে ফেটে পড়ল। 'শেষ পর্যন্ত এলেন? ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের কী সৌভাগ্য, ডাক্তার দয়া করে আমাদের ঘরে পদার্পণ করেছেন! হতচ্ছাড়া বদমাস কাঁহাকা!' গলা চিরে সে চেঁচাতে লাগল, এমন উৎকটভাবে সে পা ঠুকল যা আগে এই ওয়ার্ডের কেউ তার এ মূর্তি কখনো দেখেনি। 'খতম কর ওই বদমাসটাকে! না না, খুন হওয়া ওর পক্ষে অনেক ভালো। ব্যাটাকে পায়খানার নোংরায় ফেলে দাও।'

আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ দরজার কাছে মাথা রেখে শান্তভাবে প্রশ্ন করল:

'কেন, কিসের জন্যে?'

'কিসের জন্যে?' ইভান দ্মিত্রিচ চিৎকার করে ওঠে। তার মুখের চেহারা দেখলে ভয় হয়, পোশাকটা সামলিয়ে নিয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে সে এগিয়ে আসে। 'কিসের জন্যে? ব্যাটা চোর কোথাকার?' ঘৃণায় ঠোঁটদুটো কুঁচকিয়ে সে চিৎকার করতে থাকে, দেখে মনে হয় এই বুঝি গায়ে থুতু দেবে। 'হাতুড়ে! খুনী!'

'মাথা ঠাণ্ডা করুন,' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ অপরাধীর মত হাসি হাসি মুখ করে বলে। 'আমি নিশ্চিতভাবে আপনাকে জানাচ্ছি, সারা জীবনে আমি কখনো কিছু চুরি করিনি। বাকি যা সব বলছেন, বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি করছেন। দেখতে পাচ্ছি আমার ওপর রেগে গেছেন। আগে চেষ্টা করে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করুন, তারপর শান্তভাবে বলুন তো আপনার এই রাগের কারণ কি?'

'কেন আমাকে এখানে আটকে রেখেছেন?'

'কারণ, আপনি অসুস্থ।'

'ও, আমি অসুস্থ। কিন্তু হাজারে হাজারে পাগল যে স্বাধীনভাবে ঘুরে

বেড়াচ্ছে, তাদের বেলা কী, কেন তারা ঘুরে বেড়াতে পারছে, জানেন? কারণ, সুস্থ মানুষের থেকে তাদের তফাত বোঝার বিদ্যেবুদ্ধি আপনার নেই। অপরের পাপে কেন তবে আমাকে আর আমার মত এই হতভাগাদের এর মধ্যে বন্ধ রাখা হয়েছে। নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে আমাদের যে-কেউ আপনাদের এই হাসপাতালের গাড়লগুলোর থেকে অনেক ভালো। আপনি নিজে, আপনার সহকারী, আপনাদের সুপারিণ্টেনডেণ্ট কেউই বাদ যায় না, তাই যদি, তাহলে আমরাই কেন এখানে থাকব, আপনারা কেন থাকবেন না? এ কী ধরনের বিচার!'

'নৈতিক চরিত্র বা ন্যায় বিচারের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই। সব কিছুই দৈবদুর্বিপাকে ঘটে যায়। যাদের এখানে পোরা হয়েছে, তাদের থাকতে হয়েছে, যাদের পোরা হয়নি, তারা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আসল কথা হচ্ছে এই। আপনি যে একজন মানসিক রোগী আর আমি যে একজন ডাক্তার, এরমধ্যে কোনো নৈতিক সত্যও নেই, কোনো ন্যায়বিচারও নেই, দৈব ঘটনা ছাড়া এতে কিছুই নেই।'

ইভান দ্মিত্রিচ তার বিছানার ধারে বসে ফাঁকা গলায় বলল, 'এসব বাজে কথা আমি বুঝি না।'

এদিকে মসেইকা তার রুটির টুকিটাকি, কাগজপত্র, হাড়ের টুকরো বিছানার ওপর বিছিয়ে বসে শীতের জন্য কাঁপতে কাঁপতে আপন মনে নিজস্ব ভাষায় কী সব গুনগুন করে বলে চলেছে। বোধ হয় সে ভাবছে একটা দোকান খুলে বসেছে। ডাক্তার উপস্থিত থাকায় নিকিতা আজ তল্লাসী চালাবার সাহস পায়নি।

'আমাকে ছেড়ে দিন,' ইভান দ্মিত্রিচের কণ্ঠস্বর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

'আমি তা পারি না।'

'কিন্তু কেন, কিসের জন্যে পারেন না?'

'কারণ আমার ক্ষমতা নেই। ছেড়ে দিলে আপনার তাতে কতটুকু ভালো হবে, আপনিই একটু ভেবে দেখুন। মনে করুন, আমি ছেড়ে দিলাম, তারপরে কী হবে? শহরের লোকেরা কিংবা পুলিশ আপনাকে ধরে আবার এখানে নিয়ে আসবে।'

'ঠিক ঠিক, সত্যি বলেছেন,' ইভান দ্মিত্রিচ কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল। 'উঃ কী ভীষণ! আমি কী করি, কী করি, বলুন আমাকে?'

কণ্ঠস্বর, মুখবিকৃতি সত্ত্বেও তার বুদ্ধিদৃপ্ত তরুণ মুখখানা আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের হৃদয় স্পর্শ করল। এই তরুণকে সমবেদনা জানাতে, শান্ত করতে সে ব্যাকুল হল। ডাক্তার বিছানার ধারে তার পাশে বসে একটু ভেবে বলল:

'আপনি কী করবেন জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার পক্ষে সবচেয়ে ভালো হবে পালিয়ে যাওয়া। দুর্ভাগ্যবশত তাতেও কোনো ফয়দা হবে না। আপনাকে ধরে রাখা হবে। সমাজ যখন স্থির করে খুনী, আসামী, পাগল বা ওই ধরনের অপ্রীতিকর ব্যক্তিদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবে, সমাজের সে সংকল্প কেউ টলাতে পারে না। আপনার সামনে কেবল একটি মাত্র পথ খোলা আছে, এখানে আপনার উপস্থিতি প্রয়োজনীয় এই সত্যটা স্বীকার করে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া।'

'তাতেই বা কার কী লাভ হবে।'

'পাগলাগারদ, জেলখানা আছে বলে সেগুলো ভর্তি করার জন্যে লোকও দরকার। আপনি যদি না আসেন, আমাকে আনা হবে, আমি না হলে, অন্য কেউ। অপেক্ষা করুন, সুদূর হলেও সেদিন আসবেই যখন পাগলাগারদ ও জেলখানার অস্তিত্বই থাকবে না, গরাদ-দেওয়া এই জানলা আর হাসপাতালের এই পোষাকও সেদিন লোপ পাবে। আগে হোক পরে হোক, সেদিন আসবেই আসবে।'

ইভান দ্‌মিত্রিচ বিরক্তির হাসি হাসল।

'এসব কথায় নিশ্চয় আপনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন না,' সে চোখদুটো কুঁচকে বলল। 'আপনার ও আপনার ওই সাকরেদ নিকিতার মতো ভদ্রলোকদের ভবিষ্যত কী জানেন? কিন্তু মশাই সত্যিই আপনি নিশ্চিত হতে পারেন, সুদিন আসবেই! আমার কথাগুলো হয়ত তুচ্ছ শোনাচ্ছে, হয়ত শুনে আপনার হাসি পাচ্ছে, তবু এ আমি বলে রাখছি, নবজীবনের অরুণোদয় একদিন হবেই, সত্যের জয় হবেই, আর—আর আমরাও সেই আলোর স্পর্শ পাব। আমি পাব না, তার আগেই আমি মরে যাব, কিন্তু আর সবার নাতির নাতিরা সেই আলোর ছোঁওয়া পাবে। তাদের আমি মনেপ্রাণে সংবর্ধনা জানাচ্ছি, তারা সুখী হলে আমি আনন্দ পাই। বন্ধুগণ, এগিয়ে চল! সাথে আছে ভগবান!'

ইভান দ্‌মিত্রিচ হাতদুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর

জানলার দিকে এগিয়ে গেল। তার চোখদুটো উত্তেজনায় জ্বলছে, অনর্গল সে কথা কয়ে চলেছে।

'এই গরাদগুলোর এধার থেকে তোমাদের আমি আশীর্বাদ জানাচ্ছি। সত্য চিরস্থায়ী হোক। আনন্দ, কী আনন্দ!'

'এতে আনন্দ করার কী আছে আমি দেখতে পাচ্ছি না,' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ বলল। ইভান দ্মিত্রিচের উচ্ছ্বাসে কিছুটা নাটকীয়তা দেখতে পেলেও তা সত্ত্বেও ডাক্তারের তাকে পছন্দ হল। 'হয়ত আপনি যা বললেন তাই সত্যি হবে, পাগলাগারদ ও জেলখানাগুলো থাকবে না, হয়ত সত্যেরই জয় হবে, কিন্তু তবুও বস্তুমর্ম লোপ পাবে না, প্রকৃতির বিধিনিয়মেরও কোনো পরিবর্তন হবে না। এখনকার মতো তখনো মানুষ অসুখে ভুগবে, বুড়ো হবে, মরবে। যত উজ্জ্বল করেই সে প্রভাত আপনার জীবনকে আলোকিত করুক না, শেষ পর্যন্ত সেই কফিনের মধ্যে বন্ধ করে আপনাকে মাটির নিচে একটা গর্তে নিক্ষেপ করা হবেই।'

'কেন, অমরতা?'

'দূর, বাজে!'

'আপনি অমরতায় বিশ্বাস করেন না, আমি কিন্তু করি। দস্তয়েভস্কি না ভলতেয়ার কে যেন বলেছিলেন, ঈশ্বর না থাকলে মানুষই ঈশ্বরকে তৈরী করত। তেমনি, এও আমার বদ্ধমূল ধারণা, অমরতা বলে সত্যি কিছু না থাকলে অসাধ্যসাধনক্ষম মানুষের মন তাও সৃষ্টি করবে।'

'বেশ বলেছেন, স্মিতহাস্যে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ বলে উঠল। 'আপনার মনে বিশ্বাস আছে, ভালো কথা। আপনার মত বিশ্বাসের জোর থাকলে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও মানুষ সুখী হতে পারে। আপনি তো দেখছি একজন শিক্ষিত লোক?'

'হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি, যদিও গ্রাজুয়েট হওয়া হয়ে ওঠেনি।'

'কী প্রকারে চিন্তা করতে হয় আপনার জানা আছে দেখছি। যে কোনো অবস্থাতে আপনি আপনার চিন্তার মধ্যে সান্ত্বনা পেতে পারেন। পার্থিব কোলাহল ও মূঢ়তার ঊর্ধ্বে বাধাবন্ধনহীন গভীর যে চিন্তা জীবনরহস্যের সন্ধান এনে দেয়—মানব জীবনে এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আর কী হতে পারে। পৃথিবীময় যত জানলায় যত গরাদই থাক এই চিন্তার অধিকার

আপনার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারে না। ডাইয়জেনীজ একটা পিপের মধ্যে বাস করত কিন্তু রাজসুখও তার কাছে নগণ্য ছিল।'

'আপনার ডাইয়জেনীজ ছিল একটা গাড়ল,' ইভান দ্‌মিত্রিচ গম্ভীরভাবে বলল। 'ডাইয়জেনীজ, জীবনরহস্য এসব বড় বড় কথা আমাকে শোনাচ্ছেন কেন?' হঠাৎ ক্ষেপে লাফিয়ে উঠে সে বলল। 'আমি জীবনকে ভালোবাসি, দারুণ ভালোবাসি! আমি নিগ্রহাতঙ্কে ভুগছি, সব সময় আমার ভয়, ভয়ের তাড়নায় আমি স্থির থাকতে পারি না। কিন্তু মাঝে মাঝে জীবন আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। তখন আমার ভয় হয় আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব। আমি বাঁচতে চাই, উঃ কী ভীষণ আমার বাঁচার ইচ্ছে।'

উত্তেজিত হয়ে ঘরের ওধার থেকে এধারে এসে চাপা গলায় সে বলে চলল:

'মাঝে মাঝে স্বপ্নের মধ্যে আমার ওপর ভূতপ্রেত ভর করে। কতলোক আমায় দেখতে আসে। কতলোকের গলার আওয়াজ, কত গানবাজনা শুনতে পাই, মনে হয় আমি কোনো বনের মধ্যে বা সমুদ্রের ধারে রয়েছি। মানুষের ভিড়, মানুষের সেবাযত্ন পেতে আমার মন কেমন করে ... বলুন তো, ওখানে কী হচ্ছে?' হঠাৎ সে বিষয়ান্তরে চলে গেল। 'বাইরের জগতে কী হচ্ছে আমায় বলবেন?'

'শুধু কি আমাদের এই শহরটা সম্পর্কে না সাধারণভাবে দুনিয়া সম্পর্কে আপনি আমাকে বলতে বলছেন?'

'প্রথমে শহরটা সম্পর্কেই আরম্ভ করুন, তারপরে সাধারণভাবে দুনিয়া সম্পর্কে বলবেন।'

'বেশ, তবে শুনুন। শহরে একঘেয়েমি ছাড়া কিছুই নেই... এমন একটাও লোক নেই যার সঙ্গে দুটো কথা কওয়া যায় কিংবা যার কথা ধৈর্য ধরে শোনা যায়। নতুন লোক কেউই আসেনি। সত্যি কথা বলতে কি, খোবতভ নামে এক তরুণ ডাক্তারকে সম্প্রতি আমাদের মধ্যে আমদানি করা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তাকে জানি। সে যখন আসে আমি তখন বাইরে। তাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল একটা জড়ভরত।'

'যা বলেছেন, লোকটাকে রুচিবান শিক্ষিত ব্যক্তি বলা যায় না। সব ব্যাপারটাই কেমন যেন অদ্‌ভুত ঠেকে... বড় বড় শহর সম্পর্কে যে রকম শুনি,

তাতে তো মনে হয় সেখানে জীবনের গতিবেগ থেমে যায়নি, জ্ঞানবুদ্ধির রীতিমত চর্চা আছে। তার থেকেই ধারণা হয় সেখানে সত্যিকারের মানুষ আছে, কিন্তু কেন জানি না, আমাদের কাছে যে কটি নমুনা পাঠায় তারা কেউই আশানুরূপ নয়। এই শহরের দুর্ভাগ্য।'

'সত্যিই দুর্ভাগ্য!' ইভান দ্মিত্রিচ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, পরমুহূর্তেই হাসতে লাগল। 'এবারে দুনিয়ার কী হালচাল? খবরের কাগজে পত্রিকায় আজকাল কী বিষয় নিয়ে লেখালেখি চলছে?'

ওয়ার্ডের ভেতরে এরই মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ডাক্তার দাঁড়িয়ে উঠল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ইভান দ্মিত্রিচকে বলতে লাগল রাশিয়ার বাইরের ও ভেতরের কাগজগুলোয় কী বিষয়ে লেখা হচ্ছে, বলতে লাগল আধুনিক চিন্তাধারার গতি কোন দিকে। ইভান দ্মিত্রিচ একমনে তার কথা শুনে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে এটা ওটা প্রশ্নও করছে, এমন সময় হঠাৎ দুহাতে মাথাটা টিপে ধরে ডাক্তারের দিকে পিছন ফিরে এমনভাবে শুয়ে পড়ল, মনে হল হঠাৎ যেন তার মারাত্মক কিছু একটা মনে পড়ে গেছে।

'আপনি কি অসুস্থবোধ করছেন?' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ জিজ্ঞাসা করল।

'আমার কাছ থেকে আর একটি কথাও আদায় করতে পারবেন না,' ইভান দ্মিত্রিচ রূঢ়ভাবে জবাব দিল। 'আমায় একা থাকতে দিন।'

'কেন, কী হল?'

'বলছি, আমায় একা থাকতে দিন! আপনি তো আচ্ছা বদলোক!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ ওয়ার্ড ছেড়ে চলে গেল। দরদালানটা দিয়ে যেতে যেতে সে বলল:

'নিকিতা, জায়গাটা একটু পরিষ্কার করলে ভালো হয়... ভীষণ দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে!'

'আচ্ছা হুজুর।'

'সুন্দর ছোকরাটি!' বাড়ি ফেরার পথে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ ভাবতে লাগল। 'এত বছর পর এই প্রথম একজনকে পেলাম যার সঙ্গে কথা কওয়া যায়। বেশ যুক্তি দিয়ে কথা কইতে পারে, আর দেখলাম যে সব জিনিস গ্রাহ্য করার যোগ্য সেগুলোতেই ওর আগ্রহ।'

রাত্রে সে যতক্ষণ বসে বসে পড়ল তার কথা ভাবল। তারপর বিছানায় শুয়ে

তারই কথা চিন্তা করল। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই তার মনে পড়ে গেল আশ্চর্য এক বুদ্ধিমান ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে ঠিক করে ফেলল সুযোগ পেলেই আবার তার সঙ্গে দেখা করে আসবে।

১০

আগের দিন যেভাবে শুয়েছিল ঠিক সেইভাবে হাত দিয়ে রগ চেপে ধরে হাঁটুদুটো মুড়ে ইভান দ্মিত্রিচ বিছানায় শুয়েছিল। তার মুখটা দেয়ালের দিকে ফেরানো।

'কী বন্ধু, কেমন আছেন?' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ বলল। 'ঘুমোচ্ছেন নাকি?'

'প্রথমত, আমি আপনার বন্ধু নই,' ইভান দ্মিত্রিচ বালিশে মুখ গুঁজে চাপা গলায় বলল, 'দ্বিতীয়ত, আপনার বৃথা চেষ্টা, আমার কাছ থেকে একটা কথাও বার করতে পারবেন না।'

'আশ্চর্য ...' কিছুটা লজ্জা পেয়ে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ বলল। 'গতকাল হঠাৎ আপনি ক্ষুণ্ণ হয়ে আর কথা কইলেন না, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কী সুন্দর আলোচনা চলেছিল... নিশ্চয় আমি ভালোভাবে নিজেকে বোঝাতে পারিনি কিংবা এমন কিছু বলেছি যা আপনার বিশ্বাসের বিরোধী...'

'সত্যিই কি আশা করেন, আপনার কথা বিশ্বাস করব?' ইভান দ্মিত্রিচ উঠে বসে ডাক্তারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল। তার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ও বিদ্রূপ মেশানো। চোখের পাতাদুটো তার লাল। 'স্পাইগিরি করতে আর জেরা চালাতে আপনি বরঞ্চ অন্যত্র যান, এখানে করার কিছুই নেই। গতকাল কিসের জন্যে আপনি এখানে এসেছিলেন বুঝতে পেরেছি।'

'কী অদ্ভুত ধারণা।' ডাক্তার হেসে বলল। 'আপনি কী মনে করেন, আমি একটা স্পাই?'

'হ্যাঁ, তাই আমার ধারণা, হয় স্পাই নয়ত আমার ওপর খবরদারি করতে পাঠানো হয়েছে এমন একজন ডাক্তার —দুয়ের মধ্যে কোনো তফাত দেখি না।'

'কিন্তু যাই বলুন, আপনি কিছু মনে করবেন না ... আপনি বেশ মজার লোক!'

ডাক্তার বিছানার ধারে টুলটায় বসে তিরস্কারের ভঙ্গীতে মাথা নাড়তে লাগল।

'আচ্ছা, না হয় ধরেই নিলাম আপনার ধারণাই ঠিক,' ডাক্তার বলতে শুরু করল, 'আপনার কথামত ধরেই নিলাম, আপনার কাছ থেকে কথা বের করে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম যাতে আপনাকে পুলিসে ধরিয়ে দিতে পারি। আপনাকে গ্রেপ্তার করে বিচারে পাঠানো হত। কিন্তু আদালতে বা জেলখানায় আপনার অবস্থা এখানকার চেয়ে আরো খারাপ হত বলে কি মনে করেন? নির্বাসন কিংবা সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হলেও এই ওয়ার্ডের মতো খারাপ অবস্থায় থাকতে হত বলে মনে করেন? আমার তো তা মনে হয় না ... তাহলে আপনার ভয় পাবার কী আছে?'

স্পষ্টতই ইভান দ্‌মিত্রিচের মনে কথাগুলো দাগ কাটল। সে যেন অনেকটা স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠল।

খানিক আগে চারটে বেজেছে। এই সময় আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ সাধারণত ঘরে পায়চারি করে এবং দারিয়া তাকে জিজ্ঞাসা করে, বিয়ারটা নিয়ে আসবে কিনা। বিকেলটা উজ্জ্বল, চুপচাপ।

'দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর পায়চারি করছিলাম, এমন সময় মনে হল আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি,' ডাক্তার বলল। 'আজকের দিনটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে বসন্তকাল।'

'এটা কোন মাস? মার্চ?'

'হ্যাঁ, মার্চের শেষ।'

'বাইরে কি খুব নোংরা?'

'খুব নয়। বাগানের পথগুলো শুকিয়ে গেছে।'

এইমাত্র যেন ঘুম থেকে উঠেছে এইভাবে লাল চোখদুটো রগড়াতে রগড়াতে ইভান দ্‌মিত্রিচ বলল, 'এমন দিনে একটা গাড়িতে করে শহরের বাইরে বেড়াতে বেশ লাগে, তারপর বাড়িতে ফিরে আরাম করে গরম পড়ার ঘরটিতে বসা... আর সঙ্গে থাকবে একজন ভালো ডাক্তার, আমার মাথা ধরার চিকিৎসা করবে... মানুষের মতো বেঁচে থাকা যে কী আমি একেবারে ভুলেই গেছি। এখানে কী নোংরা! কী অসহ্য!'

গতদিনের উত্তেজনার ফলে সে দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, কথাগুলো

বলছে যেন অনিচ্ছায়। তার আঙুলগুলো কাঁপছে, মুখ দেখলেই বোঝা যায় মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে।

'আরামের গরম পড়ার ঘরের চেয়ে এই ওয়ার্ডের কোনোই পার্থক্য নেই,' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ বলল। 'বাইরের জগতে শান্তি ও সন্তোষ খুঁজে লাভ নেই, নিজেদের মধ্যে সেটা খুঁজতে হবে।'

'তার মানে?'

'বাইরের জিনিসের মধ্যে—যেমন একটা পড়ার ঘর, একটা গাড়ি—সাধারণ লোক ভালোমন্দের সন্ধান করে, চিন্তাশীল ব্যক্তি নিজের মধ্যেই তা সন্ধান করে।'

'যান মশাই, গ্রীসে গিয়ে আপনার ওই দর্শন আওড়ান, সেখানে সব সময় গরম বাতাসে কমলাফুলের ভুরভুরে গন্ধ, সেখানে আপনার দর্শন চলবে। কিন্তু আমাদের এই আবহাওয়ায় ওটা অচল। ডাইয়জেনীজ সম্পর্কে কাকে বলছিলাম, আপনাকেই তো?'

'হ্যাঁ, গতকাল বলেছিলেন।'

'ডাইয়জেনীজের গরম ঘর বা পড়ার ঘরের দরকার ছিল না, তার সহজ কারণ সর্বত্রই গরম থাকত। কমলালেবু ও জলপাইএ পেট পুরে পিপের মধ্যে নিশ্চিন্তে গড়াগড়ি দিতে পারত। যদি সে রাশিয়ায় বাস করত তাহলে শুধু ডিসেম্বরে কেন মে মাস পর্যন্ত কোথাও একটু আশ্রয়ের জন্যে দোরে দোরে তাকে ভিক্ষে করে ফিরতে হত। ঠাণ্ডার চোটে তার সমস্ত শরীর যেত বেঁকে মুচড়ে।'

'কখনোই না। আর সব যন্ত্রণার মতো ঠাণ্ডাকেও অগ্রাহ্য করা যায়। মারকাস অরেলিয়াসের কথায়: "যন্ত্রণা সম্পর্কে ধারণাই যন্ত্রণা, ইচ্ছাশক্তির জোরে এই ধারণা বদলে দিতে পারো, মন থেকে অনুযোগ কোরো না, ছেড়ে দাও, দেখবে যন্ত্রণাও উধাও হয়েছে।" ঠিকই বলেছিলেন। মুনিঋষি তো বটেই, সাধারণ চিন্তাশীল ব্যক্তিরও বৈশিষ্ট্য যন্ত্রণার প্রতি তাচ্ছিল্য। সে সদাতৃপ্ত। কিছুই তাকে অবাক করে না।'

'তাহলে নিশ্চয় আমি একটা গাড়ল, কারণ আমি যন্ত্রণা পাই, আমি পরিতৃপ্ত নই, আর মানুষের নীচতা দেখে আমার বিস্ময়ের শেষ নেই।'

'ওইখানেই আপনার ভুল। আরো ঘনঘন সবকিছুর মূল কারণে পেঁছোতে

যদি চেষ্টা করেন, বুঝবেন বাইরের এই যে জিনিসগুলো আমাদের ভাবিয়ে তোলে এগুলো কত অকিঞ্চিৎকর। জীবনকে বোঝবার চেষ্টা করতেই হবে। সেটাই একমাত্র সান্ত্বনা।'

'জীবন ধারণা ...' ইভান দ্মিত্রিচ বলল, তার মুখ উঠল বিকৃত হয়ে। 'বহির্জগত, অন্তর্লোক ... মাপ করবেন, এসব ব্যাপার বুঝি না। শুধু এই বুঝি,' এবারে সে উঠে দাঁড়িয়ে ডাক্তারের দিকে রোষকটাক্ষপাত করে বলতে লাগল, 'বুঝি যে ঈশ্বর আমাকে উষ্ণ রক্তধারা ও শিরা উপশিরা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর এও জেনে রাখুন মশায়, জৈব পদার্থের মধ্যে যতক্ষণ জীবনীশক্তি আছে ততক্ষণ তা উত্তেজনার বশীভূত থাকবেই। তাই উত্তেজিত হই। যন্ত্রণায় চিৎকার করে কাঁদি। আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে, নীচতা দেখলে ঘৃণায় ফেটে পড়ি, জঘন্য কান্ড দেখলে বিরক্তি বোধ করি। আমার মতে এই তো জীবন। প্রাণীলোকে যত নীচের স্তরে নামা যাবে ততই দেখা যায় অনুভূতি কমে আসছে, উত্তেজিত হবার ক্ষমতাও ক্ষীণ হয়ে আসছে। যত উচ্চস্তরে উঠবেন দেখবেন বস্তুজগতের প্রতিক্রিয়া সেখানে তত প্রবল, অনুভূতি সেখানে তত বেশি। একথাটা জানেন না, আশ্চর্য! এইসব গোড়ার কথা ডাক্তার হয়েও জানেন না? মানুষ হয়ে যন্ত্রণাকে তাচ্ছিল্য করা, সব অবস্থাতেই পরিতৃপ্ত থাকা, কোনো কিছুতে বিস্ময়বোধ না করা, সে মানুষ হয় ওই অবস্থায় পেঁাছেছে,' এই বলে ইভান দ্মিত্রিচ মোটা কৃষকটাকে দেখাল, 'নয়ত যন্ত্রণা সয়ে সয়ে এত শক্ত হয়ে গেছে যে যন্ত্রণা সম্পর্কে অনুভূতিটাও লোপ পেয়েছে, তার মানে, সে আর বেঁচে নেই। মাপ করবেন,' বিরক্তভাবে সে বলে চলল, 'আমি মুনিঋষিও নই, দার্শনিকও নই। ওসব ব্যাপার কিছুই আমার মাথায় ঢোকে না। এসব নিয়ে তর্ক করার মতো মনের অবস্থা আমার নেই।'

'ও, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি তো বেশ তর্ক করতে পারেন।'

'স্টোইক নামে যে গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদ আপনি বিকৃত করেছেন, মানুষ হিসেবে তাঁরা অসাধারণ ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু গত দুহাজার বছর ধরে তাঁদের দর্শন একচুলও এগোয়নি, যেখানে ছিল সেইখানেই রয়ে গেছে। এগোতে পারে না, কারণ তাঁদের দর্শন অবাস্তব, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অচল। গুটিকতক লোক, যাঁরা বিভিন্ন মতবাদ পরখ ও অনুশীলন করতে

জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, শুধু তাঁদের কাছে এই দর্শন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অধিকাংশের কাছেই এটা ছিল দুর্বোধ্য। যে দর্শন অর্থসম্পদ ও দৈহিক আরামের প্রতি ঔদাসীন্য প্রচার করে, মৃত্যু ও যন্ত্রণাকে তাচ্ছিল্য করে, অধিকাংশের বুদ্ধির কাছে সে দর্শনের মানে নেই। কারণ অধিকাংশ ব্যক্তি জানেই না অর্থসম্পদ বা দৈহিক আরাম কী জিনিস। তাদের কাছে যন্ত্রণাকে, দুঃখকষ্টকে তাচ্ছিল্য করা নিজেদের জীবনকেই তাচ্ছিল্য করার সামিল। কারণ তাদের জীবনটাই তো ভরে রয়েছে ক্ষুধা, শীত, অপমান, ক্ষয়ক্ষতি আর সবচেয়ে বেশি করে হ্যামলেটের মতো মৃত্যুভীতিতে। এইসব ব্যথা বেদনার সমষ্টিই নিয়ে জীবন, এ জীবন দুঃসহ হতে পারে দুঃখের হতে পারে, তবু একে কেউ অবজ্ঞা করে না তাই, আমি আবার বলছি স্টোইকদের দর্শনের কোনো ভবিষ্যত নেই। আর সুদূর অতীত থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত উন্নতি যদি কোথাও হয়ে থাকে তা হয়েছে মানুষের বোঝবার শক্তিতে, যন্ত্রণাবোধে আর বাইরের আঘাতে উত্তেজিত হবার ক্ষমতায়।'

ইভান দ্মিত্রিচ হঠাৎ তর্কের সূত্র হারিয়ে ফেলে, থেমে কী বলবে ঠিক করতে না পেরে কপালটায় হাত বুলোতে লাগল।

'খুব একটা দরকারি কথা বলতে চাইছিলাম, কিন্তু ভুলে গেলাম,' সে বলল। 'কী যেন বলছিলাম? ও, হ্যাঁ! বলতে চাইছিলাম একজন স্টোইকের কথা। তার প্রতিবেশীকে মুক্তি দেবার জন্যে সে নিজে দাসত্ব বরণ করে নেয়। তাহলে দেখছেন ঐ স্টোইকের উপরেও উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, কারণ অন্যের জন্য নিজেকে ধ্বংস করার মহৎ কাজ করতে হলে এমন একটি হৃদয়ের প্রয়োজন যা ঘৃণা ও করুণা অনুভব করতে পারে। এখানে, এই জেলখানার মধ্যে আমি যা জানতাম তাও ভুলে গেছি, তা নাহলে আরও অনেক উদাহরণ দিতে পারতাম। ধরুন যিশুখৃষ্টের কথাই! বাস্তব অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় যিশু কখনো কেঁদেছেন, কখনো হেসেছেন, কখনো শোকে কাতর হয়েছেন, কখনো রাগে ক্ষেপে উঠেছেন, কখনো দুঃখে ভেঙ্গে পড়েছেন। হাসিমুখে তিনি যন্ত্রণাকে বরণ করেননি, মৃত্যুকেও তাচ্ছিল্য করেননি। উপরন্তু গেথসেমেন বাগানে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন মৃত্যুর পাত্রটা যেন এড়িয়ে যেতে পারেন।' ইভান দ্মিত্রিচ এই বলে হেসে বসে পড়ল।

'আচ্ছা ধরেই নিলাম, আপনি যা বলছেন তাই ঠিক। মানুষের অন্তরেই

সুখ ও শান্তি, বাইরের কোনো কিছুতে নয়,' সে বলে চলল। 'ধরেই নিচ্ছি যন্ত্রণাকে তাচ্ছিল্য করা এবং কোনো কিছুতে বিস্ময়বোধ না করাই ঠিক। তা সত্ত্বেও, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, কোন্ অধিকারে আপনি এই মতবাদ জাহির করছেন? আপনি কি মুনিঋষি, না দার্শনিক?'

'না, আমি দার্শনিক নই, তবে এইটুকু বুঝি প্রত্যেকেরই এই দর্শন প্রচার করা উচিত, কারণ এটা যুক্তিযুক্ত।'

'কিন্তু এই জীবনরহস্য, যন্ত্রণার প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, বা এইসব ব্যাপারে নিজেকে একটা পাণ্ডা ঠাওরালেন কী করে তাই জানতে চাই। আপনি কি কখনো কষ্টভোগ করেছেন? কষ্ট বা যন্ত্রণা যে কী তার সামান্যতম ধারণা কি আপনার আছে? জিজ্ঞেস করছি বলে কিছু মনে করবেন না, ছোটবেলায় কি কখনো বেত খেয়েছেন?'

'না, আমার বাবা মা মারধোর করে শাসন করা পছন্দ করতেন না।'

'আর আমার বাবা নির্দয়ভাবে আমার উপর চাবুক চালাতেন। বাবা ছিলেন সরকারী কর্মচারি, ভীষণ বদরাগী। তাঁর নাকটা ছিল লম্বা, ঘাড়টা হল্দে রঙের, অর্শরোগে ভুগতেন। যাক্, এখন আপনার কথা বলা যাক। সারাটা জীবন আপনাকে এমন কি একটা কড়ে আঙুল দিয়েও কেউ খোঁচা মারেনি, কেউ আপনাকে শাসায়নি, কেউ আপনার ওপর অত্যাচার করেনি, আর আপনার এখন তাগড়াই ঘোড়ার মত স্বাস্থ্য। বাবার পক্ষপুটে বড় হয়ে উঠেছেন, তাঁরই পয়সায় লেখাপড়া করেছেন, তারপর এই আয়েসের চাকরী পেয়েছেন। কুড়ি বছরের ওপর আলোবাতাসওয়ালা আরামের ওই কামরাগুলো বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করে আসছেন, নিজের তাঁবেতে একজন চাকর রাখতে পারছেন, যখন খুশি হল কাজ করলেন, হল না তো করলেনই না, তার জন্যে কাউকে জবাবদিহি করার তোয়াক্কা করেন না। আপনি অলস অকর্মণ্য প্রকৃতির লোক, সেইজন্যে জীবনটাকে এমন ছকে বেঁধে রেখেছেন যাতে সব রকম ঝঞ্ঝাট ও বাড়তি দৌড়ঝাঁপ এড়িয়ে চলা যায়। আপনার যাবতীয় কাজ সহকারী আর ওরই মতো সব হতচ্ছাড়াদের ওপর ন্যস্ত করে নিজে শান্তি ও আরামে সময় কাটান, অর্থ সঞ্চয় করে, পড়াশুনা করে, নানা ধরনের আধ্যাত্মিক বুজরুকি নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে, এবং,' ইভান দ্মিত্রিচ ডাক্তারের লাল নাকটার দিকে কটাক্ষপাত করে বলল, 'মদ্যপান করে। এক কথায় আপনি

জীবনের কিছু দেখেনওনি, জানেনও না, এবং বাস্তব জগত সম্পর্কে যা ধারণা তাও মনগড়া। যন্ত্রণার প্রতি আপনার তাচ্ছিল্য, আপনার এই যে নির্বিকারত্ব, এরও একটা সহজ কারণ আছে। আপনার যতকিছু বাগাড়ম্বর, জীবনমৃত্যু ও যন্ত্রণার প্রতি আপনার বাহ্যিক ও আন্তরিক ঔদাসীন্য, আপনার জীবনরহস্যের সন্ধান, আনন্দের স্বরূপ, এইসব বড় বড় তত্ত্বকথা অকর্মণ্য রুশীর যতটা মনোমত ততটা আর কারুর নয়। ধরুন দেখতে পেলেন এক চাষী তার স্ত্রীকে ধরে মারছে। আপনি ভাবলেন, বাধা দিয়ে লাভ কী? মারছে মারুক না, আগে হোক পরে হোক দুজনেই তো একদিন মরবে। তাছাড়া পাষণ্ডটা মেরে নিজেকেই হেয় করছে, যাকে মারছে সে তো হেয় হচ্ছে না। মদ্যপান করা শিষ্টাচার বিরোধী এবং মূঢ়তার পরিচায়ক তা সত্ত্বেও যারা পান করে এবং যারা পান করে না দু'দলেরই মৃত্যু অনিবার্য। হয়ত আপনার কাছে কোনো একটি চাষী মেয়ে এল দাঁতের ব্যথা দেখাবার জন্যে ... এলো তো এলো, তাতে হয়েছে কী? ব্যথা বলে তো সত্যি কিছু নেই, ব্যথা সম্পর্কে আমাদের ধারণাই তো ব্যথা। তাছাড়া কষ্টভোগ না করে জীবন ধারণের আশাই করা যায় না, আর এ জীবনের পরিণতি মৃত্যুতে। অতএব শোনো চাষী মেয়ে, যা ঘটছে ঘটুক, আপাতত আমাকে চিন্তা করতে ও শান্তিতে মদ্যপান করতে দাও। হয়ত কোনো ছোকরা আপনার কাছে উপদেশ নিতে এল। সে জানতে চায় কী করবে, কোনপথে জীবনটা চালাবে। অপর কেউ হলে উত্তর দেবার আগে কিছু সময় ভেবে নিত, কিন্তু আপনার কাছে উত্তর একেবারে তৈরী রয়েছে: যেমন বলছিলেন তেমনি বলবেন, জীবন-রহস্যের সন্ধান করতে, পরামুক্তির আস্বাদ নিতে লেগে পড়। কিন্তু এই রহস্যময় 'পরামুক্তি' পদার্থটা কী? এর উত্তর অবশ্য কিছুই নেই। আমরা এই গরাদ-ঘেরা ঘরের মধ্যে থেকে পচছি, মার খাচ্ছি, তবুও এসব কী চমৎকার, কী সঙ্গত, কারণ এই ওয়ার্ড আর আরামপ্রদ গরম পড়ার ঘরের মধ্যে কোনো তফাত নেই। নিঃসন্দেহে বেশ সুবিধাবাদী দর্শন! কোনো কিছু সম্পর্কে কর্তব্য কিছুই নেই, বিবেক একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার, তার উপর নিজেকে আসল সাধু মনে করতে কোনো বাধা নেই ... যাই বলুন, মশাই, একে দর্শন বলে না, এ চিন্তাই নয়, কোনো উদার দৃষ্টিভঙ্গীর বিন্দুবিসর্গ এতে নেই। এ হচ্ছে নিছক আলস্য, মানসিক জড়ত্ব, চরম অদৃষ্টবাদ ... এছাড়া আর

কিছু নয়!' নবোদ্যমে ইভান দ্মিত্রিচ বলে চলল। 'আপনি যন্ত্রণাকে তাচ্ছিল্য করেন, কিন্তু আপনার কড়ে আঙুলটা দরজার পাল্লায় চিপ্‌টে গেলে মনে হয় আপনিও তারস্বরে চেঁচাতে থাকবেন!'

'হয়ত নাও চেঁচাতে পারি,' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ শান্তভাবে হেসে বলল।

'তাই নাকি! হঠাৎ যদি পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়েন কিংবা কোনো গর্দভ বা মর্কট তার পদমর্যাদা বা সামাজিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে লোকসমক্ষে আপনাকে অপমান করে এবং আপনি বুঝতে পারেন তার দরুণ তাকে শাস্তি পেতে হবে না, তাহলেই বুঝতে পারবেন জীবন রহস্যের সন্ধানের জন্যে বা যথার্থ আনন্দ লাভের জন্যে মানুষকে উপদেশ দেওয়ার অর্থ কী।'

'এসব কথা একেবারে মৌলিক,' হাত ঘষতে ঘষতে খুশি হয়ে হেসে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ বলল। 'আপনার সাধারণীকরণ ক্ষমতার প্রশংসা করি। এই মাত্র আমার চরিত্রের যে বর্ণনা দিলেন সেটা বাস্তবিকই চমৎকার! বিশ্বাস করুন, আপনার সঙ্গে আলোচনা করলে অত্যন্ত আনন্দ পাওয়া যায়। আমি আপনার বক্তব্য শুনলাম, এবার দয়া করে আমার বক্তব্যটা শুনুন ...'

১১

প্রায় ঘণ্টাখানেক তাদের মধ্যে কথাবার্তা চলল। এই আলোচনা আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের মনে নিশ্চয় গভীর রেখাপাত করেছিল। এবার থেকে প্রতিদিন সে ৬ নং ওয়ার্ডে যাওয়া শুরু করল। সকালে আর দুপুরের খাওয়ার পর যেতে আরম্ভ করল। ইভান দ্মিত্রিচের সঙ্গে সেই যে গল্প করতে বসত অনেক সময় সন্ধ্যে হয়ে যেত। প্রথম প্রথম ইভান দ্মিত্রিচ দূরে দূরে থাকত। সন্দেহ করত ডাক্তারের কোনো কুমতলব আছে। ডাক্তারকে সে দেখতে পারে না খোলাখুলিই বলে দিত। কিন্তু শীঘ্রই তাকে সয়ে গেল এবং তার কর্কশ রুক্ষ ভঙ্গীর বদলে দেখা দিল বিদ্রূপ মেশানো প্রশ্রয়ের ভাব।

ডাক্তার আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ নিয়মিতভাবে ৬ নং ওয়ার্ডে যাওয়া আসা করছে — সারা হাসপাতালে এই খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। কী তার সহকারী, কী নিকিতা বা নার্সরা — কেউ বুঝে উঠতে পারল না কিসের

জন্যে ডাক্তার সেখানে যাচ্ছে, কেনই বা সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকছে। এত কথা বলারই বা কী সেখানে পাচ্ছে, আর কেনই বা একটাও প্রেসক্রিপশন লিখছে না। সবার কাছে তার আচরণ অদ্ভুত মনে হল। মিখাইল আভেরিয়ানিচ যখন আসে সে সময় আজকাল প্রায়ই সে বাড়ি থাকে না। দারিয়াও কী করবে ঠিক পায় না, কারণ ডাক্তারের বিয়ার পানের সময়ের আজকাল স্থিরতা নেই। এমনকি সময় সময় খেতে আসতেও দেরি হয়ে যায়।

জুন মাসের শেষাশেষি একদিন ডাক্তার খোবতভ কী এক দরকারে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের সঙ্গে দেখা করতে এলো। তাকে বাড়িতে না পেয়ে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে তার সন্ধান করল। সেখানে শুনল ডাক্তার পাগলদের ওয়ার্ডে রয়েছে। হাসপাতালের সেই অংশে প্রবেশ করে খোবতভ দরদালান পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সেখানে দাঁড়িয়ে সে শুনতে পেল এই সব কথাবার্তা চলছে:

'আমরা কখনোই একমত হতে পারব না, আর আপনি কিছুতেই আমাকে আপনার মতে সায় দেওয়াতে পারবেন না,' ইভান দ্মিত্রিচ রাগতভাবে বলে চলেছে। 'বাস্তব জগত সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই, জীবনে কখনো আপনাকে দুঃখকষ্ট সইতে হয়নি। জোঁকের মত অপরের যন্ত্রণায় আপনি নিজেকে পুষ্ট করেছেন। অথচ যেদিন জন্মেছি সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমার কপালে যন্ত্রণাভোগ করা ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। অতএব স্পষ্টই আপনাকে বলে দিচ্ছি: আমি মনে করি আপনার চেয়ে আমি উন্নত এবং সর্ববিষয়ে আপনার চেয়ে অনেক বিচক্ষণ। আমাকে শিক্ষা দেবার অধিকার অন্তত আপনার নেই।'

'আপনাকে স্বমতে আনার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই,' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ শান্ত ও বিষণ্ণভাবে জবাব দিল। মনে হল ভুল বোঝার জন্যে সে দুঃখিত। 'আর আসল কথাও তো তা নয়। আমি কষ্ট ভোগ করিনি এবং আপনি করেছেন — এর সঙ্গে আসল প্রশ্নের কোনো যোগই নেই। দুঃখ কষ্টই বলুন, আনন্দই বলুন কিছুই স্থায়ী নয়। ওগুলোকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি। ওগুলোতে কিছু এসে যায় না। আসল কথা আপনি ও আমি চিন্তা করতে পারি, আমরা পরস্পরের মধ্যে এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই যে চিন্তা করতে পারে এবং তর্ক করতে সক্ষম, আমাদের মতামত যতই

বিভিন্নধরনের হোক না কেন, সেটাই আমাদের পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার সৃষ্টি করে। বন্ধু! যদি জানতেন — দুনিয়াময় পাগলামি, নির্বুদ্ধিতা ও চিন্তাশক্তির অভাব দেখে দেখে আমার মনপ্রাণ কী বিষিয়ে রয়েছে, আর প্রতিবার আপনার সঙ্গে কথা কয়ে কী রকম খুশি হই! আপনি বুদ্ধিমান, তাই আপনার সঙ্গ আমায় আনন্দ দেয়।'

খোবতভ দরজাটা ইঞ্চিটাক ফাঁক করে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখল ইভান দ্মিত্রিচ রাতের টুপিটা মাথায় দিয়ে বিছানায় বসে আর তার পাশে ডাক্তার। পাগলটা সমানে মুখ বিকৃত করছে, ক্রমাগত চমকে চমকে উঠছে, পোষাকটা দিয়ে নিজেকে জড়াচ্ছে। আর তার পাশে ডাক্তার চুপচাপ বসে, তার মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, মুখটা লাল হয়ে উঠেছে, মুখে শোকার্ত অসহায়তার ছাপ। খোবতভ কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে একটু হেসে নিকিতার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল। নিকিতাও কাঁধ ঝাঁকানি দিল।

পরের দিন খোবতভ ডাক্তারের সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে এল। তারা দুজনে দরদালানটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিতরের আলোচনা শুনল।

'মনে হচ্ছে বুড়োটার মাথা বিগড়েছে,' ওয়ার্ড থেকে বাইরে যেতে যেতে খোবতভ বলল।

'আমাদের মতো পাপীতাপীদের ভগবান রক্ষে করুন,' ধর্মান্তপ্রাণ সেরগেই সেরগেইচ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, সেই সঙ্গে হাসপাতাল প্রাঙ্গনের কাদা সাবধানে পাশ কাটিয়ে চলতে লাগল যাতে তার সুন্দর পালিশ করা বুটজোড়া নোংরা না হয়ে যায়। 'ইয়েভগেনি ফিওদরভিচ, আপনাকে সত্যি কথা বলতে কি, আমি অনেক দিন থেকেই এই ভয় করছি।'

১২

ওয়ার্ডে তার সহকর্মীর আগমনের পর থেকে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ বোধ করল তাকে ঘিরে একটা রহস্যের জাল বোনা হচ্ছে। হাসপাতালের পরিচারক, নার্স ও রোগীরা তাকে আসতে দেখলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়, এবং সে চলে গেলে চুপিচুপি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকে। হাসপাতাল সংলগ্ন বাগানে সুপারিণ্টেনডেণ্টের ছোট মেয়ের সঙ্গে তার প্রায়ই

দেখা হত। এই মেয়েটির সঙ্গ পেতে সে ভালও বাসত। ইদানীং তার মাথায় হাত দিয়ে আদর করবার জন্যে সে এগিয়ে গেলেই মেয়েটি পালিয়ে যায়। পোস্টমাস্টার মিখাইল আভেরিয়ানিচ তার বক্তৃতা শুনে যথারীতি আর 'সত্যিই তাই' বলে জবাব দেয় না। কী বলবে ভেবে না পেয়ে অস্ফুটস্বরে 'ঠিক, ঠিক' বলে বন্ধুর দিকে চিন্তাকুল ও বিষণ্ণভাবে চেয়ে থাকে। কোনো কারণে আজকাল নিজের শিক্ষা দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সে তার বন্ধুকে ভদকা ও বিয়ার পানে নিরস্ত হতে উপদেশ দেয়। সোজাসুজি না বলে আভাসে ইঙ্গিতে সে অনেক কিছু বোঝাতে চায়: একবার হয়ত বলে সেনাবাহিনীর এক কমাণ্ডারের কথা। কী চমৎকার লোকটা ছিল, পরেরবার হয়ত বলে রেজিমেণ্টের এক যাজকের কথা, সেও বড় ভালো লোক ছিল; দুজনেই মদ্যপান করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মদ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে ওঠে। দু একবার তার সহকর্মী খোবতভ তার সঙ্গে দেখা করে গেল। সেও আন্দ্রেই ইয়েফিমিচকে মদ ত্যাগ করতে উপদেশ দিল এবং আপাত দৃষ্টিতে কোনো কারণ না থাকলেও তাকে পোটাশিয়াম ব্রোমাইড খেতে বলল।

আগস্ট মাসে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ মেয়রের কাছ থেকে এক চিঠি পেল। বিশেষ জরুরী দরকারে মেয়র তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। টাউন হলে গিয়ে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ দেখল সেখানে জমায়েত হয়েছে সামরিক প্রধান কর্তা, জেলা স্কুলের ইন্‌স্‌পেকটর, কাউন্সিলের একজন সভ্য, খোবতভ আর মোটাসোটা সোনালী চুলওলা এক ভদ্রলোক, শেষোক্তকে ডাক্তার বলে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। এই ডাক্তার ভদ্রলোক, তার নামটা বিদঘুটে এক পোলিশ নাম, থাকে ত্রিশ ভের্স্ত দূরে এক অশ্বপালন কেন্দ্রে, এই শহর দিয়ে সে যাচ্ছিল।

সম্ভাষণ ও অভিবাদন পর্ব শেষ হবার পর প্রত্যেকে যখন টেবিলের চারধারে ঘিরে বসেছে, কাউন্সিলের সভ্য ভদ্রলোক আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের দিকে ফিরে বলল, 'আমরা এই একটা দরখাস্ত পেয়েছি, আপনার সম্পর্কে এতে কিছুটা উল্লেখ আছে। ইয়েভগেনি ফিওদরিচ বলছেন হাসপাতালের বড় বাড়িটায় ডাক্তারখানার জন্যে যথেষ্ট জায়গা নেই, কোনো একটা অংশে এটাকে স্থানান্তরিত করলে ভালো হয়। স্থানান্তর করার ব্যাপারটায় আমরা তেমন চিন্তিত নই। আমরা ভাবছি তা করতে হলে অংশটার মেরামত করা দরকার।'

‘সত্যি, মেরামত অত্যন্ত দরকার,’ আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ একটু থেমে ভেবে নিয়ে বলল। ‘ধরুন যদি কোণের অংশটা ডিস্‌পেন্সারির জন্যে ব্যবহার করা হয় তাহলে মনে হয় অন্তত পাঁচশ রুবল তার জন্যে খরচ পড়বে। বেফায়দা এই খরচ।’

সবাই কিছুক্ষণের জন্যে চুপচাপ রইল।

‘দশবছর আগে আপনাদের বলার সৌভাগ্য হয়েছিল,’ আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ শান্তভাবে বলে চলল, ‘যে বর্তমানে যেভাবে হাসপাতাল চলছে তা নিছক বিলাসিতা। এই বিলাসিতাকে পোষণ করার মতো সঙ্গতি আমাদের শহরের নেই। পঞ্চম দশকে এটা তৈরি হয় তখন দেশের অবস্থা ছিল অন্যরকম। পৌর-সমিতি অযথা বাড়ি নির্মাণ ও অকারণ লোক নিয়োগের ব্যাপারে অত্যধিক খরচ করে থাকে। পরিচালনা পদ্ধতিটা যদি অন্যরকম হত তাহলে নিশ্চয় করে বলতে পারি একই অর্থে আমরা দু’দুটো আদর্শ হাসপাতাল গড়ে তুলতে পারতাম।’

‘বেশ, তাহলে পরিচালনা পদ্ধতিটা অন্যরকমেরই হোক,’ কাউন্সিলের সভ্য আগ্রহভরে বলল।

‘আগেও আমার এই মতামত জানিয়েছিলাম: চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার জেমস্তভোর উপর দিয়ে দেওয়া হোক।’

‘ঠিক ঠিক, আমাদের টাকাকড়ি যা আছে জেমস্তভোর হাতে তুলে দেওয়া হোক, যাতে তারা সব গায়েব করতে পারে,’ সোনালী চুলওলা ডাক্তারটি হাসতে হাসতে বলল।

‘তা আর বলতে হবে না।’ হাসতে হাসতে কাউন্সিলের সভ্যটিও সায় দিল।

আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ উদাসীন দৃষ্টিতে সোনালী চুলওলা ডাক্তারটির দিকে ফিরে বলল:

‘আমাদের পক্ষপাতিত্ব করা উচিত নয়।’

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। চা এল। সামরিক কর্তাব্যক্তিটি কোনো কারণে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিল। টেবিলের ওপর দিয়ে সে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের হাতে স্পর্শ করল।

14—1694

'ডাক্তার, মনে হচ্ছে আপনি আমাদের ভুলেই গেছেন,' সে বলল। 'জানি, আপনি খাঁটি সন্ন্যাসী, আপনি তাসও খেলেন না, মেয়েদের দিকেও ফিরে তাকান না। আমাদের সঙ্গ তাই আপনার খারাপ লাগে।'

প্রত্যেকে বলাবলি শুরু করল মানুষ বলে গণ্য যে কোনো লোকের পক্ষেই শহরটা কী একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন। থিয়েটার বলে কিছু নেই, গানবাজনার ব্যবস্থা নেই। ক্লাবে গতবার যে বলনাচ হয়েছিল তাতে কুড়িটি মহিলা উপস্থিত ছিল, আর মাত্র দুজন পুরুষ ছিল তাদের সঙ্গে নাচে অংশ নিতে। আজকালকার তরুণ যারা, তারা নাচে না, তারা বারের কাছে বা তাস খেলার আড্‌ডায় ভীড় করতে ভালোবাসে। কারও দিকে না তাকিয়ে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ ধীর শান্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করল। কী দুঃখের কী দারুণ দুঃখের কথা যে আজকাল শহরবাসীরা তাদের শক্তি, তাদের উদ্যম তাসের আড্‌ডায় ও বাজে আলোচনায় মেতে অপচয় করে চলেছে। একটু সদালাপে বা বই পড়ে সময় কাটাতে তারা চায়ও না, পারেও না। মনের আনন্দ উপভোগ করার প্রবৃত্তিই তাদের নেই। একমাত্র মনই ইন্টারেস্টিং ও অদ্ভুত, অন্য সবকিছু তুচ্ছ ও হেয়। খোবতভ তার সহকর্মীর কথা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনছিল, হঠাৎ তাকে বাধা দিয়ে সে প্রশ্ন করল:

'আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ, আজকের তারিখ কত?'

এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে সে ও সোনালী চুলওলা ডাক্তারটি আন্দ্রেই ইয়েফিমিচকে পর পর প্রশ্ন করে চলল, সেদিন কোন বার, ক দিনে বছর হয় এবং একথা কি সত্য যে ৬ নং ওয়ার্ডে এক আশ্চর্য সাধুপুরুষ আছেন। তাদের গলার আওয়াজেই ধরা পড়ছিল পরীক্ষক হিসাবে তাদের অক্ষমতা সম্পর্কে তারা সচেতন।

শেষ প্রশ্নের জবাব দেবার সময় আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ লজ্জায় একটু লাল হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সামলিয়ে নিয়ে বলল:

'লোকটা অসুস্থ সত্যি, তবে সাধারণত এমন লোক দেখা যায় না।'

এরপর আর কোনো প্রশ্ন করা হল না।

হলে যখন সে কোট পরছিল সামরিক কর্তাব্যক্তিটি তার কাছে এগিয়ে এল। তার ঘাড়ে হাত রেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল:

'আমাদের মতো বুড়ো-হাবড়াদের এখন বিশ্রামের কথা ভাবা দরকার।'

টাউন হল থেকে বেরিয়ে যাবার সময় আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ স্পষ্ট বুঝতে পারল মানসিক অবস্থা পরীক্ষা করার জন্যে কমিশনের কাছে তাকে সমন করা হয়েছিল। যে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সেগুলির কথা মনে পড়তে লজ্জায় সে লাল হয়ে উঠল এবং জীবনে এই প্রথম বোধ করল চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি তীব্র একটা অনুকম্পা।

'হা ভগবান,' যেভাবে ডাক্তাররা তাকে পরীক্ষা করছিল তা মনে পড়তে সে ভাবল, 'এইতো সম্প্রতি তারা মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে কলেজে বক্তৃতা শুনেছে, পরীক্ষাও দিয়ে এসেছে — তাহলে কেন তাদের এই মারাত্মক অজ্ঞতা? মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও যে তাদের নেই।'

জীবনে এই প্রথম সে অপমানিত বোধ করল, ক্রুদ্ধ হল।

সেইদিনই সন্ধ্যায় মিখাইল আভেরিয়ানিচ দেখা করতে এল। সম্ভাষণ জানাবার জন্যে অপেক্ষামাত্র না করে সোজা তার কাছে চলে গেল এবং তার দুটো হাত নিজের হাতে নিয়ে গভীর আবেগের সঙ্গে বলে চলল:

'বন্ধু, আজ আপনাকে প্রমাণ দিতে হবে আপনার প্রতি আমার যে ভালোবাসা তার আন্তরিকতায় আপনি বিশ্বাস করেন, আমাকে আপনার বন্ধু বলে মনে করেন...' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে উত্তেজিতভাবে সে বলে চলল, 'আপনাকে ভালোবাসি আপনার পাণ্ডিত্য ও হৃদয়ের মাহাত্ম্যের জন্যে। এবার বন্ধু, আমার কথাটা একটু শুনুন। পেশাগত ভব্যতার দরুণ ডাক্তাররা আপনার কাছ থেকে সত্য গোপন করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু আমি সৈনিক, আমি খোলাখুলি বলে দিচ্ছি আপনি ঠিক সুস্থ নেই। আমাকে মাপ করবেন, কিন্তু যা বললাম আসল কথা তাই। আপনার চারপাশে যারা বসেছিল তারা বেশ কিছুক্ষণ ধরে এই অসুস্থতা লক্ষ্য করেছে। ইয়েভগেনি ফিওদরিচ এইমাত্র আমায় বলছিলেন আপনার স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে বিশ্রাম ও অন্য কিছু নিয়ে ব্যাপৃত থাকা একান্ত প্রয়োজন। সত্যিই তাই! চমৎকার কথা বলেছেন। কিছুদিনের মধ্যেই আমি ছুটি নিয়ে বাইরে যাচ্ছি, একটু হাওয়া বদলাতে চাই। এবারে আপনার বন্ধুতার প্রমাণ দিন — চলে আসুন আমার সঙ্গে। চলে আসুন, দেখবেন আপনার যৌবন আবার ফিরে আসবে।'

'আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি,' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ একটু থেমে বলল।

'তাছাড়া আপনার সঙ্গে যাওয়া আমার দ্বারা সম্ভব নয়। অন্য কোনো উপায়ে আপনার প্রতি আমার বন্ধুতার যদি প্রমাণ চান তো দিতে পারি।'

বিনা কারণে বইপত্র ছেড়ে, দারিয়াকে, তার বিয়ারকে ছেড়ে চলে যাওয়া, গত বিশবছর ধরে যে বাঁধা ছকে তার জীবন যাত্রা আবর্তিত হয়ে আসছে তা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা — তার কাছে প্রথমে উন্মাদের উদ্‌ভট প্রস্তাব বলে মনে হল। তারপরে মনে পড়ল টাউন হলে কী সব কথা বলা হয়েছে, মনে পড়ল টাউন হল থেকে বাড়ি ফেরার পথে কী রকম তার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, ভাবল এই শহরের আহাম্মকগুলো তাকে পাগল মনে করে। সঙ্গে সঙ্গে শহর ছেড়ে যাবার চিন্তাটা তার ভালো লেগে গেল।

'আপনি কোথায় যেতে চান?' সে প্রশ্ন করল।

'মস্কোয়, পিটার্সবুর্গে, ওয়ারশ-এ ... ওয়ারশ-এ আমি পাঁচবছর ছিলাম, আহা, আমার জীবনে ওই পাঁচটা বছর সবচেয়ে সুখের। কী চমৎকার শহর! বন্ধু, আমার সঙ্গে চলুন, দেখবেন।'

১৩

এক সপ্তাহ পরে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচকে বিশ্রাম নিতে বলা হল, অর্থাৎ, পদত্যাগ পত্র দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হল। বিন্দুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ না করে সে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিল। তারপরের সপ্তাহে দেখা গেল সে ডাক গাড়িতে মিখাইল আভেরিয়ানিচের পাশে বসে নিকটতম রেল-স্টেশনের দিকে যাত্রা করেছে। সেদিনকার আবহাওয়া ঠাণ্ডা ও স্নিগ্ধ, আকাশ নীল, বাতাস স্বচ্ছ। রেল-স্টেশন দু শ ভের্স্ট দূরে। এই পথ অতিক্রম করতে তাদের দুদিন সময় লাগল। দু রাত বিশ্রাম করতে হল।

পথে ডাক নিতে মাঝে মাঝে গাড়িটা থেমেছে, যাত্রীরা সেখানে চা পান করেছে, ঘোড়াগুলো বিশ্রাম করছে। চায়ের পাত্রটা নোংরা দেখলে কিংবা ঘোড়াগুলোকে গাড়িতে জুততে দেরি হচ্ছে দেখে মিখাইল আভেরিয়ানিচ মাঝে মাঝে রেগে আগুন হয়ে উঠেছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপতে কাঁপতে সে চিৎকার করে বলেছে: 'চোপরাও! একটাও কথা নয়!' আর গাড়ি চললে অনর্গল শুনিয়েছে তার ককেশাস ও পোলাণ্ড ভ্রমণের কথা। কত সব রোমাঞ্চকর ঘটনা! কত লোকের সঙ্গে তার চেনা পরিচয় ঘটেছে! এমন

চিৎকার ও চোখ বড় বড় করে বলছিল যে যে-কেউ মনে করত সে মিথ্যা কথা বলছে। তাছাড়া সে নিশ্বাস ফেলছিল আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের ঠিক মুখে এবং হাসছিল তার কানের উপর। ফলে ডাক্তার খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল, একাগ্রভাবে চিন্তা করতে অসুবিধা হচ্ছিল।

খরচ কম করার জন্যে তারা তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করল। যারা ধূমপান করে না তাদের জন্যে নির্দিষ্ট একটা কামরা বেছে নিল। যাত্রীদের অর্ধেকই ছিল তাদের স্বশ্রেণীর। মিখাইল আভেরিয়ানিচ শীঘ্রই তাদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলল। এ বেঞ্চ থেকে ও বেঞ্চে গিয়ে চিৎকার করে সে বুঝিয়ে দিল তাদের উচিত জঘন্য রেল রাস্তাগুলো দিয়ে যেতে অস্বীকার করা। জোচ্চোর, জোচ্চোর, সর্বত্র জোচ্চোর। ঘোড়ার পিঠে চাপা থেকে রেলে চাপা কত তফাত এখন বুঝতে পারছেন; দিনে একশ ভের্স্ত অনায়াসে চলে যাবেন, চলে যাবার পরেও শরীরে সামান্য তকলিফও বোধ করবেন না। এখন ফসল তেমন ভালো হয় না, পিনস্ক জলাভূমি থেকে জল নিকাশ করার এই ফল। বিশৃংখলা সর্বত্র। সে উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে কথা কইতে লাগল এবং আর কাউকে একটি কথাও কইতে দিল না। তার অনর্গল বকবকানি ও তারই মাঝে মাঝে অট্টহাসি ও বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীতে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ বিরক্ত হয়ে উঠল।

'আমাদের মধ্যে কাকে পাগল ভাবা উচিত?' বিরক্ত হয়ে সে ভাবল। 'সহযাত্রীদের জীবন আমি দুর্বিষহ করে তুলছি না। আমি পাগল না এই আত্মসর্বস্ব লোকটা পাগল, নিজেকে যে রেলের কামরাটার মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও অসাধারণ লোক বলে মনে করছে এবং কাউকে মুহূর্তের জন্যেও শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না?'

মস্কোয় পেৌঁছে মিখাইল আভেরিয়ানিচ সামরিক স্ট্রাইপ ছাড়া একটা জ্যাকেট এবং কিনারে লাল ফিতা মারা ট্রাউজার পরল। একটা সামরিক ওভারকোট কাঁধে চাপিয়ে ও মাথায় একটা সামরিক টুপি পরে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাকে ওই সাজে রাস্তায় দেখে সৈনিকরা সেলাম করল। আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ এবারে তার বন্ধুর মধ্যে এমন এক ব্যক্তিকে আবিষ্কার করল যে গ্রাম্য ভদ্রলোকের সবকিছু সদগুণ জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল দোষগুলিই বজায় রেখেছে। কোনো প্রয়োজন নেই, তবু তার পরিচর্যার জন্যে লোককে মোতায়েন থাকতে হবে। তারই সামনের টেবিলে হয়ত দেশলাইয়ের কৌটোটা

রয়েছে, সে দেখতেও পাচ্ছে সেটা সেখানে রয়েছে, তা সত্ত্বেও সে চিৎকার করে চাকরকে ডাকবে সেটা তার হাতে দিয়ে যাবার জন্যে। অন্তর্বাস পরে দাসীর সামনে যেতে তার কোনো দ্বিধা নেই। চাকর বাকরদের সে 'তুই' বলে সম্বোধন করে, বয়সে তার চেয়ে বড় হলেও কিছু এসে যায় না, আর চটে গেলে তাদের 'গাড়ল গাধা' ইত্যাদি বলে গালাগালি করে। আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ জানত গ্রাম্য বড়লোকের ধরনধারন এই রকমই, তবু তার মন বিরক্তিতে ভরে উঠল।

মিখাইল আভেরিয়ানিচ প্রথমে তার বন্ধুকে নিয়ে গেল ইভেরস্কায়া মন্দিরে প্রার্থনা করতে। সে প্রার্থনা করল অত্যন্ত ভক্তিভরে, একেবারে আভূমি প্রণত হয়ে। প্রার্থনা করতে করতে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। প্রার্থনা শেষ হতে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে সে বলল:

'ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হলেও প্রার্থনার একটা সুফল আছে। বন্ধু, মূর্তিকে চুম্বন করুন।'

আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ বিব্রত হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে তার নির্দেশ পালন করল, কিন্তু মিখাইল আভেরিয়ানিচ তার ঠোঁটদুটো মূর্তি সংলগ্ন করে মাথাটা এধার ওধার ঝাঁকাতে লাগল এবং চোখ ছলছল করে অস্ফুটস্বরে কী একটা প্রার্থনা জানাল। এরপর তারা ক্রেমলিনে গেল, শুধুই জার-কামান এবং জার-ঘণ্টা দেখল না, আঙুল দিয়ে স্পর্শও করল, নদীর ওপারের দৃশ্য দেখে পুলকিত হল এবং সেভিয়ারের গির্জা ও রুমিয়ান্‌ৎসেভের মিউজিয়াম দেখতে গেল।

আহার করতে তারা গেল তেস্তভ রেস্তোরাঁয়। মিখাইল আভেরিয়ানিচ বহুক্ষণ ধরে গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে খাদ্যতালিকা পর্যালোচনা করল, তারপর রেস্তোরাঁয় নিয়মিত আহারে অভ্যস্ত খাদ্যরসিকের মতো পরিচারককে ডেকে বলল:

'দেখা যাক, আজ তুমি কী খাওয়াতে পার।'

১৪

ডাক্তার গেল সব জায়গায়, দেখলও সবকিছু, আহারও করল, পানও করল, কিন্তু সর্বক্ষণ সে বোধ করল মিখাইল আভেরিয়ানিচের প্রতি বিরক্তি। বন্ধুপ্রবরের ছেদহীন উপস্থিতি তাকে ক্লান্ত করে তুলল। তার হাত থেকে

পরিত্রাণ পাবার জন্যে, নিজেকে আড়ালে রাখার জন্যে সে ছটফট করতে লাগল, কিন্তু মিখাইল আভেরিয়ানিচ সর্বদা বন্ধুর সঙ্গে থাকা এবং তাকে ভুলিয়ে রাখা পবিত্র একটা কর্তব্য বোধ করছে। দেখবার যখন কিছুই থাকে না, আলাপ আলোচনা করে সে বন্ধুর মেজাজ খুশি রাখে। পুরো দুটো দিন আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ এই সব সহ্য করল, কিন্তু তৃতীয় দিনে বন্ধুকে বলল, সে ভালো বোধ করছে না এবং সারাদিন বাড়িতে থাকবে মনস্থ করেছে। বন্ধু বলল তাহলে সে-ও বাড়িতে থাকবে। সে স্বীকার করল তাদের বিশ্রাম প্রয়োজন, নইলে হেঁটে হেঁটে পায়ের আর কিছু থাকবে না। আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ ঘরের দিকে পিছন ফিরে সোফাটায় শুয়ে রইল, দাঁতে দাঁত চেপে সে তার বন্ধুর কথা লাগল শুনতে। বন্ধুবর সাগ্রহে তাকে বোঝাতে চাইছে, আগে হোক পরে হোক ফ্রান্স একদিন জার্মানীকে ঘায়েল করবেই, বোঝাতে চাইছে মস্কো শহর জোচ্চোরে ছেয়ে গেছে কিংবা একটা ঘোড়াকে বিচার করতে হলে তার গুণাগুণের ফিরিস্তিটাই সব নয়। ডাক্তার অনুভব করল চাপা উত্তেজনায় তার বুকের ভিতরটায় হাতুড়ি পিটছে ও কান দুটো ভোঁ ভোঁ করছে। তবু ভদ্রতা বোধে তার বন্ধুকে বলতে পারল না চলে যেতে কিংবা বকুনি থামাতে। সৌভাগ্যবশত মিখাইল আভেরিয়ানিচ বাড়িতে আটক থেকে ক্লান্ত হয়ে উঠল। এবং মধ্যাহ্নভোজের পর একটু ঘুরে আসতে গেল বেরিয়ে।

একলা হয়ে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ অবিমিশ্র শান্তির মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিল। সমস্ত ঘরটার মধ্যে সে একক প্রাণী — এই চিন্তা করতে করতে সোফার উপরে নিশ্চলভাবে শুয়ে থাকা কী আনন্দের! নিঃসঙ্গতা ছাড়া সত্যকার আনন্দ কল্পনাই করা যায় না। একান্ত নিঃসঙ্গতা চেয়ে হয়ত শাপভ্রষ্ট দেবদূত ঈশ্বরকে প্রতারণা করেছিল, কারণ নিঃসঙ্গতা থেকে তারা চিরবঞ্চিত। গত কয়েকদিন ধরে যা দেখেছে বা শুনেছে সেই সব সম্পর্কে সে ভাবতে চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই মিখাইল আভেরিয়ানিচকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারল না।

'ভাবতে অবাক লাগে এই লোকটা ছুটি নিয়ে আমার সঙ্গে চলে এল বন্ধুপ্রীতি ও পরোপকারের খাতিরে!' ডাক্তার বিরক্তিভরে ভাবতে লাগল। 'এই রকম বন্ধুপ্রীতির চেয়ে অবাঞ্ছনীয় আর কী হতে পারে! সে পরোপকারী,

দিলদরিয়া, খোশমেজাজী, মেনে নিলাম—কিন্তু অসহ্য! কিছুতেই তাকে সহ্য করা যায় না। একধরনের মানুষ আছে যারা ভালো ভালো জ্ঞানগর্ভ কথা ছাড়া কিছু বলে না, অথচ যাদের সংস্পর্শে আসলেই বোঝা যায় তারা আকাট মূর্খ। এও ঠিক সেই রকম।'

এর পরের দিনগুলো আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ অসুস্থতার ওজর দিয়ে ঘর থেকে বেরোল না। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে পড়ে রইল, বন্ধু যখন তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে তার অসহ্য বোধ হয়। বন্ধুর অনুপস্থিতিতেই সে বিশ্রাম উপভোগ করে। দেশভ্রমণে বেরিয়ে এসেছে বলে সে নিজের উপর যেমন রাগ করল তেমনি তার বন্ধুর উপরেও চটে গেল কারণ দিনে দিনে বন্ধুবরের যেমন বকুনি বেড়ে যাচ্ছে তেমনি বাড়ছে তার অন্তরঙ্গতার প্রয়াস। এর ফলে গভীর আধ্যাত্মিক চিন্তায় মনোনিবেশ করা আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠছে।

'ইভান দ্মিত্রিচ যে বাস্তব জগতের কথা বলেছিল আমি তারই আতঙ্কে ভুগছি,' তুচ্ছ ব্যাপারের ঊর্ধ্বে উঠতে অক্ষম বলে নিজের ওপর চটে গিয়ে সে ভাবল। 'কিন্তু সে সবের কোনো মানে হয় না ... যখন বাড়ি ফিরে যাব সব কিছু আগের মতোই চলতে থাকবে।'

পিটার্সবুর্গে গিয়েও একই অবস্থা: দিনের পর দিন হোটেলে সে সোফায় শুয়ে কাটাত, উঠত শুধু বিয়ার পান করতে।

মিখাইল আভেরিয়ানিচ বলল আর দেরি না করে এবারে তাদের ওয়ারশতে যেতে হবে।

'কিন্তু আমাকে ওয়ারশ যেতে হবে কেন?' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ অনুনয়ের সুরে বলল, 'আপনি একাই যান, আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে দিন। দয়া করে বাধা দেবেন না।'

'সে কী, তা কি কখনো হয়?' মিখাইল আভেরিয়ানিচ আপত্তি জানিয়ে বলল, 'কী চমৎকার শহর! আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাঁচটি বছর সেখানে কাটিয়েছি।'

দুর্বল আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ জোর জবরদস্তি করতে পারে না। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে যেতে হল তার বন্ধুর সঙ্গে ওয়ারশ। এখানেও সে ঘরের বার হল না, সোফাতেই পড়ে রইল। নিজের উপর, তার বন্ধুর উপর, হোটেলের

চাকরগুলো, যারা একগুঁয়ের মতো রুশ ভাষা বুঝতে অস্বীকার করত তাদের উপর, তার মেজাজ সপ্তমে চড়ে রইল। আর এদিকে মিখাইল আভেরিয়ানিচ সর্বদা ফুর্তিবাজ ও সুস্থ, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তার পুরনো বন্ধুবান্ধবদের সন্ধানে শহরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কখনো কখনো সারা রাতই সে বাইরে কাটিয়ে দিত। কোনো এক অজানা জায়গায় রাত কাটিয়ে একদিন ভোরে চোখমুখ লাল করে আলুথালু হয়ে সে ফিরে এল অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায়। অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে আপন মনে যা তা বকতে বকতে পায়চারি করল, তারপর সে বলল:

'সবার বড় ইজ্জত।'

আরো বেশিক্ষণ ধরে পায়চারি করে দুহাত দিয়ে মাথাটা চেপে করুণভাবে সে বলল:

'সত্যি, ইজ্জতের চেয়ে বড় কথা আর কিছু হতে পারে না! কী কুক্ষণে এই জাহান্নমে আসার কথা মাথায় ঢুকেছিল। কী আর বলব ভাই,' ডাক্তারের দিকে ফিরে সে বলল, 'সত্যিই আপনি আমায় ঘৃণা করতে পারেন: জুয়া খেলে আমার টাকাকড়ি খোওয়া গেছে। পাঁচশ রুবল আমাকে দিতেই হবে।'

আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ কোনো কথা না বলে পাঁচশ রুবল গুনে তার বন্ধুর হাতে দিয়ে দিল। তখনো তার বন্ধুবর রাগে ও লজ্জায় লাল হয়ে রয়েছে। অকারণে অবান্তর সব প্রতিজ্ঞা করে টুপিটা মাথায় চাপিয়ে সে বেরিয়ে গেল। ঘণ্টা দুয়েক বাদে ফিরে এসে ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল:

'যাক, আমার ইজ্জতটা রক্ষা হয়েছে। চলুন ভেগে পড়ি। এই হতচ্ছাড়া শহরে আমার আর এক মুহূর্তও থাকার ইচ্ছা নেই। যত সব জোচ্চোর! অস্ট্রিয়ার সব স্পাই!'

দুই বন্ধু যখন দেশভ্রমণ সেরে ফিরে এল তখন নভেম্বর মাস, রাস্তাঘাটে পুরু হয়ে বরফ জমে রয়েছে। আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের জায়গায় এখন ডাক্তার খোবতভ অধিষ্ঠান করছে। সে এখনো তার পুরনো বাড়িতেই রয়েছে, প্রতীক্ষা করছে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ কবে ফিরে এসে হাসপাতালের কোয়ার্টারটা ছেড়ে দেবে। যে সাদাসিধা মেয়েমানুষটিকে সে পাচিকা বলে এরই মধ্যে সে হাসপাতালের এক অংশে বসবাস শুরু করে দিয়েছে।

হাসপাতাল সম্পর্কে নতুন নতুন গুজবে শহর গরম হয়ে উঠেছে। সবাই

বলছে সাদাসিধা মেয়েমানুষটি সুপারিণ্টেনডেণ্টের সঙ্গে নাকি ঝগড়া করে এবং সুপারিণ্টেনডেণ্ট নতজানু হয়ে তার কাছে মাপ চায়।

আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ যে দিন এসে পেঁছিল সেইদিনই তাকে বাড়ির সন্ধানে বেরোতে হল।

পোস্টমাস্টার ভয়ে ভয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনার কাছে টাকাকড়ি কত আছে?' তার কাছে যা ছিল গুনে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ বলল:

'ছিয়াশি রুবল।'

'আমি ওটা জানতে চাইনি,' ডাক্তারের জবাব শুনে বিমূঢ় ও হতবাক মিখাইল আভেরিয়ানিচ বলল, 'সবশুদ্ধ আপনার কত রুবল আছে?'

'বলছি তো, এই ছিয়াশি রুবল... এই আমার সর্বস্ব।'

যদিও মিখাইল আভেরিয়ানিচের ধারণা ডাক্তার সৎ ও উন্নতমনা, তার স্থির প্রত্যয় ছিল কমপক্ষে বিশ হাজার রুবল ডাক্তার অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছে। এখন যখন বুঝতে পারল আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ ভিখারীর সামিল, তার বেঁচে থাকার কোনো উপায় নেই, হঠাৎ সে কেঁদে ফেলল এবং তার বন্ধুকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল।

১৫

বেলোভা নামে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক মহিলার বাড়িতে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ উঠে গেল। রান্নাঘর বাদ দিয়ে ছোট বাড়িটায় ছিল মাত্র তিনখানি ঘর। রাস্তার দিকের দুখানি ঘর ডাক্তার দখল করল এবং দারিয়া, বাড়িওয়ালী ও তার তিনটি বাচ্চা রান্নাঘরটায় ও তৃতীয় ঘরটিতে রইল। সময় সময় বাড়িওয়ালীর প্রেমাস্পদ আসত রাত্রি যাপন করতে। লোকটা মাতাল এবং প্রায় সময়ে মারধোর করত। তাকে দেখে দারিয়া ও বাচ্চাগুলো ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকত। লোকটা যখন রান্নাঘরের চেয়ারে বসে ভদকার জন্যে হাঁক পাড়ত, জায়গাটা যেন দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হত। ডাক্তার তখন চিৎকাররত ছেলেমেয়েগুলোর কষ্ট সইতে না পেরে তাদের নিজের ঘরে নিয়ে এসে মেঝেয় বিছানা করে দিত। বাচ্চাগুলোকে শুইয়ে দিয়ে ডাক্তার খুব তৃপ্তি পেত।

যথানিয়মে সকাল আটটায় সে ঘুম থেকে উঠত, তারপর চা পান শেষ করে পুরনো বই ও পত্রিকাগুলো পাঠ করতে বসত। নতুন বই কেনার মতো তার টাকা নেই। বইগুলো পুরনো হওয়ার দরুণই হোক, কিংবা পরিবর্তিত পরিবেশের দরুণই হোক, যা খুবই সম্ভব, পড়ার মধ্যে আর সে তেমন ভাবে ডুবে যায় না। বরঞ্চ আজকাল পড়তে সে ক্লান্তিবোধ করে। অকাজে যাতে সময় নষ্ট না হয় সেইজন্যে সে বইগুলোর তালিকা প্রস্তুত করতে এবং প্রতিটি বইয়ের পিছনে লেবেল আঁটতে লেগে গেল। পড়াশুনা করার থেকে এই যান্ত্রিক কাজটায় তার মনটা বেশিকরে বসল। এই একটানা পরিশ্রমের ফলে তার চিন্তাগুলো স্তিমিত হয়ে এল। ফাঁকা একটা মন নিয়ে সে কাজ করে চলল। এদিকে দ্রুতগতিতে সময় চলল বয়ে। এমনকি রান্নাঘরে দারিয়ার সঙ্গে বসে আলুর খোসা ছাড়াতে কিংবা বড় বড় গমের দানা বাছতেও তার মোটেই খারাপ লাগত না। শনি ও রবিবারে সে গীর্জায় যেত। চোখ বুজে দেয়ালে হেলান দিয়ে ধর্মসঙ্গীত শুনতে শুনতে সে চিন্তা করত তার বাপ-মার, তার ইউনিভারসিটির ও নানা ধর্মের কথা। সে শান্তি ও বিষণ্ণতা বোধ করত। গীর্জা ত্যাগ করার সময় তার দুঃখ হত প্রার্থনা সভা এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল বলে।

ইভান দ্মিত্রিচের সঙ্গে কথা কইবার জন্যে দুবার সে হাসপাতালে গিয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারই তাকে দেখল অস্বাভাবিক উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ অবস্থায়: প্রতিবারই সে মিনতি করে তাকে বলল, একা থাকতে চায়, শুধু কথার বুদ্বুদ আর তার ভালো লাগে না, যত কষ্ট, যত যন্ত্রণা সে সহ্য করেছে তার বিনিময়ে হতচ্ছাড়া অমানুষগুলোর কাছে তার আছে শুধু একটিমাত্র ভিক্ষা — নির্জন কারাবাস। সে কি এইটুকুও পেতে পারে না? দু-দুবারই আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ বিদায় নেবার সময় শুভেচ্ছা জানাতেই, ইভান দ্মিত্রিচ বিকটভাবে চিৎকার করে উঠেছে:

'জাহান্নমে যাও!'

আরেকবার যাবার প্রবল ইচ্ছা মনে থাকা সত্ত্বেও আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ ঠিক করে উঠতে পারল না যাওয়া উচিত হবে কি না।

আগে আগে মধ্যাহ্নভোজের পর আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ ঘরের মেঝেয় চিন্তামগ্ন হয়ে পায়চারি করত। এখন সে দেয়ালের দিকে মুখ করে চুপচাপ

সোফায় শুয়ে থাকে বিকেলের চা পানের সময় পর্যন্ত। যে-সব তুচ্ছ চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না তাদের কথা ভাবে। বিশ বছরের বেশি চাকরি করার পরও তাকে যে পেনশন বা থোক কিছু টাকা দেওয়া হল না, এর জন্যে সে মর্মাহত। সে যে খুব একটা সততার সঙ্গে কাজ করেছে তা সে নিজেও মনে করে না। কিন্তু কাজে সততা থাক বা নাই থাক, যে কেউ কাজ করবে পেনশন তার প্রাপ্য। আধুনিক কালের ন্যায় বিচারের মূল কথাই হচ্ছে পদমর্যাদা বা সম্মান বা পেনশন চারিত্রিক গুণ বা দক্ষতার জন্যে দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় চাকরির জন্যে, তা সে চাকরি যে ধরনেরই হোক। তাই যদি, তা হলে তার বেলাতেই বা এই ব্যতিক্রম কেন? সে এখন কপর্দকশূন্য। দোকানের সামনে দিয়ে যেতে তার এখন লজ্জা হয় পাছে দোকানদারের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। বিয়ারের দরুণ তার কাছে বত্রিশ রুবল ধার আছে। বাড়িওয়ালী বেলোভার পাওনাও সে শোধ করতে পারেনি। দারিয়া গোপনে ডাক্তারের পুরনো পোষাক ও বইপত্র বিক্রী করে কিছুটা মুখরক্ষা করেছে এবং বাড়িওয়ালীকে বলেছে খুব শীঘ্রই ডাক্তার একটা মোটা টাকা পাবে।

সারা জীবনের সঞ্চয়, এক হাজার রুবল, দেশভ্রমণে বেরিয়ে নিঃশেষে খরচ করে এসেছে বলে সে নিজের উপর খাপ্পা হয়ে ওঠে। এখন সেই রুবলগুলো থাকলে কত সুবিধা হত! এর উপর তাকে কেউ একা থাকতে দেয় না। যখন তখন অসুস্থ সহকর্মীকে দেখতে আসা খোবতভ একটা কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছে। ওই লোকটার সব কিছু আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের বিরক্তি উৎপাদন করে, তার সুপুষ্ট চেহারা, তার অশিষ্ট অনুগ্রহব্যঞ্জক কথা বলার ভঙ্গী, যে ভাবে তাকে সাকরেদ বলে সম্বোধন করে সেটা, তার হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা বুটজুতো—এ সবই বিরক্তিকর। কিন্তু সবচেয়ে অসহ্য, খোবতভ মনে করে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচকে দেখাশোনা করা তার কর্তব্য এবং তার ধারণা বাস্তবিক সে তার চিকিৎসা করছে। প্রতিবার আসার সময় সে এক বোতল পটাশিয়াম ব্রোমাইড ও কিছু ছাই রঙা পাউডার সঙ্গে নিয়ে আসে।

মিখাইল আভেরিয়ানিচও মনে করে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা ও তাকে ভুলিয়ে রাখা, তার একটা কর্তব্য। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার ভাব নিয়ে ও উৎফুল্লতার ভান করে সে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের ঘরে প্রবেশ করে, তাকে ভরসা দিয়ে বলে বেশ ভালোই দেখছে, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে;

ঈশ্বর জানেন, তার এই উক্তির প্রচ্ছন্ন অর্থ হল সে তার বন্ধুর স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশা ছেড়েই দিয়েছে। ওয়ারশ-এ যে অর্থ সে ধার নিয়েছিল তা সে শোধ দেয়নি। সেই লজ্জা ও নিজের অক্ষমতা চাপা দেবার জন্যে সে আরো জোরে হাসবার, আরো মজার মজার গল্প বলার চেষ্টা করে। ইদানীং মনে হয় তার মজার গল্প ও বলবার কথার বুঝি শেষ নেই। এগুলো এখন শুধু আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের কাছেই নয়, তার নিজের কাছেও পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে।

সে যখন আসে, আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ সাধারণত তার দিকে পিছন ফিরে সোফায় শুয়ে থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে তার কথা শুনে যায়। মনে হয় তার হৃদয়ের উপরে পরতে পরতে নোংরার আস্তর পড়ছে এবং প্রতিবার তার বন্ধুর আগমনে এই আস্তরগুলো জমে জমে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠছে। শেষ পর্যন্ত মনে হয় তার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

এইসব অপকৃষ্ট মনোভাবের কবল থেকে রেহাই পাবার জন্যে সে জোর করে চিন্তা করে আগে হোক পরে হোক, একদিন না একদিন তাকে, খোবতভকে, মিখাইল আভেরিয়ানিচকে পৃথিবী থেকে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। যদি কল্পনা করা যায় আজ থেকে দশ লক্ষ বছর পরে অশরীরী কোনো আত্মা শূন্যপথে যেতে যেতে এই ভূমণ্ডলটা অতিক্রম করছে, সে দেখতে পাবে শুধু কাদার পিণ্ড ও অনাবৃত উলঙ্গ পাথরের স্তূপ। সংস্কৃতি রীতিনীতি, বিধিবিধান, সবকিছু নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে গেছে, একটুকরো ঘাসও কোথাও জন্মাতে দেখবে না। তাহলে তার এই মনোকষ্ট, দোকানদারের সামনে তার লজ্জাবোধ, অপদার্থ এই খোবতভটা, মিখাইল আভেরিয়ানিচের এই জবরদস্তি বন্ধুতা—এ সবের জন্যে ভাবনা কিসের? এগুলো তো তুচ্ছ আবর্জনা।

কিন্তু এই যুক্তিতে আর সে সান্ত্বনা পায় না। যে মুহূর্তে দশ লক্ষ বছর পরেকার পৃথিবীটা সে কল্পনা করে, অমনি দেখতে পায় ওই খোবতভ তার হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা বুটজুতো পায়ে কোনো পাথরের পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে কিংবা মিখাইল আভেরিয়ানিচ হো হো করে হাসছে। এমনকি সে শুনতে পায় দ্বিধামিশ্রিত চুপি চুপি কথা: 'ওয়ারশ-র দেনাটা ভাই, আমি কথা দিচ্ছি, কয়েকদিনের মধ্যেই মিটিয়ে দেব।'

১৬

মিখাইল আভেরিয়ানিচ একদিন বিকেলে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের সঙ্গে দেখা করতে এল। আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ তখন সোফায় শুয়ে। সেই সময় পটাশিয়াম ব্রোমাইড হাতে খোবতভ এসে হাজির হল। আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ অতি কষ্টে দুহাতে ভর দিয়ে সোফার উপরে উঠে বসল।

'বাঃ বন্ধু, বাঃ!' মিখাইল আভেরিয়ানিচ শুরু করল, 'আপনাকে যে গতকালের থেকে অনেক সুস্থ দেখাচ্ছে। সত্যি, আপনাকে সুন্দর, চমৎকার দেখাচ্ছে!'

'বন্ধু, সুস্থ হয়ে ওঠার কথা ভাববার সময় হয়েছে,' খোবতভ হাই তুলে তার সঙ্গে যোগ দিল। 'এই রোগ পর্বটা থেকে রেহাই পাবার জন্যে বুঝি ছটফট করছেন।'

'দেখবেন। কী রকম মজবুত শরীর নিয়ে আমরা সেরে উঠব,' মিখাইল আভেরিয়ানিচ ফুর্তির সঙ্গে হাসতে হাসতে বলল, 'দেখে নেবেন, আরো একশ বছর আমরা বাঁচব, না বাঁচি তো বলবেন।'

'একশ বছরের কথা বলতে পারি না, তবে আরো বিশ বছর উনি টিঁকে থাকবেন,' খোবতভ আশ্বাস দেবার ভঙ্গীতে বলল। 'থামুন, থামুন, শাক দিয়ে মাছ ঢাকবেন না।'

'হেঃ হেঃ!' হাসিতে মিখাইল আভেরিয়ানিচ ফেটে পড়ল। 'আমরা কী চীজ আপনার এখনো জানতে বাকী আছে! যথাসময়ে জানবেন। তবে ঈশ্বর যদি বাদ না সাধেন, ধরে রাখুন পরের গ্রীষ্মে আমরা ককেশাসে ধাওয়া করছি—কী মজা! সারাদিন পাহাড়ে পাহাড়ে টগবগ টগবগ করে ঘোড়ায় চেপে বেড়াব! ককেশাস থেকে ফিরে আসলে পর কে বলতে পারে আমাদের বিয়ের বর সাজতে হয় কিনা!' মিখাইল আভেরিয়ানিচ একটু চোখ টিপে হাসল। 'জেনে রাখবেন আমরা আপনার বিয়ে দেবই, না দিতে পারলে বলবেন ...'

আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের রাগে প্রায় কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। তার বুকটায় যেন দুরমুশ চলেছে।

'কী সব মামুলী কথা!' এই বলে হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে জানলার দিকে এগিয়ে গেল। 'আপনারা নিজেরা কি বুঝতে পারছেন না, কী মামুলী কথা বলছেন।'

শান্ত ও নম্রভাবে সে তার বক্তব্য বলবে ঠিক করেছিল, কিন্তু সাবধান হওয়া সত্ত্বেও সে হাতদুটো মুঠো করে মাথার উপর তুলে ধরল।

'আমাকে একা থাকতে দিন!' কাঁপতে কাঁপতে, মুখচোখ লাল করে সে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল। 'বেরিয়ে যান এখান থেকে। দুজনেই বের হন।'

মিখাইল আভেরিয়ানিচ এবং খোবতভ উভয়েই উঠে দাঁড়াল এবং প্রথমে হতচকিত হয়ে পরে সন্ত্রস্তভাবে তার দিকে চেয়ে রইল। 'দুজনেই বেরিয়ে যান বলছি!' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ সমানে চিৎকার করে চলল। 'গাড়ল, গাধা কোথাকার! দরকার নেই আপনাদের বন্ধুত্ব বা ওষুধের। জঘন্য! বিরক্তিকর!'

বিমূঢ়ের মত পরস্পরের দিকে তাকাতে তাকাতে মিখাইল আভেরিয়ানিচ ও খোবতভ পিছু হটতে হটতে দরজা পর্যন্ত গেল, তারপর দরজাটা পার হয়ে দরদালানে পেঁছিল। আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ পটাশিয়াম ব্রোমাইডের বোতলটা তুলে তাদের দিকে ছুঁড়ে মারল। দরজার চৌকাঠে ধাক্কা লেগে বোতলটা ভেঙ্গে হয়ে গেল চুরমার।

'জাহান্নমে যাক!' তাদের পিছনে দৌড়োতে দৌড়োতে দরদালান অবধি গিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে চিৎকার করে বলল, 'জাহান্নমে যাক।'

আগন্তুকরা চলে যাবার পর আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ যেন জ্বরের ঘোরে কাঁপতে লাগল। কাঁপতে কাঁপতে সোফায় শুয়ে পড়ল। তার মুখে কেবল এক কথা: 'গাড়ল, গাধা কোথাকার!'

রাগটা পড়ে যেতে প্রথমেই মনে হল মিখাইল আভেরিয়ানিচের কথা। এখন তার কী খারাপ লাগছে, কী লজ্জা পাচ্ছে, কী মনোকষ্টে বেচারি রয়েছে, কী ভয়ংকর একটা কাণ্ড ঘটে গেল। এমন ঘটনা তার জীবনে আগে আর কখনো ঘটেনি। তার বিচার বুদ্ধি কোথায় গিয়েছিল, তার জীবনরহস্য বোধ ও দার্শনিক নির্বিকারত্বই বা কোথায় ছিল?

লজ্জায় ও নিজের কৃতকর্মের জন্যে অস্বস্তিতে সারা রাত ডাক্তারের ঘুম হল না। সকালে, প্রায় দশটা নাগাদ পোস্টমাস্টারের কাছে মার্জনা চাইতে পোস্টাফিসে গিয়ে সে হাজির হল।

গভীর সমবেদনায় মিখাইল আভেরিয়ানিচ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল এবং তার বন্ধুর হাতটা জড়িয়ে ধরে বলল, 'যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আলোচনা এখন থাক। যা হবার তা হয়ে গেছে। লিউবাভকিন!' এই বলে সে এমন জোরে হাঁক

দিয়ে উঠল যে সব ডাকহরকরা এবং সেখানে যত বাইরের লোক ছিল সবাই উঠল চমকে। 'একটা চেয়ার নিয়ে এস! আঃ, একটুখানি অপেক্ষা করতে পারো না?' গরীব এক স্ত্রীলোককে উদ্দেশ করে সে চেঁচিয়ে উঠল। স্ত্রীলোকটি কাউণ্টারের গরাদের ভিতর দিয়ে একটা রেজিস্ট্রি চিঠি দিতে যাচ্ছিল। 'দেখছ না, আমি ব্যস্ত? যাক গে, যা হবার তা হয়ে গেছে,' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের দিকে তাকিয়ে সে দরদীর মতো বলল। 'দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না, দয়া করে বসুন।'

পুরো একমিনিট ধরে সে হাতের তালু দিয়ে হাঁটুটা ঘষে বলল:

'মুহূর্তের জন্যেও কিছু মনে করিনি। অসুস্থ হওয়া যে কী তা বুঝি। আমি ও ডাক্তার দুজনেই গতকাল আপনার রোগের আক্রমণ দেখে খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আপনার সম্পর্কে আমরা অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করেছি। কেন আপনি রোগটাকে অবহেলা করছেন? বাস্তবিক কিন্তু আপনার এ ভাবে চলা মোটেই উচিত নয়। বন্ধু হয়ে একটা কথা খোলাখুলি বলছি, কিছু মনে করবেন না,' মিখাইল আভেরিয়ানিচ ফিসফিস করে কথা কইতে আরম্ভ করল যে মনে হল সে যেন চুপি চুপি কথা কইছে, 'আপনি যে পরিবেশে বাস করেন তা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়: বদ্ধ ঘর, চারদিকে নোংরা, সেবাযত্ন করার কেউ নেই, চিকিৎসা করাবেন যে তারও কোনো উপায় নেই ... ডাক্তার ও আমি দুজনেই আপনাকে অনুরোধ করছি আমাদের উপদেশ মতো চলতে: আপনি হাসপাতালে চলে যান। সেখানকার খাওয়া দাওয়া পুষ্টিকর, সেখানে আপনার সেবাযত্নের ত্রুটি হবে না। তাছাড়া আপনার অসুখেরও চিকিৎসা হবে। ইয়েভগেনি ফিওদরভিচ আপনার আমার কাছে যতই গেঁয়ো হোক না, ডাক্তার হিসেবে বেশ চৌকস। তার ওপর নির্ভর করা চলে। সে আমাকে কথা দিয়েছে নিজে আপনার দেখাশোনার ভার নেবে।'

পোস্টমাস্টারের গভীর আন্তরিকতায় ভরা কণ্ঠস্বর শুনে ও হঠাৎ তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে দেখে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ অভিভূত হয়ে পড়ল।

'বন্ধু, ওদের কথায় বিশ্বাস করবেন না,' বন্ধুর বুকে হাত রেখে চাপা গলায় সে বলল। 'বিশ্বাস করবেন না ওদের কথায়। সব মিথ্যে কথা! আমার কোথায় গলদ হয়েছে জানেন, গত বিশ বছরের মধ্যে একজন মাত্র বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে এবং সেই লোকটি পাগল। আমি বিন্দুমাত্র অসুস্থ নই। আমি শুধু একটা পাপচক্রের মধ্যে আটকা পড়েছি,

তার থেকে আমার পরিত্রাণ নেই। আমি আর কিছুরই পরোয়া করি না, আপনাদের যা খুশি তাই করতে পারেন।'

'হাসপাতালেই যান।'

'যেখানে হোক, আমি তোয়াক্কা করি না, ইচ্ছে করলে আপনারা আমাকে জীবন্ত কবরও দিতে পারেন।'

'আমাকে কথা দিন, ইয়েভগেনি ফিওদরভিচের নির্দেশ আপনি মেনে চলবেন।'

'বেশ, কথা দিলাম। কিন্তু আবার আপনাকে বলে দিচ্ছি একটা পাপচক্রে আটকা পড়েছি। এখন থেকে সবকিছু, এমনকি আমার শুভার্থীদের আন্তরিক সমবেদনা পর্যন্ত একটিমাত্র উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত থাকবে—আমার ধ্বংসে। আমি শেষ হয়ে আসছি, সেটা বোঝবার সাহস আমার আছে।'

'কিন্তু আপনি ঠিক সেরে উঠবেন।'

'ও কথা বলে লাভ কী?' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ বিরক্তির সঙ্গে বলল। 'জীবনের শেষাশেষি প্রায় প্রত্যেককেই এই ধরনের অবস্থার ভেতর দিয়ে যেতেই হয়। আপনাকে হয়ত বলা হল আপনার কিডনি খারাপ হয়েছে বা হার্টের গোলযোগ দেখা দিয়েছে, তাই আপনি চিকিৎসা শুরু করলেন। কিংবা ওরা হয়তো বলল আপনি পাগল বা ডাকাত। মোটকথা যে মুহূর্তে জনসাধারণের মনোযোগ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হল, জেনে রাখবেন পাপচক্রের মধ্যে আটকা পড়লেন। শতচেষ্টা সত্ত্বেও তার কবল থেকে পরিত্রাণ নেই। পরিত্রাণের যদি চেষ্টা করেন দেখবেন আরও মোক্ষমভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। বরঞ্চ সে চেষ্টা না করাই ভালো, কারণ তা থেকে উদ্ধার পাওয়া মানুষের সাধ্যাতীত। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়।'

ইতিমধ্যে কাউণ্টারের ওধারে ছোটখাটো একটা ভীড় জমে উঠেছে। তাদের কাজের দেরি হচ্ছে দেখে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। মিখাইল আভেরিয়ানিচ আরেকবার তার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় খোবতভ তার ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট ও হাঁটু অবধি বুটজুতো পরে হঠাৎ এসে হাজির হল। যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে সে বলল:

'বন্ধু, একটা দরকারে আপনার কাছে এসেছি। চিকিৎসা সংক্রান্ত একটা আলোচনায় আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন কিনা জানতে এসেছি। আসবেন?'

আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ ভাবল হাঁটাচলা করিয়ে খোবতভ তাকে একটু অন্যমনস্ক করতে চায় কিংবা হয়তো কিছু অর্থোপার্জনের সুযোগ তাকে দিচ্ছে। তাই ভেবে সে কোট ও টুপিটা চাপিয়ে তার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। গত কালের অন্যায় আচরণের এইরকম প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ পেয়ে সে খুশিই হল। খোবতভ গতদিনের ঘটনা সম্পর্কে উল্লেখমাত্র করল না, স্পষ্টতই তার জন্যে সে কিছু মনে করেনি। এই কথা ভেবে খোবতভের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠল। এই রকম আকাট অসভ্য মানুষের মধ্যে এতটা বুদ্ধি বিবেচনা দেখে সে চমকিত হল।

'আপনার রোগী কোথায়?' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ জিজ্ঞাসা করল।

'হাসপাতালে। অনেক দিন থেকে ভাবছি আপনাকে দিয়ে তাকে দেখাব... খুব একটা মজার কেস।'

তারা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল। হাসপাতালের প্রধান বাড়িটা পাশ কাটিয়ে তারা সেই অংশের দিকে চলল যেখানে মানসিক রোগীরা থাকে। কোনো কারণে তাদের দুজনের মুখেই কথা নেই। তারা যেই সে অংশের মধ্যে প্রবেশ করল নিকিতা যথারীতি সোজা হয়ে উঠল দাঁড়িয়ে।

'এখানে একজনের ফুসফুসে একটা গোলযোগ দেখা দিয়েছে,' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচকে নিয়ে ওয়ার্ডে প্রবেশ করতে করতে খোবতভ চাপা গলায় বলল। 'আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন, মিনিটখানেকের মধ্যেই আসছি। স্টেথিস্কোপটা নিয়ে আসি।'

এই বলে সে বেরিয়ে গেল।

১৭

ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসছে। মুখটা প্রায় সম্পূর্ণ বালিশের মধ্যে ঠেসে ইভান দ্‌মিত্রিচ শুয়ে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটা নিশ্চলভাবে বসে নীরবে কেঁদে চলেছে। তার ঠোঁটদুটো শুধু নড়ছে। মোটা চাষীটা ও প্রাক্তন পোস্টাফিসের পিওনটা ঘুমে অচেতন। ঘরের ভিতরটা শান্ত নিস্তব্ধ।

ইভান দ্‌মিত্রিচের বিছানার পাশে বসে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু আধঘণ্টা পার হয়ে গেল, খোবতভের দেখা নেই। তার বদলে নিকিতা হাতে একটা আঙ্গরাখা, কিছু জামাকাপড় ও চটি নিয়ে ওয়ার্ডে প্রবেশ করল।

'হুজুর, পোষাকটা বদলে ফেলুন,' সে শান্তভাবে বলল। 'এই খাটিয়াটা আপনার,' খালি একটা খাট দেখিয়ে সে বলল। স্পষ্টতই খাটটা এইমাত্র এখানে আনা হয়েছে। 'ভগবানের ইচ্ছেয় আপনার এসব সয়ে যাবে, কিছু ভাববেন না।'

আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। বিনা বাক্যব্যয়ে নিকিতার দেখিয়ে দেওয়া বিছানাটায় সে উঠে বসল, নিকিতা তার জন্যে অপেক্ষা করছে বুঝতে পেরে অত্যন্ত অস্বস্তি সত্ত্বেও তার পরনে যা ছিল সব খুলে ফেলল। তারপর হাসপাতালের পোষাকগুলো পরার চেষ্টা করতে লাগল, দেখা গেল পায়জামাটা খুবই ছোট, সার্টটা অত্যধিক লম্বা এবং আঙ্গরাখাটা থেকে আঁশটে গন্ধ বেরুচ্ছে।

নিকিতা আবার বলল, 'ভগবানের ইচ্ছেয় এসব সয়ে যাবে।'

আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের জামাকাপড়গুলো হাতে নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় দরজাটা গেল বন্ধ করে।

'সবই তো সমান,' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ সলজ্জভাবে আঙ্গরাখাটা জড়াতে জড়াতে ভাবল, 'নতুন পোষাকে কয়েদীর সঙ্গে তার মিল আছে। ফ্রককোট, ইউনিফর্ম বা এই গাউনটা ... সবই তো সমান ...'

কিন্তু তার ঘড়িটা? ধারের পকেটে যে নোটবইটা রেখেছিল, সেটা? তার সিগারেটগুলো? নিকিতা তার জামাকাপড়গুলো নিয়ে গেল কোথায়? হয়ত বাকী জীবনে আর কখনোই সে ট্রাউজার, ওয়েস্টকোট ও বুটজুতো পরতে পারবে না। প্রথমটা এ সব তার কাছে বিস্ময়কর, এমনকি দুর্বোধ্য মনে হল। আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের দৃঢ়প্রত্যয়ে এখনো চিড় খায়নি। এখনো সে বিশ্বাস করে বাড়িওয়ালী বেলোভার বাড়ির থেকে ৬ নং ওয়ার্ডের কোনো পার্থক্য নেই, বিশ্বাস করে দুনিয়ার সব কিছুই নিরর্থক, শুধু বাইরের যা জাঁকজমক। তা সত্ত্বেও কিন্তু তার হাত কাঁপতে আর পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল এবং ইভান দ্‌মিত্রিচ ঘুম থেকে উঠেই তাকে হাসপাতালের পোষাকে দেখবে সেই

ভাবনাতেও মুষড়ে গেল। সে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে কয়েক পা পায়চারি করল, তারপর আবার বসে পড়ল।

আধঘণ্টা কেটে গেল, একঘণ্টাও কাটল। এবারে তার বসে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠল। সে ক্লান্ত বোধ করতে লাগল, একটা পুরো দিন কিংবা একটা সপ্তাহ অথবা এই লোকগুলোর মতো বছরের পর বছর এই ঘরের মধ্যে বাস করা কি সম্ভব? সে তো কিছুক্ষণের জন্যে বসেছিল, তারপর কিছুক্ষণ পায়চারি করেছে, তারপরে আবার বসেছে। এছাড়াও সে জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারে, আরো একবার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে পারে। তারপর, তারপর কী করবে? পাথরের মূর্তির মতো ওখানে সবসময় শুধু বসে থাকবে আর ভাববে? না না, কখনোই তা হতে পারে না।

আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ শুয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠে বসল। জামার আস্তিন দিয়ে কপালের ঠাণ্ডা ঘামটা মুছতে মুছতে তার মনে হল মুখ থেকে শুঁটকি মাছের গন্ধ বেরুচ্ছে। আর একবার পায়চারি করল।

বিমূঢ়ভাবে হাতদুটো এলিয়ে দিয়ে সে বলল, 'দেখছি একেবারে ভুল বোঝার ব্যাপার। ওদের সঙ্গে আমাকে কথা কইতে হবে, সব ব্যাপারটাই ভুল বুঝেছে ...'

ঠিক সেই মুহূর্তে ইভান দ্মিত্রিচের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে উঠে বসল হাতের উপর মাথাটা রেখে। মেঝেতে থুতু ফেলল। তারপরে আবিষ্ট চোখে ডাক্তারের দিকে তাকাল। স্পষ্টতই প্রথমটায় সে কিছুই বুঝতে পারল না। কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখের চেহারা একেবারে পালটে গেল, ঘুম জড়ানো ভাবের বদলে দেখা দিল পাশবিক উল্লাসের ভাব।

'তাহলে বুড়ো, তোমাকেও ওরা এখানে এনে পুরেছে!' সে বলল। ঘুমের আমেজে তার গলার আওয়াজ এখনো ভারী, একটা চোখ এখনো ভালো করে খোলেই নি। 'বেশ, বেশ, আপনাকে দেখে খুশি হলাম। অন্যের রক্ত চোষার বদলে এবারে আপনার রক্তই ওরা এসে চুষবে। বাঃ চমৎকার!'

'সব ব্যাপারটাই ভুল বুঝে হয়েছে,' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ আস্তে বলল। ইভান দ্মিত্রিচের কথায় সে ভয় পেয়েছে। কাঁধটা একবার ঝাঁকানি দিয়ে আরেকবার সে বলল, 'দেখতে হবে না, নিশ্চয় এটা ভুল বোঝার জন্যে ঘটেছে ...'

ইভান দ্মিত্রিচ আবার থুতু ফেলে শুয়ে পড়ল।

'অভিশপ্ত জীবন!' সে বলে চলে। 'এ জীবন এত বিষাক্ত এত কষ্টকর তার কারণ — থিয়েটারে বা অপেরায় যেমন দেখা যায় দুঃখভোগের পর পুরস্কৃত হয়ে বা মোক্ষলাভে জীবনের পরিণতি, এ জীবনের তেমন কোনো পরিণতি ঘটবে না। এ জীবন শেষ হবে মৃত্যুতে। জনা দুয়েক পরিচারক এসে হাত পা ধরে লাশটাকে তুলে মরার ঘরে নিয়ে যাবে। কুছ পরোয়া নেই ... পরপারে আমাদের উৎসব আসবে ... আমি ভূত হয়ে এই জানোয়ারগুলোকে ভয় দেখাতে আসব। ভয়ের চোটে ওদের মাথার চুল পাকিয়ে ছাড়ব।'

ঠিক সেইসময়ে মসেইকা ফিরে এল। ঘরের ভিতরে ডাক্তারকে দেখতে পেয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল:

'একটা কোপেক দাও!'

১৮

আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ জানলার ধারে গিয়ে বাইরে মাঠের দিকে তাকাল। অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে, ডানদিক থেকে হিমেল রক্তবর্ণ চাঁদ উঠে আসছে। হাসপাতালের বেড়াটা থেকে বেশি দূরে নয়, সাতশ ফুটও হবে না, সাদা রঙের উঁচু একটা বাড়ি। তার চারদিকে পাথরের দেয়াল। ওটা জেলখানা।

'তাহলে বাস্তবজগত মানে এই!' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ ভাবল। কথাটা মনে হতেই তার ভয় হল।

সবকিছু কী ভয়ংকর; চাঁদ, জেলখানা, বেড়ার ওপরকার দোমড়ানো পেরেকগুলো, দূরের হাড়-পোড়ান কলের ওই আগুনটা। তার পিছন থেকে কে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ ফিরে তাকিয়ে দেখল একটা লোক, সমস্ত বুক জুড়ে একগাদা তারকা ও নানা ধরনের পদক। চালাকের মতো চোখ টিপে হাসছে। এই দৃশ্যও ভয়ংকর।

আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল, চাঁদ বা জেলখানার ওই বাড়িটার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। বোঝাতে চাইল যাদের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক আছে তারাও সম্মান পদক বুকে এঁটে ঘুরে বেড়ায়। বোঝাল, সময়ে সবকিছুই পচে গলে কাদায় পরিণত হবে। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও

হঠাৎ সে নৈরাশ্যে অভিভূত হয়ে পড়ল এবং দুহাতে জানলার গরাদগুলো ধরে চেষ্টা করল নাড়া দিতে। গরাদগুলো শক্ত, একটুও নড়ল না।

তারপর মন থেকে ভয়টা দূর করার জন্যে সে ইভান দ্মিত্রিচের বিছানার কাছে গিয়ে একধারে বসল।

'বন্ধু, আমি মনের জোর হারিয়ে ফেলছি,' কপাল থেকে বিন্দু বিন্দু ঠাণ্ডা ঘাম ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে সে চাপা গলায় বলল। 'আমার আর মনের জোর নেই।'

'দার্শনিক তত্ত্ব আওড়াবার চেষ্টা করুন,' ইভান দ্মিত্রিচ শ্লেষের সুরে বলল।

'হা ভগবান, হা ভগবান... ও, হ্যাঁ!... আপনিই একবার বলেছিলেন, রাশিয়ার যদিও কোনো নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ নেই, এখানকার প্রত্যেকেই এমনকি কুলিমজুররা পর্যন্ত দার্শনিক তত্ত্ব আওড়ায়। সাধারণ কুলিমজুররা যদি দর্শনই আওড়ায় তাতে ক্ষতি কার?' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের গলার আওয়াজ শুনে মনে হল এবারে বুঝি কেঁদে ফেলবে কিংবা এইভাবে সে তার সঙ্গীদের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। 'তা হলে কেন, বন্ধু, এই বিদ্রূপের হাসি। সাধারণ লোকেরা করবেই বা কী, কিছুতেই তৃপ্তি না পেলে দার্শনিক বুলি আওড়ানো ছাড়া তাদের করারই বা আছে কী? যদি কোনো স্বাধীনচেতা বুদ্ধিমান শিক্ষিত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে ভগবানের প্রতিরূপকে এই অপরিসর নোংরা শহরে ডাক্তারি করতে হয়, সারাটা জীবন সে রক্তমোক্ষণ করাবে, জোঁক লাগাবে আর সরষের পট্টি মারবে। এই তো তার বিধিলিপি! ডাক্তারির নামে হাতুড়েগিরি, কী নীচ, কী কুৎসিত! হা ভগবান!'

'আপনি বাজে বকে চলেছেন! ডাক্তার হওয়ায় যদি আপনার এতই অপছন্দ, মন্ত্রী হলেন না কেন?'

'না না, কারুর কিছু করার সাধ্য নেই! বন্ধু, আমরা বড় দুর্বল... আমি নির্বিকার ছিলাম, মনের আনন্দে স্থির মস্তিষ্কে সবকিছু বিচার করেছি, কিন্তু যে মুহূর্তে বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হলাম, মনের জোর চলে গেল ... দেহমন ভেঙে গেছে ... আমরা দুর্বল, আমরা হতভাগা ... আপনিও তাই। আপনি বুদ্ধিমান, উন্নত মন আপনার, অনেক মহৎ গুণ নিয়ে আপনি

জন্মেছিলেন। কিন্তু জীবনযাত্রার শুরুতেই আপনি ক্লান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়লেন... দুর্বল, দুর্বল!'

অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয় ও অপমান ছাড়া জরুরি ধরনের কী যেন একটা আন্দ্রেই ইয়েফিমিচকে দংশন করতে লাগল। অবশেষে সে বুঝতে পারল সেটা তার সিগারেট ও বিয়ারের নেশা।

'আমি এখনি আসছি ...' সে বলল। 'ওদের বলি গিয়ে একটা আলো দিয়ে যেতে ... এ আমি সহ্য করতে পারছি না ... উঃ অসহ্য ...'

আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলতেই নিকিতা একলাফে সামনে এসে দরজাটা আগলে দাঁড়াল।

'কোথায় যাচ্ছেন? না না, চলবে না!' সে বলল। 'এখন বিছানা থেকে ওঠা বারণ।'

আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে অবাক হয়ে গিয়ে বলল, 'কয়েক মিনিটের জন্যে আমি বাইরে যাচ্ছি, ওই উঠোনটায় একটু পায়চারি করতে।'

'না না, হুকুম নেই। আপনি নিজেও তা জানেন।'

নিকিতা মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে পিঠ দিয়ে চেপে রইল।

'কিন্তু আমার বাইরে যাওয়ায় কার কী ক্ষতি?' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ কাঁধটায় ঝাঁকানি দিয়ে জিজ্ঞাসা করে। 'নিকিতা! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাকে বাইরে যেতেই হবে!' বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে গেল। 'আমাকে যেতেই হবে!'

'এই রকম চেঁচামেচি করে যাবার চেষ্টা করবেন না,' নিকিতা ধমক দিয়ে বলল।

ইভান দ্‌মিত্রিচ হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল। 'লজ্জাকর ব্যাপার! ওর কী অধিকার আছে কারও বাইরে যাওয়ায় বাধা দিতে? এখানে আমাদের ধরে রাখার ওদের কী অধিকার আছে? আমি জানি আইনে স্পষ্ট বলা আছে বিনা বিচারে কারো স্বাধীনতা হরণ করা চলবে না! এতো নিছক জোরজুলুম! যথেচ্ছাচার!'

'বাস্তবিকই যথেচ্ছাচার!' অপ্রত্যাশিত সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ বলল। 'আমি বাইরে যেতে চাই, আমি যাবই। আমাকে

বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার ওর নেই। শোনো বলছি, আমাকে যেতে দাও।'

'এই জানোয়ার, শুনতে পাচ্ছিস না?' দরজায় ঘুষি মারতে মারতে ইভান দ্‌মিত্রিচ চিৎকার করতে লাগল। 'খোল্‌ দরজা না হলে ভেঙ্গে ফেলব! কশাই কোথাকার!'

'দরজা খোল!' আন্দ্রেই ইয়েফিমিচও রাগে কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে উঠল। 'আমি বলছি, খোল!'

'চেঁচিয়ে যা!' দরজার ওধার থেকে নিকিতা জবাব দিল। 'চালা কত পারিস।'

'অন্তত ইয়েভগেনি ফিওদরভিচকে একবার গিয়ে ডেকে আনো! তাকে বল একমিনিটের জন্যে আমি তাকে আসতে বলছি।'

'না ডাকতেই তিনি কাল আসবেন।'

'ওরা কখনোই আমাদের বেরুতে দেবে না!' ইভান দ্‌মিত্রিচ বলল। 'এখানে মরে না পচা অবধি ওরা আমাদের রেহাই দেবে না। উঃ ভগবান, পরলোকে নরক বলে কিছু নেই, এ কি সত্যি? একি সত্যি, এই নচ্ছারগুলোকে ক্ষমা করা হবে? ন্যায়বিচার কি কোথাও নেই? এই বদমাস, দরজা খোল, আমার হাঁফ ধরছে!' সমস্ত দেহের ওজন দিয়ে ও দরজাটায় ধাক্কা দিয়ে ভাঙ্গা গলায় সে চেঁচিয়ে উঠল, 'দরজায় মাথা ঠুকে চৌচির করে ফেলব! খুনী ডাকাত সব!'

নিকিতা হঠাৎ দরজাটা খুলে ফেলল। তারপর হাত ও হাঁটু দিয়ে ধাক্‌কা মেরে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচকে পাশে হটিয়ে দিল এবং সটান তার মুখের উপর মারল এক ঘুষি। আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের মনে হল লবণাক্ত একটা উত্তাল তরঙ্গ তাকে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত করে টানতে টানতে বিছানার উপরে আছড়ে ফেলল। মুখের ভিতরটায় সত্যিই তার নোনতা স্বাদ লাগছিল। স্পষ্টতই তার মাড়ি ফেটে রক্ত পড়ছে। যেন ভেসে ওঠার চেষ্টায় সে ওপর দিকে হাতড়াতে লাগল, এবং কার বিছানার ধার ধরল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল নিকিতা তার পিঠে দুবার ঘুষি চালাল।

ইভান দ্‌মিত্রিচ বিকটভাবে আর্তনাদ করে উঠল। হয়ত তাকেও মার খেতে হল।

তারপরেই সব চুপচাপ। জানলার গরাদের ভিতর দিয়ে চাঁদের ম্লান আলো এসে পড়েছে। মেঝের ছায়াটা দেখে মনে হচ্ছে একটা জাল পাতা

রয়েছে যেন। সব কিছুই ভয়ংকর। দম বন্ধ করে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ আরো আঘাতের ভয়ে কাঠ হয়ে পড়ে রয়েছে। কেউ যেন তার শরীরের ভিতর একটা কাস্তে চালিয়ে তার বুক ও পেটের মধ্যে কয়েক পোঁচ টান দিয়ে দিল। যন্ত্রণার জ্বালায় সে বালিশটা কামড়ে ধরল, দাঁতে দাঁত ঘষল। ঠিক এই সময়, এই মহাবিশৃংখলার মধ্যে থেকে বিদ্যুৎ ঝলকের মত একটা চিন্তা উদয় হয়ে তার মনকে ভরিয়ে ফেলল, অসহ্য, সাংঘাতিক সে চিন্তা; এই যে লোকগুলো, চাঁদের আলোয় যাদের কালো কালো ছায়ার মতো দেখাচ্ছে, তারা তো দিনের পর দিন কত বছর ধরে যে-যন্ত্রণা এখন সে ভোগ করছে, তাই পেয়ে আসছে। কী আশ্চর্য, বিশ বছরের ওপর এর অস্তিত্বই সে জানেনি অথবা না জানাই ছিল তার মনোগত ইচ্ছা। সে জানত না বা এই যন্ত্রণা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা তার ছিল না, অতএব সে নির্দোষ, এইসব বলে যতই সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করুক তার বিবেক, নিকিতার মতোই নির্দয় ও অনমনীয়, তার সারা দেহে হিমপ্রবাহ বইয়ে দিল। সে লাফিয়ে উঠল, তারস্বরে চিৎকার করতে চাইল, চাইল ছুটে বেরিয়ে গিয়ে নিকিতা, খোবতভ, সুপারিণ্টেনডেণ্ট ও হাসপাতালের সহকারীকে খুন করে নিজেকে খুন করতে। কিন্তু তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না, তার ইচ্ছানুযায়ী পা দুটো চলতে অপারগ। হাঁপাতে হাঁপাতে সে গায়ের আঙ্গরাখা ও সার্টটাকে টানাটানি করে ছিঁড়ে ফেলে অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়ল।

১৯

পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গল তার মাথাটা দপদপ করছে, কানের ভেতরটা ভোঁ ভোঁ করছে আর শরীরে অসুস্থতার লক্ষণ। গতরাত্রে নিজের দুর্বলতার কথা মনে পড়তে সে লজ্জা বোধ করল না। কাপুরুষের মতো সে ব্যবহার করেছে, এমনকি চাঁদের ভয়েও সে ভীত হয়েছে এবং যা কিছু তার মনে হয়েছে, যা কিছু সে ভেবেছে অকপটে সবই সে প্রকাশ করেছে। তার অনুভূতি তার চিন্তা যে ওরকম হতে পারে—এই যেমন, অতৃপ্তি থেকেই সাধারণ লোক দার্শনিক তত্ত্ব আওড়ায়, সে কখনো কল্পনাও করতে পারেনি। এখন কিন্তু কোনো কিছুর জন্যেই তার মাথাব্যথা নেই।

পান আহার কিছুই সে করল না, নিশ্চল নির্বাক হয়ে বিছানায় শুয়ে রইল।

যখন সবাই এসে প্রশ্ন করল, সে ভাবল, 'যা খুশি বলে যাক, আমি উত্তর দেব না... কিছুরই পরোয়া করি না।'

খাওয়ার পর দুপুরে মিখাইল আভেরিয়ানিচ তার সঙ্গে দেখা করতে এল, সঙ্গে আনল এক প্যাকেট চা আর পাউণ্ডখানেক জুজুব-ফল। দারিয়াও এল, তার বিছানার পাশে ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে রইল, তার মুখে নির্বাক শোকের ছায়া। সর্বোপরি এল ডাক্তার খোবতভ। সে আনল এক বোতল পটাশিয়াম ব্রোমাইড এবং যাবার সময় নিকিতাকে বলে গেল ঘরটাতে ধোঁয়া দিতে।

সন্ধ্যে নাগাদ আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ সন্ন্যাস রোগে মারা গেল। প্রথমে, জ্বর আসার সময় যে রকম শীত ও গা বমি বমি করে সেইরকম বোধ করল, মনে হল ন্যক্কারজনক কী যেন একটা তার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে, আঙুলের ডগা পর্যন্ত চারিয়ে যাচ্ছে, সেটা যেন তার পেট থেকে মাথায় উঠে যাচ্ছে, তার চোখ ও কান দিয়ে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তার চোখে সবকিছু সবুজ হয়ে গেল। আন্দ্রেই ইয়েফিমিচ বুঝল তার মৃত্যু আসন্ন। তার মনে পড়ে গেল ইভান দ্মিত্রিচ, মিখাইল আভেরিয়ানিচ, এবং লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক অমরত্বে বিশ্বাস করে। আর অমরত্ব বলে যদি কিছু থাকে? তার অমর হবার আকাংক্ষাও নেই; মুহূর্তের জন্য কথাটা সে শুধু ভাবল। সে দেখল আশ্চর্য সুন্দর ও লাবণ্যমণ্ডিত একপাল বল্গা হরিণ, আগের দিন তাদের কথা সে পড়েছে। তারা তার সামনে দিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে। তারপর একটি গ্রাম্য মহিলা তার দিকে হাতখানা বাড়িয়ে দিচ্ছে, হাতে একটা রেজিস্ট্রি চিঠি... মিখাইল আভেরিয়ানিচ কী যেন বলল। তারপর সবকিছু মিলিয়ে গেল, আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের জ্ঞান চিরতরে হল লুপ্ত।

দুজন পরিচারক এসে হাত পা ধরে তাকে তুলে নিয়ে রেখে এল ভজনালয়ে। নিষ্পলক চোখে টেবিলের ওপর সে শুয়ে রইল, রাত্রে তার ওপর চাঁদের আলো পড়ল। পরের দিন সেরগেই সেরগেইচ ক্রুশের সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তি-গদগদ চিত্তে প্রার্থনা শেষ করে তার প্রাক্তন প্রধানের চোখদুটো বন্ধ করে দিল।

এক দিন পরে আন্দ্রেই ইয়েফিমিচের কবর দেওয়া হল। কবর দেওয়ার সময় শুধু মিখাইল আভেরিয়ানিচ আর দারিয়া উপস্থিত ছিল।

১৮৯২

বনেদী বাড়ি

(শিল্পীর গল্প)

১

ঘটনাটা ঘটেছিল ছ-সাত বছর আগে। তখন আমি ছিলাম 'টি' প্রদেশে বেলকুরভের জমিদারিতে। বেলকুরভের তখন তরুণ বয়েস। সে খুব ভোরে উঠত, কৃষকদের মতো লম্বা ঝুলওয়ালা কোর্তা পরে বেড়াত, আর প্রতি সন্ধ্যায় বীয়ার খেয়ে আমার কাছে অনুযোগ করে যেত যে জীবনে কোথাও কারো কাছ থেকে সহানুভূতি পেল না।

বাগানের লাগোয়া একটা বাড়ির অংশে সে থাকত। আর আমি ওদের পুরানো জমিদার-বাড়ির বড় বড় থামওয়ালা একটা নাচঘরে নিজের আস্তানা করে নিয়েছিলাম। একটা মস্ত চওড়া সোফা আর টেবিল ছাড়া সে ঘরে কোন আসবাবের বালাই ছিল না। সোফাটার ওপরেই ঘুমোতাম আর টেবিলটায় কখনও কখনও তাস পেড়ে পেশেন্স খেলতে বসতাম। সব ঋতুতেই, এমন কি প্রকৃতি যখন শান্ত থাকত—তখনও পুরানো চুল্লীগুলোর গুঞ্জনের বিরাম ছিল না। আর ঝড় উঠলে সমস্ত বাড়িটা এমন করে কাঁপতো যেন তক্ষুনি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। ব্যাপারটা ভয়ের বৈকি, বিশেষ করে ঝড়ের রাত্রে যখন বিদ্যুৎ চমকাতো ঘরটার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দশটা জানালা জুড়ে।

এইরকম আলস্যের জীবনে পড়ে প্রায় কিছুই করতাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, চেয়ে চেয়ে দেখতাম পাখি, বাগানের পথ, ডাকে যা চিঠিপত্র আসতো পড়তাম আর ঘুমোতাম। কখনও কখনও গভীর রাত্রি পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতাম বাইরে।

এইরকম লক্ষ্যহীন ভ্রমণ থেকে ফেরার পথে একদিন আর একটা অচেনা মহালে গিয়ে পড়লাম।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে, পুষ্পিত রাইয়ের ক্ষেতে গোধূলির ছায়া নেমেছে। বাগানের পথ বেষ্টন করে দুধারে দুই দৃঢ় প্রাচীরের মতো ঘননিবিষ্ট দীর্ঘ ফার গাছের সারি চলে গেছে এক বিষণ্ণ রমনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। অনায়াসে বেড়া টপকে সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলাম। ছুঁচলো পাইন পাতার স্তর একইঞ্চি পুরু হয়ে মাটি ছেয়ে ফেলেছে যেন বিছানো কার্পেট, চলতে চলতে পা পিছলে যায়। চারিদিক স্তব্ধ ও অন্ধকার, শুধু সূর্যাস্তের উজ্জ্বল একটু সোনা গাছের মাথায় মাথায় আর মাকড়সার জালে বন্দী হয়ে রামধনুর মতো কাঁপছে। পাইন গাছের সুগন্ধে মন অবশ হয়ে যাচ্ছে। অনতিদূরে বাঁক নিয়েই একটা লাইম গাছের দীর্ঘ বীথি। তাই ধরে এগুলাম। এখানেও চারিদিকে বহুবছরের অযত্ন ও জীর্ণতার ছাপ। পায়ের তলায় গত বছরের ঝরা পাতা থেকে বিষণ্ন মর্মর উঠছে, গোধূলির ছায়া জমেছে বড় বড় গাছের গুঁড়ির আড়ালে। আমার ডানদিকে প্রাচীন ফলের বাগানে একটা অরিয়ল পাখি মৃদু অলস একটানা ডেকে চলেছে। পাখিটাও সম্ভবত প্রাচীন। লাইম গাছের বীথি শেষ হতেই সামনে পড়ল একটা পুরানো বাড়ি, তার সামনে একটি বারান্দা, ওপর তলায় ঘর। হঠাৎ চোখে পড়ল বাড়িটার উঠোন আর বাঁধানো স্নানের ঘাটসমেত বড়ো পুকুর। সেখানে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা সবুজ উইলো গাছ। পুকুরটার ওপারে দেখা যায় প্রায় গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায় খুব উঁচু সরু একটা গির্জার ঘণ্টাঘর। ঘণ্টাঘরের মাথায় বসানো ক্রুশটা অস্তোন্মুখ সূর্যের শেষ আভায় জ্বল জ্বল করছে। মুহূর্তের জন্য পরিচিত কোন কিছুর মোহে যেন আবিষ্ট হয়ে গেলাম। এখানে কিসের সঙ্গে যেন আমার বহুদিনের পরিচয় ছিল। মনে হল এই দৃশ্যপট শৈশবে যেন দেখেছি।

খানিকটা উঠোনের পর শ্বেত পাথরের তোরণ-দ্বার, তারপরেই ফাঁকা মাঠ শুরু হয়েছে। সেই প্রাচীন সিংহশোভিত মজবুত তোরণ-দ্বারে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুজনের মধ্যে বড় মেয়েটি তন্বী, গায়ের রং একটু ফ্যাকাশে, দেখতে খুব সুন্দরী, কপালের ওপর কটা চুলের চূড়া বাঁধা, ছোট্ট মুখখানার মধ্যে একটা জেদের ভাব। দেখে মনে হয় বেশ গম্ভীর। আমার দিকে একবার

তাকিয়েও দেখল না। অন্যজন দেখতে একবারে ছেলেমানুষ—সতেরো আঠারোর বেশি বয়স নয়। তারও গায়ের রং ফ্যাকাশে, ছিমছাম চেহারা, কিন্তু মুখটা বেশ বড়-সড়। দেখে মনে হয় একটু লাজুক লাজুক। বড়ো বড়ো অবাক চোখ মেলে সে চেয়েছিল আমার দিকে—চলে যেতে যেতে কানে এল, ইংরিজীতে দু-একটা কী কথা যেন বলছে। মনে হল এই রমণীয় মুখ দুটির সঙ্গে যেন আমার কোন অতীত কালের চেনা। বাড়ি ফিরলাম। মনে হল যেন একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি।

কিছুদিন পরে এক বিকেলে আমি আর বেলকুরভ বাড়িটার কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এমন সময় দীর্ঘ ঘাসের উপর চাকার খস খস শব্দ তুলে একটা হালকা গাড়ি বাঁক ঘুরে উঠোনের মধ্যে ঢুকে গেল। গাড়ির মধ্যে সেই বড়ো মেয়েটি বসেছিল, যাকে আগে দেখেছি।

এক অগ্নি-দুর্ঘটনাগ্রস্তদের সাহায্যের জন্যে চাঁদার একটি তালিকা নিয়ে মেয়েটি আমাদের কাছে এল। আমাদের দিকে না তাকিয়েই গম্ভীরভাবে সে খুঁটিয়ে দুর্ঘটনার সমস্ত বিবরণ দিয়ে যেতে লাগল—সিয়ানোভো গ্রামে আগুন লাগায় কত বাড়ি দগ্ধ হয়েছে, কত নরনারী শিশু গৃহহারা হয়েছে, আর্তত্রাণ কমিটি কী কী সাময়িক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করেছে। সে নিজেও ঐ কমিটির একজন সদস্যা । তালিকাটা সে আমাদের সই করতে দিল। তারপর সেটা গুছিয়ে তখুনি ফিরে যাওয়ার উপক্রম করল।

'পিওতর পেত্রোভিচ, আপনি তো আমাদের ভুলেই গেছেন,' বেলকুরভের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিতে দিতে মেয়েটি বলল, 'একদিন আমাদের ওখানে আসুন না,' তারপর মেয়েটি আমার নাম করে বলল, 'আর মঁসিয়ে 'ন'-ও যদি তাঁর গুণমুগ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করতে আসেন তাহলে আমি আর মা খুবই খুশি হবো।'

আমি ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন জানালাম।

মেয়েটি চলে যেতে পিওতর পেত্রোভিচ্ তার সম্বন্ধে অনেক খবর দিল। বলল, মেয়েটি উঁচু বংশের, নাম লিদিয়া ভল্‌চানিনভা। যে মহালে মেয়েটি তার মা আর বোনের সঙ্গে থাকে সেখান থেকে পুকুরের ওপারে ঐ গ্রাম অবধি সমস্ত অঞ্চলটার নাম শেলকোভ্‌কা। ওর বাবা মস্কো শহরে উঁচু পদের লোক ছিলেন। প্রিভি কাউন্সিলার হয়ে তিনি মারা যান।

বেশ অবস্থাপন্ন হলেও ভলচানিনভরা সারা বছর গ্রামাঞ্চলেই কাটায়। লিদিয়া শেলকোভকা গ্রামে জেমস্তভো-ইস্কুলে পড়ায় আর তার জন্যে মাসিক বেতনও পায় পঁচিশ রুবল। এই টাকাতেই মেয়েটি তার ব্যক্তিগত খরচা চালিয়ে নেয়। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবে এই ওর গর্ব।

'ভারি অদ্ভুত এই পরিবারটি,' বেলকুরভ বলল। 'চলো ওদের সঙ্গে একদিন দেখা করে আসি। ওরা ভারি খুশি হবে।'

সেদিনটা ছিল কোনো এক সন্তের পুণ্যদিবস। দুপুরের খাবার পর মনে হল ভল্‌চানিনভদের কথা। শেলকোভকার দিকে রওনা দিলাম। মা ও মেয়ে দুজনকেই বাড়িতে পাওয়া গেল। মার নাম ইয়েকাতেরিনা পাভলভনা। মহিলা বয়েসকালে নিশ্চয়ই সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু এখন বয়েসের তুলনায় বেশি মোটা, অল্পেই তাঁর হাঁফ ধরে, এবং কিঞ্চিত বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক বলে মনে হয়। আমাকে খুশি করবার জন্যে ভদ্রমহিলা শিল্পকলার প্রসঙ্গ তুললেন। শেলকোভ্‌কাতে ওঁদের সঙ্গে আলাপ করতে আমি আসতে পারি একথা তাঁর মেয়ের কাছ থেকে শোনার পর ভদ্রমহিলার মনে পড়েছিল মস্কোয় ছবির প্রদর্শনীতে আমার দু-তিনখানা ছবি তিনি দেখেছেন। আমায় তিনি প্রশ্ন করলেন ঐ ছবিগুলিতে আমি কী কী ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছি।

লিদিয়া, তাকে বাড়িতে সবাই লিদা বলে ডাকে, আমার চেয়ে বেলকুরভের সঙ্গেই বেশি কথাবার্তা কইছিল। গম্ভীরমুখ করে বেলকুরভকে সে প্রশ্ন করতে লাগল, বেলকুরভ কেন জেমস্তভোতে কাজ করে না? জেমস্তভোর একটা মিটিং-এও তাকে দেখা যায় না কেন?

মেয়েটি মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গীতে তাকে বলল, 'এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না পিওতর পেত্রোভিচ্‌, এর জন্যে আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত।'

'ঠিক লিদা, ঠিকই বলেছ, এটা সত্যি ভালো হচ্ছে না,' মা মেয়েকে সমর্থন জানালেন।

আমার দিকে ফিরে লিদা বলে চলল, 'আমাদের এই সমস্ত জেলাটা বালাগিনের হাতে। তিনি স্থানীয় বোর্ডের চেয়ারম্যান। নিজের জামাই, ভাইপো-ভাগনেদের জেলার বড় বড় চাকরিগুলো দিয়ে যা-ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছেন। এসবে আমাদের বাধা দেওয়া উচিত। আমরা যারা তরুণ, তাদের উচিত একটা শক্তিশালী পার্টি গড়ে তোলা। কিন্তু আমাদের

তরুণরা যে কী ধরনের তা তো এ-ই দেখছেন। এটা খুবই খারাপ, পিওতর পেত্রোভিচ!'

যতক্ষণ জেমস্তভো নিয়ে কথাবার্তা চলছিল, ছোট বোন জেনিয়া ততক্ষণ কোনো কথা বলেনি। গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা চললে সে যোগ দেয় না, কেননা, কেউ তাকে বয়স্কা মনে করে না। বাড়িতে সবাই তাকে এখনো আদর করে মিসি বলে ডাকে। ছোটবেলায় তার গবর্নেসকে সে ঐ নামে ডাকতো বলে মিসি নামটাই তারও চল্ হয়ে গেছে। আমি ওদের পারিবারিক ছবির এলবামটার পাতা উল্টে দেখছিলাম, মিসি কৌতূহলী চোখে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে ছবিগুলোর ইতিহাস বলে যাচ্ছিল। এক একটা ছবিতে আঙুল দিয়ে দিয়ে সে বলে যাচ্ছিল — 'এই আমার কাকা, এই আমার ধর্মকাকা,' ইত্যাদি। ছবি দেখাতে গিয়ে তার কাঁধটা এসে আমার কাঁধে ঠেকছিল এবং ওর অনতিপুষ্ট শিশুর মতো দুটি স্তন, হালকা কাঁধ, শোভন দুটি বেণী, কোমরে দৃঢ়-বন্ধনী দিয়ে টেনে বাঁধা তার সম্পূর্ণ তন্বী দেহলতা — সব কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।

দুজনে মিলে আমরা ক্রকেট আর টেনিস খেললাম, বাগানে ঘুরলাম, চা খেলাম, তারপর রাত্রির খাওয়ার টেবিলে অনেকক্ষণ বসে রইলাম একসঙ্গে।

বেলকুরভের মস্ত মস্ত থামওয়ালা ফাঁকা নাচঘরের চেয়ে এই আরামপ্রদ ছোট্ট বাড়িটায় অনেক স্বস্তি পাচ্ছিলাম। এখানকার দেয়ালে বিরাট বিরাট তৈলচিত্র টাঙানো নেই। এরা চাকর বাকরদের 'তুই' না বলে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করে। লিদা আর মিসি দুজনে মিলে এখানকার আবহাওয়াটাকে অনাবিল ও প্রাণময় করে রেখেছিল, সবকিছুই যেন নিটোল হয়ে উঠেছে। রাত্রিতে খাওয়ার সময় বেলকুরভের সঙ্গে লিদা আবার জেমস্তভো, বালাগিন আর ইস্কুলের লাইব্রেরী নিয়ে আলোচনা শুরু করল। ওর মধ্যে বেশ একটা সততা, প্রাণময়তা আর দৃঢ়বিশ্বাসের ভাব আছে। উচ্চকণ্ঠে বেশি কথা বলা তার স্বভাব সত্ত্বেও বাক্যালাপে সে বেশ পটু, ক্লাশে পড়াতে পড়াতে বোধহয় ঐরকম অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। অন্যপক্ষে, বন্ধুবর পিওতর পেত্রোভিচের সমস্ত বাক্যালাপকেই তর্কে পরিণত করার ছাত্রকালীন অভ্যাস যায়নি। সে-ও একটানা বিরক্তিকর দীর্ঘ তর্ক চালিয়ে যেতে লাগল। সে-ও যে বুদ্ধিমান, তার চিন্তাধারাও যে প্রগতিশীল সবিস্তারে এইটে বুঝিয়ে

দিতে চেষ্টা করল। হাত-পা নেড়ে কথা বলতে গিয়ে তার জামার আস্তিনে লেগে সসের বাটি উল্টে টেবিলক্লথের ওপর পড়ে থৈ থৈ করতে লাগল, কিন্তু মনে হল, আমি ছাড়া কেউ তা লক্ষ্যও করেনি।

যখন দুজনে বাড়ির দিকে ফিরলাম তখন চারদিক অন্ধকার। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বেলকুরভ বলল, 'কি জানো, সুরুচির পরিচয় এই নয় যে টেবিলের ওপর সসের বাটিটা উল্টে ফেলা চলবে না। বরং কেউ তা উল্টে ফেললে সেটা লক্ষ্য না করার মধ্যেই আসল সুরুচির পরিচয়। সত্যি, ভারি আনন্দময় শিক্ষিত এই পরিবারটি। ভালো ভালো লোকজনের সঙ্গে মেশা আমার কতোকাল বন্ধ হয়ে গেছে, আমি অনেক নেমে গেছি। জীবনে কতো কী করবার আছে, কিন্তু সময় নেই!'

আদর্শ ভূস্বামী হতে হলে কী কী করা উচিত সে তা বলে যেতে লাগল। আর আমি ভাবতে লাগলাম আচ্ছা আলসে আর অবাধ্য লোক যা হোক। কোনো গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সে কথার মধ্যে অস্বস্তিকর ভাবে ঘন ঘন 'মানে' 'ইয়ে' যোগ করে। কাজকর্মের ধরনও তার একই রকম, সবসময় সে পিছিয়ে পড়ে, কোনকিছু ঠিকসময় শেষ হয় না। তাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে এ বিশ্বাস আমার একেবারেই ছিল না। কেননা, চিঠি ডাকে ফেলতে দিয়ে দেখেছি সপ্তাহের পর সপ্তাহ সেটা তার পকেটেই রয়ে গেছে।

পাশাপাশি যেতে যেতে সে বিড়বিড় করে বলল, 'আর সবচেয়ে বিশ্রী কি জানো? তুমি কাজ করে করে মর, তবু কারো কাছ থেকে একটু সহানুভূতি পাবে না, কোনোরকম সহানুভূতি কখনো পাবে না!'

২

ভলচানিনভদের বাড়ি যাওয়া আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। বারান্দায় উঠবার সিঁড়ির সবচেয়ে নীচু ধাপটায় আমার বসার জায়গা। মর্মপীড়া আমায় গ্রাস করছে। এত তুচ্ছভাবে এত দ্রুত জীবনটার অপব্যয় হচ্ছে ভেবে অনুশোচনা হয়। ক্রমাগত মনে মনে বলতাম যদি হৃৎপিণ্ডটাকে ছিঁড়ে ফেলতে পারি তো মন্দ হয় না, সেটার ভার অসহ্য হয়ে গেছে। বারান্দা থেকে খালি ভেসে

আসতো স্কার্টের খস্‌খস্‌ আওয়াজ, বইয়ের পাতা ওল্টানোর শব্দ আর টুকরো টুকরো বাক্যালাপ। কিছুদিনের মধ্যেই জানতে পারলাম যে লিদা রুগী দেখে, সকলকে বইপত্তর ধার দেয়, সকালের দিকে প্রায়ই মাথায় প্যারাসোল দিয়ে গ্রামে যায়। আর সারা সন্ধ্যা উচ্চকণ্ঠে জেমস্তভো ও ইস্কুল সম্বন্ধে আলোচনা করে। সে সুন্দরী তন্বী এবং কড়া ধরনের। তার ঠোঁট দুটি সুশ্রী, ছোট্ট। কাজের কথা আলোচনা সুরু করার আগেই আমার দিকে তাকিয়ে নিরুত্তাপ কণ্ঠে ভূমিকা করে নিত:

'আপনার এসব কথা শুনতে ভালো লাগবে না।'

আমাকে সে অপছন্দ করত। কেননা, আমি শুধুই ল্যান্ডস্কেপ আঁকতাম, জনসাধারণের অভাব অভিযোগ আমার ছবিতে ফুটিয়ে তুলতাম না। তাছাড়া তার মনে হয়েছিল যে যেটা সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে তাতে আমি সম্পূর্ণ উদাসীন।

মনে পড়ছে, বৈকাল হ্রদের তীরে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেড়াতে একদা সার্ট আর নীল ট্রাউজার পরা ঘোড়ায়-চড়া একটি বুরিয়াত মেয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। মেয়েটির কাছ থেকে তার হুঁকোটি আমি কিনতে চেয়েছিলুম। সে আমার মাথার টুপি ও ইউরোপীয় চেহারার প্রতি ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে একমিনিটও সময় অপব্যয় না করে সজোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিল। লিদাও তেমনি আমার মধ্যে অনাত্মীয় কিছু অনুভব করেছিল। বাইরে তার অপছন্দের কোনো আভাস না পেলেও অন্তরে অন্তরে আমি তা অনুভব করতে পারতাম। সুতরাং বারান্দার সিঁড়ির সবচেয়ে নীচু ধাপে বসে মনে মনে জ্বলতাম আর বলতাম যে নিজে ডাক্তার না হয়ে কৃষকদের চিকিৎসা করা মানে আসলে তাদের ঠকানো, হাজার হাজার বিঘা জমি থাকলে দাতা হওয়া সহজ।

কিন্তু তার বোন্‌ মিসির কোনো দুর্ভাবনা ছিল না। আমারই মতো সে সম্পূর্ণ আলস্যে দিন কাটাত। ভোরে ঘুম ভাঙার পরেই বারান্দায় একটা আর্মচেয়ারে বসে সে পড়া শুরু করে দিত। আর্মচেয়ারটি ওর তুলনায় এত বড়ো যে মেঝেতে তার পা পেঁছিত না। কিম্বা বই নিয়ে চলে যেত একা একা লাইম গাছের বীথির আড়ালে, নয়ত ফটক পেরিয়ে চলে যেত মাঠে। তার পড়া চলত সারাদিন ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, গভীর আগ্রহ নিয়ে। মাঝে মাঝে কেবল

তার ক্লান্ত উদাস দৃষ্টিতে কিম্বা মুখের অত্যন্ত পাণ্ডুরাভায় ধরা পড়ত যে এতে তার মনের ওপর চাপ পড়ছে।

আমি গেলে, আমায় দেখতে পাওয়ামাত্র সে একটু লাল হয়ে উঠত। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ত বইপত্তর ফেলে। তারপর ডাগর চোখ দুটো আমার মুখের ওপর রেখে বলতে শুরু করে দিত আমার আসার আগে ইতিমধ্যে কী কী ঘটনা ঘটেছে। চাকরবাকরদের মহলে চিমনিতে কী করে আগুন লেগেছিল, একটা লোক পুকুর থেকে কতো বড়ো একটা মাছ তুলেছে, এমনি যত খবর।

রবিবার ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য দিন সে পরতো রঙীন জামা আর গাঢ় নীল রঙের স্কার্ট। ওতে আমাতে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতাম, জ্যাম তৈরীর জন্যে কখনো কুড়িয়ে বেড়াতাম চেরী ফল, নৌকা বাইতাম দুজনে আর উঁচু ডাল থেকে চেরী ফল ছেঁড়বার জন্যে যখন সে লাফ দিত কিম্বা দাঁড় টানবার জন্যে দাঁড়ের ওপর ঝুঁকে আসত তখন তার চওড়া আস্তিনের মধ্যে দিয়ে আমার চোখে পড়ত দুর্বল দুটি সুঠাম বাহু। কখনো কখনো হয়ত আমি স্কেচ করতাম আর সে পাশে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকত সপ্রশংস দৃষ্টিতে।

জুলাই মাসের শেষে এক রবিবারে, সকাল নটা নাগাদ ভলচানিনভদের বাড়িতে পেঁছিলাম। বাড়িটাকে যথাসম্ভব দূরে রেখে পার্কের চারপাশে ব্যাঙের ছাতার খোঁজে ঘুরতে লাগলাম। সেবারকার গ্রীষ্মে ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছিল অঢেল। জায়গাগুলোকে ছড়ি দিয়ে চিহ্নিত করে রাখছিলাম, যাতে পরে আমি আর জেনিয়া দুজনে মিলে ওগুলো কুড়োতে পারি। উষ্ণ বাতাস বইছে, দেখতে পেলাম জেনিয়া আর তার মা রবিবারের হালকা রঙের পোশাকে গির্জা থেকে ফিরছে। বাতাসে পাছে উড়ে যায় ভেবে জেনিয়া একহাত দিয়ে তার টুপিটা চেপে রেখেছে। কিছুক্ষণ পরে শব্দ শোনা গেল। বুঝলাম ওরা বারান্দায় চা খেতে বসেছে।

আমার মতো যারা নির্ভাবনার লোক, যারা আলসেমি করে দিন কাটাবার ছুতো খোঁজে, তাদের কাছে গ্রামাঞ্চলের এই রবিবারগুলোর একটা বিশেষ মোহ আছে। শিশির-ভেজা সবুজ একটা বাগান যখন রোদ্দুরে ঝলমল করে, অলিয়েণ্ডার আর মিগনোনেট বাড়ির ফুল-বাগানে গন্ধ ছড়ায়, আর গির্জা থেকে ফিরে এসে তরুণেরা চা খেতে বসে বাগানে। সকলেই ভারি হাসিখুশি,

সকলেই সাজগোজে শোভন। যখন মনে হত এই স্বাস্থ্যবান, সুন্দর লোকগুলোকে সারাদিন আর খাটতে হবে না, তখন কামনা করতাম জীবন যেন এমনি করেই কেটে যায়। সেদিনকার সেই সকালবেলাতেও বাগানে বেড়াতে বেড়াতে এই কথাই মনে হচ্ছিল। সমস্ত দিন, সমস্ত গ্রীষ্মকাল কিছু না করে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে প্রস্তুত ছিলাম।

হাতে একটা টুকরি নিয়ে জেনিয়া এসে দাঁড়াল। তার ভাব দেখে মনে হল, যেন তার জানাই ছিল, অন্তত সে টের পেয়েছিল আমাকে বাগানেই পাওয়া যাবে। ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে কুড়োতে আমরা গল্প করতে লাগলাম। আমায় কোনো কিছু জিগ্যেস করতে হলে সে সামনের দিকে এগিয়ে আসছিল, যাতে আমার মুখ দেখতে পায়।

ও বললে, 'জানেন, কাল গ্রামে একটা অবাক কাণ্ড হয়েছে। খোঁড়া পেলাগেয়া এক বছর ধরে অসুখে ভুগছিল, ডাক্তারে কি ওষুধে কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না, কিন্তু একটা বুড়ী ওঝা ঝাড়ফুঁক করে তার অসুখ একেবারে সারিয়ে দিয়েছে।' আমি বললাম, 'ওসব বাজে। শুধু অসুস্থ বা বুড়ীদের কাছে অলৌকিক ঘটনার সন্ধান করা উচিত নয়। মানুষের স্বাস্থ্যটাই এক অলৌকিক ব্যাপার। মানুষের জীবনটাও। বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝাতে পারি না, তার সবটাই তো অলৌকিক।'

'যা বোঝা যায় না, তা দেখে আপনার ভয় করে না?'

'না। যেসব অসাধারণ ব্যাপার আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে, সেখানে সাহস করে এগিয়ে যাই, তার কাছে হার মানি না। আমি তার চেয়ে বড়ো। মানুষের মনে এই ভাব থাকা উচিত। বাঘ সিংহ, নক্ষত্র সমস্ত প্রকৃতির ঊর্ধ্বে তার স্থান। যে-সব অলৌকিক বিষয় আমাদের কাছে দুর্বোধ্য তাদের চেয়ে মানুষ যদি নিজেকে শ্রেষ্ঠ না ভাবে তাহলে সে মানুষই নয়, সে একটা ইঁদুর, সব কিছুতেই তার ভয়।'

জেনিয়া ভাবল, শিল্পী বলে অনেক কিছুই আমি জানি। যে সব ব্যাপার বুদ্ধির অগম্য, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আমি সে সমস্তও জানতে পারি। যে উচ্চলোকের আমি অধিবাসী, সে চাইত তেমনি কোনো একটা উঁচু অনন্ত, সুন্দর জগতে আমি তাকে নিয়ে যাই। সে তাই ঈশ্বরের কথা তুলত, কথা তুলত শাশ্বত জীবনের, নানারকম অলৌকিক বিষয়ের।

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমি আর আমার ধ্যান-ধারণা সব নিঃশেষে মুছে যাবে একথা ভাবতে আমার মন চাইত না। তাই জবাব দিতাম, 'ঠিক বলেছ, মানুষ অবিনশ্বর, আমাদের সামনে রয়েছে অবিনশ্বর জীবন।' সে শুনে যেত। কোনো প্রমাণ দাবী না করেই আমার সব কথা বিশ্বাস করে বসত। বাড়ির দিকে যখন ফিরছিলাম তখন জেনিয়া হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলল, 'আচ্ছা, লিদা আশ্চর্য মেয়ে, নয়? আমি ওকে খুব ভালোবাসি, এক মুহূর্তেই ওর জন্য জীবন দিতে পারি। কিন্তু কেন?' জেনিয়া আমার কোটের আস্তিনে হাত রেখে বলল, 'কেন সব সময় ওর সঙ্গে তর্কাতর্কি করেন? আপনি এত চটে যান কেন?'

'কারণ সে ভুল কথা বলে।'

জেনিয়া সে কথা মানতে না চেয়ে মাথা ঝাঁকালো, আর তার দুটি চোখ ছলছল করে উঠল। বলল, 'কাউকে বোঝা কতো কঠিন।'

লিদা তখন কোথা থেকে যেন ফিরে এসে ঘোড়ার চাবুক হাতে ঢাকা বারান্দায় দাঁড়িয়ে মজুর খাটাচ্ছিল; তার সুঠাম সুন্দর দেহ রোদে ঝলমল করছে। সে চটপট দু-তিনজন রুগী দেখল, চিৎকার করে কথা কইল ওদের সঙ্গে, তারপর ভীষণ ব্যস্তসমস্ত ভাবে এঘর ওঘর করে এক একটা দেরাজ খুলে দেখল, আবার উপরে উঠে গেল। দুপুরের খাবারের জন্য তাকে ডেকে আনার সময় বহুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতে হল। যখন সে এসে পৌঁছল তার আগেই আমাদের সুপ খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। কেন জানি না এসব তুচ্ছ ঘটনাও আমি সস্নেহে মনে রেখেছি, এই দিনটাতে বিশেষ কিছু না ঘটলেও তার স্মৃতি আমার মনে সবচেয়ে জীবন্ত হয়ে আছে।

দুপুরের খাবারের পর জেনিয়া একটা আর্মচেয়ারে গা ঢেলে পড়তে লাগল, আমি বসে রইলাম সেই সিঁড়ির সবচেয়ে নীচু ধাপটিতে। কেউ কোনো কথা বলছে না। আকাশ মেঘে ঢাকা। ঝির ঝির করে পাতলা বৃষ্টি নেমেছে। চারিদিকটা বেশ গরম, বাতাস অনেকক্ষণ থেমে গেছে। মনে হচ্ছে যেন দিনটা অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে। ইয়েকাতেরিনা পাভলভনা হাতে একটা পাখা নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখদুটো তখনো ঘুমে ভারী।

জেনিয়া তাঁর হাতে চুম্বন করে বলল, 'ছিঃ মা, দিনে ঘুমুনো তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব খারাপ।'

তারা পরস্পরকে খুব ভালোবাসতো। দুজনের একজন যখন বাগানের

মধ্যে চলে যেত তখন আর একজন গাছের ডালপালার মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে ডাক দিত, 'কুউ-উ-উ, জেনিয়া!' কিম্বা অন্যজন 'মা-আ-আ! কোথায় তুমি?'

ওরা একই সঙ্গে প্রার্থনা করত। ভক্তিও ছিল ওদের একই মাত্রার। দুজনের মধ্যে না বোঝার কিছুই থাকেনি কখনো, এমনকি যখন কথা বলত না, তখনো।

অপরের সম্বন্ধে ওদের মতামতেরও মিল ছিল খুব। অল্পদিনের মধ্যেই ইয়েকাতেরিনা পাভলভনার আমি এত প্রিয়পাত্র হয়ে পড়লাম যে দু একদিন না এলেই, আমার শরীর ভালো আছে কি না জানতে তিনি লোক পাঠাতেন। তিনি সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার স্কেচগুলো দেখতেন, আর মিসির মতন সরল অকপটে আমায় সমস্ত খবর জানাতেন। এমনকি সংসারের গোপন কথাটিও আমার প্রায়ই অজানা থাকত না।

বড়ো মেয়ের সম্বন্ধে তাঁর একটা ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রম ছিল। লিদার মধ্যে আদরের কোনো অবকাশ ছিল না। গুরুতর বিষয় নিয়েই তার যত আলোচনা। তার নিজের জীবনযাত্রা ছিল স্বতন্ত্র ধরনের। মা ও বোনের কাছে সে একটা দুর্বোধ্য পবিত্র কিছুর মতো হয়ে উঠেছিল — জাহাজের নাবিকদের কাছে যেমন কেবিনের মধ্যেকার এ্যাডমিরাল রহস্যময় হয়ে ওঠে। তার মা প্রায়ই বলতেন, 'লিদা বেশ মেয়ে, না?'

সেদিনও সেই শান্ত বর্ষণ-বেলাতেও আমরা লিদার কথাই আলোচনা করছিলাম।

মা বলছিলেন, 'লিদা চমৎকার মেয়ে,' তারপর গলা নামিয়ে গোপন মন্ত্রণার সুরে ইতস্তত তাকিয়ে বলতে লাগলেন, 'ওর মতো খুব কম মেয়েই দেখা যায়। কিন্তু জানেন, ওর হাবভাব দেখে আমার কেমন যেন ভয় লাগে। ইস্কুল, ডাক্তারখানা, বইপত্তর — এ সব খুবই ভালো, কিন্তু এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি করা কেন? বয়েস তো চব্বিশ হল, এবার ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবা উচিত। বইপত্তর, ডাক্তারখানা এসব মানুষকে এমন মাতিয়ে রাখে, জীবন যে বয়ে যাচ্ছে এ হুঁশ থাকে না... এইবার ওর বিয়ে করা উচিত।'

পড়তে পড়তে জেনিয়ার মুখে-চোখে একটা ক্লান্তির ভাব ফুটেছিল, চুলগুলো হয়েছিল এলোমেলো। মাথা তুলে সে মার দিকে চাইল, কিন্তু বলল যেন নিজের মনেই, 'আমাদের ভাগ্য তো ভগবানের হাতে, মা!'

আবার সে ডুবে গেল বইয়ের মধ্যে।

এমব্রয়ডারী-করা সার্টের ওপর কৃষক-কোর্তা পরে বেলকুরভও হাজির হল। আমরা টেনিস খেললাম, ক্রকেট খেললাম। রাত্রি হলে নৈশ ভোজের টেবিল ঘিরে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। লিদা তার স্কুল আর সমস্ত জেলাটাকে যে আয়ত্ত করে ফেলেছে সেই বালাগিনের বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে গেল।

ভলচানিনভদের কাছ থেকে সেদিন চলে আসবার সময় মনে হল একটা দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ অলস মন্থর দিন গেল কেটে। ভাবতে খারাপ লাগল যে যত দীর্ঘস্থায়ীই হোক এ-পৃথিবীর সবকিছুতেই একদিন ছেদ নেমে আসে। জেনিয়া আমাদের গেট অবধি পেঁছে দিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা তার সঙ্গে কাটানোর জন্যেই হয়ত মনে হল তাকে ছাড়া আমার বড় নিঃসঙ্গ লাগবে। টের পেলাম এই পরিবারটি আমার কত প্রিয় হয়ে উঠেছে। আর সেদিনই, সারা গ্রীষ্মে এই প্রথম আমার মনে জাগলো একটি ছবি আঁকি।

একসঙ্গে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেলকুরভকে বললাম, 'আমার জীবনটা না হয় নিস্তব্ধ একঘেয়ে ক্লান্তিকর হতেই পারে, কেননা আমি চিত্রশিল্পী, খেয়ালী; যৌবন থেকেই আমার নিজের কাজ সম্বন্ধে একটা অবিশ্বাস, ঈর্ষা আর মর্মপীড়া আমাকে ছিঁড়ে খেয়েছে। কিন্তু তুমি, তুমি এমন একঘেয়ে ক্লান্তিকর জীবন কাটাচ্ছো কেন বলো তো? আমি একটা ভবঘুরে, চিরটাকাল আমার গরিব হয়ে কাটবে, কিন্তু তুমি স্বাস্থ্যবান, ভদ্র, জমিদার মানুষ, তোমার জীবনটা কেন এমন নিরানন্দ? জীবনের কাছ থেকে তোমার পাওনা কেন এত অল্প? যেমন ধরো, জেনিয়া বা লিদার প্রেমে পড়তে তোমার বাধা কিসের?'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আর একটি মহিলাকে আমি ভালবাসি,' বেলকুরভ উত্তর দিল।

আমি জানতাম লিউবভ্ ইভানভনার কথা ও বলতে চাইছে। মহিলাটির সঙ্গে সে বাগানের লাগোয়া বাড়ির অংশটায় বাস করে। এই স্থূলাঙ্গী, গালফুলো, জাঁকালো মহিলাটিকে আমি রোজই দেখি। রুশ জাতীয় পোষাক আর পুঁতির পাথরের মালা গলায় পরে বাগানে বেড়িয়ে বেড়ান, প্রায় একটি মাইকেল মাসের হাঁসের মতো। মাথা তাঁর ছাতায় ঢাকা থাকে প্রায় সবসময় আর প্রায় সবসময়ই চাকরবাকরেরা তাঁকে হয় কিছু খাবার জন্যে নয় চা

পানের জন্যে ডাকাডাকি করে। বছর তিনেক আগে বেলকুরভের কাছ থেকে তিনি বাগানের লাগোয়া ঐ অংশটা গ্রীষ্মাবাস হিসেবে ভাড়া নিয়ে ছিলেন, তারপর এখন বেলকুরভের সঙ্গে সারাজীবন ওখানেই কাটাবেন বলে মনে হচ্ছে। বয়েসে তিনি বেলকুরভের চেয়ে বছর দশেকের বড়। তাকে এমন হাতের মুঠোয় করে রেখেছেন যে কোথাও যেতে হলে বেলকুরভকে তাঁর অনুমতি নিয়ে যেতে হয়। ভাঙ্গা ভাঙ্গা পুরুষালি গলায় প্রায়ই তাঁকে কান্নাকাটি করতে শোনা যায়, তখন আমাকে বাধ্য হয়ে বলে পাঠাতে হয় যে তিনি চুপ না করলে আমি ঘর ছেড়ে চলে যাব। তাতে তিনি চুপ করেন।

বাড়ি ফিরে বেলকুরভ আমার ঘরে সোফায় বসে ভ্রূ কুঁচকে কী ভাবতে শুরু করল আর আমি একটা মৃদু উত্তেজনা নিয়ে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগলাম, যেন প্রেমে পড়েছি। আমার খুব ইচ্ছে করছিল ভলচানিনভদের প্রসঙ্গ আলোচনা করি।

বললাম, 'এমন যদি কেউ থাকে যে জেমস্তভোর সভ্য এবং লিদার মতোই হাসপাতাল আর ইস্কুলে আগ্রহ, তবে শুধু তাকেই লিদা ভালোবাসতে পারে। কিন্তু ও রকম একটি মেয়ের জন্যে যে-কোনো পুরুষের উচিত, প্রয়োজন হলে লোহার বুট পর্যন্ত পায়ে দিয়ে বেড়ানো — রূপকথার সেই প্রেমিকের মতো, জেমস্তভোর সভ্য হওয়া তো তুচ্ছ কথা। আর মিসি? কী অপূর্ব ওই মেয়েটি, মিসি!'

অসংখ্য 'ইয়ে' যোগ করে বর্তমান যুগের নৈরাশ্য-ব্যাধির ওপর দীর্ঘ মন্তব্য শুরু করল বেলকুরভ। কথা কইছিল সে বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে এবং এমন একটা সুরে, মনে হতে পারতো তার সঙ্গে যেন আমার তর্কাতর্কি চলেছে।

আপনারই ঘরে বসে একটি লোক যদি বকেই যেতে থাকে, বকেই চলে, থামবার নামও না করে তাহলে সীমাহীন, একঘেয়ে, সূর্যদগ্ধ স্তেপও তার চেয়ে নিরানন্দ নয়।

বিরক্ত হয়ে বলেই ফেললাম, 'ব্যাপারটা আশাবাদ কি নৈরাশ্যবাদের নয়, আসলে শতকরা নিরানব্বুইজনেরই মস্তিষ্ক বলে কোনো পদার্থ নেই ।'

বেলকুরভ এটাকে ব্যক্তিগত খোঁচা হিসেবে নিয়ে আহতভাবে উঠে চলে গেল।

৩

'জানো মা, প্রিন্স এখন মালজেমভোতে আছেন, তোমায় অভিবাদন জানিয়েছেন,' সবেমাত্র বাইরে থেকে ফিরে লিদা তার হাতের দস্তানাদুটো খুলতে খুলতে মাকে বলল।

'অনেক চিত্তাকর্ষক খবর শোনাচ্ছিলেন... মালজেমভোতে যে হাসপাতালটা খোলা হয়েছে, তার কথা প্রদেশের আগামী মিটিং-এ তুলবেন বলে কথা দিয়েছেন। উনি অবিশ্যি বলেই রেখেছেন যে বিশেষ ভরসা নেই।' তারপর আমার দিকে ফিরে লিদা বলল, 'মাপ করবেন এসব বিষয়ে আপনার যে উৎসাহ নেই সে কথাটা আমার মনে থাকে না।'

ভিতরে ভিতরে আমি জ্বলছিলাম।

কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'কেন নেই? আপনি হয়ত আমার মতামতের অপেক্ষা রাখেন না, কিন্তু এ ব্যাপারে আমার যথেষ্ট উৎসাহ আছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, আছে। আমার মতে মালজেমভোতে কোনো হাসপাতালের প্রয়োজন নেই।'

আমার বিরক্তি চাপা ছিল না। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে লিদা জিজ্ঞেস করল:

'তাহলে কিসের প্রয়োজন আছে? ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকার?'

'না, ল্যাণ্ডস্কেপেরও প্রয়োজন নেই, কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই।'

হাতের দস্তানা খুলে সে সদ্য ডাকে-আসা খবরের কাগজখানা খুলছিল। স্পষ্টতই নিজের মনোভাব দমন করার জন্য সে চেষ্টা করছে। মিনিটখানেক পরে শান্তস্বরে বলল:

'গত সপ্তাহে আন্না প্রসব হতে গিয়ে মারা গেছে। কাছাকাছি একটা ডাক্তারখানা থাকলে সে আজো বেঁচেই থাকত। আমি কিছুতেই না ভেবে পারি না যে এমন কি ল্যাণ্ডস্কেপ-আঁকিয়েদেরও এ-বিষয়ে কিছু মাথা ঘামানো উচিত।'

উত্তর দিলাম, 'আমি আপনাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি এবিষয়ে আমার অত্যন্ত দৃঢ় মতামতই আছে,' কিন্তু লিদা খবরের কাগজের আড়ালে আত্মগোপন করল, যেন আমার কথায় সে কান দিতেই চায় না। 'আমার মতে বর্তমানে যা অবস্থা তাতে হাসপাতাল, ইস্কুল, লাইব্রেরী, ডাক্তারখানা, সবকিছু দিয়ে দাসত্বকেই জোরদার করা হয়। লোকে ভারী শেকলে বাঁধা, সে শেকল ছিঁড়ে ফেলার বদলে আপনারা শুধু নতুন নতুন বেড়ি লাগাতেই ব্যস্ত, এই আমার দৃঢ় মত।'

আমার দিকে চেয়ে লিদা অবজ্ঞার হাসি হাসলো, কিন্তু না থেমে আমার মূলকথাটা বলবার চেষ্টা করলাম, 'আন্না প্রসব হতে গিয়ে মারা গেছে এইটে বড়ো কথা নয়। প্রধান কথা ঐ আন্না, মাভ্‌রা, পেলাগেয়াকে উদয়াস্ত খেটেই যেতে হচ্ছে, সেই প্রচণ্ড খাটুনির ফলেই তারা রোগে পড়ছে, ক্ষুধিত রুগ্ন ছেলেমেয়েদের জন্যে সারাজীবন ধরে ভোগ করছে দুশ্চিন্তা, রোগের ভয়ে, মরণের ভয়ে সারাজীবন ঝিমিয়ে চলেছে, তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, তারপর দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে তাদের মরতে হচ্ছে। তাদের ছেলেপিলেরাও বড় হওয়ামাত্র মায়ের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটছে এইভাবে। লক্ষ লক্ষ লোক শুধু একটুকরো রুটির জন্যে, ভয়ে ভয়ে কোনো রকমে দিন গুজরান করার জন্যে বেঁচে থাকছে পশুর চেয়েও অধমভাবে। আর এই অবস্থার সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার, নিজেদের আত্মার কথা ভাববার কিম্বা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হিসেবে নিজেদের অনুভব করার সময়ও তারা কখনো পায় না। যা কিছু মানুষকে পশুর থেকে আলাদা করে এবং এই জীবনকে অর্থময় করে তোলে — সেই আত্মিক সক্রিয়তার সব পথ রুদ্ধ করে তুষার-ঝঞ্ঝার মতো এসে ঝাপট মারছে ক্ষিদে, শীতার্ত আবহাওয়া, পাশবিক আতঙ্ক আর অবিচ্ছিন্ন মেহনত। আপনারা চাইছেন হাসপাতাল কি ইস্কুল করে ওদের সাহায্য করতে — এতে ওদের বন্ধন ঘোচে না, বরং এতে ওদের দাসত্ব আরো বেড়ে যায়। কেননা, ওদের জীবনে নতুন নতুন কুসংস্কার জুটিয়ে ওদের অভাববোধটাকেই আপনারা বাড়িয়ে তুলছেন। জোঁক আর তাদের বইপত্তরের জন্যে জেমস্তভোকে যে টাকা দিতে হয় এবং তার জন্য তাদের আরো বেশি করে পরিশ্রম করতে হয় — সেকথা না হয় নাই তুললাম।'

খবরের কাগজটা নামিয়ে লিদা বলল, 'আপনার সঙ্গে তর্ক করব না।

এসব কথা আমার অনেক শোনা আছে। শুধু একটা কথা বলব, কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকাটাও কর্তব্য নয়। সত্যিই হয়ত আমরা মানুষকে বাঁচাতে পারছি না, হয়ত অনেক ভুলও করছি। কিন্তু যা পারি তাই করছি আর তাই করাই উচিত। যিনি শিক্ষিত তাঁর সবচেয়ে মহৎ ও পবিত্র কর্তব্য হল নিজের প্রতিবেশীর সেবা করা। আমাদের যথাসাধ্য তা করবার চেষ্টা করি। আপনার হয়ত আমাদের কাজ পছন্দ না হতে পারে, কিন্তু যতোই করি না সকলকে তো আর কেউ সন্তুষ্ট করতে পারে না।'

'ঠিক লিদা, ঠিকই বলেছ,' মা মেয়েকে সমর্থন করলেন।

লিদার সামনে তিনি সর্বদা কাঁচুমাচু হয়ে থাকেন, কথা কইবার সময় পাছে বোকার মতো বেঠিক কিছু বলে ফেলেন এই ভয়ে বার বার তার দিকে তাকান, লিদা যা বলে কখনো তা খণ্ডন না করে সর্বদাই মেয়ের সঙ্গে একমত হয়ে সমর্থন জানান: 'ঠিক লিদা, ঠিক।'

বললাম, 'আপনার ঘরের ঐ জানালার আলোটুকু দিয়ে যেমন বাগানের অন্ধকার দূর করা যায় না তেমনি চাষীদের অক্ষর-জ্ঞান দিয়ে কতকগুলো হতচ্ছাড়া নীতি-উপদেশ ও চালু আপ্তবাক্যের বই আর হাসপাতাল দিয়ে ওদের অজ্ঞানতা কিংবা ওদের মৃত্যুর হার দূর করাও অসম্ভব। আপনারা ওদের কিছুই দেন না, ওদের জীবনযাত্রার মধ্যে গিয়ে পড়ে শুধু শুধু কতকগুলো নতুন অভাববোধ জাগিয়ে তোলেন, আর ওদের যাতে আরো খাটতে হয় তার নতুন তাগিদ সৃষ্টি করেন।'

'আচ্ছা মুস্কিল, কিছু তো একটা করতেই হবে!' লিদা বলল চটে গিয়ে। তার কথার সুর শুনে বোঝা গেল আমার যুক্তিগুলোকে সে নিতান্ত তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান করছে।

বললাম, 'কঠোর কায়িক শ্রম থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে হবেই। ওদের বোঝা হালকা করে দিতে হবে, যাতে তারা হাঁফ ফেলবার অবকাশ পায়, যাতে ওদের সমস্ত জীবনটা কেবল চুল্লীর সামনে, ধোবীখানায় কিম্বা মাঠে খাটতে খাটতে না কেটে যায়, যাতে তারা নিজেদের আত্মার কথা, ঈশ্বরের কথা চিন্তা করারও অবসর পায়, এবং তাদের আধ্যাত্মিক শক্তিকে বিকাশ করার সুবিধে পায়। প্রত্যেক লোকেরই একটা আধ্যাত্মিক বৃত্তি আছে—সত্যের জন্য এবং জীবনের গূঢ় অর্থের জন্য অবিশ্রাম সন্ধান। ওদের স্থূল কায়িক শ্রম থেকে

অব্যাহতি দিন, ওদের অনুভব করতে দিন মুক্তির স্বাদ, তখন দেখবেন এইসব বইপত্তর কিম্বা ডাক্তারখানা সত্যি সত্যি কীরকম প্রহসনের মতো লাগে। মানুষ যখন অনুভব করবে তার সত্যিকার ব্রত কী, তখন তার তৃপ্তি হতে পারে একমাত্র ধর্ম, বিজ্ঞান আর শিল্পে, এসব বাজে জিনিসে নয়।'

'ওদের শ্রম থেকে মুক্তি দেওয়া! সেটা সম্ভব নাকি!' লিদা বিদ্রূপ করে বলে উঠলো।

'হ্যাঁ, ওদের কাজের ভার আপনারা নিজেরা কিছু কিছু নিন। মানব সমাজের একাংশ তাদের কায়িক প্রয়োজন মেটাবার জন্য যে পরিমাণ মেহনত করছে সেই শ্রম যদি আমরা, গ্রাম আর শহরের সমস্ত বাসিন্দারাই, সবাই মিলে ভাগ করে নিই তাহলে দিনে দু-তিন ঘণ্টার বেশী খাটতেও হয় না। ভেবে দেখুন, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে আমরা সবাই যদি দিনে ঘণ্টাতিনেক খেটে বাকি সময়টা হাতে পাই তাহলে কেমন হয়? ভেবে দেখুন, শরীরের ওপর আরও কম নির্ভর করার জন্যে আরও মেহনত কমাবার জন্যে যদি আমরা যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করে নিই এবং আমাদের প্রয়োজন যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করে আনি তাহলে কেমন হয়! এতে আমরা আর আমাদের ছেলেমেয়েরা শক্ত হয়ে উঠবে, ফলে শীত কিম্বা ক্ষিদের ভয় তাদের আর করতে হবে না, আর তাদের স্বাস্থ্যের বিষয়েও আন্না, মাভ্‌রা আর পেলাগেয়ার মতো সব সময় দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হবে না। একবার ভেবে দেখুন, যদি ওষুধ খেতে না হয়, ডাক্তারখানা, তামাকের কারখানা আর মদ চোলাইয়ের কারবার চালু না রাখতে হয় তাহলে কতো সময় আমাদের বাঁচে। সে সময়টা আমরা মিলিতভাবে বিজ্ঞান ও শিল্পের চর্চায় কাটাতে পারি। চাষীরা যেমন মাঝে মাঝে একজোট হয়ে রাস্তাঘাট মেরামত করে নেয়, আমরাও তেমনি সম্মিলিতভাবে একমত হয়ে যদি সত্যের অনুসন্ধান করতাম, জীবনের অর্থকে খুঁজতাম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাহলে সেই সত্য শীঘ্রই আবিষ্কৃত হতো, তাহলে মানুষ যন্ত্রণাদায়ক নিরন্তর মৃত্যুভয় থেকে, এমনকি মৃত্যুর হাত থেকেও অবশ্যই নিষ্কৃতি পেত।'

লিদা বলল, 'কিন্তু আপনি নিজের যুক্তি নিজেই খণ্ডন করছেন। আপনি বিজ্ঞানের স্বপক্ষে প্রচার করছেন, অথচ নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রস্তাব বাতিল করে দিচ্ছেন!'

'যে শিক্ষা মানুষকে বড়জোর সরাইখানার সাইনবোর্ডের অক্ষরগুলো উচ্চারণ করতে পারা আর মাঝে-মধ্যে দুর্বোধ্য কিছু বই পড়তে পারা ছাড়া আর কিছুই শেখায় না, রিউরিকের সময় থেকেই আমাদের দেশে সে রকম শিক্ষা চলে আসছে। গোগলের পেত্রুস্কা বহুদিন পড়তে শিখে গিয়েছে, তবুও রিউরিকের সময় থেকে গ্রামাঞ্চল যা ছিল তাই আছে। আমাদের যা দরকার তা লিখতে পড়তে শেখা নয়, আমাদের আত্মিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটাবার জন্যে অবসর প্রয়োজন। ইস্কুল নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের দরকার আমাদের।'

'আপনি চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন।'

'হ্যাঁ, করি। প্রাকৃতিক একটা ঘটনার মতো রোগেরও লক্ষণ নির্ণয়ের জন্যেই মাত্র তার প্রয়োজন থাকতে পারে, রোগ নিরাময়ের জন্য নয়। চিকিৎসার যদি প্রয়োজন থাকে তবে রোগের নয়, তার মূল কারণের চিকিৎসা করা হোক। মূল কারণ, যেমন অতিরিক্ত দৈহিক শ্রম বন্ধ করে দিলেই আর রোগ থাকবে না। যে বিজ্ঞান শুধু রোগই নিরাময় করতে চায় তাকে আমি মানি না।'

উত্তেজিত হয়ে বলে চললাম, 'সত্যিকারের বিজ্ঞান ও শিল্পের লক্ষ্য অস্থায়ী ও আংশিক নয়, সর্বব্যাপী ও শাশ্বত। সে বিজ্ঞান সে শিল্প সত্যকে, ও জীবনের প্রকৃত অর্থকে অন্বেষণ করে, ঈশ্বরকে, আত্মাকে অনুসন্ধান করে। কিন্তু যখন তারা মুহূর্তের প্রয়োজনে ডাক্তারখানা কিম্বা লাইব্রেরী ঘরে আটকা পড়ে, তখন জীবনকেই শুধু জটিল ও দুর্বহ করে তোলে। ডাক্তার, উকিল, রাসায়নিক এবং লিখতে পড়তে জানা প্রচুর লোক আজকাল রয়েছে, কিন্তু জীব-বিজ্ঞানী, গণিত-বিজ্ঞানী, দার্শনিক বা কবি আমাদের মোটেই নেই। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের আত্মিক শক্তি মুহূর্তের প্রয়োজন মেটাতেই খরচা হয়ে যাচ্ছে... বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পীরা কাজ করেন দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। তাঁদের জন্যই আমাদের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য, সাংসারিক চাহিদা প্রত্যহ বেড়েই চলে, কিন্তু তবুও সত্য থেকে আমরা দূরেই থেকে গেছি, মানুষ এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে নোংরা,সবচেয়ে লোলুপ একটি জীব ছাড়া আর কিছুই হতে পারেনি। সবকিছুই চলেছে গোটা মানব-সমাজের অধঃপতনের দিকে, চলেছে প্রাণশক্তির অপূরণীয় অপব্যয়ের দিকে। এক অবস্থায় শিল্পীর জীবন হয়ে দাঁড়ায় অর্থহীন; শিল্পী যতো প্রতিভাবান, ততোই অদ্ভুত আর দুর্বোধ্য

তার ভূমিকা, কেননা বাইরে থেকে দেখে মনে হবে যে প্রচলিত ব্যবস্থাকে সমর্থন করে সে এই লোভী নোংরা জীবের আনন্দ-বিধানের জন্যেই পরিশ্রম করে চলেছে। আমি কাজ করতে চাই না। কিছুতেই কাজ করব না... কোনোকিছুরই দরকার নেই, দুনিয়াটা হুড়মুড় করে ধূলিসাৎ হয়ে যাক।'

'মিসি যাও তো এখান থেকে।' স্পষ্টতই আমার কথাগুলো তার মতো ছোটো মেয়ের শোনা উচিত নয় ভেবে লিদা তার বোনকে যেতে বলল।

জেনিয়া বিষণ্ণভাবে একবার দিদির দিকে একবার তার মার দিকে তাকিয়ে চলে গেল।

লিদা বলল, 'লোকে সাধারণত নিজের ঔদাসীন্যের সমর্থনে ও রকম ভালো ভালো যুক্তি দেয়। রুগীকে চিকিৎসা করা কিম্বা নিরক্ষরকে লিখতে পড়তে শেখানোর চেয়ে হাসপাতাল বা ইস্কুলের প্রয়োজনীয়তা সরাসরি অস্বীকার করা অনেক সোজা...'

মা বললেন, 'ঠিক লিদা, ঠিক বলেছ।'

লিদা বলে চলল, 'আপনি বলছেন যে ছবি আঁকা ছেড়ে দেবেন। স্পষ্টই নিজের কাজকে আপনি খুব মূল্যবান মনে করেন। তর্ক থাক, আপনার সঙ্গে মতে মিলবে না, কেননা আপনি অবজ্ঞাভরে এই মাত্র যে সবের উল্লেখ করলেন, তাদের মধ্যেকার সবচেয়ে গলদভরা লাইব্রেরী আর ডাক্তারখানাকে আমি পৃথিবীর যাবতীয় ল্যান্ডস্কেপের চেয়ে বেশী মূল্য দেবো।' এই বলে লিদা হঠাৎ মার দিকে ফিরে অন্য সুরে কথা শুরু করল, 'প্রিন্সকে গতবার শেষ যেমনটি দেখেছিলাম তার চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছেন। ওঁকে ভিশি-তে পাঠানো হচ্ছে।'

আমার সঙ্গে বাক্যালাপ এড়াতে চেয়ে সে মার সঙ্গে প্রিন্সের বিষয়ে কথাবার্তা কইতে লাগল। তার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে। উত্তেজনা গোপন করার জন্যে সে টেবিলের ওপর এতটা ঝুঁকে পড়ে খবরের কাগজ পড়ার ভাণ করল যেন চোখ তার খারাপ। আমার উপস্থিতি স্বভাবতই ওর কাছে অপ্রিয়। আমি বিদায় নিয়ে বাড়ি চলে এলাম।

৪

বাড়ির সামনের চত্বরে তখন অখণ্ড নৈঃশব্দ্য। পুকুরের ওপারে গ্রামটা ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটিও আলো নেই, শুধু নক্ষত্রের পাণ্ডুর প্রতিবিম্ব পুকুরের জলের ওপরে যেটুকু চিকচিক করছে তা প্রায় চোখেই পড়ে না। সিংহশোভিত ফটকের কাছে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেনিয়া। আমায় এগিয়ে দিতে এসেছে।

অন্ধকারে তাকে ভালো করে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করছিলাম, একজোড়া বিষণ্ণ কালো চোখ আমার মুখের ওপর স্থির নিবদ্ধ। বললাম, 'গাঁয়ের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সরাইওলা আর ঘোড়া-চোরেরাও এইরাত্রে শান্তিতে বিছানা নিয়েছে। আর আমরা সম্মানিত ভদ্রলোকেরাই শুধু পরস্পর চটাচটি করে তর্ক চালিয়ে যাই।'

বিষণ্ণ আগস্টের রাত। বিষণ্ণ, কেননা বাতাসে শরতের আভাস। রাঙ্গা মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ উঠছে, কিন্তু তাতে রাস্তাটা বিশেষ আলো হয়ে ওঠেনি। দুধারে শরতের বিস্তৃত ক্ষেত পড়ে আছে। আকাশে ক্রমাগত উল্কা খসছে। জেনিয়া আমার পাশে পাশে হাঁটছে, চেষ্টা করছে ওপর দিকে না তাকাবার যাতে উল্কাপাত দেখতে না হয়। কেন জানি না উল্কা পড়া দেখে ওর খুব ভয় করছে।

রাত্রির স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডায় ও শিউরে উঠে বলল, 'আমার ধারণা, আপনার কথাই ঠিক। আমরা সবাই মিলে যদি আত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারতাম, তাহলে অনেক কিছুই আবিষ্কার করা যেত।'

'নিশ্চয়ই, আমরা শ্রেষ্ঠতর জীব, মানবিক প্রতিভার মূল্য যদি আমরা বুঝতাম, উঁচু একটা আদর্শের জন্যে যদি আমরা জীবন কাটাতে পারতাম, তাহলে একদিন আমরা দেবতার মতো হয়ে উঠতাম। কিন্তু তা হবার নয়, মনুষ্যত্বের অধঃপতন ঘটছে। অল্পদিনের মধ্যেই দেখা যাবে প্রতিভার চিহ্ন মাত্র নেই।'

বাড়ির ফটকটা ততক্ষণে আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছে। জেনিয়া হঠাৎ দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি আমার হাতে মৃদু চাপ দিল। শীতে কাঁপতে কাঁপতে

সে বলল, 'শুভরাত্রি।' একটা পাতলা ব্লাউজ ছাড়া ওর গায়ে আর কিছু নেই, ঠাণ্ডায় কেমন জড়োসড়ো হয়ে আছে। 'কাল আসবেন।'

নিজের আর অন্যের ওপর বিরক্তি ও অসন্তোষে মন ভরেছিল। এমনি একটা মানসিক অবস্থায় এর পর নিঃসঙ্গ হয়ে কাটাতে হবে ভেবে ভারী বিচ্ছিরি লাগল। আমিও আর খসা উল্কাগুলোর দিকে চাইতে পারলাম না।

'আমার কাছে আর একটু থাকবে?' বললাম, 'একটু থাক।'

আমি জেনিয়ার প্রেমে পড়েছি। হয়ত আমার সঙ্গে তার এমনি ভাবে দেখা করতে আসা, এমনি করে আমাকে বিদায় জানানো, এমনি ধারা কোমল সানুরাগ চাউনির জন্যেই তার প্রেমে পড়েছি। তার ফ্যাকাশে মুখ, হালকা গ্রীবা আর বাহু, তার ভেতরকার সুকুমার ভাব, তার আলসেমি, তার বই পড়া, এসব কিছুরই কেমন একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে আমার কাছে। আর তার মনটুকু, আমার মনে হয় সে অসাধারণ তীক্ষ্ণধী, তার উদার মনের তারিফ না করে পারি না। তার কারণ হয়ত তার চিন্তার খাত কঠিন, সুন্দরী লিদার চেয়ে আলাদা। লিদা আমাকে পছন্দ করতে পারেনি, কিন্তু জেনিয়া শিল্পী হিসেবে আমায় পছন্দ করেছে। শিল্প-দক্ষতা দিয়ে আমি ওর মন কেড়ে নিয়েছি। আমার ভারি ইচ্ছে হয় যা আঁকার তা যেন শুধু ওর জন্যেই আঁকি— এই গ্রামে, এই মাঠে, সন্ধ্যার কুয়াশায়, সন্ধ্যার অস্তরাগে, অপূর্ব আনন্দময় এই অঞ্চলে—যেখানে এতদিন ভীষণ নিঃসঙ্গ আর নিরর্থক বোধ করেছি সেখানে ওকে রাণী করে আমরা রাজ্য গড়ে তুলি।

'আর একটু থাকো,' ওকে অনুরোধ করলাম, 'শুধু এক মিনিট।' আমার ওভারকোটটা খুলে ওর ঠাণ্ডা কনকনে কাঁধের ওপর চাপিয়ে দিলাম। পুরুষের পোষাকে অদ্ভুত আর বিশ্রী দেখাচ্ছে ভেবে ও খিল্‌খিল্‌ করে হেসে গা থেকে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। আর আমি দু-হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে ওর মুখ, কাঁধ, বাহু—ভরে দিলাম অজস্র চুম্বনে।

রাত্রির নৈঃশব্দ্য যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় এমনি সতর্কভাবে আমায় আলিঙ্গন করে কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে ও বলল, 'আবার কাল, কেমন? মা আর দিদিকে সব বলতে হবে, এক্ষুনি। আমরা কেউ তো কিছুই লুকিয়ে রাখি না... উঃ জানেন, আমি এত ভীতু। মা'র জন্যে ভাবি না, মা আপনাকে খুব ভালবাসেন, কিন্তু লিদা...'

ফটকের দিকে দৌড়ে যেতে যেতে সে বলল, 'বিদায়।'

দু-এক মিনিট চুপ করে তার মিলিয়ে-যাওয়া পায়ের ধ্বনি শুনলাম। বাড়ি যেতে ইচ্ছে করল না। যাবার তাড়াও বিশেষ নেই। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর ধীরে ধীরে আবার ফিরে চললাম। একবার তাকিয়ে দেখলাম বাড়িটার দিকে, যেখানে সে থাকে। শান্ত প্রিয়তম সেই পুরানো বাড়িটার উপর তলার ঘরের জানালাগুলো যেন চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে—যেন তারা সমস্তই বোঝে। বারান্দা ছাড়িয়ে টেনিস কোর্টের কাছে, প্রাচীন একটা উইলো গাছের নীচে একটা বেঞ্চিতে সেই অন্ধকারে বসে রইলাম। মিসির ঘরে একটা উজ্জ্বল বাতি জ্বলে উঠল—কিছুক্ষণ পরে আলোটা নরম সবুজ হয়ে গেল। কেউ বোধ হয় একটা শেড্ লাগিয়ে দিয়েছে। নড়াচড়া করছে কয়েকটা ছায়ামূর্তি...

শান্তি, তৃপ্তি আর মমতায় আমার হৃদয় ভরে গিয়েছে। আমিও প্রেমে পড়তে পারি এইটে আবিষ্কার করে আনন্দের সীমা ছিল না। তবু মন খচ্‌খচ্ করছে এই ভেবে যে যে-লিদা আমাকে অপছন্দ করে আর হয়ত ঘৃণাও করে, সে-ও আছে কয়েক গজ দূরে ঐ বাড়িরই একটা ঘরে।

জেনিয়াকে হয়ত দেখা যাবে ভেবে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কান খাড়া করে রইলাম, মনে হল যেন উপরের চালাঘর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। জানালায় সবুজ আলো নিভে গেল, ছায়ামূর্তিগুলোকেও আর দেখা গেল না। চাঁদ ইতিমধ্যে উঠে এসেছে বাড়িটার মাথার ওপরে, ঘুমন্ত বাগান, আর জনবিরল পথটা ভরে দিয়েছে জ্যোৎস্নায়।

বাড়ির সামনে কেয়ারিতে ডালিয়া আর গোলাপগুলো স্পষ্ট করে যায় চেনা, শুধু রঙের কোনো তফাৎ করা যায় না। সত্যি সত্যিই শীত পড়ে গেছে বেশ। বাগান থেকে বেরিয়ে রাস্তার ওপর থেকে ওভারকোটটা কুড়িয়ে নিলাম, তারপর আস্তে আস্তে পা বাড়ালাম বাড়ির দিকে।

পরের দিন বিকেলে ভল্‌চানিনভদের বাড়ি গিয়ে দেখলাম যে বাগানের দিকের কাঁচের দরজা হাট করে খোলা, এক্ষুনি হয়ত জেনিয়া টেনিসকোর্টে কিম্বা বাগানের কোনো একটা পথে দেখা দেবে বা বাড়ির মধ্যে তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যাবে এই আশায় গিয়ে বসলাম বারান্দায়। তারপর বসবার ঘরে

ঢুকলাম, তারপর খাবার ঘরে। জনপ্রাণীও চোখে পড়ল না। খাবার ঘর থেকে টানা-বারান্দা দিয়ে হলের মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। আবার ফিরলাম। বারান্দা থেকে ঘরে যাবার জন্যে পরপর অনেকগুলো দরজা। সেইসব ঘরেরই একটা থেকে লিদার গলা শোনা যাচ্ছে:

'একটি কাক কোনস্থলে একখণ্ড,' উচ্চকণ্ঠে সুর করে লিদা বলে যাচ্ছে। বোধহয় কাউকে শ্রুতিলিখন দিচ্ছিল, '...একখণ্ড পনীর... ঐ কাক... কে ওখানে?' আমার পায়ের শব্দ শুনে সে হঠাৎ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আমি।'

'ওঃ। মাপ করবেন, আমি কিন্তু আপনার কাছে ঠিক এখনি যেতে পারব না, এখন দাশাকে পড়াচ্ছি।'

'ইয়েকাতেরিনা পাভলভনা কি বাগানে আছেন?'

'না। মা আর আমার বোন আজ সকালে পেন্‌জা প্রদেশে কাকীমার বাড়ি চলে গেছে। শীতকালে ওরা বোধ হয় বিদেশ যাবে...' শেষের কথা ক'টি লিদা বলল একটু থেমে।

'একটি কাক কোনস্থলে... একখণ্ড পনীর পাইয়াছিল... লিখেছো?'

হলঘরে বেরিয়ে কিছু না ভেবে তাকাতে লাগলাম পুকুরের দিকে, গ্রামের দিকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন দূর থেকে শুনতে পেলাম লিদার কথা 'একখণ্ড পনীর... একটি কাক কোনস্থলে একখণ্ড পনীর পাইয়াছিল...'

যে পথ দিয়ে প্রথম এসেছিলাম, সেই পথেই উল্টোমুখে এই মহাল ছেড়ে চললাম, উঠোন থেকে বাগানে, বাড়িটা ছাড়িয়ে, তারপর সেই লাইম গাছের বীথিতে পেঁছিলাম... এখানে একটি ছোটছেলে দৌড়তে দৌড়তে এসে আমার হাতে একটি চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিতে লেখা: 'দিদিকে সব বলেছি, সে চায় আমাদের বিচ্ছেদ হোক। অবাধ্য হয়ে তার মনে দুঃখ দেবার সাহস হল না। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আমায় ক্ষমা করুন! যদি জানতেন আমি আর মা কী অসহ্য কান্না কাঁদছি!'

তারপর এল সেই ফার গাছের বীথি, সেই ভাঙা রেলিং... আর সেই মাঠ। যেখানে রাই পুষ্পিত হয়ে উঠত, কোয়েল ডাকত, সেখানে এখন গরু আর ঘোড়া চরে চরে বেড়াচ্ছে। ইতস্তত পাহাড়ী টিলার ওপরে দেখা দিয়েছে শীত-শস্যের সবুজাভা। একটা প্রাত্যহিক গদ্যের মেজাজ আবার আমার মনকে ছেয়ে

ফেলল। ভলচানিনভদের ওখানে যা সব বলেছি তার জন্যে এখন লজ্জা করতে লাগল আমার। জীবন আবার একঘেয়ে হয়ে উঠল। বাড়ি ফিরে জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে সেইদিন সন্ধ্যাতেই পিটার্সবুর্গে রওনা হলাম।

ভল্‌চানিনভদের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। শুধু কিছুকাল আগে ক্রিমিয়া যাবার পথে বেলকুরভের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো ট্রেনে। আগের মতোই তার পরনে সেই কৃষক-কোর্তা আর এমব্রয়ডারী-করা সার্ট। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছো?' বলল, 'তোমাদের আশীর্বাদে ভালোই আছি।' দুজনে একটু গল্প-গুজবও করা গেল।

আগের মহালটা বিক্রী করে দিয়ে সে আর একটা ছোট তালুক কিনেছে লিউবভ্‌ ইভানভ্‌নার নামে। ভলচানিনভদের সম্বন্ধে বেশি কিছু খবর সে আমাকে দিতে পারল না। লিদা এখনো শেলকোভ্‌কা-তেই থাকে আর গ্রামের ইস্কুলে পড়ায়। অল্প অল্প করে সে নিজের চারপাশে সমধর্মী লোকেদের একটি ছোট দল গড়ে তুলেছে, একটা শক্তিশালী পার্টিও বানিয়েছে। জেমস্তভোর গত নির্বাচনে তারা বালাগিন্‌কে ভোটে হারিয়ে দিয়েছে, সেই বালাগিন যে ওদের জেলাটাকে মুঠোর মধ্যে রেখেছিল। জেনিয়ার সম্বন্ধে একমাত্র খবর যা সে দিতে পারল তা হচ্ছে এই যে জেনিয়া ঐ বাড়িতে বাস করে না, তবে কোথায় আছে তার জানা নেই।

বনেদী ঐ বাড়িটার কথা প্রায় ভুলতে বসেছি, কিন্তু কখনো কখনো পড়তে পড়তে কিম্বা আঁকতে আঁকতে এক-একমুহূর্তে কেন জানি না, জানালার সেই সবুজ আলো মনে পড়ে যায়, যেন শুনতে পাই সেই রাত্রির মাঠে মাঠে নিজের পদশব্দের প্রতিধ্বনি, মনে পড়ে ভালোবাসার সেই রাতে ঠাণ্ডা হাত ঘষে-ঘষে গরম করতে করতে আমার বাড়িফেরা। তার চেয়েও কম করে বিষণ্ণ নির্জন মুহূর্তে অস্পষ্ট স্মৃতির আবেগে মন ছেয়ে যায়। ধীরে ধীরে মনে হয় আমাকেও একজন মনে রেখেছে, আমার জন্যেও একজন প্রতীক্ষা করে আছে, আবার দেখা হবে আমাদের ...

মিসি, তুমি কোথায়?

১৮৯৬

ইয়োনিচ

১

‘এস্’ শহরে সদ্যাগত আগন্তুকরা যখন সেখানকার একঘেয়ে ও বিরক্তিকর জীবন সম্পর্কে অভিযোগ করে, সেখানকার পুরনো বাসিন্দারা প্রতিবাদ করে বলে ‘এস্’-এর মত এমন শহর আর হয় না, এখানে একটা লাইব্রেরি, একটা থিয়েটার ও একটা ক্লাব আছে, এখানে মাঝে মাঝে বল নাচের অনুষ্ঠান হয় এবং সর্বোপরি এখানে অনেক পরিবার বসবাস করে যাদের শিক্ষাদীক্ষায় আচার আচরণে এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে তাদের সঙ্গে আলাপ করে কৃতার্থ হওয়া যায়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির জাজ্জ্বল্য উদাহরণ স্বরূপ তারা তুরকিন পরিবারের উল্লেখ করে।

গভর্ণরের বাড়ির পাশে সদর রাস্তার উপরেই তুরকিনরা বাস করে তাদের নিজস্ব বাড়িতে। ইভান পেত্রোভিচ পরিবারের কর্তা। সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা। তার মাথার কালো চুল ও একজোড়া জুলপি নজরে পড়ার মতো। দান-খয়রাতের জন্যে মাঝে মাঝে সে ঘরোয়াভাবে নাটক অভিনয় করে। সেই সব নাটকে বুড়ো জেনারেলের অংশে অভিনয় করার সময় সে এমন মজা করে কাশে যে সবাই হেসে লুটিয়ে পড়ে। হাসির গল্প প্রবাদ ও ধাঁধা তার জানা আছে অফুরন্ত। রসিকতা ও ঠাট্টাতামাসা করতে সে ভালোবাসে। সে ঠাট্টা করছে, না করছে না, তার মুখ দেখে বোঝাই যায় না। ভেরা ইয়োসিফভনা তার স্ত্রী, রুগ্ন চেহারার মধ্যে তার মুখখানি সুন্দর। সে প্যাঁশনে চশমা পরে এবং গল্প উপন্যাস লেখে। অতিথিদের সামনে নিজের লেখা পড়ে শোনাতে কখনই তার উৎসাহের অভাব হয় না। তাদের একমাত্র কন্যা ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা। তরুণীর সখ পিয়ানো বাজানো। এক কথায় পরিবারের প্রতিটি

ব্যক্তি কোনো না কোনো দিক থেকে প্রতিভাসম্পন্ন। আতিথেয়তা তুরকিনদের একটা পারিবারিক বৈশিষ্ট্য। তারা তাদের প্রতিভার পরিচয় দিত দিল খুলে, খুশি মনে। পাথরে তৈরি মস্ত বাড়িটা গ্রীষ্মকালেও সর্বদা শীতল থাকে। বাড়িটার পিছনদিকের জানালাগুলোর নিচেই ছায়ায় ঘেরা একটা প্রাচীন বাগান, বসন্তকালে সেই বাগান থেকে নাইটিঙ্গেলের গান ভেসে আসে। বাড়িতে অতিথি অভ্যাগতের সমাগম হলে রান্নাঘর থেকে ছুরি খুন্তির শব্দ শোনা যায়, এবং পেঁয়াজ ভাজার খোশবাইয়ে চারদিক আমোদিত হয়ে ওঠে, বোঝা যায় রসনাতৃপ্তিকর ভুরিভোজের আয়োজন চলেছে।

'এস্' শহর থেকে প্রায় দশ ভের্স্ত দূরে দ্যালিজ্-এ সদ্যনিযুক্ত জেমস্তভো-চিকিৎসক ডাক্তার দ্মিত্রি ইয়োনিচ স্তার্তসেভ বাস করতে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে জানিয়ে দেওয়া হল, রুচিবান শিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে তুরকিনদের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় করা অবশ্য প্রয়োজন। শীতকালে এক দিন রাস্তায় ইভান পেত্রোভিচের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। আবহাওয়া, থিয়েটার, কলেরা মহামারী ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনার শেষ পর্যন্ত পরিসমাপ্তি ঘটল আমন্ত্রণে। অতএব বসন্তকালীন কোনো এক ধর্মীয় ছুটির দিনে — সেদিন ছিল যিশুখৃষ্টের স্বর্গারোহণের দিন — স্তার্তসেভ রোগী দেখা শেষ করে শহরের দিকে যাত্রা করল। উদ্দেশ্য, কাজের চাপ থেকে একটু ছুটি নেওয়া এবং শহরে যাচ্ছেই যখন কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে আনা। ধীরে সুস্থে সে হেঁটে চলল সারা রাস্তা গান গাইতে গাইতে:

'তখনো এই জীবন পাত্র অশ্রুধারায় যায়নি পূরে ...'

শহরেই সে মধ্যাহ্নভোজন সেরে নিল। পার্কে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াবার পর তার খেয়াল হল ইভান পেত্রোভিচের আমন্ত্রণের কথা। ভাবল, দেখাই যাক না তুরকিনদের সঙ্গে দেখা করে তারা কী রকম মানুষ।

'আরে, আরে, খবর কি!' সদর দরজার সামনে দেখা হতে ইভান পেত্রোভিচ বলে উঠল। 'এইরকম অভ্যাগত অতিথির দেখা পেয়ে আনন্দিত হলাম। আসুন আসুন, ভেতরে আসুন। চলুন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।' ডাক্তারকে স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর সে বলে চলল, 'ভেরা, আমি ওঁকে বলছিলাম হাসপাতালে সর্বক্ষণ আবদ্ধ থাকার কোনো অধিকার ওঁর

নেই, অবসর সময় সমাজের পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করা ওঁর কর্তব্য। আমি ঠিক বলিনি, বলতো ভেরা?'

'এখানে বসুন,' ভেরা ইয়োসিফভনা তার পাশের একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল। 'আমার কাছে আপনি আপনার প্রাণের কথা খুলে বলতে পারেন। আমার স্বামীর আবার ওথেলোর মতো সন্দেহের বাতিক। তা হোক, আমরা একটু সাবধানে চলাফেরা করব। কী বলেন?'

ইভান পেত্রোভিচ তার স্ত্রীর কপাল চুম্বন করে সাদরে বলল, 'দুষ্টু মেয়ে!' আগন্তুকের দিকে ফিরে সে আবার বলল, 'আপনি বেশ সুসময়ে এসে পড়েছেন। আমার স্ত্রী এইমাত্র এক প্রকাণ্ড উপন্যাস লেখা শেষ করেছেন এবং আজই সন্ধ্যেবেলা আমাদের তিনি তা পড়ে শোনাচ্ছেন।'

'জাঁ, সোনা আমার,' স্বামীকে সম্বোধন করে ভেরা ইয়োসিফভনা বলল, 'Dites que l'on nous donne du thé*।'

এর পরেই ইয়েকাতেরিনা ইভানভনার সঙ্গে স্তার্তসেভের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। আঠারো বছরের তরুণীটিকে ঠিক মায়ের মতোই দেখতে — তেমনি রোগা রোগা চেহারা, সুন্দর মুখ। তার মুখে এখনো শিশুর সারল্য, ললিত লতার মতো তার দেহসৌষ্ঠব। তার কৌমার্যের স্তন দুটি ইতিমধ্যেই পুষ্ট হয়েছে, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে অটুট, যেন বসন্তের আসল আভাস বয়ে আনছে। তারপর তারা বসল চা পান করতে জ্যাম, মধু, মিষ্টি ও মুখে দিলেই মিলিয়ে যায় এমন চমৎকার বিস্কুট সহযোগে। সন্ধ্যা হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুকরা আসতে শুরু করল। এক একজন আসছে আর ইভান পেত্রোভিচ খুশিতে চোখদুটো জ্বলজ্বল করে বলে উঠছে:

'আরে, আরে, খবর কী?'

সবাই আসার পর তারা বসার ঘরে গিয়ে গম্ভীর মুখে বসল আর ভেরা ইয়োসিফভনা উপন্যাস পাঠ শুরু করল। উপন্যাসের আরম্ভ হচ্ছে: 'এখন দারুণ শীত ...' জানলাগুলো হাট করে খোলা, সেখান দিয়ে ভেসে আসছে রান্নাঘরের ভাজা পেঁয়াজের সুবাস ও সেই সঙ্গে ছুরির ঝনঝন শব্দ ...

নরম কোমল চেয়ারে বসার ব্যবস্থা, বসার ঘরে আধো অন্ধকারে আলোর

---

* ফরাসী ভাষায় — বলুন অতিথিদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করতে।

অলস কম্পন — মোটামুটি বৈঠকের পরিবেশটা বেশ শান্তিময়। গ্রীষ্মের এই সন্ধ্যায়, রাস্তা থেকে যখন ভেসে আসছে হাসি ও কলরব এবং বাগান থেকে বাতাস যখন বয়ে আনছে লাইলাকের সুগন্ধ, তখন মনে আনা সহজ নয় 'এখন দারুণ শীত', অস্তগামী সূর্যের শীতল করস্পর্শে তুষারাস্তীর্ণ সমভূমি আলোকিত হয়ে উঠছে এবং সেখানে একা চলেছে এক যাত্রী। ভেরা ইয়োসিফভনা পড়ে চলল, কী ভাবে সুন্দরী তরুণী কাউণ্টেস তার স্বগ্রামে ইস্কুল, হাসপাতাল ও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করল, কেমন করে সে ভবঘুরে শিল্পীর প্রেমে পড়ল — এমনি সব ঘটনা, বাস্তব জীবনে যা অসম্ভব। তবুও যারা শুনছে তাদের শুনে যেতে ভালোই লাগছে, শুনতে শুনতে তাদের মনে স্নিগ্ধ মধুর কত চিন্তাই ভেসে যাচ্ছে, তারা মশগুল হয়ে বসে রয়েছে ...

'মন্দ নয়!' ইভান পেত্রোভিচ মৃদু স্বরে বলল।

একজন অতিথি শুনতে শুনতে উন্মনা হয়ে ভাবতে লাগল কোন দূর সুদূরের কথা। প্রায় অস্ফুটস্বরে সে বলল:

'বাস্তবিকই ...'

এক ঘণ্টা কেটে গেল, তারপরে আরো এক ঘণ্টা। কাছাকাছি পার্ক থেকে গানবাজনার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভেরা ইয়োসিফভনা যখন তার খাতাটি বন্ধ করল পাঁচ মিনিট কেউ কোনো কথা বলল না। সবাই তখন পার্কের 'লুচিনুস্কা' গানটি শুনছে। উপন্যাসে যা নেই গানটায় তাই রয়েছে — বাস্তব জীবনের কাহিনী।

'সাময়িকপত্রে কি আপনার লেখা ছাপান?' স্তার্তসেভ ভেরা ইয়োসিফভনাকে জিজ্ঞাসা করল।

'না,' সে উত্তর দিল। 'কোনো লেখাই ছাপাই না। লিখে বাক্সবন্দী করে রাখি। কী দরকার ছাপিয়ে? খেয়ে পরে বাঁচার মতো আমাদের যথেষ্টই তো আছে,' এই বলে সে না-ছাপানোর কৈফিয়ৎ দিল।

কোনো না কোনো কারণে উপস্থিত সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ইভান পেত্রোভিচ এবার মেয়েকে উদ্দেশ করে বলল, 'মিনিপুষি, এবার আমাদের কিছু একটা বাজিয়ে শোনাও।'

মস্ত পিয়ানোর ঢাকাটা তোলা হল, স্বরলিপি বই রাখার জায়গায় যথারীতি স্থাপিত ছিল, এগুলো খোলা হল। ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা এবারে বসে

দুহাত দিয়ে রিডগুলোয় আঘাত করল। সমস্ত শক্তি দিয়ে বার বার সেগুলোকে আঘাত করে চলল। তার কাঁধ ও বুকটা দুলে দুলে উঠতে লাগল। একই জায়গায় একগুঁয়ের মতো ক্রমাগত সে রিডগুলো আঘাত করতে থাকে, মনে হয় সেগুলোকে পিয়ানোর ভেতরে চালিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত থামবে না। বসার ঘরের মধ্যে যেন মেঘগর্জন হতে থাকে, মেঝে ছাত, আসবাবপত্র সব কিছু গমগম করে ... ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা খুব একটা জটিল অংশ বাজাচ্ছে, কালোয়াতি জটিলতাই তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য। বাজনাটা দীর্ঘ ও একঘেয়ে। শুনতে শুনতে স্তার্তসেভ কল্পনা করে পাহাড়ের চূড়া থেকে বড় বড় পাথরের চাঁই গড়িয়ে পড়ছে। একটার পর একটা গড়িয়ে পড়ছে তো পড়ছেই। সুন্দর স্বাস্থ্যবতী ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা পরিশ্রমের ফলে লাল হয়ে উঠেছে, তার কপালের উপর একগুচ্ছ চুল এসে পড়েছে। তাকে এই অবস্থায় দেখতে স্তার্তসেভের খুবই ভালো লাগা সত্ত্বেও তার ইচ্ছে হচ্ছিল পাথর পড়া এবার ক্ষান্ত হোক। চাষাভূষা ও রোগীদের মধ্যে সারা শীতটা দ্যালিজে কাটিয়ে এই বসার ঘরে বসে বসে সুদর্শনা ও নিঃসন্দেহে নিষ্কলুষ এই যুবতীর দিকে তাকিয়ে থাকা এবং ক্লান্তিকর ও জোরালো হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃতিমূলক এই ধ্বনি শোনা প্রীতিপ্রদ তো বটেই, অভিনবও ...

'বাঃ মিনিপুষি, আজ যেন তুমি নিজেকেও ছাড়িয়ে গেছ,' বাজনা শেষ করে যখন তার কন্যা উঠে দাঁড়াল ইভান পেত্রোভিচ বলল। আনন্দে পিতার চোখদুটো জলে ভরে এসেছে। 'দেনিস, মরে গেলেও এর চেয়ে ভালো বাজাতে পারবে না।'

সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়াল, সবাই অভিনন্দন জানালো। প্রত্যেকে চমকিত, প্রত্যেকে বলছে এমন বাজনা বহুকাল শোনেনি। মেয়েটি মুখে মৃদু হাসির রেখা টেনে নীরবে এই স্তুতি শুনে যাচ্ছে, আর তার সারা দেহে ফুটে উঠছে জয়ের আনন্দ।

'আশ্চর্য! চমৎকার!'

সাধারণ স্তুতিবাদে গলা মিলিয়ে স্তার্তসেভও বলে ওঠে: 'চমৎকার!'

'কোথায় শিখেছেন?' সে ইয়েকাতেরিনা ইভানভনাকে জিজ্ঞাসা করল। 'সঙ্গীত কলেজে বুঝি?'

'না, কলেজে ভর্তি হবার জন্যে আমি তৈরি হচ্ছি, এর মধ্যে আমি বাড়িতেই শিখছি মাদাম জাভলোভস্কায়ার কাছে।'

'এখানকার হাইস্কুল থেকে বুঝি পাশ করে বেরিয়ে এসেছেন?'

'না, না,' ভেরা ইয়োসিফভনা কন্যার হয়ে জবাব দিল। 'আমরা বাড়িতেই মাস্টার রেখে ওকে পড়িয়েছি। আপনি নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে একমত হাইস্কুলই হোক বা বোর্ডিং স্কুলই হোক, সেখানকার প্রভাবটা ভালো না হওয়ারই সম্ভাবনা। মেয়ে যখন বড় হয়ে উঠছে তখন মা ছাড়া আর কারও প্রভাবে তাকে রাখা উচিত নয়।'

'আমার কিন্তু সঙ্গীত কলেজে যাবার খুব ইচ্ছে,' ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা বলল।

'না, না, মিনিপুষি তার মাকে খুব ভালোবাসে। মিনিপুষি তার বাপ-মার মনে কষ্ট দেবে না।'

আবদার করে পা ঠুকে ঠুকে ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা বলল, 'আমি যাবোই যাবো!'

নৈশভোজের সময় সুযোগ এল ইভান পেত্রোভিচের কৃতিত্ব জাহির করার। শুধুমাত্র চোখদুটো হাসিতে ভরে সে গল্প বলে রসিকতা করে, নানা ধাঁধা বলে নিজেই তার উত্তর দেয় এবং সর্বক্ষণ নিজস্ব অদ্ভুত ভাষা ব্যবহার করে, বহুদিন থেকে ঠাট্টার ছলে ব্যবহার করতে করতে সে ভাষায় কথা বলা এখন তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, যথা: 'চমৎচিকীর্ষিত', 'মন্দবন্ত নয়', 'আনতবিনতভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি'।

কিন্তু এটাই সব নয়। চোব্যচোষ্য আহার শেষ করে অতিথিরা খুশি মনে যখন বাইরের হলঘরে এসে যে-যার কোট ও লাঠি খুঁজছে তখন দেখা গেল ভৃত্য পাভেল, যার ডাক-নাম পাভা, ভরাট-গাল নেড়া-মাথা চোদ্দ বছরের ছোকরা, তাদের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে।

'খেলা দেখাও পাভা, দেখাও,' ইভান পেত্রোভিচ বলল।

পাভা অমনি অদ্ভুত এক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে একটা হাত উপরের দিকে তুলে বিয়োগান্তক গলায় বলল:

'মর, হতচ্ছাড়ী!'

সঙ্গে সঙ্গে সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে স্তার্তসেভ ভাবল, 'বেশ মজার তো!'

একপাত্র বিয়ার পান করার জন্যে সে এক রেস্তোরাঁয় গেল, তারপর হাঁটতে হাঁটতে দ্যালিজে ফিরল। যেতে যেতে সারা পথ সে গুনগুন করে গাইল:

'তোমার স্বর মিষ্টি ও আদরে ভরা...'

নয় ভের্স্ত হেঁটে আসার পর বিন্দুমাত্র শ্রান্তিবোধ না করে সে শুতে গেল, মনে মনে বলল, 'আরো বিশ ভের্স্ত সে আনন্দে হাঁটতে পারে।'

'মন্দবস্তু নয়,' মনে পড়তে তার হাসি পেল, তারপরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

২

তুরকিনদের সঙ্গে আবার দেখা করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালের কাজের চাপে তার পক্ষে দু'এক ঘণ্টাও সময় করা সম্ভব হল না। এই ভাবে একলা বৎসরাধিক কাল তার কেটে গেল কাজের মধ্যে। তারপর একদিন শহর থেকে তার কাছে এল নীল খামে মোড়া একখানা চিঠি ...

অনেক দিন থেকেই ভেরা ইয়োসিফভনা মাথা ধরায় ভোগে, কিন্তু সম্প্রতি তাদের মিনিপুষির সঙ্গীত কলেজে যাবার বায়না বৃদ্ধি পাওয়ায় মাথাটা বেশ ঘন ঘন ধরছে। শহরের সব ডাক্তারই তুরকিনদের বাড়ি এসে গেছে। শেষকালে জেমস্তভো-ডাক্তারের ডাক পড়েছে। ভেরা ইয়োসিফভনা মর্মস্পর্শী এক চিঠি লিখে একবার এসে তার যন্ত্রণা দূর করার জন্যে অনুরোধ করেছেন। স্তার্তসেভ তাকে দেখতে গেল, এবং এই যাওয়ার পর তুরকিনদের পরিবারে তার গতিবিধি বিলক্ষণ বেড়ে গেল ... বাস্তবিকই তার দ্বারা ভেরা ইয়োসিফভনার রোগের কিছুটা উপশম হল এবং যারা দেখতে আসত সবাইকেই বলা হল এমন ডাক্তার আর হয় না, আশ্চর্য ডাক্তার। কিন্তু এখন আর শুধু মাথাধরার চিকিৎসা করতেই সে তুরকিনদের ওখানে যাওয়া আসা করে না ...

সেদিন কি একটা ছুটির দিন। ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা সবে পিয়ানোয় দীর্ঘ ও বিরক্তিকর এক কসরত শেষ করেছে। খাবার ঘরের টেবিল ঘিরে তাদের তখন চা সহযোগে দীর্ঘ বৈঠক চলেছে। ইভান পেত্রোভিচের

একটা মজার গল্প প্রায় মাঝামাঝি বলা শেষ হয়েছে, এমন সময় সদর দরজা থেকে ঘণ্টা নাড়ার শব্দ শোনা গেল। ইভান পেত্রোভিচকে উঠে যেতে হল আগন্তুকের সঙ্গে দেখা করতে। এই ক্ষণিক গোলমালের সুযোগ নিয়ে স্তার্তসেভ ইয়েকাতেরিনা ইভানভনার কানে কানে গভীর আবেগমিশ্রিত অস্ফুটস্বরে বলে ফেলল:

'ঈশ্বরের দোহাই, দয়া করুন, আমাকে আর যন্ত্রণা দেবেন না। চলুন, বাগানে যাই।'

ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা কাঁধটা এমনভাবে ঝাঁকাল যে মনে হল তার কাছে এটা অপ্রত্যাশিত এবং স্তার্তসেভ যে কী চায়, সে বুঝতেই পারছে না। তা সত্ত্বেও কিন্তু সে উঠে বেরিয়ে গেল।

'দিনে তিন চারঘণ্টা আপনি বাজনার চর্চা করেন,' তাকে অনুসরণ করতে করতে স্তার্তসেভ বলল। 'তারপরে আপনার মার কাছটিতে বসে থাকেন। কথা বলার কোনো সুযোগই পাই না। অনুরোধ করছি পনেরো মিনিট সময় দিন!'

শরৎকাল আসন্ন। প্রাচীন বাগানটায় একটা স্তব্ধ বিষণ্ণতা। বাগানের পথগুলো কাল ঝরা পাতায় ছাওয়া। দিনগুলো ছোট হয়ে আসছে।

'পুরো এক সপ্তাহ আপনাকে দেখিনি,' স্তার্তসেভ বলে চলল। 'যদি শুধু জানতেন এই না-দেখা আমার কাছে কত কষ্টকর! চলুন, বসি গিয়ে। আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

বাগানে তাদের বসবার প্রিয় জায়গা প্রাচীন এক ম্যাপ্‌ল্‌ গাছের নিচেকার বেঞ্চি। তারা সেই বেঞ্চিটায় বসল।

ব্যাবসাদারের আবেগউত্তাপহীন কণ্ঠে ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কী চান?'

'পুরো এক সপ্তাহ আপনাকে দেখিনি, মনে হচ্ছে কত যুগ আপনার গলার আওয়াজ শুনিনি। আপনার একটু কথা শোনার জন্যে আমি আকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছি। কথা বলুন!'

স্তার্তসেভ মুগ্ধ হয়েছে, মুগ্ধ হয়েছে তার সজীবতায়, তার চাহনির সারল্যে, তার কপোলের সদ্যস্ফুট রক্তিমায়। এমনকি তার পরিহিত পোষাকের পারিপাট্যেও স্তার্তসেভ অকল্পিত এক মাধুর্যের আস্বাদ পাচ্ছে, তার সহজ ও

সাবলীল লালিত্য তার মন স্পর্শ করেছে। এত সরলতা সত্ত্বেও স্তার্তসেভের মনে হল কী অসাধারণ বুদ্ধিমতী, ওর বয়সের তুলনায় কত বেশি বিজ্ঞ। সাহিত্য, শিল্প বা যে কোনো মনোমত বিষয় নিয়ে স্তার্তসেভ তার সঙ্গে আলোচনা করতে পারে, জীবন ও জনসমাজ সম্পর্কে তার যতকিছু অভিযোগ তার কাছে পারে পেশ করতে, যদিও সে-মেয়ে গভীর আলোচনার মাঝখানে হাসতে শুরু করে অথবা উধাও হয় বাড়ির দিকে। 'এস্' শহরের প্রায় অধিকাংশ মেয়েদের মতোই সে খুব পড়তো, (সত্যি কথা বলতে কি, 'এস্' শহরে পড়াশোনার চর্চা তেমন কিছুই ছিল না, এবং স্থানীয় গ্রন্থাগারিকের অভিমত, মেয়েরা ও অল্পবয়সী ইহুদীরা না থাকলে লাইব্রেরিটা বন্ধ করে দিলেও ক্ষতি হত না)। সে-কথা জেনে স্তার্তসেভের আনন্দের সীমা থাকত না। প্রতিবার তার সঙ্গে ইয়েকাতেরিনা ইভানভনার দেখা হতে প্রতিবারই সে আগ্রহভরে প্রশ্ন করত গত কয়েকদিন সে কী পড়ছিল এবং মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যেত ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা উত্তরে যা বলত।

'আমাদের শেষ দেখা হবার পর থেকে সারা সপ্তাহটা ধরে কী পড়লেন,' সে এখন তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন দয়া করে।'

'পিসেমস্কি পড়ছিলাম।'

'তাঁর কোন বইটা?'

'সহস্র আত্মা,' মিনিপুষি উত্তর দিল। 'পিসেমস্কি-র নামটা কী মজার — আলেক্সেই ফিওফিলাকতিচ!'

এই বলেই সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল। 'আরে চললেন কোথায়?' সচকিত স্তার্তসেভ চিৎকার করে উঠল। 'আপনার সঙ্গে যে একটা কথা আছে আমার, অনেক কিছুই আপনার বলতে হবে... আরো কিছুক্ষণ, দোহাই আপনার, অন্তত আর পাঁচ মিনিট আমার সঙ্গে থাকুন!'

ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা থামল, যেন কী বলতে চায়, তারপর হঠাৎ স্তার্তসেভের হাতে একটা চিঠি গুঁজে দৌড়ে বাড়ির ভিতর চলে গেল এবং গিয়েই আবার পিয়ানো বাজাতে বসল।

'রাত এগারোটায় কবরখানায় দেমেটির সমাধির কাছে থাকবেন,' চিঠিতে স্তার্তসেভ পড়ল।

'একেবারে ছেলেমানুষি,' বিস্ময়বোধটা কেটে যেতে স্তার্তসেভ ভাবল। 'কবরখানায় কেন? ওখানে কিসের জন্যে?'

ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিষ্কার, 'মিনিপুষি' তাকে বোকা বানাতে চায়। যখন রাস্তায় ঘাটে বা পার্কে সহজেই দেখা করা সম্ভব কারুর মনে পড়ে তখন অত রাত্রে শহর থেকে অত দূরে দেখা করার ব্যবস্থা! আর তাছাড়া, সে একজন জেমস্তভো-ডাক্তার, সম্ভ্রান্ত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তার পক্ষে কি শোভা পায় একটা মেয়ের জন্যে হাহুতাশ করা, চিঠিপত্রের আদানপ্রদান করা, কবরখানায় ঘুরে বেড়ানো বা এই ধরনের পাগলামি করা যা দেখে আজকালকার ইস্কুলের ছেলেরাও হাসে? এই ঘটনার পরিণতিই বা কী হবে? তার সহকর্মীরা যদি জানতে পারে তারাই বা কী বলবে? ক্লাবের টেবিলগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে স্তার্তসেভ এই সব ভাবছিল, তা সত্ত্বেও কিন্তু সাড়ে দশটা বাজতেই সে কবরখানার দিকে বেরিয়ে পড়ল।

এখন তার নিজস্ব গাড়িঘোড়া হয়েছে, সঙ্গে কোচোয়ানও আছে। কোচোয়ানের নাম পান্তেলেইমন, ভেলভেটের ওয়েস্টকোটটা সে পরেছে। জ্যোৎস্না রাত। চারদিক স্তব্ধ ও স্নিগ্ধ, আকাশে বাতাসে শরতের স্নিগ্ধতা। নগরের উপকণ্ঠে কশাইখানার কাছে কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। নগর প্রান্তে একটা গলিতে গাড়ি থেকে নেমে স্তার্তসেভ পায়ে হেঁটে কবরখানার দিকে চলল। প্রত্যেকেরই নিজস্ব খেয়াল আছে, সে নিজেকে বোঝায়। 'মিনিপুষি' যেরকম অদ্ভুত ধরনের মেয়ে, কে বলতে পারে হয়ত সে ঠাট্টাছলে লেখেনি, হয়ত সত্যিই সেখানে হাজির থাকবে। এই ক্ষীণ মিথ্যা আশার ছলনায় সে আত্মসমর্পণ করল।

তার গন্তব্যস্থানে যাবার রাস্তার শেষ অংশটুকু একটা মাঠের মধ্যে দিয়ে। কবরখানাটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে একটা কালো রেখা, আবছা যেন বনানীবলয় কিংবা প্রকাণ্ড একটা বাগান। আরো কাছে আসতে সাদা একটা পাথরের প্রাচীর নজরে পড়ল। তারপরে, একটা প্রবেশদ্বার... চাঁদের আলোয় প্রবেশদ্বারের উপরে খোদিত লিপিটা পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে: 'তোমারও সময় আসবে।' ছোটো ফটকটা ধাক্কা দিয়ে খুলে স্তার্তসেভ ভিতরে ঢুকল। সামনেই দেখল সুপরিসর এক বীথিকা, তার উভয়পার্শ্বে শ্বেতবর্ণ ক্রুশ, স্মারকস্তম্ভ এবং দীর্ঘকায় পপলার গাছ। তাদের দীর্ঘ কালো ছায়া পথের

উপর পড়েছে। সব কিছু হয় কালো নয় সাদা। নিঝুম গাছগুলো সাদা পাথরের স্তম্ভগুলোর উপর ডালপালা ছড়িয়ে রয়েছে। মাঠের চেয়ে এখানে যেন বেশি আলো। মেপল গাছের পাতাগুলোকে দেখাচ্ছে যেন কতকগুলো থাবা। বীথিকার হলদে বালি আর কবরগুলো পিছনে থাকায় সেগুলো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্মারকস্তম্ভগুলোর উপরকার খোদিত লিপিগুলিও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। স্তার্তসেভের ভাবতে অবাক লাগল যে জীবনে এই প্রথম এমন একটা জগত তার দৃষ্টিগোচর হল যে জগতকে হয়ত সে আর কখনো দেখবে না—এ জগতের সঙ্গে অন্য কোনো জগতের মিল নেই, এ জগতে জ্যোৎস্না এমন কোমল ও মধুর যে মনে হয় এটা বুঝি জ্যোৎস্নার দোলনা। জীবন-স্পন্দনহীন এ জগতের সর্বত্র, ছায়ায় ঢাকা প্রতিটি পপলার, প্রতিটি সমাধির মধ্যে অনন্ত জীবনের আশ্বাসভরা এক রহস্যের অস্তিত্ব। কবরগুলো থেকে, শুকু ফুল ও পচা পাতার শরৎকালীন গন্ধ থেকে বিপদ এবং শান্তি যেন আসছে ভেসে।

সর্বত্র স্তব্ধতা। আকাশের তারারা নিচের দিকে চেয়ে রয়েছে বিনয়াবনত দৃষ্টিতে। স্তার্তসেভের পদশব্দ এই স্তব্ধতায় কর্কশ বেসুরো শোনাচ্ছে; গীর্জার ঘড়িতে যখন ঘণ্টা বাজতে লাগল এবং স্তার্তসেভের যখন মনে হচ্ছিল সে মরে গেছে ও চিরকালের মতো তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছে, সেই মুহূর্তে সে বোধ করল তার দিকে কে যেন তাকিয়ে রয়েছে। নিমেষের জন্যে তার মনে হল এটা নিস্তব্ধতা বা শান্তি নয়, এটা অনস্তিত্বের ও অবদমিত হতাশায় ভরা গভীর বিষণ্ণতা...

দেমেটির স্মারকস্তম্ভটি একটি মন্দিরের আকারে, আর চূড়ায় দেবদূতের মূর্তি। অতীতে এক সময় ইতালীয় এক অপেরা-দল এই শহরে আসে এবং তাদের এক গায়িকা এখানে মারা যায়। তাকে এখানেই কবরস্থ করা হয়। তারই স্মৃতিরক্ষার্থে এই স্মারকস্তম্ভটি। শহরে তাকে কেউ মনে রেখেছে বলে মনে হয় না, কিন্তু তার সমাধিদ্বারে যে দীপাধারটি ঝুলছে চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হওয়ায় মনে হচ্ছে সেটা যেন জ্বলছে।

কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। এই মধ্যরাতে এখানে কে আসতে যাবে? কিন্তু স্তার্তসেভ অপেক্ষা করে রইল। চাঁদের আলোর স্পর্শ পেয়ে তার কামনা যেন তীব্রতর হয়ে উঠল। সাগ্রহে সে প্রতীক্ষা করতে লাগল, কত আলিঙ্গন, কত

চুম্বনের কল্পনায় তার মন উঠল ভরে। প্রায় আধ ঘণ্টা সে কবরটার পাশে বসে রইল, তারপরে টুপিটা হাতে নিয়ে পার্শ্ববর্তী বীথিকায় পায়চারি করতে করতে লাগল অপেক্ষা করতে। সে কল্পনা করতে লাগল এই কবরগুলোর মধ্যে যত তরুণী ও মহিলা সমাধিস্থ রয়েছে তাদের মধ্যে কতজন ছিল সুন্দরী ও মোহিনী, কতজন ভালোবেসেছিল আর প্রেমিকের আলিঙ্গনবন্ধনে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হয়ে কত রাত্রি প্রেমানলে দগ্ধ হয়েছিল। জননী প্রকৃতি মানুষকে নিয়ে এ কী ক্রূর উপহাস করে চলে! এটা মেনে নেওয়া কী অপমানকর। এই সব ভাবতে ভাবতে স্তার্তসেভের ইচ্ছা হল চিৎকার করে বলে, ভালোবাসা তার চাই, যেমন করে হোক ভালোবাসা তাকে পেতেই হবে! সাদা সাদা প্রস্তরফলকের কথা আর সে চিন্তা করছে না, এখন তার চিন্তায় রয়েছে শুধু সুন্দর মানবদেহ। সে দেখছে গাছের ছায়ার আড়ালে সেই দেহগুলিকে সলজ্জভাবে লুকিয়ে থাকতে, সে অনুভব করছে তাদের অঙ্গের উত্তাপ। শেষ পর্যন্ত তার অসহ্য মনে হয় প্রণয়ক্লান্তি।

মেঘের আড়ালে চাঁদটা ঢাকা পড়তে হঠাৎ যবনিকাপাতের মতো চারদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ফটকটা খুঁজে বার করা স্তার্তসেভের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল, কারণ শারদ রাত্রির মতোই অন্ধকার এখন ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। যেখানে সে তার গাড়িটা ছেড়ে এসেছিল সেই গলিটার সন্ধান করতে তাকে প্রায় দেড়ঘণ্টা ঘোরাফেরা করতে হল।

‘এত ক্লান্ত যে দাঁড়াতে পারছি না,’ সে বলল পান্তেলেইমনকে, এবং আরাম করে আসনে বসে সে নিজেকে বলল:

‘এত মোটা হওয়া চলবে না!’

৩

বিয়ের প্রস্তাব করার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে পরের দিন সন্ধ্যেয় সে তুরকিনদের ওখানে গেল। কিন্তু লগ্ন অনুকূল ছিল না। কারণ ইয়েকাতেরিনা ইভানভনার শয়নকক্ষে কেশপ্রসাধিকা তার কেশ প্রসাধনে ব্যস্ত। ক্লাবে একটা নাচের অনুষ্ঠানে যাবার জন্যে সে তৈরি হচ্ছে।

আরেকবার অনেকক্ষণ ধরে তাকে খাবার ঘরে বসে থাকতে হল চা নিয়ে। অতিথিকে বিমর্ষ ও চিন্তান্বিত দেখে ইভান পেত্রোভিচ ওয়েস্ট কোটের

পকেট থেকে কিছু কাগজপত্র বের করে আনল এবং ভাঙা রাশিয়ানে লেখা এক জার্মান পরিদর্শকের ভীষণ মজার একটা চিঠি চিৎকার করে পড়ে চলল।

'ওকে হয়তো ওরা ভালো যৌতুক দেবে,' অন্যমনস্ক হয়ে শুনতে শুনতে স্তার্তসেভ ভাবল।

বিনিদ্র রজনী যাপনের পর সে যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল— যেন মিষ্টি একটা ঘুমের ওষুধ পান করেছে। স্বপ্নময় মধুর উষ্ণ অনুভূতিতে তার অন্তর ভরে উঠেছে। কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে গুরুভার একটা শীতল কণিকা তার সঙ্গে সমানে তর্ক করে চলল:

'অতিরিক্ত দেরী হয়ে যাবার আগে সংযত হও। ও মেয়ে কি তোমার উপযুক্ত? ও বেয়াড়া, ও খামখেয়ালী, দুপুর দুটো পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমোয়, আর তুমি, একজন জেমস্তভো ডাক্তার, এক সেক্সটনের ছেলে...'

'হলই বা, তাতে হয়েছে কী?' সে ভাবল।

'তাছাড়া ও মেয়েকে বিয়ে করলে,' সেই কণিকাটি বলে চলল, 'ওর আত্মীয়স্বজনদের চেষ্টা হবে তুমি যাতে জেমস্তভোর কাজ ছেড়ে দিয়ে শহরে এসে বসবাস কর।'

'তাই যদি হয়,' সে ভাবল, 'শহরে থাকতেই বা ক্ষতি কী? মেয়েকে তো ওরা যৌতুক দেবেই, তাই দিয়ে আমরা সংসার পাতব ...'

অবশেষে ইয়েকাতেরিনা ইভানভনার আবির্ভাব হল। বলনাচের বুক-কাটা পোশাকে তাকে যেমন সজীব তেমনি সুন্দর দেখাচ্ছে। স্তার্তসেভ প্রাণভরে তাকে দেখে নিল, দেখতে দেখতে সে এমনি বিভোর হয়ে গেল যে একটা কথাও মুখ দিয়ে বেরুল না, তার দিকে তাকিয়ে শুধু হাসতে লাগল।

ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা উপস্থিত সবাইকার কাছ থেকে বিদায় নিল। স্তার্তসেভও বসে থেকে কী আর করবে, দাঁড়িয়ে উঠে সবাইকে জানিয়ে দিল তারও বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে, রোগীরা তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

'করার কিছু নেই,' ইভান পেত্রোভিচ বলল। 'যেতে পারেন! মিনিপুষিকে তাহলে আপনার গাড়িতেই পৌঁছিয়ে দিন না!'

বাইরে বেশ অন্ধকার, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। পান্তেলেইমনের ঘংঘঙে কাশির শব্দ লক্ষ্য করে তারা শুধু বুঝতে পারছিল গাড়িটা কোথায় রয়েছে। গাড়ির হুডটা ওঠানো হল।

মেয়েকে গাড়িতে তুলে দিতে দিতে ইভান পেত্রোভিচ অনর্গল রসিকতা করে চলল এবং হাসিমুখে এই বলে তাদের বিদায় দিল: 'এসো তা হলে!'

তারা গাড়িতে চেপে চলে গেল।

'কাল আমি গোরস্থানে গিয়েছিলাম,' স্তার্তসেভ বলল। 'কী নিষ্ঠুর, কী নির্দয় আপনি...'

'গোরস্থানে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, প্রায় দুঘণ্টা আপনার জন্যে অপেক্ষা করলাম। কী যে কষ্ট...'

'ঠাট্টা না বুঝলে সহ্য করতে হয়।'

তার গুণমুগ্ধ এই পাগলটাকে এমন সুন্দরভাবে ঠকাতে পেরেছে দেখে এবং সে তাকে এত গভীর ভাবে ভালোবাসে জেনে ইয়েকাতেরিনা ইভানভনার খুশি আর ধরে না। সে হাসিতে ফেটে পড়ল। পরমুহূর্তেই ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল, কারণ ক্লাবের ফটক দিয়ে প্রবেশ করার জন্যে ঘোড়াগুলো বেগে মোড় ঘুরতেই গাড়িটা ধাক্‌কা খেয়ে এক পাশে হেলে গেল। স্তার্তসেভ হাত দিয়ে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরল। ভয় পেয়ে সেও স্তার্তসেভের কাছে সরে গেল। স্তার্তসেভ আর থাকতে পারল না, তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটে গালে আবেগভরে চুম্বন করে চলল।

'অনেক হয়েছে,' ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা নিরুত্তাপভাবে বলল।

পরমুহূর্তেই সে আর গাড়িতে নেই। আলোয় ঝলমল ক্লাবের প্রবেশদ্বারে যে পুলিসটা দাঁড়িয়েছিল সে তখন পান্তেলেইমনের উদ্দেশে বিকটভাবে চিৎকার করে বলছে:

'এই হাবা, খাড়া হয়ে রয়েছ কেন? হাটো!'

স্তার্তসেভ বাড়ি ফিরে গেল, কিন্তু শীঘ্রই ফিরে এল। অপরের একটা ফ্রককোট পরে এবং কড়াগোছের সাদা কুঁচকে যাওয়া একটা টাই গলায় লাগিয়ে, টাইটা আবার বেঁকে গেছে, তাকে মধ্যরাত্রে দেখা গেল ক্লাবের বসার ঘরে বসে ইয়েকাতেরিনা ইভানভনাকে উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে চলেছে:

'যারা কখনো ভালোবাসেনি তারা কত কম জানে। আমার মনে হয় আজ পর্যন্ত কেউই প্রেমের যথার্থ বর্ণনা দিতে পারেনি, বাস্তবিকই এই বেদনাভরা সুকুমার আনন্দানুভূতিকে প্রকাশ করা অসম্ভব। জীবনে একবার হলেও ভালোবাসা যে কী যে জেনেছে, সে কখনো ভাষায় তা প্রকাশের চেষ্টা করবে না।

কী দরকার এই সব ভণিতার, এই সব বর্ণনার? কেনই বা এই বাগাড়ম্বর? আমার ভালোবাসার যে সীমা নেই ... আপনার কাছে আমি ভিক্ষা চাইছি,' স্তার্তসেভ শেষ পর্যন্ত মনের কথা বলে ফেলে বক্তব্য শেষ করল, 'আমার স্ত্রী হবার সম্মতি দিন!'

একটু থেমে ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা মুখে অত্যন্ত গম্ভীর ভাব এনে বলল, 'দ্মিত্রি ইয়োনিচ, আপনি আমাকে যে মর্যাদা দিতে চান, তার জন্যে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। আপনি আমার শ্রদ্ধার পাত্র কিন্তু...' সে দাঁড়িয়ে উঠে বলে চলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার পক্ষে আপনার স্ত্রী হওয়া অসম্ভব। খোলাখুলিভাবেই আমাদের বক্তব্য বলা ভালো। দ্মিত্রি ইয়োনিচ, আপনি ভালোমতই জানেন, জীবনে আমি সবচেয়ে ভালোবাসি শিল্পকলা, সঙ্গীত আমার প্রাণের প্রিয়, সঙ্গীতের জন্যে আমি পাগল, তারই সাধনায় আমার জীবন উৎসর্গ করেছি। আমি খুব বড় বাজিয়ে হতে চাই, নাম যশ স্বাধীনতা —এসব আমি চাই, আর আপনি আমাকে এই শহরের মধ্যে বন্দী থাকতে বলেন, এখানকার এই একঘেয়ে নিষ্ফল জীবন যাপন করতে, যা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। শুধু কারো স্ত্রী হয়ে থাকা? না, না, না, আপনাকে ধন্যবাদ, কিন্তু না! প্রত্যেক লোকেরই মহৎ উজ্জ্বল কোনো আদর্শ থাকা উচিত। সংসার করতে গেলে চিরদিনের জন্যে আমি জড়িয়ে পড়ব। দ্মিত্রি ইয়োনিচ,' (তার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল, কারণ 'দ্মিত্রি ইয়োনিচ' বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল 'আলেক্সেই ফিওফিলাকতিচ') 'দ্মিত্রি ইয়োনিচ, আপনি দয়ালু ও উদার। আপনি বুদ্ধিমান, আর সবার চেয়ে আপনি অনেক ভালো,' বলতে বলতে তার চোখদুটো জলে ভরে এল, 'আপনার জন্যে সত্যি আমার মন কাঁদে, কিন্তু... কিন্তু, আমি ঠিক জানি আপনি আমায় বুঝবেন...'

কান্না চাপতে সে মুখটা ফিরিয়ে বসার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্তার্তসেভ উদ্বেগ ও আশঙ্কার হাত থেকে মুক্তি পেল। ক্লাব থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রাস্তায় পৌঁছিয়ে প্রথমেই সে তার গলার শক্ত টাইটা ছিঁড়ে ফেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিছুটা লজ্জা, কিছুটা অপমান সে বোধ করছিল— প্রত্যাখ্যানটা তার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত—সে ভাবতেই পারেনি তার সব আশা আকাংক্ষা, সব কামনার পরিণতি এমন হাস্যকর ও তুচ্ছ হয়ে

যাবে, সৌখিন নাটুকে দল কোনো ছোট প্রহসন অভিনয় করলে তার শেষদৃশ্য যেমন দাঁড়ায় অনেকটা সেইরকম। যা সে এতদিন ধরে বোধ করেছে, তার এই ভালোবাসা, এর জন্যে তার এত অনুতাপ হল যে তার ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছা করছিল। ইচ্ছা করছিল পান্তেলেইমনের ওই চওড়া কাঁধটায় তার ছাতি দিয়ে সজোরে বাড়ি মারতে।

তিনদিন তার কোনো কিছুই ঠিক রইল না, সে খেল না, ঘুমোল না, কিন্তু যেই খবর পেল ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা সঙ্গীত কলেজে ভর্তি হবার জন্যে মস্কোয় গেছে সে শান্ত হয়ে আগেকার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেল।

পরে যখনই তার মনে পড়েছে কবরখানায় কী ভাবে সে ঘুরে বেরিয়েছে, কী ভাবে একটা ফ্রককোট খুঁজে বের করতে সারা শহর সে চুঁড়ে বেরিয়েছে, হাত পা এলিয়ে দিয়ে সে নিজেকেই বলেছে:

'কী দুর্ভোগ!'

৪

চার বছর কেটে গেছে। শহরে স্তার্তসেভের বেশ পসার জমে উঠেছে। প্রতিদিন সকালে দ্যালিজে রোগীদের পরীক্ষা তাড়াহুড়া করে সেরে নিয়ে সে শহরে রোগী দেখতে বেরিয়ে যায়, বাড়িতে ফিরে আসে অনেক রাতে। এখন সে চলাফেরা করে জুড়ি গাড়িতে নয়, তিনঘোড়াওয়ালা গাড়িতে, তাতে আবার ঘণ্টা লাগানো। তার দেহের মেদ বৃদ্ধি হয়েছে। হাঁটতে চেষ্টা করে না, হাঁটলে তার বুক ধড়ফড় করে। পান্তেলেইমনও আরো মোটা হয়েছে, যতই তার আকার ব্যাপক হচ্ছে ততই সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের দুরদৃষ্টের কথা বলে আপশোস করে: 'কেবল ঘোরা আর ঘোরা।'

স্তার্তসেভ অনেক বাড়িতেই যায়, অনেক লোকের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করে কিন্তু কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয় না। শহরের লোকদের কথাবার্তা, মতামত, এমনকি তাদের চেহারা পর্যন্ত তার কাছে বিরক্তিকর মনে হয়। ক্রমে ক্রমে সে শিখেছে 'এস্' শহরের কূপমণ্ডূকের সঙ্গে যতক্ষণ তাস খেলবে বা একসঙ্গে বসে খাবে, ততক্ষণ তাকে শান্তিপ্রিয় আমুদে, কিছুটা বুদ্ধিমান বলেও মনে হবে, কিন্তু খাদ্য ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে, যেমন রাজনীতি বা বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনার মোড় ঘুরলেই হয় সে বোকার মতো তাকিয়ে থাকবে, নয়ত

মাথামুণ্ডু নেই এমন সব তত্ত্বকথা আওড়াতে থাকবে যে তা শুনে তার সঙ্গ ত্যাগ করে সরে পড়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। উদারমতাবলম্বী কোনো এক ব্যক্তিকে স্তার্তসেভ হয়ত বোঝাতে চেষ্টা করে, ভগবানের দয়ায় মানবজাতি উন্নতির পথে চলেছে, সময়ে এক দেশ থেকে অপর দেশে যাবার ছাড়পত্র বা মৃত্যুদণ্ডের মতো শাস্তির প্রয়োজন লোপ পাবে, সেই ব্যক্তি সন্দিগ্ধ চোখে তার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে বসে: 'তাহলে তখন তো রাস্তায় ঘাটে যে-সে যার-তার গলা কাটবে, বলার কেউ থাকবে না।' চা খেতে খেতে বা রাত্রে খাবার টেবিলে বসে স্তার্তসেভ হয়ত বলল, প্রত্যেকের কাজ করা উচিত, অকাজের জীবন অসম্ভব। উপস্থিত সবাই এই মন্তব্য ভর্ৎসনা হিসেবে নিয়ে তুমুল তর্ক করতে লেগে গেল। তার উপর, এইসব কূপমণ্ডূকেরা কিছুই করে না, একেবারে অকর্মণ্য, কোনো বিষয়ে তাদের কৌতূহলও নেই। তাদের সঙ্গে কথা কওয়া যায় এমন কোনো বিষয়ই নেই। স্তার্তসেভ তাই পারতপক্ষে তাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেয় না, তাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাওয়া ও ভিণ্ট্ খেলা পর্যন্তই যথেষ্ট। কারো বাড়িতে গিয়ে কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে কেউ যদি তাকে নিমন্ত্রণ করে, সে চুপচাপ বসে নিজের প্লেটের খাবারের দিকে ছাড়া অন্য কোনো দিকে না তাকিয়ে খেয়ে চলে। কারণ, এই সব উপলক্ষ্যে যা কিছু বলা হয় তার মধ্যে অভিনবত্ব তো থাকেই না, বরঞ্চ সে-সব অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতায় ঠাসা, শুনলে মেজাজ চড়ে যায়। সে নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। ওইরকম স্তব্ধ কাঠিন্যের সঙ্গে সে প্লেটের দিকে তাকিয়ে মুখে কুলুপ লাগিয়ে বসে থাকে বলে শহরে তার নামই হয়ে গিয়েছিল 'তিরিক্ষি পোল', যদিও তার ধমনীতে একবিন্দু পোলিশ রক্ত নেই।

থিয়েটার দেখায় বা কনসার্ট শোনায় তার বিশেষ আসক্তি নেই, কিন্তু প্রতি সন্ধ্যাবেলায় প্রায় ঘণ্টা তিনেক ভিণ্ট খেলে সে খুব আনন্দ পায়। তার চিত্ত বিনোদনের আরো একটা ব্যাপার এবং যেটায় তার আসক্তি নিজের অজান্তেই ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে সেটা হল সারাদিন ধরে ঘুরে সে যত ব্যাঙ্কনোট সঞ্চয় করে সন্ধ্যেবেলায় সেগুলো পকেট থেকে বের করে দেখা। তার পকেটগুলো ঠাসা এই সব নোটে — কোনোটা হলদে, কোনোটা সবুজ, কোনোটা থেকে সুগন্ধ বেরুচ্ছে, কোনোটাতে ভিনিগারের, ধূপের বা আঁশটে গন্ধ — যোগ করলে কখনো সখনো সত্তর রুবলও হয়। এমনি জমে জমে কয়েক

শ' রুবল হলে, মিউচুয়াল ক্রেডিট সোসাইটিতে তার নিজের নামে সে জমা দেয়।

ইয়েকাতেরিনা ইভানভনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার পর চার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এর মধ্যে মাত্র দুবার, তাও ভেরা ইয়োসিফভনার আমন্ত্রণে, এখনো তার মাথা ধরার ব্যামো সারেনি, সে তুরকিনদের ওখানে গিয়েছিল। প্রতি গ্রীষ্মে ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা তার বাপ-মার কাছে এসে থাকে, কিন্তু স্তার্তসেভের সঙ্গে তার কখনোই দেখা হয় না, ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে ওঠে না।

এখন চার বছর পার হয়ে গেছে। শান্ত স্নিগ্ধ এক সকালে হাসপাতালে একখানা চিঠি এল। ভেরা ইয়োসিফভনা দ্মিত্রি ইয়োনিচকে লিখে জানিয়েছে, অনেকদিন তার দেখা না পেয়ে খুব খালি খালি বোধ করছে, সে যেন অতি অবশ্য একবার এসে তাকে দেখে এবং তার কষ্টের লাঘব করে, আরেকটা কথা — আজকের দিনটা তার জন্মদিন। চিঠির শেষে একটা লাইন যোগ করা হয়েছে: 'মা-র অনুরোধের সঙ্গে আমার অনুরোধও যোগ করলাম। ই.।'

স্তার্তসেভ ভালো করে ভেবে নিল এবং সন্ধ্যেবেলায় তুরকিনদের ওখানে গিয়ে হাজির হল। ইভান পেত্রোভিচ তার স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী 'আরে রে রে, কী খবর!' বলে অভ্যর্থনা জানাল, তার সঙ্গে যোগ করল, 'বঁ-জুরতে!' এবং শুধু তার চোখজোড়া হাসিতে ভরিয়ে রাখল।

ভেরা ইয়োসিফভনার উপর ইতিমধ্যে বয়সের বেশ ছাপ পড়েছে, চুলে পাক ধরেছে। স্তার্তসেভের হাতটা চেপে ধরে কৃত্রিম হা-হুতাশ করে সে বলল:

'ডাক্তার, আমার কাছে আসতে আপনার মন চায় না, আমাদের সঙ্গে তাই দেখা করতে আসেন না। আপনার কাছে আমি না হয় বুড়ী, কিন্তু এখন তো তরুণী এখানে হাজির রয়েছে, হয়ত আমার চেয়ে সে বেশি ভাগ্যবতী হবে।'

তারপর আমাদের মিনিপুষির খবর? সে আরো রোগা আরও ফ্যাকাশে হয়েছে, তবুও তার রূপ যেন আরো খুলেছে, চেহারায় আরো লাবণ্য এসেছে। এখন সে আর মিনিপুষি নয়, এখন ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা। তার সেই সজীবতা ও শিশুসুলভ সারল্যের ভাব আর নেই। তার বদলে নতুন কী যেন

একটা এসেছে, চাউনিটা কেমন যেন সন্ত্রস্ত, অপরাধীর মতো, যেন তুরকিনদের এই বাড়িতে সে আর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না।

স্তার্তসেভের হাতে হাত রেখে সে বলল, 'কতদিন আমাদের দেখা সাক্ষাত নেই।' স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল তার বুকের ভিতরে হাতুড়ি পিটছে। স্তার্তসেভের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সে বলে চলল: 'দেখছি আপনি বেশ মোটা হয়ে গেছেন, রোদ-পোড়া হয়েছেন, চেহারাতেও বেশ কর্তৃত্বভাব এসেছে, তা সত্ত্বেও মোটের উপর আপনি তেমন বদলাননি।'

স্তার্তসেভের তাকে ভালো লাগল, খুবই ভালো লাগল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মধ্যে কী যেন এখন আর নেই কিংবা অতিরিক্ত কী যেন আছে, কী যে তা সে বলতে পারবে না। কিন্তু সে যাই হোক এই নতুনত্বের ফলে তাকে ঠিক আগের মতো মনে হল না। স্তার্তসেভের ভালো লাগল না তার বিবর্ণতা, তার মুখের নতুন ভাব, তার ক্ষীণ হাসি, তার কণ্ঠস্বর এবং শীঘ্রই তার রীতিমতো খারাপ লাগতে লাগল তার পোশাকটা, যে চেয়ারটায় সে বসেছিল সেটা, অতীতে যখন সে প্রায় তাকে বিয়ে করে ফেলেছিল তখনকার কী যেন একটা। স্তার্তসেভের মনে পড়ল চার বছর আগে সে কী রকম প্রেমে পাগল হয়ে উঠেছিল, কত স্বপ্ন কত আশা গড়ে তুলেছিল। সে লজ্জা পেল।

চা চলছে, সঙ্গে ক্রিম-দেওয়া রুটি। ভেরা ইয়োসিফভনা সরবে তার উপন্যাস পড়ে চলেছে বাস্তব জীবনে যা ঘটে না এমন সব কাহিনী। স্তার্তসেভ শুনে যাচ্ছে এবং মহিলার সুন্দর সাদা মাথাটার দিকে তাকিয়ে ভাবছে, কতক্ষণে শেষ হবে।

'যে গল্প লিখতে পারে না, সৃজনীশক্তির অভাব তার মধ্যে ততটা নেই,' সে আপন মনে বলল, 'যতটা আছে তার মধ্যে যে লেখে অথচ এই অভাব গোপন করতে পারে না।'

ইভান পেত্রোভিচ বলল, 'মন্দবন্ত নয়!'

তারপর ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা অনেকক্ষণ ধরে পিয়ানোতে শব্দতাণ্ডব চালাল এবং সে থামতে সকলে মিলে অনেকক্ষণ ধরে তাকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাল।

স্তার্তসেভ ভাবল, 'শেষ পর্যন্ত ওকে বিয়ে না করে ভালই করেছি।'

ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা তার দিকে তাকাল, স্পষ্টতই সে আশা করছে

স্তার্তসেভ তাকে বলবে তার সঙ্গে বাগানে যেতে। কিন্তু স্তার্তসেভ চুপচাপ রইল।

স্তার্তসেভের কাছে গিয়ে সে বলল, 'আসুন, গল্প করা যাক। আপনার কী রকম চলছে? কী করে দিন কাটাচ্ছেন? আপনার কথা আমার সব সময়ই মনে হত,' দ্বিধাভরে সে বলে চলল। 'ভেবেছি আপনাকে চিঠি লিখি, দ্যালিজে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করে আসি, ঠিকই করে ফেলেছিলাম যাবো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গেলাম না, ভগবান জানেন আমার সম্বন্ধে এখন আপনার কী মনোভাব। আজ আপনার পথ চেয়ে কী আকুলভাবে প্রতীক্ষা করে ছিলাম। চলুন বাগানে যাই।'

চার বছর আগের মতোই তারা বাগানে গিয়ে সেই পুরনো ম্যাপল গাছটার নিচে বেঞ্চিতে বসল। তখন বেশ অন্ধকার।

'তারপর, কী রকম আছেন?' ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা বলল।

'ভালোই, ধন্যবাদ,' স্তার্তসেভ জবাব দিল।

আর কিছু বলার মতো কোনো কথা সে খুঁজে পেল না। চুপচাপ তারা বসে রইল।

ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা হাত দিয়ে মুখটা চাপা দিয়ে বলল, 'আমি উত্তেজিত। আমার ব্যবহারে কিছু মনে করবেন না! বাড়ি ফিরে আমার কী আনন্দ হয়েছে, সবাইকে দেখে কত খুশি হয়েছি, এত কিছুর মধ্যে নিজেকে যেন কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছি না। আগেকার কত কথা মনে পড়ে। ভেবেছিলাম আজ সারা রাত ধরে আপনি আমি কথা কয়েই কাটিয়ে দেব।'

স্তার্তসেভ দেখতে পাচ্ছে ইয়েকাতেরিনা ইভানভনার মুখখানা, দেখতে পাচ্ছে তার সুন্দর উজ্জ্বল চোখদুটো। এখানে এই অন্ধকারে তাকে যেন ঘরের ভেতরের চেয়ে অনেক কম বয়সের মনে হচ্ছে, এমনকি তার আগেকার সেই শিশুসুলভ সারল্যও যেন ফিরে এসেছে। স্তার্তসেভ দেখতে পেল ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা তার দিকে চেয়ে আছে। সে চাউনিতে অকপট কৌতূহল। সে যেন আরো অন্তরঙ্গ হতে চায়, এই লোকটিকে বুঝতে চায় যে তাকে এককালে কত গভীরভাবে, কত দরদ দিয়ে, কত ব্যর্থভাবে ভালোবেসেছিল। অতীতের সেই ভালোবাসার জন্যে আজ তার চাউনিতে কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ছে। স্তার্তসেভেরও মনে পড়ে গেল যা কিছু ঘটে গেছে,

সব। তুচ্ছতম ঘটনাও বাদ গেল না। গোরস্থানে কীভাবে সে ঘুরে বেড়িয়েছিল, কী ভাবে অনেক রাত্রে পরিশ্রান্ত হয়ে সে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল, সব তার মনে পড়ল। হঠাৎ তার মনটা বিষাদে ভরে গেল। চলে-যাওয়া দিনগুলোর জন্যে তার দুঃখ হল। তার অন্তরে একটি আগুনের শিখা উঠল জ্বলে।

'আপনার মনে আছে সেই রাতের কথা যখন আপনাকে আমি ক্লাবে নিয়ে যাই?' সে বলল। 'তখন বৃষ্টি পড়ছিল, চারদিক অন্ধকার ছেয়ে ছিল ...'

অন্তরের শিখাটা ক্রমশ বড় হয়ে উঠল, এবারে তার মন কথা কইতে চাইল, চাইল জীবন সম্পর্কে হাহুতাশ করতে...

'হা আমার কপাল!' দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সে বলে, 'কী নিয়ে দিন কাটে আপনি জিজ্ঞাসা করছিলেন না? জানতে চান কী ভাবে আমরা বেঁচে আছি? আমরা বেঁচেই নেই। আমরা শুধু বুড়ো হই আর মোটা হই আর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিই। দিনের পর দিন, এই করে জীবনটাই চলে যায় — বৈচিত্র্যহীন ক্লিন্নতায় ভরা এ জীবনে না আছে কোনো গভীর অনুভূতি, না আছে কোনো চিন্তার বালাই ... রোজগার করতে সারা দিন কেটে যায়, আর সন্ধ্যেটা কাটে ক্লাবে, তাসের আড্ডায় মাতাল ও হল্লাবাজদের সঙ্গে, যাদের আমি ঘৃণা করি। কী একঘেয়ে জীবন!'

'কিন্তু আপনার তো কত কাজ করার আছে, জীবনের একটা মহৎ আদর্শ আছে। আপনার হাসপাতালের বিষয়ে গল্প বলতে আগে কী ভালোবাসতেন। তখন আমি কী রকম অদ্ভুত ধরনের ছিলাম, নিজেকে মনে করতাম বড় একজন পিয়ানো-বাজিয়ে। আজকাল সব মেয়েই পিয়ানো বাজায়, সবাইকার মতো আমিও বাজাতাম। এতে কিছুমাত্র আমার বিশেষত্ব ছিল না। মা যেমন ঔপন্যাসিক আমিও তেমনি পিয়ানো-বাজিয়ে। তখন সত্যিই আমি আপনাকে বুঝতে পারিনি, কিন্তু পরে, মস্কোয় গিয়ে প্রায়ই আপনার কথা মনে হত। আর কোনো কিছুই আমার মনে আসত না। জেমস্তভো-ডাক্তার হওয়ার মতো আনন্দ আর কি কিছুতে আছে, মানুষের সেবা করা, তাদের যন্ত্রণা দূর করতে সহায়তা করা—এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে?' ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা উৎসাহের সঙ্গে বলে চলল। 'মস্কোয় যখনই আপনার কথা ভেবেছি, আপনাকে একজন আদর্শ ও উন্নত চরিত্রের লোক বলে মনে হয়েছে ...'

স্তার্তসেভের মনে পড়ে গেল প্রতি সন্ধ্যায় পকেট থেকে নোটগুলো বের করে সে কী তৃপ্তিলাভ করে, সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরের আগুনটা নিভে গেল।

সে বাড়ির ভিতরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা তার হাতটা ধরে ফেলল।

'আপনার মতো এত ভালো লোক আমি কখনো দেখিনি,' সে বলে চলল, 'আমাদের দুজনের আবার দেখা হবে, আবার কথা হবে, হবে না? কথা দিন, হবে। নিঃসন্দেহে সত্যিকারের পিয়ানো-বাজিয়ে আমি নই, আপনার সামনে আর কখনো আমি গানবাজনা করব না, এমনকি আলোচনা পর্যন্ত না।'

বাড়ির ভিতরে এসে স্তার্তসেভ ঘরের আলোয় ইয়েকাতেরিনা ইভানভনার মুখখানা দেখল, দেখল সে তার দিকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, সে দৃষ্টি যেমন বিষাদ-করুণ তেমনি অন্তর্ভেদী। স্তার্তসেভ একটু অস্বস্তি বোধ করল, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিল:

'ওকে বিয়ে না করে ভালোই করেছি।'

স্তার্তসেভ এবারে বিদায় নিল।

'না খেয়ে চলে যাওয়ার কোনো পার্থিব অধিকার আপনার নেই,' ইভান পেত্রোভিচ তাকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল। 'আপনার পক্ষে ইহা অতীব আশ্চর্য ব্যবহার। কই রে, খেলা দেখা!' হলে গিয়ে সে পাভার দিকে ফিরে চিৎকার করে বলল।

পাভা আর ছোট ছেলেটি নেই, সে এখন যুবক, তার গোঁফ গজিয়েছে। যথারীতি সে অদ্ভুত এক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে পড়ে একটা হাত উপর দিকে তুলে বিয়োগান্তক গলায় বলল:

'মর হতচ্ছাড়ী!'

এইসব স্তার্তসেভের মনে শুধু বিরক্তি উৎপাদন করে। গাড়িতে ওঠার সময় অন্ধকার বাড়িটা ও এককালে তার অতি প্রিয় বাগানটার দিকে তাকিয়ে নিমেষের মধ্যে সব কিছু তার মনে ভেসে যায় — ভেরা ইয়োসিফভনার উপন্যাসগুলো, পিয়ানোয় মিনিপুষির শব্দতাণ্ডব, ইভান পেত্রোভিচের রসিকতা, পাভার কাতর ভঙ্গী। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে, 'সারা শহরের সবচেয়ে প্রতিভাবান পরিবার যদি এইরকম অতি সাধারণ পর্যায়ের হয়, এই শহরের কাছ থেকে কী আশা করা যেতে পারে?'

তিনদিন পরে পাভা ইয়েকাতেরিনা ইভানভনার কাছ থেকে একখানা চিঠি নিয়ে এল।

'আপনি কই, আর তো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন না। কেন?' সে লিখেছে। 'আমার ভয় হচ্ছে আমাদের সম্বন্ধে আপনার মনোভাব বদলে গেছে। আমাকে আশ্বস্ত করুন, একবার এসে বলে যান সব ঠিক আছে। আপনার দেখা যেন নিশ্চয়ই পাই। আপনার ই. ত.।'

স্তার্তসেভ চিঠিখানা একবার পড়ল, তারপর মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করে পাভাকে বলল:

'শোন হে, বলো গিয়ে আজ আমি আসতে পারছি না। ভীষণ ব্যস্ত। দু একদিনের মধ্যেই যাবো।'

কিন্তু তিনদিন চলে গেল, এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল, সে গেল না। একবার তুরকিনদের বাড়ির সামনে দিয়ে গাড়িতে চেপে যেতে যেতে তার মনে হয়েছিল একবার, অন্তত কয়েক মিনিটের জন্যে দেখা করে আসা উচিত, কিন্তু দ্বিতীয়বার চিন্তা করে সে আর থামেনি।

পরে আর কখনো সে তুরকিনদের বাড়ি মাড়ায়নি।

৫

আরও কয়েক বছর কেটে গেল। স্তার্তসেভ আরো মোটা হয়েছে, রীতিমত জরদ্‌গব হয়ে গেছে, সবসময় হাঁফায়, চলার সময় মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে দেয়। তার লাল মুখ ও বিরাট বপুখানা নিয়ে তিনঘোড়ার ঘণ্টা বাজানো গাড়িতে চেপে সে যখন যায়, সে একটা দৃশ্য। কোচোয়ানের আসনে থাকে পান্তেলেইমন, তারও অমনি লাল মুখ, অমনি বিরাট শরীর, পিছনে ঘাড়ের উপর থাকে থাকে চর্বি জমেছে, হাতদুটো সামনের দিকে এমনভাবে বাড়িয়ে থাকে মনে হয় সেগুলো যেন কাঠের, আর সামনের দিক থেকে যারা গাড়ি চালিয়ে আসে তাদের উদ্দেশ্যে সমানে চিৎকার করে: 'ডাইনে চলো, ডাইনে!' মনে হয়, মানুষ নয়, কোনো ঠাকুর দেবতা চলেছে। শহরময় আজকাল এত পসার যে নিশ্বাস ফেলারও তার অবকাশ নেই। একটা জমিদারির সে এখন মালিক, শহরে দুটো বাড়ি তো আছেই, আরো একটা কেনার তাল

করছে। সেটাতে নাকি লাভ হবে আরো বেশি। ম্যুচুয়াল ক্রেডিট সোসাইটির কাছ থেকে যখনই সে খবর পেত শীঘ্রই কোনো বাড়ি নিলাম হবে, কোনো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকে যেত এবং প্রতিটি ঘরের ভিতরে গিয়ে গিয়ে দেখে আসত। মেয়েরা হয়ত ঠিকমত পোশাক পরে নেই, বাচ্চারা হয়ত খেলা করছে, তাকে দেখে যতই তারা ভয়ে ও বিস্ময়ে অবাক হোক না কেন, তার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই, প্রতিটি ঘরের দরজায় সে তার হাতের লাঠিটা দিয়ে ঠুকে জিজ্ঞাসা করে চলে:

'এটা কি পড়ার ঘর? এটা কি শোবার ঘর? এই ঘরটা কীসের?'

এবং সর্বক্ষণ সে ফোঁস ফোঁস করে হাঁফাতে থাকে ও কপালের ঘাম মোছে।

এখন তাকে অনেক কিছু নিয়ে ভাবতে হয়। তবুও কিন্তু সে জেমস্তভো-ডাক্তারের চাকরিটা ছাড়েনি। এখন সে পুরোপুরি লোভের কবলে, যেখান থেকে যা কিছু পাওয়া যায় কিছুই সে ছাড়বে না। দ্যালিজে এবং শহরের সর্বত্র সবাই এখন তার নামকরণ করেছে — 'ইয়োনিচ'। 'ইয়োনিচ গেল কোথায়?' কিংবা 'ইয়োনিচকে একবার ডাকলে হত না?'

গলার চারপাশে স্তরে স্তরে চর্বি পড়াতে তার গলার আওয়াজটা তীক্ষ্ণ ও কর্কশ হয়ে উঠেছে। তার মেজাজও বদলে গেছে। আজকাল সে যেমন রূঢ় তেমনি খিটখিটে। রোগী দেখতে দেখতে ইদানীং সে প্রায়ই চটে যায়, অধৈর্য হয়ে মেঝের উপর লাঠি ঠুকতে ঠুকতে কর্কশ গলায় চিৎকার করে ওঠে:

'যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দিন, আজেবাজে বকবেন না।'

সে একা থাকে। জীবনে তার সুখ নেই, কিছুতেই তার আগ্রহ নেই।

দ্যালিজে আসার পর থেকে এই দীর্ঘকালের মধ্যে একবার মাত্র সে আনন্দ পেয়েছিল মিনিপুষির প্রতি তার ভালোবাসায়। সম্ভবত সে-ই তার জীবনের শেষ আনন্দদায়ক ঘটনা। সন্ধ্যেবেলা সে ক্লাবে গিয়ে ভিণ্ট খেলে, তারপর মস্ত খাবার টেবিলটায় একা বসে খায়। তাকে পরিবেশন করে ইভান। ক্লাবের পরিচারকদের মধ্যে ইভানই সবচেয়ে পুরনো, সবাই তাকে সমীহ করে। ১৭ নং লাফিত স্তার্তসেভকে পরিবেশন করা হয়। ক্লাবের প্রত্যেকে — পরিচালকরা, পাচক ও ভৃত্যরা — সবাই জানে তার কী পছন্দ, কী অপছন্দ। তারা প্রত্যেকে তার মনোরঞ্জন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কারণ কোনো কিছুর ত্রুটি হলে আর রক্ষে নেই, সে খাপ্পা হয়ে মেঝেয় লাঠি ঠুকতে শুরু করে দেবে।

রাত্রে খেতে বসে সে কখনো সখনো মুখটা ফিরিয়ে আলোচনায় যোগ দেয়।

'কি হে, কীসের কথা বলছ? কার সম্পর্কে? এ্যাঁ?'

পাশের টেবিলে আলোচনাটা যদি তুরকিনদের নিয়ে হয়, সে তাহলে জিজ্ঞাসা করে:

'তুরকিনদের কথা বলছ? সেই যাদের মেয়ে পিয়ানো বাজাতে পারে?'

স্তার্তসেভ সম্পর্কে বলার আর কিছু নেই।

আর তুরকিনদের সম্পর্কে? ইভান পেত্রোভিচের চেহারায় হাবেভাবে এখনো বয়সের ছাপ পড়েনি, সে যেমন ছিল তেমনি আছে, এখনো তেমনি ঠাট্টা তামাসা করে ও মজার মজার গল্প করে। ভেরা ইয়োসিফভনা অতিথি অভ্যাগতদের সামনে তেমনি দিলখোলা উৎসাহ নিয়ে তার উপন্যাস পড়ে। আর মিনিপুষি দিনে চারঘণ্টা করে বাজনার কসরত করে। তার চেহারায় বয়সের বেশ ছাপ পড়েছে, প্রায়ই অসুস্থ হয় এবং প্রতি বৎসর শরৎকালে তার মা-র সঙ্গে ক্রিমিয়ায় যায়। তাদের ট্রেনে তুলে দিতে আসে ইভান পেত্রোভিচ। ট্রেনটা স্টেশন ছেড়ে যেই চলে যেতে থাকে চোখ মুছতে মুছতে সে বলে: 'এসো!'

আর চলন্ত ট্রেনের দিকে রুমাল নাড়তে থাকে।

১৮৯৮

খোলসের লোক

মিরনোসিৎস্কয়ে গ্রামে পেঁছবার ঠিক আগেই অন্ধকার নেমে এল, শিকারীরা ঠিক করল গাঁয়ের মোড়ল প্রকোফির আটচালাতেই রাতটা কাটিয়ে দেবে। ওরা ছিল শুধু দুজন। পশুচিকিৎসক ইভান ইভানিচ আর হাইস্কুলের মাস্টার বুর্‌কিন। ইভান ইভানিচের পদবীটা একটা অদ্‌ভুত সমাস-বদ্ধ পদ দিয়ে তৈরি — চিমশা-হিমালাইস্কি। ও নাম তাকে মানাতো না, সকলে তাই তাকে তার স্বনাম ও পৈত্রিক নাম মিলিয়ে ইভান ইভানিচ বলে ডাকতো। শহর থেকে অল্প দূরেই একটা ঘোড়ার বাথানে সে থাকত—খোলা হাওয়ায় খানিকটা ঘুরে বেড়ানোর জন্যে আজ শিকারে বেরিয়েছিল। হাইস্কুলের শিক্ষক বুরকিন প্রতি গ্রীষ্ম কাটাতো কাউণ্ট 'পি'-এর তালুকে — ওখানকার অধিবাসীরা তাকে নিজেদের একজন বলেই মনে করত।

আটচালায় ওদের কারুরই ঘুম এল না। দীর্ঘকায়, লম্বা গোঁফওয়ালা, কৃশ বৃদ্ধ ইভান ইভানিচ দরজার বাইরে চাঁদের আলোয় বসে বসে পাইপ টানতে শুরু করল। বুরকিন রইল ঘরের ভেতরে খড়ের গাদার ওপর শুয়ে, অন্ধকারে তাকে দেখা যাচ্ছিল না।

সময় কাটাবার জন্যে ওরা পরস্পরকে গল্প শোনাচ্ছিল। মোড়লের বৌ মাভ্‌রার কথা উঠল। নিখুঁত স্বাস্থ্যবতী মেয়েটি, বুদ্ধিশুদ্ধিও মন্দ নয়, কিন্তু জীবনে সে কখনও গ্রাম ছেড়ে বাইরে যায়নি। জীবনে কখনো সে শহর কি রেলপথ দেখেনি আর শুধু চুল্লীর পাশে বসেই কাটিয়েছে শেষ দশটি বছর। বাইরে যদি বা বেরিয়েছে সে কেবল রাত্রে।

বুরকিন বলল, 'সে আর কি এমন আশ্চর্য কথা। পৃথিবীতে এরকম লোক প্রচুর আছে যারা স্বভাবতই কুনো, কাঁকড়া বা শামুকের মতো তারা

কেবল একটা শক্ত খোলার মধ্যে গুটিয়ে থাকতেই ভালোবাসে। এ হয়ত এক ধরনের পূর্বগানুকৃতির লক্ষণ, সেই সুদূর অতীতেই ফিরে যাওয়া, যখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা নির্জন গুহায় বাস করত। যখন তারা সামাজিক জীব হয়ে ওঠেনি। কিম্বা কে জানে হয়ত এরা মানুষেরই এক-একটা রকমফের। আমি অবিশ্যি জীবতত্ত্ববিদ নই, তাই এ সব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা আমার ঠিক সাজে না। আমি শুধু এইটে বলতে চাইছি যে মাভরার মতো লোক মোটেই বিরল নয়। এই তো, দু-একমাস আগে আমাদের শহরে আমার এক সহকর্মী গ্রীক ভাষার শিক্ষক বেলিকভ মারা গেল। ওর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। যতো ভালো আবহাওয়াই থাক না কেন, ছাতা না নিয়ে, তুলোর কোট আর গালোশ্ না পরে ও ঘর থেকে বেরুত না — তার জন্যে ওর নামও ছড়িয়েছিল। ছাতায় সে একটা ঢাকা পরিয়ে রাখত, তার ঘড়ির জন্যেও একটা ধূসর রং-এর স্যাডের খাপ ছিল আর যখন পেন্সিল কাটবার জন্যে ছুরি বার করত, দেখা যেত ওটাকেও বার করতে হচ্ছে একটা খাপ থেকে। এমন কি মনে হত তার মুখখানার জন্যেও বুঝি একটা খাপ তৈরি করে রাখা আছে, কেননা কোটের কলারটা সে সবসময় উল্টে মুখখানাকে ঢাকা দিয়ে রাখত। চোখে ছিল তার গাঢ় রং-এর চশমা, গায়ে পুরু জার্সি আর কানের ফুটো দুটো বন্ধ করে রাখা থাকত তুলো দিয়ে। যদি কখনো দ্রজ্‌কিতে চাপতে হত তাহলে সহিসকে হুকুম হত, গাড়ীর হুড্ তুলে দাও। বলতে কি, নিজেকে পৃথক করে রাখা আর বাহ্যিক প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার মতো একটা আবরণ রচনা করার জন্য তার মধ্যে যেন একটা অদম্য ইচ্ছা নিরন্তর কাজ করে যেত। বাস্তবের সংস্পর্শে এলেই তার মনে বিরক্তি ও আশংকা হত। সবসময় যেন তাকে ভয়ে ভয়ে থাকতে হত। বর্তমান সময়ে তার মনে যে ভয় ও বিরক্তি ছিল তাকে চাপা দেবার জন্যেই সে সর্বদা অতীতের প্রশংসা করত, এমন সব জিনিসের গুণগান করত আদপেই যার কোনো অস্তিত্ব কখনো ছিল না। এমনকি যে মৃত ভাষাগুলো সে পড়াত সেগুলোও যেন তার কাছে ছিল বাস্তব জীবন থেকে একটা ব্যবধান রচনার জন্য গালোশ কিংবা ছাতার মতোই একটা উপায় মাত্র।

আত্মমগ্নের মতো তাকে বলতে শোনা যেত, "কী সুন্দর, কী সুরেলা

এই গ্রীক ভাষা।” আর যেন তার প্রমাণস্বরূপ সে একটা আঙুল তুলে নিমীলিত নেত্রে উচ্চারণ করত: “এ্যান-থ্রো-পস্*!”

বেলিকভ নিজের চিন্তাধারাকেও একটা আবরণ দিয়ে রাখবার চেষ্টা করত। কোনো কিছু নিষিদ্ধ করে যে সব সার্কুলার জারী হত কিম্বা খবরের কাগজে প্রবন্ধ প্রকাশ হত, সেগুলোই শুধু তার কাছে বোধগম্য ঠেকত। স্কুলের ছাত্রদের রাত্রি নটার পর রাস্তায় ঘোরা বন্ধ করে নিষেধাজ্ঞা এলে, শরীরী প্রেমকে নিন্দা করে এক প্রবন্ধ বার হলে এসব অবিলম্বে তার কাছে ভারি পরিষ্কার বলে ঠেকত। যেটা নিষিদ্ধ তার কাছে সেটার আর কোনো নড়চড় ছিল না। কোনো কিছুর অনুমতি দিতে হলে বা কিছু উপেক্ষা করার কথা উঠলে তার মনে হত এর মধ্যে নিশ্চয়ই সন্দেহ জনক কিছু একটা আছে, কী একটা যেন চেপে যাওয়া হচ্ছে, অস্পষ্ট করে রাখা হচ্ছে। যদি একটা নাট্যচক্র, রিডিংরুম কিম্বা কাফে খোলার অনুমতি দেওয়া হত, তাহলে শান্তভাবে মাথা নেড়ে, সে জানাতো, “তা, জিনিসটা মন্দ নয়, তবে এ থেকে খারাপ কিছু না হলেই বাঁচি।”

নিয়মের কোথাও কোন সামান্যতম ত্রুটি বিচ্যুতি হলেই তার মন ছেয়ে যেত দুশ্চিন্তায় — সে ত্রুটির সঙ্গে তার সম্পর্ক থাক্ আর না থাক্।

যদি তার সহকর্মীদের কেউ প্রার্থনায় আসতে দেরি করত কিংবা যদি কোন ছাত্রের দুষ্টুমির কথা তার কানে পেঁছিত কিংবা যদি ক্লাসের তত্ত্বাবধায়িকাকে অধিক রাত্রি অবধি কোনো অফিসারের সঙ্গে ঘুরতে দেখা যেত, তাহলে সে ভীষণ বিচলিত হয়ে উঠত, বারবার বলত, যে এ থেকে খারাপ কিছু না হলেই বাঁচি।

শিক্ষক পরিষদের অধিবেশনে তার সতর্কতা, সন্দেহ, তার আশঙ্কা ও উপদেশাবলী (যা এক ধরনের আবৃত মনের বৈশিষ্ট্য) দিয়ে সে আমাদের জ্বালিয়ে মারত: ছেলেই বলো কি মেয়েই বলো, দুটো ইস্কুলেই ছেলে-মেয়েরা খুব লজ্জাকর আচরণ করছে, ক্লাশের মধ্যে খুব হৈ চৈ করছে। — এখন এসব যদি কর্তৃপক্ষের কানে ওঠে, তাহলে কিছু খারাপ না হলেই সে বাঁচে বটে, কিন্তু যদি পেত্রভকে দ্বিতীয় শ্রেণী ও ইয়েগোরভকে চতুর্থ শ্রেণী

---

* গ্রীক ভাষায় — মানুষ।

থেকে তাড়ানো যায় তাহলে কি এ ব্যাপারে আরো সুবিধা হয় না? —আপনার কী মনে হয়? চোখে গাঢ় রঙের চশমা-পরা প্রায় বেজীর মতো দেখতে ছোট শাদা মুখে, সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নানা খেদসূচক ধ্বনি করে আমাদের এত মন খারাপ করে দিত যে আমরা সবাই বাধ্য হয়ে তার কথা মেনে নিতাম; পেত্রভ আর ইয়েগোরভকে স্বভাবের জন্যে খুব কম নম্বর আমরা দিয়েছিলাম, পরে তাদের ঘরে বন্ধ করে রাখা হল, আর সবশেষে ইস্কুল থেকে হল তাড়িয়ে দেওয়া।

তার চিরকালকার অভ্যাস ছিল আমাদের সকলের সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করা। বাড়িতে এসে সে কিন্তু কোনো কথা না বলে শুধুই চুপচাপ বসে থাকত যেন কিছু না কিছু চেয়ে চেয়ে দেখছে। এমনিভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে সে আবার উঠে চলে যেত। একে সে বলত 'সহকর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা'। স্বভাবতই এ ব্যাপারটা তার কাছে খুব প্রীতিকর লাগার কথা নয়, কিন্তু তবু আমাদের সঙ্গে এইভাবে দেখা করতে আসত, কেননা এটা তার কাছে সহকর্মী হিসেবে একটা কর্তব্য বলে মনে হত। আমরা সবাই তাকে ভয় করে চলতাম। এমনকি হেডমাস্টার মশায় পর্যন্ত। ভাবুন একবার, আমাদের শিক্ষকেরা সবাই বেশ মার্জিত, বুদ্ধিমান, তুর্গেনেভ, শ্চেদ্রিন পড়ে মানুষ, তবু এই নগণ্য লোকটা তার ছাতা আর পা-ঢাকা গালোশের বিভীষিকায় সমস্ত স্কুলটাকে পনেরো বছর ধরে মুঠোর মধ্যে রেখেছিল। আর শুধু স্কুলই নয়—সমস্ত শহরটাকেও। পাছে ওর চোখে পড়ে এই ভয়ে ভদ্রমহিলারা শনিবার-শনিবার থিয়েটারে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। উনি সামনে থাকলে পাদ্রীরা মাংস খেতে কিম্বা তাস খেলতে সাহস পেত না। বেলিকভের মতো লোকের জ্বালায় আমাদের শহরের লোকগুলো যে-কোনো কিছু করারই সাহস হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছিল। চেঁচিয়ে কথা বলা, চিঠি লেখা, কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করা, বই পড়া, গরীবকে সাহায্য করা কিম্বা নিরক্ষরকে লেখাপড়া শেখাতে যাওয়া — কিছুই সাহস করে করা যেত না ...'

এই পর্যন্ত বলে ইভান ইভানিচ গলা খাঁকারি দিয়ে নিল, যেন খুব একটা মূল্যবান মন্তব্য সে এবার করবে। কিন্তু তার আগে সে প্রথমে পাইপটা ধরালো, আকাশে চাঁদের দিকে তাকালো একবার, তারপর ধীরে ধীরে বলল:

'সত্যিই তাই, মার্জিত বুদ্ধিমান সব লোক তুর্গেনেভ, শ্চেদ্রিন, বাক্‌ল ইত্যাদি সব পড়েছে, তবু তারাও ওর কথা মেনে নিত, ওকে সহ্য করে যেত… হুবহু এই অবস্থা।'

বুরকিন বলে যেতে লাগল, 'বেলিকভ আর আমি থাকতাম একই বাড়িতে একই তলায়। আমার ঘরের সামনেই তার ঘর, পরস্পরে দেখা-শুনো হত যথেষ্ট। তার গার্হস্থ্য জীবন কী রকম ছিল, সে সম্বন্ধে আমার জানতে বিশেষ কিছু বাকি ছিল না। ওখানেও সেই একই কাহিনী — ড্রেসিংগাউন পরে থাকা, নাইটক্যাপ দিয়ে মাথা ঢাকা, খড়খড়ি বন্ধ করা, ছিটকিনি লাগানো, খিল্ দেওয়া এই রকম এক লম্বা বাধা-নিষেধের ফিরিস্তি — আর সেই সঙ্গে সেই পুরনো বুলি: এ থেকে কিছু খারাপ না হলেই বাঁচি।

লেণ্ট পর্বটা তার পছন্দ ছিল না, তবু পাছে লোকে বলে যে সে লেণ্ট পর্ব উদ্‌যাপন করছে না এই জন্যে সে মাংসও খেতে পারত না। তার বদলে সে মাখনে পাইক মাছ ভেজে খেত — একে যেমন উপোস করা বলা চলে না তেমনি মাংস খাওয়াও বলা যায় না। বাড়িতে সে কখনো ঝি রাখত না পাছে লোকে তার সম্বন্ধে কিছু ধারণা করে বসে। তাই একটা ষাট বছরের বুড়ো মাতাল পাগলাটে ধরনের লোক আফানাসিকে সে রেখেছিল রাঁধুনী হিসেবে। রন্ধন বিদ্যা সম্পর্কে লোকটার অভিজ্ঞতা এইটুকু যে সে একদা কোনো অফিসারের খাস চাকরের কাজ করেছিল। এই আফানাসিকে প্রায়ই দেখা যেত — হাত জোড় করে দরজার চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে। বিড় বিড় করে কেবলই বলে চলেছে, "আহা, আজকাল এদিকে 'ওঁদের' দেখা পাওয়া যাচ্ছে তাহলে!"

বেলিকভের শোবার ঘরটা ছিল ছোট্ট, প্রায় একটা বাক্‌সের মতো। বিছানার ওপরে টাঙানো থাকত একটা চাঁদোয়া। ঘুমোবার আগে প্রত্যেকদিন সে মাথা অবধি মুড়ি দিয়ে নিত চাদরটা। ঘরখানা ভরে উঠত গুমোটে আর গরমে। বন্ধ দরজাগুলোয় মাথা ঠুকে মরত বাতাস, চিমনিতে গোঁ গোঁ আওয়াজ উঠত, আর রান্নাঘর থেকে ভেসে আসত যত অশুভ দীর্ঘনিশ্বাস…

কম্বলের তলায় শুয়ে শুয়ে সে ভয়ে কাঁপত। ভাবত, এ থেকে খারাপ কিছু না হলেই বাঁচি … হয়ত আফানাসি তাকে খুন করবে, নয়ত চোর ঢুকবে বাড়িতে, তার স্বপ্নের মধ্যেও এইসব আতঙ্ক তাকে হানা দিত। তারপর

সকালবেলা একসঙ্গে পাশাপাশি ইস্কুলে যাবার সময়েও দেখতাম ও কী রকম নিস্তেজ আর পাণ্ডুর হয়ে আছে। স্বভাবতই এবার যে ইস্কুলের ছাত্রদের ভিড়ের সম্মুখীন হতে হবে এইটেও হল তার কাছে একটা ভীতি ও বিতৃষ্ণার বস্তু। লোকটা এমন কুনো যে আমার পাশাপাশি চলছে এটাও তার কাছে ছিল অরুচিকর।

যেন নিজের মন খারাপের একটা অজুহাত দেওয়া দরকার এই ভেবে সে বলত, "ছেলেরা ক্লাশে এমন গোলমাল করে, খুবই লজ্জার কথা!"

কিন্তু বলব কি মশায়, এই গ্রীক ভাষার মাস্টারটি, এই খোলসের লোকটি একবার আর একটু হলেই বিয়ে করে ফেলছিল।'

একথা শুনে ইভান ইভানিচ হঠাৎ চালার দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে বলল, 'যাঃ, সত্যি বলছেন?'

'আরে হ্যাঁ, শুনতে যতই অদ্‌ভুত লাগুক, সে আর একটু হলেই বিয়ে করে ফেলছিল।

আমাদের ইস্কুলে ইতিহাস ভূগোলের নতুন একজন মাস্টার এল। লোকটা ইউক্রেনীয়। তার নাম কভালেঙ্ক মিখাইল সাভিচ। সে সঙ্গে করে তার বোন ভারিয়াকেও নিয়ে এসেছিল।

লোকটা ছিল তরুণ, লম্বা, কালো রঙ, প্রকাণ্ড হাত, মস্ত মুখ, আর গলার আওয়াজ গমগমে। সত্যি বলতে কি এমন গমগমে ছিল তার গলার আওয়াজ যে মনে হত যেন ব্যারেলের ভেতর থেকে কথা বেরিয়ে আসছে ... তার বোন, অল্পবয়সী নয়—তিরিশের কাছাকাছি, সে-ও বেশ দীর্ঘাঙ্গী। সুশ্রী চেহারা, কালো কালো একজোড়া ভুরু, গোলাপী গাল, ছিপছিপে। এক কথায় ভারি মিষ্টি। প্রাণোচ্ছল, ফুর্তিবাজ, সবসময় ইউক্রেনীয় গান গাইছে, সবসময় হাসছে। সামান্য কারণেই হা হা করে হাসির ঝঙ্কারে ফেটে পড়ত। যতদূর মনে পড়ে এই ভাই ও বোনের সঙ্গে আমাদের সর্বপ্রথম আলাপ হল হেডমাস্টারের জন্মদিনের এক পার্টিতে। পার্টিতে যাওয়াও যাঁদের কাছে শুধু একটা কর্তব্যের সামিল সেইসব নিষ্প্রাণ, গুরুগম্ভীর সেকেলে শিক্ষকমণ্ডলীর মাঝখানে যেন হঠাৎ সমুদ্র থেকে উঠে এল একটি ভেনাস—উঠে এল এমন একটি মেয়ে যে কোমরে হাত দিয়ে হাসি নাচ গান সুরু করে দিয়েছে ... ভারি দরদ ঢেলে মেয়েটি গাইল — 'বাতাস চলেছে বয়ে'। তারপর আর একটা

গান, তারপর আরো একটা। আমরা সকলে মুগ্ধ হয়ে গেলাম, এমনকি বেলিকভও।

বেলিকভ তার পাশটিতে বসে মধুর হেসে বলল, "ইউক্রেনের ভাষা এমন মিষ্টি, এমন ঝঙ্কারময় যে প্রাচীন গ্রীক ভাষার কথা মনে পড়িয়ে দেয়।"

মেয়েটি খুব খুশি হয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে তাকে তার গাদিয়াচি উয়েজ্‌দ-এর গল্প বলতে লাগল। সেখানে তার জমিদারি, আর জমিদারিতে থাকত তার মা। সেখানকার পিয়ার, তরমুজ, আর কুমড়ো ভারি চমৎকার। কুমড়োকে ইউক্রেনে বলে সব্জা। সেখানে বেগুন আর লাল লঙ্কা দিয়ে ভারি মুখরোচক বোর্শ তৈরি হয়।

তাকে ঘিরে বসে আমরা সবাই শুনছিলাম। হঠাৎ একই চিন্তা সকলের মনে এসে পড়ল।

হেডমাস্টারের স্ত্রী আমার কানে কানে ফিসফিস করে বললেন:

"এদের দুটিতে বিয়ে হলে মন্দ হয় না।"

কেন জানি সকলেরই হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে বেলিকভ অবিবাহিত। আমাদের আশ্চর্য লাগল যে এ নিয়ে আমরা আগে কখনো কোনো কথাই বলিনি — তার জীবনের এই জরুরী ব্যাপারটা একেবারেই সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। মেয়েদের সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গিটা কী, জীবনের এই গভীর সমস্যাটা সে কী ভাবেই বা সমাধান করেছে? কথাটা যে এর আগে আমাদের মনেই হয়নি তার কারণ হয়ত এই যে, যে-লোকটা সারা বছর গালোশ পরে বেড়ায় কিম্বা চাঁদোয়া টাঙ্গিয়ে শোয় — সে-ও যে ভালোবাসতে পারে এ আমরা মানতে পারতাম না।

হেডমাস্টারের স্ত্রী বললেন, "চল্লিশের ওপর ওর বয়েস হয়েছে আর মেয়েটিরও তিরিশ; আমার মনে হয় ওকে বিয়ে করতে মেয়েটির আপত্তি হবে না।"

জেলা-অঞ্চল এত একঘেয়ে যে মাঝে মাঝে এক একটা দারুণ অর্থহীন অদ্ভুত কাণ্ড লোকে করে বসে — তার কারণ যেটি করা দরকার সেটি কখনই করা হয় না। কেন, কেন আমাদের মাথায় ঢুকল বেলিকভের বিয়ে দিতে হবে—সেই বেলিকভ, বিবাহিত লোক হিসেবে যাকে কখনো কেউ কল্পনা করতে পারেনি? হেডমাস্টারের স্ত্রী, ইনস্পেকটরের স্ত্রী এবং

ইস্কুলের সঙ্গে যাঁদের কোনোরকম সম্বন্ধ আছে এমন সমস্ত মহিলাবৃন্দ খুশিতে ঝলমল করে উঠলেন, বলতে কি তাঁদের সত্যিই যেন আরো সুন্দরী দেখালো, মনে হল জীবনে যেন তাঁরা একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছেন। হেডমাস্টারের স্ত্রী থিয়েটারে বক্স ভাড়া নেন। দেখা যায়, সেখানে বসে খুশিতে ঝলমল ভারিয়া একটা মস্ত পাখা নিয়ে হাওয়া খাচ্ছে আর তার পাশে ছোটোখাটো বেলিকভ বসে আছে গুটিসুটি হয়ে, যেন কেউ তাকে নিজের ঘর থেকে সাঁড়াশী দিয়ে তুলে এনেছে। আমি নিজেও একটা পার্টি দিলাম। মহিলারা ঐদিন ভারিয়া আর বেলিকভকে নিমন্ত্রণ করার জন্যে আমায় ধরে পড়লেন। এক কথায় আমরা সবাই ব্যাপারটাকে গড়াতে দিলাম। মনে হল, বিয়ের ব্যাপারে ভারিয়ারও বিশেষ বিতৃষ্ণা নেই। ভাইয়ের বাড়িতে খুব সুখে তার দিন কাটছিল না। সারাদিন তারা ঝগড়া ছাড়া আর কিছুই করত না। প্রায়ই এই রকমের ব্যাপার ঘটত: হয়ত কভালেঙ্ক বুক ফুলিয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে। লম্বা, মোটাসোটা, পরনে এমব্রয়ডারি করা সার্ট, টুপির তলা থেকে কপালের চুল পড়ছে ভুরুর ওপর, এক হাতে বইয়ের পার্শেল, অন্য হাতে গিটওয়ালা ছড়ি। তার পেছন পেছন তার বোনও আসছে, তারো হাতে একগাদা বই। হঠাৎ শোনা গেল বোনটি চেঁচিয়ে বলছে, "মিশা, তুমি কিন্তু এ বইটা পড়োনি কক্ষনো পড়োনি, আমি একেবারে নিঃসন্দেহ বইটা তুমি কক্ষনো পড়োনি!"

"আমি বলছি, পড়েছি," কভালেঙ্ক হাতের ছড়িটা ফুটপাথের ওপর ঠুকতে ঠুকতে প্রত্যুত্তর দিল।

"কী মুশকিল মিশা, এত চটছো কেন? এটা একটা নীতিগত ব্যাপার ছাড়া তো আর কিছু নয়।"

কভালেঙ্ক কিন্তু আরো চেঁচায়, "তোমায় বলছি বইটা পড়েছি।"

বাড়িতেও কেউ ওদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে গেলে ওরা ঝগড়া সুরু করে দিত। সম্ভবত ভারিয়ার এই জীবন আর ভালো লাগছিল না। নিজস্ব একটি ঘর-সংসারের জন্যে সে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। এদিকে বয়েসও পেরিয়ে যাচ্ছে — আর কোনো বাছবিচারের ফুরসৎ ছিল না। এ অবস্থায় যে-কোন মেয়ে যাকে পায় তাকেই বিয়ে করতে রাজী, এমন কি গ্রীক ভাষার শিক্ষককেও। প্রসঙ্গত বলি যে এটা এদেশের সব মেয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য,

বিয়ের জন্যেই যাকে হোক তারা বিয়ে করতে রাজী। সে যাই হোক, আমাদের বেলিকভের প্রতি ভারিয়ার অনুরাগ কিন্তু স্পষ্ট করেই প্রকাশ পেতে লাগল।

আর বেলিকভ? সে আমাদের সঙ্গে যেমন নিয়মিত সাক্ষাৎ করতে আসত তেমনি যেত কভালেঙ্কদের বাড়িতেও। দেখা করতে যেত, কিন্তু বসে থাকত চুপচাপ, কোনো কথাবার্তা কইতো না। সে চুপচাপ বসে থাকত আর ভারিয়া তার দিকে কালো চোখের দৃষ্টি মেলে গাইতো 'বাতাস চলেছে বয়ে' কিম্বা হা হা করে হঠাৎ ফেটে পড়ত হাসির ঝঙ্কারে।

হৃদয়ের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিয়ের ব্যাপারে ইঙ্গিত ভারি জোরালো। সহকর্মী আর মহিলারা সবাই বেলিকভকে বোঝাতে লাগলেন যে তার বিয়ে করা উচিত, বিয়ে ছাড়া তার জীবনে আর করার কিছু নেই। আমরা সকলে তাকে অভিনন্দন জানাতে শুরু করলাম, আর গম্ভীর মুখ করে বিয়ের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে বহু চলতি বকুনি আওড়ে গেলাম। তাকে বোঝানো হল যে ভারেঙ্কা মোটেই সাধারণ মেয়ে নয়। একে এমন কি সুন্দরীই বলা চলে। তাছাড়া সে এক স্টেট কাউন্সিলরের মেয়ে, তার নিজের একটা খামার আছে আর সবচেয়ে বড়ো কথা, ভারেঙ্কাই হল প্রথম নারী যে তার সঙ্গে সস্নেহ ব্যবহার করেছে। সুতরাং তার মাথাটি বিগড়ে গেল। নিজেকে সে বোঝালো যে বিয়ে করাটা তার কর্তব্য।'

ইভান ইভানভিচ টিপ্পনি কাটল, 'তার ছাতা আর গালোশ ছিনিয়ে নেবার ঐ ছিল সময়।'

'তা বটে, কিন্তু দেখা গেল সেটা একেবারেই অসম্ভব! ডেস্কের ওপর সে এনে বসালো ভারেঙ্কার ফটো, আমার কাছে নিয়মিত এসে ভারেঙ্কার বিষয়, পারিবারিক জীবন আর বিবাহের গুরুদায়িত্ব নিয়ে সে আলোচনা করতে শুরু করল, কভালেঙ্কর বাড়িতেও যেতে লাগল ঘন ঘন। কিন্তু তার চালচলন বিন্দুমাত্র পাল্টালো না। বরং তার উলটোই — দেখা গেল বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেবার পর থেকে সে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে, আরো রোগা আরো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে, আরো বেশি করে যেন গুটিয়ে যাচ্ছে তার শক্ত খোলসের মধ্যে।

মৃদু বাঁকা হেসে সে আমাকে বলল, "ভারভারা সাভিশনাকে আমার বেশ ভালোই লাগে। সবাইকার যে একদিন বিয়ে করা উচিত এ কথাও জানি, কিন্তু

জানেন ... মানে, ব্যাপারটা এত আকস্মিক ... একটু ভেবে চিন্তে দেখতে হয় ...”

উত্তর দিলাম, “এতে আর ভাববার কী আছে — চটপট বিয়ে করে ফেলুন ... ব্যস্!”

“না, না, বিয়েটা একটা গুরুতর ব্যাপার, নিজের ভবিষ্যৎ কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা আগে ভালো করে বুঝে নেওয়া উচিত... পরে যাতে না খারাপ কিছু ঘটে। এ নিয়ে মনে এমন দুশ্চিন্তা হচ্ছে যে রাত্রে ঘুমুতে পারি না। আর সত্যি বলতে কি, আমার একটু ভয়ও লাগছে: ওদের ধ্যানধারণা ভারি অদ্ভুত — ভাইবোন দুজনেরই দৃষ্টিভঙ্গি ভারি বিচিত্র! তার ওপর আবার মেয়েটি ভারি ছটফটে। ধরুন, বিয়ে তো করলাম — তারপর যদি কোন মুস্কিলে পড়ি।”

তাই সে মেয়েটির কাছে বিয়ের প্রস্তাব করা কেবলি পিছিয়ে দিতে লাগল, হেডমাস্টারের স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলারা অত্যন্ত হতাশ হয়ে উঠলেন। ভারেঙকার সঙ্গে প্রায় রোজই সে বেড়াতে লাগল — বোধহয় ভাবল, এ অবস্থায় এ রকম বেড়াতে যাওয়াই তার উচিত। ক্রমাগত তার ভবিষ্যৎ কর্তব্য ও দায়িত্বের ভার হিসেব করতে লাগল। আমার কাছে পারিবারিক জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি আলোচনার জন্যে লাগল আসতে। যদি না হঠাৎ ঐ ein kolossalische Skandal* হত, তাহলে খুব সম্ভব হয়ত সে শেষটায় প্রস্তাবও করে ফেলত। অসহ্য একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আর কিছু করতে না পেরে যে-রকম হাজার হাজার বিয়ে এ অঞ্চলে হয়ে থাকে তেমনি নির্বোধ অনাবশ্যক আর একটি বিবাহ হয়ত সম্পন্ন হত। বলা দরকার যে প্রথম দিনের আলাপের পর থেকেই ভারেঙকার ভাই কভালেঙকর মনে বেলিকভের প্রতি একটা ঘৃণা জন্মেছিল, সে কিছুতেই ওকে সহ্য করতে পারত না।

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে সে বলত, “আমি আপনাদের বুঝতে পারি না, কী করে যে ঐ আহাম্মুকটাকে, চুকলিখোরকে আপনারা সহ্য করেন? আপনারা, মশাই এখানে থাকেন কী করে? এই বিষাক্ত আবহাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে যাবার

---

* জার্মান ভাষায় — চূড়ান্ত কেলেঙ্কারি।

যোগাড়। আপনারা আবার নিজেদের মনে করেন শিক্ষক, গুরু। নিজেদের পদোন্নতির চেষ্টা ছাড়া আর কিই বা আপনারা করেন? জ্ঞানমন্দির না ছাই, আপনাদের ইস্কুলটা বড়ো জোর একটা সহবৎ প্রতিষ্ঠান। পুলিস ঘুম্‌টির মত একটা গুমসানি গন্ধ এর চারদিকে। না, মশায় না, আমি আর বেশি দিন আপনাদের সঙ্গে থাকছি না, আমি নিজের খামারে ফিরে যাব, কাঁকড়া ধরব, ইউক্রেনের ছেলেদের পড়াবো। আমি চলে যাব, আপনারা থাকুন আপনাদের জুডাসের সঙ্গে, ওর সঙ্গেই জাহান্নামে যান।"

এক এক সময় আবার সে হো হো করে হেসে উঠত, সেই হাসি গভীর খাদ থেকে উঠত তীক্ষ্ন সপ্তমে, হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে পড়ত।

"ও লোকটা অমন করে এখানে বসে থাকে কেন? বসে বসে অমন ড্যাব্‌ড্যাব্‌ করে চেয়ে থাকে কেন? ও চায় কী?"

ঠাট্টা করে বেলিকভের সে এক নতুন নামকরণ করেছিল, 'রক্তচোষা মাকড়সা'।

স্বভাবতই আমরা তার কাছ থেকে চেপে রেখেছিলাম যে তার বোন এই 'রক্তচোষা মাকড়সা'কেই বিয়ে করতে চলেছে। হেডমাস্টারের স্ত্রী তাকে যখন আভাসে বললেন যে বেলিকভের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত সম্মানিত কোনো লোকের সঙ্গে তার বোনের বিয়ে হলে বেশ হয় সে তখন ভুরু কুঁচকে জবাব দিল, "এসব আমার ব্যাপার নয়; সে একটা সাপকে বিয়ে করুক না, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। অন্য লোকের ব্যাপারে মাথা গলাতে যাওয়া আমার ব্যবসা নয়।"

শুনুন, তারপর কী হল। কে এক রসিক ব্যক্তি একটা কার্টুন আঁকলো — গালোশ পরিহিত বেলিকভ, তার ট্রাউজার গোটানো, মাথার ওপরে খোলা ছাতা — ভারিয়া তার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলেছে; নীচে লেখা: 'প্রেমে পড়া এ্যান্‌থ্রোপস'। জানেন, ছবিতে তার মুখচোখের ভাব অবিকল জীবন্ত লোকটার মতোই দেখাচ্ছিল। শিল্পীটিকে নিশ্চয়ই বেশ কয়েক রাত জাগতে হয়েছিল, কেননা, ছেলে আর মেয়েদের ইস্কুল এবং ধর্ম ইস্কুলের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা, অফিসাররা এক এক কপি করে সেই ছবি উপহার পেয়েছিল। বেলিকভও পেল এক কপি। এই কার্টুন দেখে সে ভীষণ মন-মরা হয়ে গেল।

সেদিনটা ছিল রবিবার, মে মাসের পয়লা তারিখ — মাস্টার ছাত্র, ইস্কুলের

সবাই, ইস্কুলবাড়ির সামনে জমায়েত হয়ে শহরের বাইরে বনে বেড়াতে যাবার কথা। আমরা তো সবাই বেরিয়ে পড়লাম। মেয়েদের দেখে বেলিকভের মুখটা ভারি গম্ভীর আর থমথমে হয়ে উঠল।

সে হঠাৎ বলল, "পৃথিবীতে কী সাংঘাতিক নিষ্ঠুর সব লোক আছে," তার ঠোঁট দুটো কাঁপছিল।

তার জন্যে দুঃখ হল। আমরা চলতে চলতে দেখলাম যে কভালেঙ্ক সাইকেলে করে আসছে, পেছনে পেছনে আর একটা সাইকেলে তাকে অনুসরণ করছে ভারেঙ্কা, হাঁপাচ্ছে, মুখ লাল হয়ে গেছে, তবুও দারুণ খুশি আর স্ফূর্তিতে উছলে পড়ছে।

যেতে যেতে ভারেঙ্কা চেঁচিয়ে বলল, "আমরা আপনাদের সক্‌কলের আগে পেঁাছে যাব! দিনটা ভারি সুন্দর, না? ভারি চমৎকার!"

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা অদৃশ্য হল। বেলিকভের মুখটা এতক্ষণ ছিল হাঁড়ির মতো, কিন্তু এইবার সেটা হয়ে উঠল মড়ার মতো ফ্যাকাশে। মুখে তার রা সরছিল না। থমকে দাঁড়িয়ে সে আমার দিকে চেয়ে রইল বিস্ফারিত চোখে।

"এর মানে কী?" সে আমায় জিজ্ঞেস করল। "নাকি এ আমার দৃষ্টির বিভ্রম? ইস্কুলের শিক্ষক কিম্বা মহিলাদের কি সাইকেলে চড়া উচিত?"

বললাম, "এতে অন্যায়ের কী আছে? কেন ওরা সাইকেলে চাপবে না?"

"কিন্তু এ একেবারে অসহ্য।" সে চীৎকার করে উঠল। "আপনি কী করে ও কথা বলতে পারলেন?"

আঘাতটা তার পক্ষে নিদারুণই হয়েছিল। কিছুতেই আর যেতে চাইল না সে, ফিরে গেল বাড়িমুখো।

তার পরের দিন সমস্তক্ষণ ধরে সে কেবল চঞ্চল হয়ে দুহাত কচলালে আর মাঝে মাঝে চমকে উঠতে লাগল। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে তার শরীর বেশ খারাপ। ক্লাশ শেষ না করেই সে বাড়ি চলে গেল — এরকম কাজ সে আগে কখনো করেনি। এমন কি সেদিন দুপুরের খাবার পর্যন্ত খেল না। সন্ধ্যার দিকে সেই পরিপূর্ণ গ্রীষ্মকালেও গরম কাপড়চোপড় পরে কভালেঙ্কর বাড়ির দিকে সে ধীরে ধীরে চলল। ভারেঙ্কা বাড়ি ছিল না। তার ভাইকে বাড়িতে পাওয়া গেল।

কভালেঙ্ক ভুরু কুঁচকে নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, "বসুন দয়া করে ।" সে তখন বৈকালিক নিদ্রা দিয়ে উঠেছে, তার মুখখানা ঘুমে ফোলা, ভারী ভারী দেখাচ্ছে।

মিনিটদশেক চুপচাপ বসে থাকার পর, বেলিকভ সুরু করল, "দেখুন, আমি মন খুলে সমস্ত আলোচনা করতে এসেছি, মনের মধ্যে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। কোন এক অজ্ঞাত কার্টুনিষ্ট আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করেছে। আপনার আমার দু'জনেরই ঘনিষ্ঠ একজনকেও সে এই ঠাট্টার মধ্যে জড়িয়েছে। আপনাকে জানানো কর্তব্য যে এতে আমার নিজের কোনো দোষ নেই। এসব রঙ্গ তামাশা করার মতো কোনো কাজ আমি করিনি। বরঞ্চ তার উলটোই— সব সময় আমি ভদ্রজনোচিত ব্যবহারই করে এসেছি।"

কভালেঙ্ক থমথমে মুখে বসে রইল চুপ করে। একটু থেমে, বেলিকভ আবার নীচু গলায় অনুযোগের সুরে বলতে লাগল:

"আপনাকে আমার আরো কয়েকটি কথা বলবার আছে। দেখুন, আমার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে আর আপনি সবেমাত্র কর্মজীবন আরম্ভ করেছেন। আপনার চেয়ে বয়েসে বড়ো সহকর্মী হিসেবে আপনাকে আমার সাবধান করে দেওয়া কর্তব্য। আপনি বাইসাইকেলে চড়ে বেড়ান, কিন্তু ছেলেপিলেদের শিক্ষার ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের পক্ষে সাইকেল চড়ে ফুর্তি করে বেড়ানোটা গুরুতর অপরাধ।"

"কেন?" কভালেঙ্ক ভারিক্কি গলায় প্রশ্ন করল।

"এও কি বুঝিয়ে বলতে হবে মিখাইল সাভিচ্। আমি ভেবেছিলাম এটা এমনিতেই বোঝা যায়। শিক্ষক যদি সাইকেল চড়ে বেড়ান তাহলে ছাত্রেরা তো এবার মাটিতে মাথা দিয়ে হাঁটতে শুরু করবে। তাছাড়া শিক্ষকেরা সাইকেল চড়ে বেড়াতে পারবেন এমন কোনো সার্কুলার যখন দেওয়া হয়নি তখন এরকম কাজ অন্যায়। গতকাল আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম, তারপর আপনার বোনকে দেখে তো মাথা ঘুরে পড়ছিলাম আর একটু হলে। একজন তরুণী সাইকেল চালাচ্ছে ... কী বিদ্ঘুটে কাণ্ড!"

"আপনি ঠিক কী বলতে চান সোজাসুজি বলুন দেখি?"

"আমি শুধু আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই মিখাইল সাভিচ। আপনার বয়েস কম, আপনার সামনে সমস্ত জীবনটা পড়ে রয়েছে, অতি

সাবধানে আপনার চলা উচিত। কিন্তু আপনি বড়ো বেপরোয়া, বড় বেশি বেপরোয়া আপনার চালচলন। আপনি এমব্রয়ডারি করা সার্ট পরে ঘুরে বেড়ান, সব সময় আপনাকে নানা ধরনের বই হাতে নিয়ে রাস্তায় ঘুরতে দেখা যায়। তার ওপর আবার নতুন উপসর্গ এই বাইসাইকেল। আপনি ও আপনার ভগ্নীকে বাইসাইকেল চড়তে দেখা গেছে একথা হেডমাষ্টারের কানে উঠবে, কর্তৃপক্ষের কানে পেঁছবে ... আর তার ফল মোটেই ভালো হবে না।"

কভালেঙ্ক ক্ষেপে উঠে বলল, "আমি আর আমার বোন সাইকেল চড়ি কি না চড়ি, তা কারুর দেখার দরকার নেই। আমার পারিবারিক জীবনে যারা মাথা গলাতে আসে তারা চুলোয় যাক!"

শুনে বেলিকভের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, সে উঠে দাঁড়াল।

"আমার সঙ্গে আপনি যখন এভাবে কথা কইতে শুরু করেছেন তখন আমার আর কিছু বলার নেই। কিন্তু আমারই সামনে দাঁড়িয়ে কর্তাদের বিষয়ে আপনি যে ধরনের উক্তি করছেন তাতে আপনাকে আমি সাবধান হতে অনুরোধ করব। কর্তৃপক্ষের প্রতি সম্মান জানিয়ে কথা বলা উচিত," সে বলল।

কভালেঙ্ক তার দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রশ্ন করল, "কিন্তু আমি কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে কি এমন কোনো মন্তব্য করেছি যা অন্যায়? আমায় নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে দিন মশাই। আমি একজন সৎলোক, আপনার মতো ব্যক্তিকে আমার কিছু বলার নেই। সাপদের আমি ঘৃণা করি।"

বেলিকভ ছটফট করে তাড়াতাড়ি কোট গলাতে সুরু করে দিল। তার মুখের ওপর বিভীষিকা ফুটে উঠেছে। জীবনে কেউ তাকে এমন কড়া কড়া কথা শোনায়নি।

সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে সে বলল, "আপনি যা ইচ্ছে তাই বলতে পারেন। কিন্তু আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি: কেউ নিশ্চয়ই আমাদের কথাবার্তা শুনেছে, আর আমাদের বাক্যালাপকে যাতে কেউ বিকৃতভাবে অন্যের কাছে উপস্থাপিত না করতে পারে সেজন্যে এই বাক্যালাপের মূল বিষয়টা আমি হেডমাষ্টারের কাছে জানিয়ে রাখব—এর প্রধান প্রধান পয়েন্টগুলো, এটা আমার কর্তব্য।"

"কী বললেন? রিপোর্ট করবেন? যান, যা খুশি করুন গে!" কভালেঙ্ক এই বলে তার জামার কলার ধরে মারলে এক ধাক্কা, আর বেলিকভ সিঁড়ি

দিয়ে গড়াতে লাগল, সিঁড়ির ধাপে ঠোক্কর খেতে লাগল তার গালোশগুলো। সিঁড়িটা বেশ লম্বা আর খাড়া বটে, তবু অক্ষত দেহেই সে নিচে পৌঁছল। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে নাকের ওপর হাত দিয়ে দেখতে লাগল চশমাটা ভেঙেছে কিনা। ইতিমধ্যে সিঁড়ি দিয়ে যখন সে গড়াচ্ছিল, তখন ভারেঙ্কা দুজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে নিচের বারান্দায় ঢুকেছিল। সিঁড়ির তলায় তারা তিনজন বেলিকভের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল আর সেটাই হয়ে উঠল বেলিকভের পক্ষে চরমতম লাঞ্ছনা। এমন একটা হাস্যকর মূর্তিতে দর্শন দেওয়ার চাইতে বরং আগেই নিজের ঘাড় কিম্বা পার্দুটো মটকে যাওয়া ভালো ছিল। এখন শহরের সবাই এ ব্যাপারটা জেনে যাবে, হেডমাস্টারকেও কেউ জানাবে, কর্তৃপক্ষও সম্ভবত জানতে পারবে। কিছু খারাপ না ঘটলে বাঁচি! আবার হয়ত কেউ তার একটা কার্টুন আঁকবে, তার ফলে শেষ পর্যন্ত তাকে পদত্যাগই করতে হবে ...

সে উঠে দাঁড়াল, ভারিয়া তাকে চিনতে পারল; কী ঘটেছে অবশ্য তার জানা ছিল না। ভাবল, বোধহয় পা পিছলে পড়ে গিয়েছে। সুতরাং তার হাস্যকর মুখভঙ্গি, কুঁচকানো কোট আর গালোশ জোড়ার দিকে তাকিয়ে ভারিয়া ফেটে পড়ল তার উচ্ছ্বসিত হাসিতে, "হা-হা-হা!"

ব্যস্, যা বাকি ছিল তা সবকিছু চুরমার হয়ে গেল ঐ উচ্ছ্বসিত হা-হা-র ঝঙ্কারে। শেষ হয়ে গেল বেলিকভের প্রেম আর তার পার্থিব জীবন। সেই মুহূর্তে ভারেঙ্কার স্বর তার কানে গেল না, চোখে কিছুই দেখল না। বাড়ি গিয়ে প্রথম সে ডেস্কের ওপর থেকে ভারেঙ্কার ফটোগ্রাফটা সরিয়ে ফেলল, তারপর সে সেই যে শয্যা নিল আর উঠল না।

দিন তিনেক বাদে আফানাসি এসে আমাকে জিগ্যেস করল ডাক্তার ডাকবে কিনা, তার মনিব কী রকম করছে। বেলিকভকে দেখতে গেলাম। চাঁদোয়ার নিচে লেপমুড়ি দিয়ে সে শুয়ে ছিল নীরবে। আমার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর শুধু ছোট্ট 'হ্যাঁ' 'না' দিয়ে কাজ সারল, বাড়তি একটা কথাও কইল না। ওই ভাবেই সে শুয়ে রইল, আর আফানাসি মুখ কালো করে ভুরু কুঁচকে তার শয্যার চারিধারে হাঁটাচলা করে বেড়াল। মাঝে মাঝে গভীর এক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ত আর সারা গা দিয়ে তার এমন মদের গন্ধ বেরুত যেন আস্ত একটা ভাঁটিখানা।

মাসখানেক বাদে বেলিকভ মারা গেল। সবাই — মানে, দুটো ইস্কুল আর ধর্ম ইস্কুলের সকলে তার শবানুগমন করল। কফিনের মধ্যে সে যখন শুয়ে ছিল তখন মনে হচ্ছিল মুখের ভাবটা তার কেমন যেন শান্ত, সুন্দর, এমনকি খুশিই হয়ে উঠেছে, অবশেষে এমন একটা খাপ সে পেয়ে গেছে যা আর ছেড়ে যাবার দরকার হবে না, যেন এইজন্যে তার আনন্দ ধরছে না। যা সে চাইছিল, তা সে পেয়ে গেছে। যেন তাকেই সম্মান দেখাবার জন্যে দিনটাও ছিল মেঘে ঢাকা, বৃষ্টিভেজা। আমাদের সকলকেই গালোশ পরতে হয়েছিল, ছাতা হাতে নিতে হয়েছিল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ভারিয়াও এসেছিল। কফিনটা যখন কবরের মধ্যে নামানো হচ্ছিল তখন তার চোখ থেকে একফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। দেখেছি ইউক্রেনের মেয়েরা হয় হাসবে নয় কাঁদবে, এর মাঝামাঝি কোনো কিছু যেন তাদের আসে না।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে বেলিকভের মতো লোকেদের কবর দেওয়ার মধ্যে দারুণ একটা আনন্দ আছে। কিন্তু সেদিন আমরা সবাই কবরখানা থেকে ফিরেছিলাম উপবাসক্লিষ্ট শুকনো মুখে। কেউ কাউকে দেখাতে চাইনি মনে মনে আমরা কতোটা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। এধরনের মুক্তি বহুকাল আগে অনুভব করেছি — বড়োরা বাইরে বেরিয়ে গেলে ছেলেবেলায় আমরা বাগানের চারদিকে ইচ্ছেমতো দৌড়ঝাঁপ করে ঘণ্টা দু-একের জন্যে যে মুক্তির স্বাদ পেতাম এ যেন সেইরকম একটা মুক্তি। মুক্তি, আহ্, মুক্তি! জিনিসটার এতটুকু একটু ইশারা, মুক্তি পাওয়া যাবে এমন এতটুকু একটু ভরসাতেই আমার হৃদয় যেন ডানা মেলে দিতে চায়, নয়কি?

কবরখানা থেকে আমরা ফুর্তি নিয়েই ফিরেছিলাম। কিন্তু হপ্তাখানেক যেতে না যেতেই আবার বিষণ্ণ, ক্লান্তিকর, অর্থহীন প্রাত্যহিক জীবন সুরু হয়ে গেল — কোনো সার্কুলার জারী করে এ জীবন নিষিদ্ধ করা হয়নি, মঞ্জুরও করা হয়নি। আগের চেয়ে অবস্থার যে বিশেষ উন্নতিও হল তা-ও মোটেই না। যাই হোক, ভেবে দেখলে দেখা যাবে, যদিও বেলিকভকে কবর দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু শক্ত খোলার মধ্যে বাস করে এমন বহুলোক এখনো আছে, পরেও জন্মাবে।'

'বাস্তবিক, সে কথা সত্যি,' পাইপ ধরাতে ধরাতে ইভান ইভানিচ বলল।

বুরকিন আগের কথাটার পুনরাবৃত্তি করে বলল, 'পরেও এমন লোক অনেক জন্মাবে!'

ইস্কুল মাস্টারটি আটচালাটার বাইরে এসে দাঁড়াল। দেখতে বেঁটেখাটো, মোটাসোটা, মাথা ভর্তি টাক আর লম্বা কালো দাড়ি প্রায় কোমর অবধি পৌঁছেছে। দুটো কুকুরও তার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এল।

আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, 'আঃ! কী একটা চাঁদ!'

মধ্যরাত্রি পেরিয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ দিকে সম্পূর্ণ গ্রামটা দেখা যাচ্ছিল, প্রায় ভের্স্ত পাঁচেক অবধি দীর্ঘ রাস্তাটা বিস্তৃত, সবকিছুই যেন শান্ত গভীর নিদ্রামগ্ন, একটু শব্দ না, একটুও আলোড়ন নেই কোথাও। প্রকৃতি এত শান্ত হতে পারে তা যেন ভাবাই যায় না। জ্যোৎস্নারাত্রে প্রশস্ত গ্রাম্য রাস্তার দিকে যদি তাকানো যায়, কোনো গ্রামের ঘরবাড়ি আর রাশিকৃত খড়ের স্তূপ আর ঘুমন্ত উইলো গাছের দিকে যখন চোখ পড়ে, তখন হৃদয় ভরে ওঠে এক অতল প্রশান্তিতে।

দিনের যতো শ্রম, আর দুঃখ দুশ্চিন্তা রাত্রির ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়ে গ্রামখানিকে কেমন শুচি শান্ত, বিষণ্ণ সুন্দর করে তোলে, মনে হয় যেন আকাশের তারাগুলো পর্যন্ত করুণাভরা চোখে চেয়ে আছে, যেন পৃথিবীতে মন্দ আর কিছু নেই, এখন সবখানি তার ভালো।

বাঁদিকে গ্রাম যেখানে শেষ হয়ে মাঠ সুরু হয়েছে, সেদিকে বহুদূর দৃষ্টি চলে যায় একেবারে দিগন্ত অবধি, সবকিছু সেখানেও স্তব্ধ, শান্ত। জ্যোৎস্নার প্লাবনে ভেসে গেছে বিশাল মাঠখানা।

ইভান ইভানিচ বলল, 'বাস্তবিকই, এই যে আমরা শহরে থাকি, ঠাসাঠাসি ঘরে জড়োসড়ো হয়ে দিনাতিপাত করি, আজেবাজে কলম চালিয়ে, তাস খেলে কাটাই — এটাও কি সেই খোলসের মধ্যেই বাস করা নয়? এই যে আমরা, সব নিষ্কর্মা লোক, মামলাবাজ মানুষ, কুঁড়ে মূর্খ স্ত্রীলোকদের মধ্যে সারাজীবন কাটিয়ে দিই, যতো বাজে কথায় কান দি, যতো বাজে কথা নিজেরা বলে যাই — এ সমস্তও কি ঐ খোলসের মধ্যেই বাস করা নয়? যদি শুনতে চান, তাহলে একটা দীর্ঘ শিক্ষামূলক কাহিনী বলতে পারি...'

বুর্কিন বলল, 'মনে হচ্ছে এবার ঘুমোবার সময় হয়েছে, ওটা কালকের জন্যে রেখে দিন।'

আটচালাটার ভেতরে গিয়ে ওরা শুয়ে পড়ল। খড়ের গাদার মধ্যে আরামে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে যখন একটু ঝিমুনি এসেছে তখন বাইরে শোনা গেল একটা লঘু পায়ের আওয়াজ—তাদের চালাটা থেকে সামান্য দূরে কেউ যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে, কয়েক পা এগুচ্ছে, তারপর থামছে তারপর আবার কয়েক পা এগুচ্ছে। কুকুর দুটো ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

বুরকিন বলল, 'মাভরা বেড়াতে বেরিয়েছে।'

পায়ের আওয়াজ আর শোনা গেল না।

ইভান ইভানিচ পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, 'চুপ করে শুধু মিথ্যে কথা শোনা, তারপর এইসব মিথ্যেকে মুখ বুজে সহ্য করে নিজেকে নির্বোধ সাজানো, অপমান গ্লানি গলাধঃকরণ করা, সৎ স্বাধীনচেতা লোকের পক্ষ নিয়ে কোনো কথা বলতে সাহস না পাওয়া, মুখের ওপর একটু হাসি ফুটিয়ে তোলা, নিজে মিথ্যাচার করা এবং এসব শুধুমাত্র এক টুকরো রুটি, একটা আরামের আশ্রয়কোণ ও একটা তুচ্ছ চাকরির জন্যে করা, উহ্, এরকম করে বাঁচা একেবারে অসহ্য!'

'এ কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা একটা প্রসঙ্গ, ইভান ইভানিচ।' ইস্কুল মাস্টার মন্তব্য করল, 'এবার ঘুমুনো যাক!'

মিনিট দশেকের মধ্যেই বুরকিন ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ইভান ইভানিচ এপাশ ওপাশ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে লাগল। তারপর উঠে বাইরে গেল, দোরের পাশে উবু হয়ে বসে পাইপটা ধরাল।

১৮৯৮

গুজবেরি

সাত সকাল থেকে আকাশ ঢেকে রয়েছে বর্ষার মেঘে, দিনটি স্থির শান্ত, শীতল এবং বিষণ্ণ, কুহেলিকায় ভরা অস্পষ্ট সেই দিনগুলির একটি, যখন মেঘগুলি ক্রমান্বয়ে নেমে আসতে থাকে ক্ষেতের ওপর আর মনে হয় এই এক্ষুনি বৃষ্টি হবে, কিন্তু বৃষ্টি আসে না। পশু চিকিৎসক ইভান ইভানিচ এবং হাই স্কুলের শিক্ষক বুর্কিন হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তবু মাঠ মনে হচ্ছে সীমাহীন। বহু দূরে মিরনোসিৎস্কয়ে গ্রামের হাওয়া-কলের আভাস মাত্র তাঁদের নজরে পড়ে, আর ডানদিকে গ্রাম সীমানার বাইরে পর্যন্ত বিস্তৃত এক সারি নীচু পাহাড়ের মতো যেটাকে মনে হয়, দুজনেই জানেন এই পাহাড় সারি আসলে নদীর তীর, আর সেটা ছাড়িয়ে মাঠ প্রান্তর, সবুজ উইলো গাছ, বাগান-বাড়ি। তাঁরা জানেন একটি পাহাড়চূড়ায় উঠলে দেখা যাবে সেই একই সীমাহীন প্রান্তর আর টেলিগ্রাফ পোস্টগুলি, আর দূরে শুঁয়োপোকার মতো মন্থরগতি ট্রেন; আবহাওয়া উজ্জ্বল থাকলে শহরটাও দেখা যাবে। এই শান্ত দিনটিতে সমগ্র প্রকৃতি যেন মমতাময়ী ও ধ্যানমগ্না হয়ে রয়েছে। সহসা ইভান ইভানিচ এবং বুর্কিন এই প্রান্তরের প্রতি একটি অনুরাগের আবেগ বোধ করলেন, ভাবলেন, তাঁদের দেশ কত বিশাল আর কত সুন্দর।

বুর্কিন বললেন, 'মোড়ল প্রকোফির চালাঘরে আগের বার যখন ছিলাম তখন তুমি বলেছিলে যে একটা গল্প বলবে।'

'হ্যাঁ, আমার ভাইয়ের কাহিনী বলতে চেয়েছিলাম।'

ইভান ইভানিচ একটি দীর্ঘশ্বাস টেনে নিয়ে গল্প বলার আগে পাইপ ধরিয়ে নিলেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বৃষ্টি এল। পাঁচ মিনিট পরে

মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে লাগল, কখন যে তা থামবে কেউ বলতে পারে না। ইভান ইভানিচ আর বুরকিন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন চিন্তায় ডুবে গিয়ে। কুকুরগুলির দেহ সিক্ত হয়ে গেছে, ল্যাজ নামিয়ে ওরা দাঁড়িয়ে রইল তাঁদের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে।

বুরকিন বললেন, 'আশ্রয় খুঁজে বার করতে হয়। চলো আলেখিনের বাড়ি যাই। এই তো কাছে।'

'তাই চলো।'

পাশ ফিরে তাঁরা সোজা ফসল-কাটা ক্ষেতের ওপর দিয়ে হেঁটে চললেন, তারপর ডানদিকে বেঁকে সড়কে এসে পেঁাছলেন। একটু পরেই চোখে পড়ল পপলার গাছের সারি, ফলের বাগান, আর খামার বাড়িগুলির লাল ছাদ। নদী ঝকঝক করছে। একটি প্রসারিত জলাশয়ের বিস্তার, একটি হাওয়া-কল, আর শাদা একটি চান করার চালাঘর। এ হচ্ছে সোফিনো, এখানে থাকেন আলেখিন।

মিলটা চলছে, তার পাখার শব্দ বৃষ্টির আওয়াজকে ডুবিয়ে দিচ্ছে, সমস্ত বাঁধটা কাঁপছে থরথর করে। ঘোড়াগুলি ভিজে চুপসে কতকগুলো গাড়ির কাছে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর লোকজন কাঁধে মাথায় বস্তা নিয়ে ইতস্তত চলাফেরা করছে। ভিজে স্যাঁতসেঁতে, কর্দমাক্ত, বিষণ্ণ পরিবেশ, জলটাকে মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা আর অশুভ। ইভান ইভানিচ এবং বুরকিনের জলে ভিজে কাদাময়লায় এবং দৈহিক অস্বস্তিতে বিশ্রী লাগছিল। তাঁদের জুতো কাদায় একেবারে মাখামাখি হয়ে গেছে। এইভাবে মিল-বাঁধ ছাড়িয়ে যখন তাঁরা মালিকের খামার বাড়ির ঊর্ধ্বমুখী পথ ধরে এগুলেন তখন যেন পরস্পরের প্রতি বিরক্তি বোধ করে ওঁরা একেবারে নীরব হয়ে গেলেন।

একটা খামার থেকে তুষ-ঝাড়ার শব্দ আসছে। তার দোর খোলা। ভেতর থেকে রাশি রাশি ধুলো উড়ে আসছে। দোরগোড়ায় আলেখিন স্বয়ং দাঁড়িয়ে। বছর চল্লিশেক বয়সের হৃষ্টপুষ্ট লম্বা লোকটি, মাথায় লম্বা চুল, দেখতে বরং জমিদারের চেয়ে অধ্যাপক কিংবা শিল্পীর মতো। গায়ে তাঁর সাদা সার্ট, না কাচলে আর নয়, একটা দড়ি দিয়ে বেল্টের মতো করে সার্টটি বাঁধা, পরনে লম্বা ড্রয়ার, তার ওপর পাৎলুন নেই। তাঁর বুটও কাদায় ও খড়ে ভরা। ধুলোয় চোখ নাক কালো। ইভান ইভানিচ এবং বুরকিনকে চিনতে পারলেন তিনি, মনে হল ওঁদের দেখে খুশি হয়েছেন।

মুচকি হেসে তিনি বললেন, 'বাড়িতে উঠুন মশায়েরা। আমি এই এক্ষুনি আসছি।'

বড়ো দোতলা বাড়ি। একতলায় থাকেন আলেখিন। দুখানা ঘর, তার সিলিং খিলানওয়ালা, ঘরের জানালাগুলি খুব ছোটো ছোটো, পূর্বে এ ঘরে থাকত নায়েব গোমস্তারা। ঘরে সাজসজ্জা আসবাবপত্র সাদাসিধে, রাই-রুটি, সস্তা ভদকা আর ঘোড়ার সাজের গন্ধে ভরা। অতিথি অভ্যাগতের আগমন না হলে আলেখিন ওপর তলার ঘরে প্রায় ঢোকেনই না। ইভান ইভানিচ এবং বুরকিনকে স্বাগত জানাল একটি চাকরাণী, তরুণী মেয়েটি এমন সুন্দরী যে ওঁরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে পড়লেন চুপ করে এবং দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

হলঘরে তাঁদের কাছে এসে আলেখিন বললেন, 'বন্ধু, এখানে আপনাদের দেখে আমি যে কী খুশি হয়েছি তা ধারণাও করতে পারবেন না! এমন অপ্রত্যাশিত!' তারপর চাকরাণীর দিকে ফিরে বললেন, 'পেলাগেয়া, ভদ্রলোকদের শুকনো কাপড়চোপড় দাও। আমারও পোষাক বদলানো দরকার। কিন্তু আগে আমার চান করা চাই, মনে হচ্ছে সেই বসন্তকালের পরে আর চানই করিনি। আপনারাও যাবেন নাকি, চান করে নেবেন? ইতিমধ্যে এরা সব ব্যবস্থা করে দেবে।'

সুন্দরী পেলাগেয়াকে ভারি নম্র এবং রুচিশীলা দেখাচ্ছে। সে তাঁদের গা মোছবার চাদর আর সাবান এনে দিল, তারপর আলেখিন আর তাঁর অতিথিরা চললেন চানঘরের দিকে।

জামাকাপড় খুলে আলেখিন বললেন, 'হ্যাঁ, অনেকদিন চান করিনি। আপনারা এই যে চমৎকার চানের জায়গাটি দেখছেন এটি তৈরি করেছিলেন আমার বাবা, কিন্তু আমি কেমন করে যেন চান করার সময়ই পাই নে।'

সিঁড়ির ওপরে বসে লম্বা চুল আর ঘাড়ে সাবান লাগালেন তিনি, তাঁর চারদিকে জলটা বাদামী হয়ে উঠল।

গৃহকর্তার মাথার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে ইভান ইভানিচ বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি নিশ্চয় ...'

'চান করেছি সে বহুদিন হয়ে গেল ...' একটু লজ্জা পেয়ে আলেখিন বললেন আবার, তারপর আবার সারা গায়ে সাবান লাগালেন, এবার জলটা হয়ে উঠল ঘন নীল, কালির মতো।

চালার তলা থেকে বেরিয়ে ইভান ইভানিচ সশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়লেন

জলে, বৃষ্টির মধ্যে সাঁতার কাটতে লাগলেন হাত ছড়িয়ে দিয়ে, চতুর্দিকে তাঁর তরঙ্গ সৃষ্টি হতে লাগল, আর শাদা কুমুদ ফুলগুলি সেই ঢেউয়ে লাগল দুলতে। সাঁতরে একেবারে নদীর মাঝখানে চলে গেলেন তিনি, তারপর ডুব দিয়ে একমুহূর্ত পরে অন্য আর এক জায়গায় ভেসে উঠলেন এবং আরো সাঁতার কেটে চললেন। বার বার ডুব দিয়ে নদীর নীচে মাটি ছুঁতে চেষ্টা করতে লাগলেন। আমোদ পেয়ে বার বার বলতে লাগলেন, 'হে ঈশ্বর ...' 'আহ্ ভগবান ...' সাঁতরে তিনি কলের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে কয়েকজন কিষানের সঙ্গে দুটো কথা বলে ফিরলেন। কিন্তু নদীর মাঝামাঝি এসে বৃষ্টি ধারার দিকে মুখ রেখে চিৎ হয়ে ভাসতে লাগলেন ইভান ইভানিচ। বুরকিন এবং আলেখিন জামাকাপড় পরে বাড়ি যাবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু তিনি সাঁতার কেটে আর ডুব দিয়েই চললেন।

আর বার বার বলতে লাগলেন, 'ঈশ্বর! ঈশ্বর! ওগো ভগবান!'

বুরকিন চেঁচিয়ে বললেন তাঁকে, 'এই চলে এসো!'

ওঁরা ফিরে এলেন বাড়িতে। তারপর ওপর তলায় বড়ো বৈঠকখানায় আলো জ্বালানো হল। বুরকিন আর ইভান ইভানিচ রেশমের ড্রেসিং গাউন আর গরম চটি পরে বসলেন আর্মচেয়ারে, আর আলেখিন চান করার পর চুল আঁচড়ে নতুন ফ্রককোট পরে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরের উষ্ণতা, পরিচ্ছন্নতা, শুকনো পোষাক আর আরামের চটির স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে করতে। এদিকে রূপসী পেলাগেয়া মমতার হাসিতে মুখ ভরিয়ে চা আর খাবারের ট্রে নিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে এল কার্পেটের ওপর দিয়ে। ইভান ইভানিচ সুরু করলেন তাঁর গল্প, আর মনে হতে লাগল যেন বুরকিন আর আলেখিন নয়, সোনা বাঁধানো ফ্রেম থেকে প্রাচীন মহিলা, তরুণী এবং সৈনিক মহোদয়েরাও সে গল্প শুনছেন। তাদের দৃষ্টি শান্ত ও কঠোর।

'আমরা ছিলুম দুই ভাই,' ইভান ইভানিচ সুরু করলেন। 'আমি ইভান ইভানিচ আর আমার চেয়ে দু বছরের ছোটো আমার ভাই নিকলাই ইভানিচ। আমি গেলুম লেখাপড়া শিখতে, হলাম পশুচিকিৎসক; কিন্তু নিকলাই মাত্র উনিশ বছর বয়সে এক সরকারী অফিসে চাকরীতে লাগল। বাবা চিমসা-হিমালাইস্কি একটা স্কুলে শিক্ষালাভ করেছিলেন, স্কুলটা ছিল সৈনিক প্রাইভেটদের ছেলেদের জন্য; পরে অবশ্য তিনি অফিসার র‍্যাঙ্কে প্রমোশন

পান, তাঁকে বংশানুক্রমিক নোব্‌ল্‌ করা হয় এবং ছোটো একটি জমিদারি দেওয়া হয়। তাঁর মৃত্যুর পর দেনার দায়ে সে সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে হয়েছে, কিন্তু আমাদের ছেলেবেলাটা অন্তত কাটতে পেরেছে পল্লীর অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে। সেখানে আমরা কিষান ছেলেদের মতো মাঠে বনে ঘুরে বেড়াতুম, ঘোড়া চরাতে যেতুম, লাইম গাছের গা থেকে ছাল ছাড়িয়ে নিতুম, মাছ ধরতুম, এই ধরনের নানা কাজ করে বেড়াতুম। যে লোক জীবনে একবার পার্চ ধরেছে কিংবা চোখ ভরে দেখেছে শরৎকালের মেঘমুক্ত শীতল দিনে গ্রামের ওপর বহু উঁচু দিয়ে গরম দেশে উড়ে-যাওয়া থ্রাশ পাখিদের, শহরের জীবনে সে আর খাপ খাবে না, সারা বাকী জীবন ধরে সে কেবল পল্লীর জীবন কামনা করবে। সরকারী অফিসে বসে আমার ভাইয়ের মন খারাপ হয়ে যেত। বছরের পর বছর কেটে যায়, সে কিন্তু প্রতিদিন একই জায়গায় গিয়ে বসে, একই দলিলপত্র লিখে চলে, আর সব সময় একই চিন্তা থাকে মাথায় — কেমন করে ফিরে যাওয়া যায় গ্রামে। তার এই স্পৃহা ক্রমে ক্রমে একটি দৃঢ় নির্দিষ্ট অভিপ্রায়ের রূপ নিল, স্বপ্ন হয়ে উঠল কোনো একটি নদীর ধারে কিংবা হ্রদের পারে একটি ছোট্ট ভূসম্পত্তি কেনা।

আমার ভাইটি ছিল ভারি বিনম্র সুশীল প্রকৃতির ছেলে; তাকে আমি ভালোবাসতাম, কিন্তু তার নিজের ভূসম্পত্তির মধ্যে সারা জীবন আবদ্ধ করে রাখার বাসনার প্রতি কোনো সহানুভূতি আমার ছিল না। লোকে বলে মানুষের প্রয়োজন মোটে চার হাত ভূমি। কিন্তু এই চার হাত জমি প্রয়োজন হয় শবের, মানুষের নয়। এখন আবার লোকে বলতে সুরু করেছে, আমাদের বুদ্ধিজীবীরা যে জমির জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছে এবং ভূসম্পত্তি সংগ্রহের চেষ্টা করছে এটি খুব ভালো লক্ষণ। তবু এই সকল ভূসম্পত্তি তো সেই চার হাত ভূমি ছাড়া আর কিছুই নয়। শহর থেকে, সংগ্রাম থেকে, জীবনের কলরব থেকে পরিত্রাণ পাওয়া, পরিত্রাণ পেয়ে ভূসম্পত্তির মধ্যে মাথা লুকোনো, এ তো জীবন নয়, এ হল অহমিকা, অলসতা, এ এক ধরনের বৈরাগ্য। কিন্তু সে বৈরাগ্যের মধ্যে কোনো প্রত্যয় নেই। মানুষের প্রয়োজন মাত্র চার হাত জমি নয়, মাত্র একটি ভূসম্পত্তিতে তার প্রয়োজন মেটে না, তার চাই সারা পৃথিবীটা, প্রকৃতির সর্বস্ব চাই তার, যাতে সে তার নিজের ক্ষমতা ও আত্মার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করতে পারে।

আফিসের ডেস্কে বসে আমার ভাই নিকলাই স্বপ্ন দেখত তার নিজের বাড়ির বাঁধাকপি দিয়ে তৈরি সুপ খাবে যার সুবাস ছড়িয়ে পড়বে তার নিজের বাড়ির প্রাঙ্গণ জুড়ে, স্বপ্ন দেখত বাড়ির বাইরে গিয়ে আহার করবে সবুজ ঘাসের ওপর; রোদে শুয়ে নিদ্রা দেবার স্বপ্ন দেখত, স্বপ্ন দেখত বাড়ির ফটকের বাইরে একটি বেঞ্চির ওপর সে বসে থাকবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আর তাকিয়ে থাকবে মাঠ আর বনের দিকে। কৃষি বিজ্ঞানের বই আর ক্যালেণ্ডারে ছাপা নানারকম পরামর্শে সে আনন্দ পেত, সেগুলি ছিল তার প্রিয় পারমার্থিক তৃপ্তির বস্তু। খবরের কাগজ পড়তেও সে ভালোবাসত, কিন্তু খবরের কাগজে পড়ত সে বিজ্ঞাপন, যাতে ছাপা থাকত এই এত একর চাষযোগ্য ও মেঠো জমি বিক্রি হবে, সঙ্গে লাগোয়া বসতবাটি, একটি নদী, একটি ফলের বাগান, একটি হাওয়া-কল আর পুকুরগুলি, যাতে জল আসে ঝরণা থেকে। তার মাথায় ভরা ছিল বাগানের পথ, ফুল ফল, তৈরি পাখির বাসা, মাছ ভর্তি পুকুর, আর এই রকম সব জিনিসের স্বপ্ন। যেমন যেমন বিজ্ঞাপন চোখে পড়ত তেমন তেমন বদল হত তার স্বপ্ন, কিন্তু কী জানি কেন তার কল্পনায় গুজবেরির ঝোপগুলো সর্বদাই লেগে থাকত। মনে মনে এমন কোনো ভূসম্পত্তি বা মনোরম নিভৃত কোণ সে কল্পনাতেই আনতে পারত না যেখানে গুজবেরির ঝোপ নেই।

সে বলত, "পল্লী জীবনের নানা সুবিধা রয়েছে। বারান্দায় গিয়ে বোসো, চা খাও বসে বসে, চোখে দেখো তোমারই হাঁসগুলি ভেসে চলেছে পুকুরে, আর সব কিছুতে এমন চমৎকার গন্ধটি জড়ানো, আর ... আর ঝোপের মধ্যে পেকে উঠেছে গুজবেরি।"

সে তার ভূসম্পত্তির নকসা আঁকত, সব নকসাতেই দেখা যেত একই বৈশিষ্ট্য: ক) মূল বসতবাটি, খ) চাকরবাকরদের ঘরদোর, গ) সবজি বাগান, ঘ) গুজবেরির ঝোপ। সে থাকত অত্যন্ত হিসেব করে, কখনো পেট ভরে পানাহার করত না, ভিখিরীর মতো সাজপোষাক করত, আর এইভাবে ব্যাঙ্কে টাকা জমাত। ভয়ানক কৃপণ হয়ে উঠল সে। তার দিকে আমি তাকাতে পারতাম না, আর যখনই সামান্য কিছু টাকাকড়ি পাঠাতুম তাকে কিংবা কোনো একটা উৎসব উপলক্ষে কোনো উপহার পাঠাতুম, সে তাও জমিয়ে রাখত।

মানুষের মাথায় একটা কোনো ধারণা ঢুকে গেলে তাকে দিয়ে আর কিছু করানো যায় না।

আরো কাটল কয়েকবছর। তাকে পাঠানো হল অন্য প্রদেশে আর এক সরকারী আফিসে। বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেল। তখনো সে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন পড়ে, আর টাকা জমায়। শেষে একদিন শুনতে পেলুম সে বিয়ে করেছে। সেই একই উদ্দেশ্যে, গুজবেরির ঝোপওয়ালা একটি ভূসম্পত্তি কেনবার জন্য সে বিয়ে করল এক কুরূপা বয়স্কা বিধবাকে, মহিলার প্রতি তার বিন্দুমাত্র ভালোবাসা ছিল না। বিয়ে করেছিল কারণ তার কিছু টাকাকড়ি ছিল। বিয়ের পরেও বরাবরের মতোই মিতব্যয়ী জীবন যাপন করে চলল নিকলাই, বউকে আধপেটা খাইয়ে আর বউ-এর টাকা ব্যাঙ্কে তার নিজের নামে জমা করে নিয়ে। মেয়েটির প্রথম পক্ষের স্বামী ছিলেন পোষ্টমাষ্টার, মিষ্টি রুটি আর ফলের মদ খেতে সে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীর কাছে এসে পর্যাপ্ত কালো রুটিও সে খেতে পেত না। এ রকম সংসারে পড়ে সে নির্জীব হয়ে পড়ল, তিন বছর পরে তার আত্মা বিলীন হয়ে গেল ভগবানে। আমার ভাই অবশ্য স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য নিজেকে বিন্দুমাত্র দায়ী মনে করল না। টাকা ভদকার মতোই মানুষকে খামখেয়ালী করে তোলে। আমাদের শহরটিতে ছিল এক বণিক, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে সে একবাটি মধু চেয়েছিল। সেই মধু দিয়ে তার সমস্ত ব্যাঙ্ক নোট এবং লটারীর টিকেট খেয়ে ফেলেছিল, যাতে আর কেউ সে সব না পায়। আমি একদিন রেলস্টেশনে একপাল গরুভেড়া পরীক্ষা করে দেখছিলাম, এমন সময় এক ব্যাপারী পড়ে গেল এঞ্জিনের তলায়, পা-টা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। রক্তে মাখা লোকটিকে ধরাধরি করে আমরা নিয়ে এলাম হাসপাতালে, ভয়ঙ্কর দৃশ্য; কিন্তু লোকটা তার পা খুঁজে দিতে বারবার অনুরোধ করল, কেবল তার দুশ্চিন্তা — বুটে বিশটা রুবল ছিল, সে ভয় পাচ্ছিল ও টাকা বুঝি তার হারিয়ে যাবে।'

বুরকিন বললেন: 'গল্পের সূত্র হারিয়ে যাচ্ছে তোমার।'

একটু থেমে ইভান ইভানিচ আবার বলে চললেন, 'স্ত্রী মারা যাবার পর আমার ভাই ভূসম্পত্তির খোঁজখবর করতে সুরু করল। পাঁচ বছর ধরে লোকে একটা জিনিষ অবশ্যই খুঁজে বেড়াতে পারে তারপর শেষে একটা ভুল হয়ে

যায়, এমন কিছু কিনে বসে যা এতদিনের কল্পনার সঙ্গে একেবারে মেলে না। আমার ভাই নিকলাই তিনশ একরের একটি ভূসম্পত্তি কিনল, তাতে বসতবাটি, চাকরবাকরদের থাকবার জায়গা, একটি বাগান সবই আছে, সেই সঙ্গে রয়েছে একটি বন্ধকনামা, তার টাকা এক এজেন্ট মারফৎ দিতে হবে। কিন্তু তাতে না আছে ফলের বাগান, না গুজবেরির ঝোপ, না পুকুরে সাঁতার-কাটা হাঁস। একটা নদী ছিল, কিন্তু তার জল একেবারে কফির মতো কালো, কারণ ভূসম্পত্তির একদিকে ছিল ইঁটখোলা আর অন্যদিকে একটা হাড় পোড়ানোর কারখানা। কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে আমার ভাই নিকলাই ইভানিচ দুডজন গুজবেরি ঝোপের ফরমাশ দিল এবং জমিদারের মতো সেখানে স্থায়ী হয়ে বসল।

গতবছর তার কাছে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সেখানে তার কেমন চলছে দেখে আসব। চিঠিতে সে আমাকে ঠিকানা দিয়েছিল 'চুম্‌বারোক্লভা পুশতোশ বা হিমালাইস্কয়ে'। হিমালাইস্কয়েতে এলুম বিকেলে। ভয়ানক গরম। চারদিকে খাল, বেড়া, ফারগাছের সারি, প্রাঙ্গণে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া এবং গাড়ি রাখবার জায়গা পাওয়া শক্ত। আমি ঢুকতেই বেরিয়ে এল লালচে রঙের একটা মোটা কুকুর, শুওরের সঙ্গে তার অদ্‌ভুত সাদৃশ্য। ওটাকে দেখে মনে হচ্ছিল অমন অলস না হলে সে বোধ হয় ঘেউ ঘেউ করে উঠত। রাঁধুনীটাও মোটা এবং শুওরের মতো রসুইঘর থেকে সে খালি পায়ে বেরিয়ে এসে বলল যে, গৃহকর্তা খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করছেন। ভাই-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম সে বসে আছে বিছানার ওপর, হাঁটুদুটো কম্বলে ঢাকা। বার্ধক্য এসেছে তার, মোটা থলথলে হয়ে উঠেছে। তার গাল, নাক, ঠোঁট কেমন বাইরে দিয়ে ঠেলে উঠেছে — আমার মনে হচ্ছিল এই বুঝি কম্বলের মধ্যে সে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠবে।

পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আমরা কাঁদলুম, হর্ষ বিষাদে মেশানো সে অশ্রু, কাঁদলুম এই জন্য যে, এককালে আমরাও তরুণ ছিলাম, কিন্তু এখন আমাদের চুল পেকে গেছে, ধীরে ধীরে মরণের পথে এগিয়ে চলেছি। সে এরপর জামাকাপড় পরে নিল এবং আমাকে তার ভূসম্পত্তি দেখাতে নিয়ে চলল।

আমি শুধোলাম, "এখানে চলছে কেমন?"

"বেশ কাটছে, ভগবানের দয়ায় বেশ সুখে আছি।"

সে আর সেই দরিদ্র ভীরু কেরাণীটি নেই, সে এখন সত্যিকারের মালিক, একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। স্থায়ী হয়ে সে বসেছে, সোৎসাহে পল্লীজীবনের মধ্যে প্রবেশ করছে। প্রচুর খায়দায়, স্নানাগারে চান করে শরীরে বেশ মাংস হয়েছে তার। ইতিমধ্যেই গ্রাম্য সমাজ, ইঁটখোলা এবং হাড় পোড়ানো কলের সঙ্গে সে মামলায় জড়িয়েছে, আর চাষীরা 'হুজুর' না বলে সম্বোধন করলে সে রাগ করে। ধর্মকর্ম সে করে আড়ম্বরে, ভদ্রলোকের মতো, জমক দেখানো সৎকাজের মধ্যে কোনো রকম সরলতা নেই। কী তার সৎকাজ? চাষীদের সর্বরোগের চিকিৎসা করে সে সোডা আর ক্যাস্টর অয়েল দিয়ে, তার নামকরণের দিনে এক বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উৎসব অনুষ্ঠান করায়, তারপর আধ হাঁড়ি ভদকা বিলিয়ে মনে করে বুঝি এটাই ঠিক কাজ। সে যে কী সাংঘাতিক আধ হাঁড়ি ভদকা বিতরণ! তার জমিতে ভেড়া চরিয়েছে বলে আজ স্থূলবপু জমিদার জেমস্তভোর কর্তার সামনে চাষীদের টেনে নিয়ে যায় আর কাল আমোদের দিনে সে তাদের বিলিয়ে দেয় আধ হাঁড়ি ভদকা। তারা তাই খায় আর চেঁচিয়ে জয়ধ্বনি দেয়, তারপর মাতাল হয়ে গেলে তার সামনে মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি দেয়। যে কোনো রাশিয়ানের অবস্থা একটু ফিরলেই, একটু তৃপ্তি কিংবা কুঁড়েমি দেখা দিলেই তার মধ্যে সৃষ্টি হয় আত্মসন্তুষ্ট ঔদ্ধত্য। সরকারী চাকরীতে থাকার সময় নিকলাই ইভানিচ নিজস্ব কোনো মত পোষণ করতেও ভয় পেত, কিন্তু এখন সে সব সময় দারুণ প্রভুত্বের ভঙ্গীতে বচন দিয়ে চলছে: "শিক্ষা নিশ্চয় আবশ্যক, কিন্তু লোকে এখনো তার জন্য প্রস্তুত হয় নি", "বেত্রাঘাত সাধারণত অন্যায়, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা কল্যাণকর এবং অপরিহার্য।"

সে বলে, "আমি লোক চিনি, তাদের সঙ্গে কী রকম আচরণ করতে হয় জানি। লোকে আমাকে ভালোবাসে, আমার শুধু কড়ে আঙুলটি তোলার সঙ্গে সঙ্গে যা চাই সবাই তা করবে।"

আর বুঝলেন, এই সব কথা সে বলে বেশ একটি বিজ্ঞ এবং ক্ষমাশীল হাসির সঙ্গে। বার বার সে বলে একটা কথা: 'আমরা যারা সম্ভ্রান্ত' অথবা 'ভদ্রলোক হিসেবে বলতে গেলে', এই সব বলে আর বোধ হয় একদম ভুলে যায় যে আমাদের পিতামহ ছিলেন চাষী এবং আমাদের বাবা একজন সাধারণ

সৈনিক। আমাদের পদবী—চিমশা-হিমালাইস্কি—আসলে অতি অদ্‌ভুত, কিন্তু এখন নিকলাই-এর কাছে এই পদবীই একটি গালভরা, একটি বিশিষ্ট শ্রুতিমধুর নাম।

কিন্তু তার কথা আমি বলতে চাইছি না, বলতে চাইছি নিজেরই কথা। ভাই-এর পল্লীভবনে ওই কয়েকঘণ্টা কাটিয়ে আমার মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা দিল তাই বর্ণনা করতে চাই। সন্ধ্যাবেলা আমরা চা খাচ্ছিলাম, এমন সময় রাঁধুনী এক প্লেটভর্তি গুজবেরি এনে দিল আমাদের। ফলগুলো টাকা দিয়ে কেনা হয়নি, এ আমার ভাইয়ের বাগানেরই জিনিষ, সে যে গুজবেরির ঝোপ লাগিয়েছিল এগুলো তারই প্রথম ফল। নিকলাই ইভানিচ হা হা করে হাসিতে ফেটে পড়ল, তারপর জল-ভরা চোখে চুপচাপ ফলগুলির দিকে অন্তত এক মিনিট তাকিয়ে রইল। আবেগে রুদ্ধবাক হয়ে একটিমাত্র গুজবেরি মুখে ফেলে দিয়ে আমার দিকে বিজয়ীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, যেন একটি শিশু শেষ পর্যন্ত তার দীর্ঘ আকাংক্ষিত খেলনাটি হাত করতে পেরেছে। সে বলল:

"চমৎকার!"

তারপর সে খেতে লাগল লোভীর মতো, আর বার বার বলতে লাগল:

"ভারি চমৎকার, খেয়ে দেখো।"

ফলগুলি শক্ত আর টক, কিন্তু পুশকিন যে বলেছেন: 'যে-মিথ্যে আমাদের উৎফুল্ল করে হাজারটা ধ্রুব সত্যের চেয়ে তা প্রিয়তর', সেইরকম ব্যাপার। চোখের সামনে দেখলুম সত্যিকারের সুখী একটি মানুষ, যার প্রিয়তম আকাংক্ষা পূর্ণ হয়েছে, যে জীবনের লক্ষ্য সাধন করেছে, যা চেয়েছিল তা পেয়েছে, পেয়ে নিজের বরাত নিয়ে আর নিজেকে নিয়ে তৃপ্তি লাভ করেছে। মানুষের সুখ সম্পর্কে আমার যে অনুভূতি তা বরাবরই একটু বিষাদের আভাস মাখা। সুখী একটি মানুষের মুখোমুখি বসে আমার মন বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল, সে-বিষণ্ণতা প্রায় নৈরাশ্যেরই মতো। মনের এই ভাবটি সব থেকে জোরালো হয়ে দেখা দিল রাত্রিতে। ভাই-এর শয়নকক্ষের পাশের ঘরটিতে আমাকে শুতে দেওয়া হয়েছে, শুয়ে শুয়ে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম সে অস্থিরভাবে হেঁটে চলেছে, একটু পর পরই উঠছে আর প্লেট থেকে একটি করে গুজবেরি নিয়ে আসছে। মনে মনে বললুম, ক'জন লোকই বা তৃপ্ত, সুখী!

কী সাংঘাতিক অভিভূতকারী শক্তি! একবার চিন্তা করে দেখুন এই জীবনের কথা—প্রবলের রূঢ়তা আর আলস্য, দুর্বলের অজ্ঞতা আর পাশবিকতা, চতুর্দিকে অসহ্য দারিদ্র্য, আবদ্ধ সংকীর্ণ বাড়িঘর, অধঃপতন, মাতলামি ভণ্ডামি, মিথ্যাচার ... কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হয় সে সব গৃহকোণে, সে সব পথেঘাটে কত শান্তি আর শৃংখলা বিরাজ করছে। কোনো শহরের পঞ্চাশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে চীৎকার করে উঠে সশব্দে নিজের ক্রোধ প্রকাশ করবে। আমরা তাদেরই দেখি যারা খাবার কিনতে যায় বাজারে, যারা দিনের বেলা খায়দায় আর রাতে ঘুমোয়, যারা বকবক করে সময় কাটায়, বিয়ে করে, বুড়ো হয়, কবরে নিয়ে যায় নিজেদের মৃত আত্মীয়স্বজনদের। কিন্তু যারা দুঃখভোগ করে তাদের কথা আমরা শুনিও না, তাদের দেখিও না, জীবনের ভয়ঙ্কর ব্যাপারগুলি সর্বদাই ঘটে দৃশ্যের অন্তরালে। সবই স্থির, শান্ত, কেবল যে সংখ্যাতত্ত্ব মূক, তাই প্রতিবাদ জানায়: এতগুলো লোক পাগল হয়ে গেছে, এত পিপে মদ পান করা হয়েছে, এতগুলি শিশু পুষ্টির অভাবে মারা গেছে ... আর ঠিক এসবই যেন ঘটবার কথা। যেন সুখী যারা তারাই কেবল জীবন উপভোগ করতে পারে, কারণ দুঃখীরা নীরবে তাদের বোঝা বহন করে, এই নীরবতা না থাকলে সুখভোগ সম্ভব হত না। এ যেন একরকম সার্বজনীন সংবেশন। প্রত্যেকটি তৃপ্ত সুখী মানুষের দ্বারের পেছনে হাতুড়ী হাতে একটা লোক দাঁড়িয়ে থাকা উচিত; বারবার আঘাত করে সে কেবল স্মরণ করিয়ে দেবে, পৃথিবীতে দুঃখী মানুষ আছে, স্মরণ করিয়ে দেবে সুখী মানুষ আজ যতই সুখী থাকুক, কয়েক দিন আগেই হোক পরেই হোক জীবন তার অনাবৃত নখর প্রদর্শন করবেই, তার বিপর্যয় ঘটবেই — আসবে পীড়া, দারিদ্র্য, ক্ষয়ক্ষতি, আর তখন কেউ তা দেখবে শুনবে না, যেমন আজ সে অন্যের দুর্ভাগ্য দেখছে না বা অন্যের দুঃখের কথা শুনছে না। কিন্তু হাতুড়ী হাতে এমন কোনো লোক নেই। সুখী মানুষ জীবন যাপন করে চলেছে, অ্যাসপেন তরুর পত্ররাশিতে বাতাসের কম্পনের মতো ভাগ্যের তুচ্ছ উত্থান-পতন তাকে আলগোছে ছুঁয়ে যাচ্ছে মাত্র; সবই আছে ঠিক।'

ইভান ইভানিচ উঠে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে বলে চললেন, 'সেই রাত্রিতে আমি বুঝলাম, আমিও সুখী এবং তৃপ্ত। আমিও শিকার করতে গিয়ে, কিংবা ডিনার

টেবিলে বসে জীবন যাপনের, পুজো আর্চার, লোকজনকে চালিয়ে ঠিক পথে নেবার উপদেশ দিতাম। আমিও বলেছি যে, জ্ঞান ছাড়া আলো দেখা দিতে পারে না, বলেছি শিক্ষাদান আবশ্যক, কিন্তু বলেছি যৎসামান্য লিখতে পড়তে শেখাই সাধারণ লোকের পক্ষে যথেষ্ট। বলেছি, স্বাধীনতা আশীর্বাদ। বাতাস ছাড়া যেমন চলে না তেমনি স্বাধীনতা ছাড়াও চলে না, তবে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। হ্যাঁ, একথাই বলেছি, কিন্তু এখন আমি প্রশ্ন করি: কেন? কীসের জন্য অপেক্ষা করব?' বলে ইভান ইভানিচ বুরকিনের দিকে সক্রোধে তাকালেন। 'আমি জিজ্ঞেস করছি, কীসের নামে অপেক্ষা করব আমরা? বিবেচনা করার আছে কী? লোকে বলে, অত তাড়াতাড়ি কোরো না, বলে প্রত্যেকটি ভাবধারা বাস্তবে পরিণতি লাভ করে ক্রমে ক্রমে, আপন সময় মতো। কিন্তু এসব কথা যারা বলে কারা তারা? তাদের কথা যে ন্যায় তার প্রমাণ কোথায়? বস্তুর প্রাকৃতিক নিয়মের কথা বলবে, ঘটনাবলীর যুক্তি ধারার কথা বলবে, কিন্তু আমি, একজন চিন্তাশীল জীবন্ত ব্যক্তি, একটা পরিখা যখন লাফিয়ে পার হয়ে যেতে পারি কিংবা তার ওপর দিয়ে একটি সেতু গড়ে তুলতে পারি তখন কেন, কোন নিয়মে, কোন যুক্তিবিজ্ঞানের জন্য আমি তার পারে দাঁড়িয়ে থাকব আর অপেক্ষা করব কবে পরিখাটা ধীরে ধীরে আগাছায় ভরাট হয়ে ওঠে কিংবা পঙ্কে বুজে যায়? আবার জিজ্ঞাসা করি, কীসের নামে আমরা অপেক্ষা করব? অপেক্ষা! যখন বাঁচবার সামর্থ্যটুকু নেই অথচ বাঁচবার সাধ আছে আর বাঁচতে হবেই, তখন অপেক্ষা করার কথা বলার অর্থ কী?

পরদিন খুব সকালে ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, আর তারপর থেকে শহরের জীবন আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। শান্তি আর স্তব্ধতা আমার মেজাজে যেন ভার হয়ে চেপে বসে, জানালার দিকে তাকাতে ভয় করে, কারণ চায়ের টেবিল ঘিরে বসে-থাকা একটি সুখী পরিবারকে দেখার চেয়ে আজকাল আমার কাছে আর কোনো বিষণ্ণতর দৃশ্য নেই। আমি বুড়ো হয়ে গেছি, লড়াই-এর জন্য আর উপযুক্ত নই, এমন কি ঘৃণা বোধ করতেও আমি অসমর্থ। কেবল অন্তরে অন্তরে কষ্ট ভোগ করতে পারি, আর কুপিত বিরক্ত হয়ে পড়ি। রাত্রিতে চিন্তার স্রোতে আমার মাথা জ্বলে যায়, ঘুমুতে পারি না ... উঃ, শুধু যদি তরুণ হতাম!'

উত্তেজিত হয়ে ইভান ইভানিচ পায়চারি করতে করতে বার বার বলতে লাগলেন:

'এখনো যদি যুবক থাকতাম!'

হঠাৎ তিনি আলেখিনের কাছে গিয়ে প্রথমে তাঁর একটি হাত, পরে অন্যটি টিপতে লাগলেন।

অনুনয়ের সুরে তিনি বললেন, 'পাভেল কনস্তান্তিনিচ। আপনি যেন উদাসীন হয়ে যাবেন না, আপনি যেন আপনার বিবেককে নিদ্রায় অসাড় করে ফেলবেন না! যতদিন এখনো তরুণ, সবল, কর্মঠ আছেন ততদিন ভালো কাজে বিরক্ত হবেন না। সুখ বলে কোনো জিনিস নেই, থাকা উচিতও নয়, কিন্তু জীবনে যদি কোনো অর্থ বা লক্ষ্য থেকে থাকে তাহলে সেই তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য নিজের সুখের মধ্যে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় মহত্তর কিছুর মধ্যে, উন্নততর কিছুর মধ্যে। আপনি ভালো করুন, কল্যাণ করুন!'

কথাগুলি ইভান ইভানিচ বললেন একটি সকরুণ অনুনয়ের হাসি হেসে, যেন তিনি নিজের জন্য কিছু প্রার্থনা করছেন।

তারপর তারা তিনজন পরস্পরের থেকে বেশ খানিকটা আলাদা হয়ে আর্মচেয়ারে বসে রইলেন অনেকক্ষণ, কেউ কোনো কথা বললেন না। ইভান ইভানিচের কাহিনী বুরকিন বা আলেখিন কাউকেই সন্তুষ্ট করেনি। দেয়ালে টাঙানো সেনাপতি এবং সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ছবিগুলো যেন আঁধারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সোনালী ফ্রেম থেকে ওঁরা যখন এদিকে তাকিয়ে রয়েছেন তখন ভালো লাগে না এক গরীব কেরাণীর গল্প শুনতে যে গুজবেরি খায়। তার চেয়ে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক হত মার্জিত লোকদের, মহিলাদের গল্প শোনা। আর তাছাড়া তাঁরা যে সেই বৈঠকখানাটায় বসে আছেন সেই ঘটনাটিই যে-কোনো গল্পের চেয়ে ভালো। এ বৈঠকখানার সবকিছু — পটি-বাঁধা দীপাধার, আর্মচেয়ার, মেঝের ওপর বিছানো গালিচা সবকিছু প্রমাণ করছে যে ফ্রেমের মধ্য থেকে তাকিয়ে-থাকা ওই নারী ও পুরুষেরা এককালে এখানে চলে ফিরে বেড়িয়েছেন, চেয়ারে উপবেশন করেছেন, চা পান করেছেন এখন যেখানে সুন্দরী পেলাগেয়া ইতস্তত নিঃশব্দে চলাফেরা করছে।

বেজায় ঘুম পেয়েছে আলেখিনের। ভোর তিনটের সময় উঠতে হয়েছে তাঁকে, উঠে বাড়ির কাজকর্ম করতে হয়েছে, এখন আর চোখ খুলে রাখতে

পারছিলেন না তিনি। কিন্তু উঠে ঘুমুতে যেতেও পারছিলেন না, যদি তাঁর চলে যাবার পর অতিথিদের কোনো একজন চমৎকার কিছু বলেন এই ভয়ে। এইমাত্র ইভান ইভানিচ যা বললেন তা খুব ন্যায্য কিনা কিংবা খুব জ্ঞানগর্ভ কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারছেন না আলেখিন, তাঁর অতিথিরা শস্য, খড়, আলকাতরা প্রভৃতি ছাড়াও আর আর সব বিষয়ে কথা বলছিলেন, এমন সব বিষয় যার সঙ্গে আলেখিনের দৈনন্দিন জীবনের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। এইটি আলেখিনের ভালো লাগছিল, আর তিনি চাইছিলেন ওঁরা গল্প করে যান।

বুরকিন উঠে বললেন, 'আচ্ছা, এবার শুতে যাবার সময় হল। শুভরাত্রি।'

আলেখিন শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেলেন একতলায় তাঁর নিজের কক্ষে, ওপরে রইলেন অতিথিরা। রাত্রি যাপনের জন্য তাঁদের দেওয়া হল প্রকাণ্ড একখানা ঘর, তাতে রয়েছে খোদাই কাজ করা বহু প্রাচীন দুখানা কাঠের খাট, আর এক কোণে হাতির দাঁতের একটি ক্রুশ। পেলাগেয়া সুন্দরী তাঁদের শয্যা প্রস্তুত করে দিল, প্রশস্ত, শীতল বিছানাদুটি থেকে সদ্য-কাচা চাদর প্রভৃতির মনোরম গন্ধ পাওয়া যেতে লাগল।

নীরবে জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লেন ইভান ইভানিচ।

'ঈশ্বর আমাদের, পাপীতাপীদের, কৃপা করুন,' এই বলে তিনি চাদরে মাথা ঢেকে দিলেন।

টেবিলে তিনি তাঁর পাইপটি রেখেছিলেন। তা থেকে বাসি তামাকের কড়া গন্ধ আসছিল আর সেই দুর্গন্ধটা কোথা থেকে আসছে তাই ভেবে ভেবে অনেকক্ষণ বুরকিনের চোখে ঘুম এল না।

সারা রাত্রি জানালার শার্সিতে বৃষ্টির শব্দ হতে থাকল।

১৮৯৮

কুকুরসঙ্গী মহিলা

১

কথাটা সবাই বলাবলি করছিল। সমুদ্রের তীরে একজন নবাগতাকে দেখা গেছে। কুকুরসমেত একজন মহিলা। পক্ষকাল হল দ্মিত্রি দ্মিত্রিচ গুরভ এসেছে ইয়াল্তায়, মোটামুটি পরিচিত হয়ে উঠেছে শহরের হালচালের সঙ্গে। সেও এখন নতুন লোক এলেই কৌতূহলী হয়ে ওঠে। ভের্নেৎ-এর খোলা জায়গার কাফেতে বসে সে দেখল, 'টোক্' টুপি মাথায় দিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে একটি তরুণী। তার চুল সোনালী, সে খুব বেশি লম্বা নয়। একটি সাদা পমেরানিয়ান কুকুর গুটি গুটি চলেছে তরুণীর পেছনে পেছনে।

তারপর থেকে দিনের মধ্যে কয়েকবার করে দেখা হতে লাগল মিউনিসিপাল পার্কে এবং স্কোয়ারে। তরুণীটি সব সময়ে একা, সব সময়ে সেই একই 'টোক্' টুপি পরে থাকে আর পমেরানিয়ান কুকুরটি সব সময়ে চলে পাশে পাশে। তরুণীর পরিচয় কারুরই জানা ছিল না, উল্লেখ করতে হলে লোকে শুধু বলত, 'কুকুরসঙ্গী মহিলা'।

গুরভ ভাবল, 'যদি ওর স্বামী বা বন্ধুবান্ধব না থাকে তাহলে ওর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলে মন্দ হয় না কিন্তু।'

গুরভের বয়স এখনো চল্লিশ হয়নি, কিন্তু এই বয়সেই তার মেয়ের বয়স বারো, দুটি ছেলে স্কুলে পড়ে। কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময় গুরভের বিয়ে হয়েছিল। ধরা পড়া বিয়ে। তার বৌকে এখন দেখলে মনে হয়, তার দ্বিগুণ বয়স। স্ত্রীলোকটির গড়ন লম্বা, ভুরু কালো, ঋজু শরীর। চালচলন সম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদাসূচক। আর নিজেকে সে বলে "চিন্তাশীলা'।

প্রচুর বই পড়ে, শব্দের শেষে 'কাঠিন্যসূচক চিহ্ন'* বাদ দিয়ে চিঠি লেখে, স্বামীকে 'দ্‌মিত্রি' না বলে ডাকে 'দিমিত্রি'। আর গুরভের যদিও মনে মনে ধারণা যে তার স্ত্রী মানুষ হিসেবে বোকা, সংকীর্ণমনা, অমার্জিত — কিন্তু বাইরে সে স্ত্রীকে ভয় করেই চলে এবং পারতপক্ষে বাড়িতে থাকে না। স্ত্রীর সঙ্গে প্রতারণা শুরু করেছে বহুকাল আগে থেকেই এবং হালে দাম্পত্য সততা বলে কোনো কিছুর বালাই তার নেই। নিঃসন্দেহে এই কারণেই সে স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করে, বলে, 'নিম্নতর জাতি'।

গুরভ মনে করে, জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে সে এতবেশি শিক্ষা পেয়েছে যে স্ত্রীলোকদের যা খুশি বলবার অধিকার তার আছে। অথচ এই 'নিম্নতর জাতিকে' বাদ দিয়ে একটি দিনও তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। পুরুষের সাহচর্য তার কাছে অপ্রীতিকর ও অস্বস্তিকর। ফলে পুরুষের সঙ্গে তার ব্যবহার নিরুত্তাপ ও আড়ষ্ট। কিন্তু স্ত্রীলোকদের সাহচর্যে সে ঘরোয়া স্বস্তি অনুভব করে, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করতে হয়, কোন বিষয়ে বলতে হয় তা তার ভালো ভাবেই জানা। এমন কি স্ত্রীলোকদের মধ্যে এসে চুপচাপ থাকতে হলেও ব্যাপারটা তার কাছে কিছুমাত্র বিসদৃশ ঠেকে না। তার চেহারা ও চালচলনের মধ্যে এমন একটা বিভ্রান্তিকর মাধুর্য আছে যে স্ত্রীলোকরা তার প্রতি আকর্ষণ ও সহানুভূতি অনুভব করে। এটা সে জানে এবং নিজেও এক অদৃশ্য শক্তির টানে স্ত্রীলোকদের দিকে আকৃষ্ট হয়।

তার জীবনে বারবার এই তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, কোনো মেয়ের সঙ্গে নতুন করে ঘনিষ্ঠতা হবার প্রথম পর্বে ব্যাপারটা যতোই রোমাঞ্চকর মনে হোক না কেন, তার ফলে প্রাত্যহিক জীবনে যতোই মনোমুগ্ধকর বৈচিত্র্য আসুক না কেন, শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে অসহ্য রকমের বিরক্তিকর, বাড়াবাড়ি রকমের এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি। ভদ্রলোকদের জীবনে এমনি ঘটনাই ঘটে থাকে (বিশেষ করে মস্কোতে, যেখানকার

---

* এক দল প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী ব্যঞ্জনবর্ণের পরে কাঠিন্যসূচক চিহ্ন বাদ দিয়ে লিখত। রুশ বর্ণমালায় পরে যে সংস্কার হয়েছে, এ থেকেই তার সূচনা।

ভদ্রলোকরা অত্যন্ত অব্যবস্থিতচিত্ত এবং সব ব্যাপারেই গড়িমসি করে)। কিন্তু আকর্ষণীয় চেহারার স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে এলেই সে এই অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে জীবনের প্রতি কামনা দুর্বার হয়ে ওঠে এবং সবকিছুকেই মনে হয় সরল ও কৌতুকপ্রদ।

এক সন্ধ্যেয় সে পার্কের রেস্তোরাঁয় খাচ্ছিল এমন সময়ে টোক্-পরিহিতা সেই মেয়েটি ঘুরতে ঘুরতে এসে বসল পাশের এক টেবিলে। মেয়েটির হাবভাব, চালচলন, পোশাক পরিচ্ছদ, চুল-বাঁধা ইত্যাদি দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে সে সম্ভ্রান্তবংশীয়া এবং বিবাহিতা, বোঝা যাচ্ছিল যে ইয়াল্তাতে সে এই প্রথম এসেছে এবং তার এখানকার জীবন নিঃসঙ্গ ও একঘেয়ে ... ইয়াল্তায় যারা বেড়াতে আসে তাদের নৈতিক শৈথিল্য নিয়ে বহু গল্প প্রচলিত আছে, সে সব গল্প বড়ো বেশি অতিরঞ্জিত। সে তাতে বিশেষ কর্ণপাত করে না কারণ সে জানে যে অধিকাংশ গল্পগুলো তারাই বানিয়েছে যারা হদিশ জানা থাকলে নিজেরাই পরমানন্দে নৈতিক শৈথিল্যের মধ্যে ডুবে যেতে পারত। কিন্তু যখন তার টেবিল থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে এসে মেয়েটি বসল তখন আর সে স্থির থাকতে পারল না। সহজে নারীচিত্তজয় ও পাহাড়ে বেড়ানোর গল্পগুলো তার মনে পড়ল। দ্রুত ও ক্ষণিক অন্তরঙ্গতার, যে মেয়েটির নাম পর্যন্ত সে জানে না তার সঙ্গে প্রেম করার লোভনীয় ইচ্ছে হঠাৎ তাকে ভর করল।

পমেরানিয়ান কুকুরটার দিকে আঙুল দিয়ে ইসারা করতেই কুকুরটা গুটি গুটি তার কাছে এসে হাজির। তখন কুকুরটাকে তর্জনী তুলে সে শাসিয়ে উঠল। গর্গর্ শব্দে ডেকে উঠল কুকুরটা। আবার সে তর্জনী তুলে শাসাল।

মেয়েটি তার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল সঙ্গে সঙ্গে।

'ও কাউকে কামড়ায় না,' বলে মেয়েটি আরক্ত হয়ে উঠল।

'ওকে একটা হাড় দিতে পারি?' তার প্রশ্নের জবাবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল মেয়েটি। অন্তরঙ্গ সুরে গুরুভ প্রশ্ন করল, 'আপনি কি ইয়াল্তাতে অনেক দিন এসেছেন?'

'প্রায় পাঁচ দিন।'

'দু' সপ্তাহ ধরে এখানে আমি আছি।'

কিছুক্ষণ কেউ আর কোনো কথা বলল না।

'দিনগুলো তো তাড়াতাড়ি কেটে যায় কিন্তু তা সত্ত্বেও কী ভীষণ একঘেয়ে লাগে!' তার দিকে না তাকিয়েই মেয়েটি বলল।

'একঘেয়েমি নিয়ে নালিশ জানানোটা এখানকার রেওয়াজ। বেলিয়েভ বা ঝিজ্‌দ্রার মতো হতকুচ্ছিৎ জায়গাতে থেকেও লোকে কিন্তু একঘেয়েমি নিয়ে নালিশ জানায় না। কিন্তু এখানে এলেই বলে, "কী একঘেয়ে! ইস্‌, কী ধুলো!" মনে হয় যেন সব গ্রেনাদা থেকে এসেছে!'

মেয়েটি হাসল। তারপর দুজনে খেয়ে চলল নিঃশব্দে, যেন কারও সঙ্গে কারও বিন্দুমাত্র পরিচয় নেই। কিন্তু খাওয়াদাওয়ার পর দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে এল রেস্তোরাঁ থেকে। আর আরম্ভ হল স্বাধীন তৃপ্ত মানুষের হালকা হাসিঠাট্টায় ভরা কথোপকথন, যারা যেখানেই যাক বা যে বিষয়েই কথা বলুক কিছু যায় আসে না। তারা ঘুরে বেড়াতে লাগল। সমুদ্রের ওপরে অদ্ভুত একটা আলো—তাই নিয়ে কথা হল কিছুটা। সমুদ্রের জল উষ্ণ; কোমল বেগুনী রঙ; তার ওপর জ্যোৎস্নার সোনালী ফালি। সারাটা দিনের গরমের পরে কী গুমোট বলাবলি করল দুজনে। মেয়েটিকে গুরভ জানালো যে সে এসেছে মস্কো থেকে, কাজ করে মস্কোর একটা ব্যাঙ্কে যদিও আসলে সে ভাষাতত্ত্ববিদ। একসময়ে এক প্রাইভেট অপেরা কোম্পানীতে গান গাইবার জন্য নিজেকে সে তৈরি করেছিল, পরে কিন্তু মত বদলায়। মস্কোতে তার নিজস্ব দুটি বাড়ি আছে... আর মেয়েটির কাছ থেকে সে জানল যে সে মানুষ হয়েছে পিটার্সবুর্গে, কিন্তু তার বিয়ে হয়েছে স· শহরে। গত দু বছর সেখানেই সে আছে। আরো মাসখানেক সে ইয়ালতাতে থাকবে। হয়ত তার স্বামীও আসবে—কারণ তারও বিশ্রাম দরকার। সে সঠিকভাবে বলতে পারল না তার স্বামী 'গুবের্নিয়া' পরিষদে না 'জেম্‌স্তভো' বোর্ডে চাকরি করে। নিজের অজ্ঞতায় নিজেরই তার ভারি মজা লাগল। গুরভ আরো জানতে পারল যে মেয়েটির নাম আন্না সের্গেয়েভ্‌না।

নিজের ঘরে ফিরে গুরভ মেয়েটির কথা ভাবতে লাগল। পরের দিন মেয়েটির সঙ্গে হয়ত আবার দেখা হবে। দেখা হতেই হবে। শুতে যাবার সময়েও তার বারবার মনে হতে লাগল যে অল্প কিছুকাল আগেও মেয়েটি ছিল ছাত্রী, তার নিজের মেয়ের মতো, পড়া তৈরী করত। মনে পড়ল, মেয়েটির হাসি এবং বাইরের লোকের সঙ্গে ব্যবহারের মধ্যে কতটা সংকোচ ও আড়ষ্টতা

রয়েছে। জীবনে বোধ হয় এই প্রথম মেয়েটি একা এবং এমন অবস্থায় রয়েছে যখন পুরুষরা ওর পেছু নেয়, ওর দিকে নজর রাখে, ওর সঙ্গে কথা বলে। আর এসবের পেছনে গোপন মতলব আছে তাও মেয়েটির কাছে দুর্বোধ্য থাকার কথা নয়। গুরভের মনে পড়ল মেয়েটির রোগা মসৃণ গ্রীবা আর ওর সুন্দর ধূসর চোখদুটি।

ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে সে ভাবল, 'কিন্তু তবুও মেয়েটি যেন কেমন বেচারা-বেচারা।'

২

আলাপের সূত্রপাতের পর এক সপ্তাহ কাটল। সেটা ছিল ছুটির দিন। ঘরের ভেতরে গুমোট, কিন্তু বাইরে ধুলোর ঝড়, লোকের টুপি উড়ে যাচ্ছে। ঘন ঘন তৃষ্ণা পায়। গুরভ বারবার যাতায়াত করছে সদর রাস্তার কাফেতে, আন্না সের্গেয়েভনাকে দেবার জন্যে আইসক্রীম ও ফলের রস কিনে আনছে। ভয়ংকর গরম।

সন্ধ্যার সময় বাতাসের দাপট একটু কমলে ওরা জাহাজঘাটায় বেড়াতে গেল স্টীমার আসা দেখতে। অবতরণের জায়গায় প্রচুর লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ কেউ ফুলের গুচ্ছ হাতে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। ইয়াল্‌তার এই ফিটফাট মানুষগুলোর মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে— বয়স্কা মহিলারা সকলেই অল্পবয়স্কার মতো সাজপোষাক পরে আর মনে হয় যেন জেনারেলদের সংখ্যা অতিরিক্ত।

সমুদ্রের বিক্ষুব্ধতার জন্য স্টীমারটা পেঁছিল দেরি করে সূর্যাস্তের পর। জেটির পাশে লাগবার জন্যে বেশ কিছুটা কসরৎ করতে হয় স্টীমারটাকে। আন্না সের্গেয়েভনা অপেরা গ্লাস চোখে দিয়ে স্টীমার ও যাত্রীদের এমনভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল যেন পরিচিত কাউকে খুঁজছে। গুরভের দিকে যখন তাকাল তখন তার চোখদুটো চকচক করছে। সে অনর্গল কথা বলে চলল, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলল, পর মুহূর্তেই ভুলে যেতে লাগল কী জানতে চেয়েছিল। তারপর ভিড়ের মধ্যে ওর অপেরা গ্লাসটা গেল হারিয়ে।

ফিটফাট মানুষগুলো চলে যেতে শুরু করল। এখন আর স্পষ্টভাবে চেহারা চেনা যায় না। বাতাস একেবারে শান্ত হয়ে পড়েছে। গুরভ ও আন্না

সের্গেয়েভনা তখনো দাঁড়িয়ে, যেন অপেক্ষা করছে আর কেউ স্টীমার থেকে বেরিয়ে আসবে। আন্না সের্গেয়েভনার মুখে কথা নেই, গুরভের দিকে না তাকিয়ে বারবার ফুলের গন্ধ শুঁকছে।

গুরভ বলল, 'সন্ধেটা ভারি চমৎকার হয়েছে কিন্তু। কী করা যায়, বলুন তো? চলুন গাড়ি করে খানিক ঘুরে বেড়িয়ে আসি।'

আন্না সের্গেয়েভনা উত্তর দিল না।

গুরভ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। তারপর হঠাৎ তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল ঠোঁটে। ফুলের সুগন্ধ আর আর্দ্রতা আচ্ছন্ন করল গুরভকে। কিন্তু পর মুহূর্তেই সে আতঙ্কিত হয়ে তাকাল পেছন দিকে —কেউ কি দেখে ফেলেছে?

'চলুন, আপনার ঘরে যাই।' ফিসফিস করে বলল সে।

দ্রুত পায়ে স্থানত্যাগ করল দুজনে।

ঘরের ভেতরটা গুমোট। জাপানী দোকান থেকে ও কী একটা সেন্ট কিনেছিল, তারই গন্ধ সেখানে। গুরভ ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, 'জীবনে কত অদ্ভুত দেখাশুনোই না হয়!' তার মনে পড়ল সেই সব নিরুদ্বিগ্নচিত্ত ভালোমানুষ মেয়েদের কথা যারা প্রেম করত উচ্ছল হয়ে এবং অল্পক্ষণের জন্যে হলেও তাদের সে যে আনন্দ দিয়েছিল সেজন্যে কৃতজ্ঞ হত তার কাছে। অন্য ধরনের মেয়েরাও ছিল—তার স্ত্রীও তাদের মধ্যে একজন—তাদের সোহাগ ছিল কপট, আড়ষ্ট আর হিস্টিরিয়াগ্রস্তদের মতো। তারা বলত প্রচুর অপ্রয়োজনীয় কথা। তাদের হাবভাব দেখে একথাটাই যেন মনে হত, ওরা যা করছে সেটা শুধুই প্রেম করা বা কামনার তাগিদে নয়—তার তাৎপর্য আরো অনেক বেশি। তার জীবনে আরো দু তিনটি মেয়ে এসেছিল। তারা সুন্দরী ও নিরুত্তাপ। তাদের মুখেচোখে খেলে যেত একটা হিংস্র ভাব। জীবন যতটুকু দিতে পারে তার চেয়ে বেশি কিছু নিংড়ে নেবার সংকল্প যেত বোঝা। প্রথম যৌবন পার হয়ে আসা সেই মেয়েরা ছিল খামখেয়ালী বিবেকহীন, স্বেচ্ছাচারী এবং বুদ্ধিহীন। ওদের সম্পর্কে গুরভের আবেগ কমে গেলে ওদের রূপ দেখে তার মনে বিতৃষ্ণা ছাড়া আর কিছু জাগত না। ওদের অন্তর্বাসের লেস-লাগানো কিনার দেখে মনে হত যেন মাছের আঁশ।

কিন্তু এই মেয়েটির মধ্যে অনভিজ্ঞ তারুণ্যের ভীরুতা ও আড়ষ্টতা এখনো

স্পষ্ট। আবহাওয়ায় কেমন যেন একটা বিব্রতভাব, যেন এইমাত্র দরজায় টোকা দিয়েছে কেউ। 'কুকুরসঙ্গী মহিলা' আন্না সের্গেয়েভনাকে দেখে মনে হল যেন ব্যাপারটা তার কাছে বিশেষ একটা ঘটনা, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এমন ভাব করেছে যেন সে ভ্রষ্টা হয়ে গেছে। গুরভের কাছে এই মনোভাব বিসদৃশ ঠেকল। সে স্বস্তি বোধ করল না। মেয়েটির চোখেমুখে ফুটে উঠেছে একটা বিহ্বলতার ছাপ, লম্বা চুলগুলো শোকার্তভাবে ঝুলে পড়েছে মুখের দুপাশ দিয়ে। দেখে মনে হয়, গভীর বিষাদের প্রতিমূর্তি—ক্লাসিকাল চিত্রের কোনো অনুতপ্ত পাপীর মতো।

মেয়েটি বলল, 'এ অন্যায়। এর পর আমার সম্পর্কে তোমার আর ভালো ধারণা থাকবে না।'

টেবিলের ওপর একটা তরমুজ ছিল। তার থেকে একটা টুকরো কেটে নিয়ে আস্তে আস্তে খেতে শুরু করল গুরভ। অন্তত আধঘণ্টা সময় কেটে গেল নিঃশব্দে।

আন্না সের্গেয়েভনাকে ভারি করুণ দেখাচ্ছে। জীবন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ভদ্র সরল মেয়ের পবিত্রতা উঠেছে ফুটে। টেবিলের ওপর একটিমাত্র মোমবাতি জ্বলছিল। সেই আলোয় ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না ওর মুখ। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে ও মুষড়ে পড়েছে।

গুরভ বলে, 'কেন? তোমার সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকবে না কেন?কী যা-তা বলছ।'

'ঈশ্বর যেন আমাকে ক্ষমা করেন। উঃ, কী ভয়ংকর!' ওর দু চোখ জলে ভরে উঠল।

'নিজেকে সমর্থন করার চেষ্টা করার দরকার নেই।'

'নিজেকে সমর্থন করবো কী করে? আমি একটা খারাপ মেয়ে, ভ্রষ্টা। নিজেকে আমি ঘৃণা করি। নিজেকে সমর্থন করার কথা একেবারেই ভাবছি না। স্বামীকেই আমি ঠকাইনি, ঠকিয়েছি নিজেকেও। আর এটা তো শুধু আজকের একদিনের ব্যাপার নয়। অনেক দিন ধরেই আমি নিজেকে ঠকিয়ে আসছি। আমার স্বামী হয়ত মানুষ হিসেবে সৎ, যোগ্য — কিন্তু লোকটা যেন চাকরবাকরের মতো। আপিসে সে কী কাজ করে জানি না—কিন্তু এটুকু জানি যে সে চাকরবাকরের মতোই। তার সঙ্গে যখন বিয়ে হয়েছিল তখন

আমার বয়স মাত্র কুড়ি। সে সময়ে প্রচণ্ড একটা কৌতূহল আচ্ছন্ন করেছিল আমাকে, চেয়েছিলাম উন্নততর জীবন। নিজেকেই নিজে বলেছিলাম, আমি চাই অন্য ধরনের জীবন, সে জীবন আছে, নিশ্চয়ই আছে ... প্রচণ্ড একটা কৌতূহলে দগ্ধে মরছিলাম ... তোমার পক্ষে এসব কথা বোঝা কিছুতেই সম্ভব নয়, কিন্তু ভগবানের দিব্যি, নিজেকে আর কিছুতেই সামলে রাখতে পারছিলাম না, কিছুতেই স্থির থাকতে পারছিলাম না। স্বামীকে বললাম আমার শরীর অসুস্থ, এই বলে চলে এলাম এখানে ... ঘুরে বেড়াতে লাগলাম ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো, পাগলের মতো ... এখন হয়ে গেছি নিতান্তই সাধারণ, অপদার্থ মেয়ে। সবাই আমাকে এখন তো ঘেন্না করতেই পারে।'

গুরভ তার কথা শুনতে শুনতে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে উঠল। কথা বলার সরল ভঙ্গি আর অনুশোচনা — ভারি অপ্রত্যাশিত, আর বেমানান। মেয়েটির চোখে জল এসেছিল তাই, নইলে মনে হত, ও ভাঁড়ামি করছে কিংবা অভিনয় করছে।

মৃদু স্বরে গুরভ বলল, 'বুঝতে পারছি না, তুমি ঠিক কী চাও!'

গুরভের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ও আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এল।

'আমাকে বিশ্বাস করো, তোমাকে অনুরোধ, আমাকে বিশ্বাস করো,' ও বলতে লাগল, 'জীবনে যা কিছু সৎ এবং পবিত্র, আমি তা ভালোবাসি। পাপকে সহ্য করতে পারি না। আমি কী করছি জানি না। লোকে বলে শয়তানের ফাঁদে পড়া। এবার নিজের সম্পর্কেও বলা চলে, শয়তানের ফাঁদে পড়েছি।'

ফিসফিস করে গুরভ বলল, 'ওসব বলে না লক্ষ্মীটি।'

মেয়েটির আতঙ্কিত বিস্ফারিত চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গুরভ, চুম্বন করল ওকে, মিষ্টি কথা বলে সান্ত্বনা দিতে লাগল। আস্তে আস্তে প্রকৃতিস্থ হল মেয়েটি, আস্তে আস্তে খুশির ভাবটুকু ফিরে এল ওর মধ্যে। একটু পরেই দেখা গেল দুজনে গলা মিলিয়ে আবার হাসছে।

একটু পরে যখন ওরা বাইরে বেরিয়ে এল তখন রাস্তায় জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। শহরটাকে আর সাইপ্রেস গাছগুলোকে মৃত মনে হচ্ছে। কিন্তু সমুদ্র তখনো গর্জন করছে, তখনো আছড়ে আছড়ে পড়ছে তীরে। ঢেউয়ের মাথায়

নাচছে একটি জেলে নৌকো, জেলে নৌকোর বাতিটা ঘুমঘুমে চোখে পিট্‌পিট করছে।

একটা ভাড়া গাড়ি পাওয়া গেল। গাড়িতে চেপে ওরা রওনা হল অরিয়ান্‌দার দিকে।

গুরভ বলল, 'হলঘরের বোর্ডে তোমার নাম লেখা রয়েছে দেখতে পেলাম। ফন দিদেরিৎস। তোমার স্বামী বুঝি জার্মান?'

'না, সম্ভবত স্বামীর ঠাকুর্দা জার্মান ছিলেন। তবে স্বামী কিন্তু খ্রিশ্চিয়ান।'

অরিয়ান্‌দাতে গির্জার কাছাকাছি একটা বেঞ্চিতে বসে তারা তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে। দুজনেই নির্বাক। শেষরাতের কুয়াশার ভেতর দিয়ে অস্পষ্টভাবে ইয়াল্‌তা শহর দেখা যাচ্ছে। পর্বতের চূড়োয় সাদা সাদা নিশ্চল মেঘ। গাছের পাতা নিষ্কম্প। ঝিঁঝিঁ ডাকছে, শোনা যাচ্ছে সমুদ্রের একঘেয়ে ফাঁপা গর্জন। সমুদ্র যেন বলছে শান্তির কথা, বলছে সকল মানুষের ভবিতব্য চির-নিদ্রার কথা। ইয়াল্‌তা বা অরিয়ান্‌দা নামে কোন শহর যখন ছিল না তারও বহু আগে সমুদ্র এভাবেই গর্জন করেছিল। আজও গর্জন করছে এবং ভবিষ্যতে যখন আজকের দিনের মানুষরা থাকবে না তখনো গর্জন করবে এমনি নির্বিকার ও ফাঁপাভাবে। বোধ হয়, মানুষের চিরস্থায়ী পরিত্রাণ, এই গ্রহের জীবনধারা এবং পূর্ণ পরিণতির দিকে এই জীবনধারার অবিশ্রান্ত গতির অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে এই অবিচ্ছিন্নতার মধ্যেই, জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে এই চরম উদাসীনতার মধ্যেই।

একটি তরুণী মেয়ের পাশে বসে রয়েছে গুরভ। ভোরের আলোয় মেয়েটিকে অপরূপ দেখাচ্ছে। সমুদ্র, পাহাড়, মেঘ আর আকাশের বিপুল বিস্তৃতি তার মনকে শান্ত ও মুগ্ধ করে তুলেছে। মনে মনে গুরভ বলল, ভাবতে গেলে বাস্তবিকই পৃথিবীর সবকিছুই সুন্দর শুধু আমাদের চিন্তা ও আচরণ ছাড়া, যখন আমরা ভুলে যাই জীবনের উন্নততর উদ্দেশ্য আর মানুষ হিসেবে আমাদের মর্যাদাবোধের কথা।

কে যেন ওদের দিকে এগিয়ে এল, বোধ হয় একজন পাহারাদার। ওদের দিকে তাকিয়ে চলে গেল। তার আবির্ভাবও মনে হয়েছে রহস্যজনক এবং

সুন্দর। ভোরের আলোয় ফিওদোসিয়ার স্টীমারটাকে জাহাজঘাটার দিকে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। স্টীমারটার বাতি নেভানো।

'ঘাসে শিশির জমেছে,' আন্না সের্গেয়েভনা প্রথম কথা বলল।

'হ্যাঁ, বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে।'

শহরে ফিরে গেল দুজনে।

তারপর থেকে রোজই দুপুরে সমুদ্রের ধারে দেখা হয় ওদের, দুপুরে ও বিকেলে একসঙ্গে খায় দুজনে, সমুদ্রের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘুরে বেড়ায় একসঙ্গে। আন্না সের্গেয়েভনা জানায় যে রাত্রে ওর ঘুম হয় না, বুক ধড়ফড় করে। একই প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞেস করে। কখনো ওর ঈর্ষা, কখনো ভয় — সেটা এই ভেবে যে গুরভ হয়ত সত্যিই ওকে শ্রদ্ধা করে না। স্কোয়ারে বা পার্কে ঘুরে বেড়াবার সময় আশেপাশে কেউ না থাকলে গুরভ ওকে হঠাৎ কাছে টেনে নিয়ে আবেগভরে চুম্বন করে। এই নিরঙ্কুশ আলস্য, ভরা দিনের আলোয় এই চুমু খাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে কেউ দেখে ফেলল কিনা এই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে চারিদিকে তাকানো, এই উত্তাপ, সমুদ্রের এই গন্ধ, চারদিকে সর্বক্ষণ একদল চমৎকার সাজপোশাক পরা অতি লালনপুষ্ট মানুষের অলস চলাফেরা — এই পরিবেশে গুরভের প্রাণে যেন নতুন জোয়ার এসেছে। আন্না সের্গেয়েভনাকে ও বলে যে সে সুন্দরী এবং মোহিনী, প্রচণ্ড আবেগে প্রেম করে আন্নার সঙ্গে, কখনো আন্না সের্গেয়েভনার কাছছাড়া হয় না। ওদিকে আন্না সের্গেয়েভনা সব সময়েই বিষণ্ণ হয়ে থাকে, সব সময়েই গুরভকে দিয়ে জোর করে স্বীকার করিয়ে নিতে চায় যে গুরভ ওকে শ্রদ্ধা করে না, ওকে একটুও ভালোবাসে না, ওকে নিতান্তই মামুলী একটা স্ত্রীলোক বলে মনে করে। প্রায় প্রতি রাত্রেই ওরা দুজনে গাড়ি করে বেড়াতে যায় অরিয়ান্দায়, ঝরণার ধারে কিংবা অন্য কোনো সুন্দর জায়গায়। এভাবে বেড়িয়ে আসাটা প্রতি বারেই সফল হয়। প্রতি বারেই মনের ওপরে নতুন করে মহিমামণ্ডিত সৌন্দর্যের ছাপ পড়ে।

এতদিন ওরা রোজই আশা করছিল আন্না সের্গেয়েভনার স্বামী যে কোনোদিন এসে হাজির হতে পারে। কিন্তু একটা চিঠি এল। চিঠিতে ভদ্রলোক জানিয়েছেন তাঁর চোখে ব্যথা হয়েছে, অনুরোধ করেছেন আন্না সের্গেয়েভনা

যেন যত তাড়াতাড়ি পারে বাড়ি ফিরে আসে। আন্না সের্গেয়েভনা যাবার তোড়জোড়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'ভালোই হয়েছে চলে যেতে হচ্ছে।' গুরভকে ও বলল। 'একেই বলে কপালের লিখন।'

একটা ঘোড়ার গাড়িতে আন্না সের্গেয়েভনা ইয়ালতা ছাড়ল। রেলস্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেল গুরভ। প্রায় সারাটা দিন কাটল ঘোড়ার গাড়িতে। তারপর যখন এক্‌স্‌প্রেস ট্রেনের কামরায় চেপে বসল এবং ট্রেন ছাড়ার দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজল, তখন ও বলল, 'আর একবার তোমায় দেখি ... শেষবার দেখি ... হ্যাঁ, এই ভাবে।'

সে কাঁদল না কিন্তু তার মুখটা ভার ভার। মনে হল তার অসুখ করেছে। তার গালের মাংসপেশীগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'তোমার কথা ভাববো ... সব সময় তোমার কথা ভাববো,' আন্না সের্গেয়েভনা বলল, 'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, আমার ওপর রাগ রেখো না।... চিরকালের জন্যে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে... আমাদের কখনো দেখা না হওয়াই উচিত ছিল। বিদায়, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

ট্রেনটা দ্রুতবেগে স্টেশনের বাইরে চলে গেল, দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল তার আলো, আর এক মিনিট পরে তার শব্দটুকু পর্যন্ত আর শোনা গেল না। মনে হতে লাগল, চারদিকে একটা ষড়যন্ত্র চলছে যাতে এই মধুর বিস্মৃতি আর এই উন্মত্ততার দ্রুত পরিসমাপ্তি ঘটে। প্ল্যাটফর্মের ওপর একা দাঁড়িয়ে রইল গুরভ, দূর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে শুনতে লাগল ফড়িঙের ডাক আর টেলিগ্রাফের তারের গুনগুনানি। মনে হল যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে সে। নিজেই নিজেকে সে বলল যে তার জীবনের অনেক এ্যাডভেঞ্চারের মতো এটিও আর একটি — তার বেশি কিছু নয়। এটাও শেষ হয়ে গেল, এখন শুধু স্মৃতি ছাড়া আর কিছু পড়ে নেই... বিচলিত ও বিষণ্ণ হয়ে উঠল সে। সেই সঙ্গে কিছুটা অনুতপ্তও হল। সত্যি বলতে কি এই তরুণীটি, যার সঙ্গে তার আর কোনোকালেই দেখা হবে না, তাকে পেয়ে সত্যিকারের সুখী হতে পারেনি। প্রীতি ও স্নেহের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তার সমস্ত আচরণের মধ্যে, তার কথার সুরে, এমন কি তার আদর জানানোর মধ্যে কিছুটা বিদ্রূপ থেকে গিয়েছিল, কিছুটা সৌভাগ্যবান পুরুষের অবমাননাকর প্রশ্রয়, যার বয়স ওর

প্রায় দ্বিগুণ। ওর কিন্তু স্থির ধারণা ছিল যে মানুষ হিসেবে সে ভালো, অসাধারণ এবং তার মনটা উঁচু। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটি তার যে পরিচয় পেয়েছে তা তার পরিচয় নয়। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় না হোক মেয়েটির সঙ্গে সে প্রতারণা করেছে ...

বাতাসে ইতিমধ্যে শরতের আভাস, সন্ধ্যাবেলায় শীত শীত করে।

'এবার আমারও উত্তরের দিকে রওনা হবার সময় হয়েছে,' প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যেতে যেতে গুরভ ভাবল, 'সময় হয়েছে!'

৩

মস্কোতে যখন সে পৌঁছল তখন শীত পড়ি পড়ি। স্টোভে প্রত্যহ আগুন জ্বালানো হয়। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাবার জন্যে ঘুম থেকে উঠে যখন চা খেতে বসে তখনো অন্ধকার থাকে। নার্সকে তাই সামান্যক্ষণের জন্যে আলো জ্বালাতে হয়। শীত পড়তে শুরু করেছে। প্রথম যেদিন বরফ জমে আর স্লেজগাড়িতে চেপে প্রথম যেদিন রাস্তায় বেরনো যায় সেদিন চারদিকের সাদা জমি আর সাদা ছাদ দেখে ভালো লাগে, আগের চেয়ে নিশ্বেস নেওয়া সহজ হয়ে ওঠে, আর যৌবনের কথা মনে পড়ে। তুষারে সাদা লাইম ও বার্চগাছগুলোর ভালোমানুষের মতো চেহারা, সাইপ্রেস বা পাম গাছের চেয়েও ওরা হৃদয়ের কাছাকাছি। ওদের ডালপালার তলায় দাঁড়ালে সমুদ্র বা পাহাড়ের স্মৃতি মনে হানা দেয় না।

চমৎকার এক শীতের দিনে গুরভ ফিরে এল মস্কোতে, যে-মস্কোতে সে চিরকাল থেকেছে। তারপর যখন সে ফারের আস্তর দেওয়া ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে আর পুরু দস্তানা পরে পেত্রোভ্কা স্ট্রীটে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল, কিংবা যখন শনিবারের সন্ধ্যায় শুনতে লাগল গীর্জার ঘণ্টা, তখন তার কাছে সদ্য বেড়িয়ে আসা জায়গাগুলোর কোনো মাধুর্যই রইল না। আস্তে আস্তে মস্কোর জীবনে ডুবে যেতে লাগল সে, প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে প্রতি দিন তিনটি সংবাদপত্র গিলতে থাকল আর সেই সঙ্গে বলে বেড়াল যে নীতি হিসেবেই সে মস্কোর সংবাদপত্র ছুঁয়েও দ্যাখে না। রেস্তোরাঁ, ক্লাব, প্রীতিভোজ আর উৎসব অনুষ্ঠানের ঘূর্ণিবাত্যায় আবার সে মেতে উঠল,

আবার সে মনে মনে একথা ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করল যে নামডাকওলা উকিল ও অভিনেতারা তার বাড়িতে আসে আর সে মেডিকেল ক্লাবে একজন অধ্যাপকের পার্টনার হয়ে তাস খেলেছে।

মনে মনে তার বিশ্বাস ছিল যে মাসখানেকের মধ্যেই আন্না সের্গেয়েভ্না তার কাছে হয়ে উঠবে একটা ঝাপ্সা স্মৃতি, তার বেশি কিছু নয়। তারপর থেকে কখনো-সখনো আন্না সের্গেয়েভনা তার মোহিনী হাসি নিয়ে শুধু স্বপ্নে দেখা দেবে, যেমন দেখা দেয় অন্যরা। কিন্তু পুরো একমাস সময় পার হতে চলল, পুরোপুরি শীতকাল এসে গেছে, তবুও তার মনের মধ্যে কোনো স্মৃতিই এতটুকু ঝাপ্সা হয়নি, যেন আন্না সের্গেয়েভনার সঙ্গে মাত্র এই আগের দিন বিচ্ছেদ হয়েছে। তার স্মৃতিগুলো ক্রমশ হয়ে উঠতে লাগল তীব্রতর। যখন নিথর সন্ধ্যায় পড়ার ঘরে বসে সে শোনে তার ছেলেমেয়েরা পড়া তৈরি করছে, যখন রেস্তোরাঁয় বসে সে গান বা বাজনার শব্দ শুনতে পায়, যখন চিমনির ভেতরে বাতাস গোঁ গোঁ করে গর্জন করে তখন তার সব কথা মনে পড়ে যায়: ভোররাত্রে সেই জাহাজঘাটায় বসে থাকা, সেই কুয়াশায় আবছা পাহাড়, ফিওদোসিয়ার সেই স্টীমার, সেই চুম্বন। তখন ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে সে পায়চারি করে, পুরনো দিনের কথা ভেবে হাসে, আর তখন তার স্মৃতি হয়ে ওঠে স্বপ্ন, যা ঘটেছে তার সঙ্গে মিশে যায় যা ঘটবে তার কথা। আন্না সের্গেয়েভনা তার কাছে স্বপ্নে আসে না, যেখানেই সে যায় ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। চোখ বুজলে মনে হয় সে এসে রক্তমাংসের শরীর নিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে, আরো সুন্দর দেখাচ্ছে আন্না সের্গেয়েভনা, আরো অল্পবয়সী, আরো সুকুমার, যা ছিল তার চেয়েও। নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেকেও যেন মনে হয় আরো অনেক ভালো, ইয়াল্তাতে সে যা ছিল তার চেয়েও। সন্ধ্যেবেলা মনে হয় আন্না সের্গেয়েভনা তাকিয়ে আছে তার দিকে, তাকিয়ে আছে বইয়ের তাক থেকে, আগুনের চুল্লি থেকে, দেয়ালের কোণ থেকে। তার নিশ্বাস শোনা যায় যেন, তার স্কার্টের মিষ্টি খস্খস্ শব্দটুকুও। রাস্তায় বেরিয়ে সে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখে, যদি তার মুখের মতো আরেকটি মুখ চোখে পড়ে যায়...

ভয়ানক ইচ্ছে হতে থাকে নিজের মনের এই সমস্ত স্মৃতির ভাগ অন্য কাউকে দেয়। কিন্তু বাড়ির কাউকে তার এই প্রেমের কাহিনী বলা চলে না,

আর বাড়ির বাইরে কেউ নেই যার কাছে সে মনের গোপন কথা বলতে পারে। ভাড়াটেদের কাছে তো সে আর এসব কথা বলতে পারে না, ব্যাঙ্কের সহকর্মীদের কাছেও নয়। আর বলারই বা কী আছে? সে যা অনুভব করেছে তার নামই কি প্রেম? আন্না সের্গেয়েভনার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তার মধ্যে এমন কিছু কি আছে যাকে বলা চলে সুষমা ও কবিত্বমণ্ডিত, এমন কিছু যা থেকে শিক্ষা নেওয়া চলে বা এমন কি খানিকটা মজা পাওয়া যায়? প্রেম ও নারী সম্পর্কে সে ভাসা ভাসা কথা বলে, কেউই অনুমান করতে পারে না সে কী বলতে চায়। অবশ্য মাঝে মাঝে তার স্ত্রী কালো ভুরুদুটো কুঁচকে বলে:

'দিমিত্রি, ভাঁড়ের ভূমিকায় তোমায় একেবারেই মানায় না।'

একদিন মেডিকেল ক্লাবে তার তাস খেলার পার্টনার ছিল একজন সরকারী কর্মচারী। সন্ধ্যেবেলা তার সঙ্গে বেরিয়ে আসবার সময়ে কিছুতেই আর নিজেকে সামলাতে না পেরে সে বলে উঠল, 'ইয়াল্‌তাতে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, কী চমৎকার মেয়ে যদি জানতে!'

সরকারী কর্মচারীটি নিজের শ্লেজগাড়িতে ওঠে, তারপর গাড়ি ছুটিয়ে চলে যাবার আগে মুখ ফিরিয়ে হাঁক দিয়ে উঠল:

'দ্‌মিত্রি দ্‌মিত্রিচ্‌!'

'বলুন!'

'আপনি ঠিকই বলেছিলেন, মাছে কিছু দুর্গন্ধ ছিল।'

কথাগুলো খুব মামুলী, কিন্তু কী জানি কেন শুনেই গুরভ চটে উঠল। বড়ো স্থূল মনে হল কথাগুলোকে, বড়ো মর্যাদাহানিকর। কী সব বর্বর হাবভাব, কী সব লোকজন! সন্ধ্যেগুলো কী ভাবেই না নষ্ট হচ্ছে, কী বিশ্রী আর ফাঁকা দিনগুলো! মরিয়া হয়ে তাস খেলা, রাক্ষসের মতো খাওয়া, মাতলামি করা আর একই বিষয়ে অনবরত কথা বলে যাওয়া। মানুষের বেশির ভাগ সময় আর বেশির ভাগ কর্মক্ষমতা এমন সব ব্যাপারে খরচ করতে হয় যা কারুর কোনো কাজেই লাগে না। কথা বলতে গেলেও সেই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি। সব মিলিয়ে জাঁক করে বলার কিছু নেই। এমন এক জীবন যা মাটি ছাড়িয়ে মাথা তুলতে পারে না, তুচ্ছতার আবর্তে আটকে থাকা, পালিয়ে যাবার জায়গা নেই কোথাও। মনে হতে পারে, জীবনটা কাটছে কোনো একটা পাগলাগারদে বা কয়েদখানায়।

সারা রাত রাগে ছটফট করতে করতে গুরভ ঘুমোতে পারল না। তার পরের সারাটা দিন কাটল মাথার যন্ত্রণা নিয়ে। পরের কয়েকটা রাত্রেও ভালো ঘুম হল না তার। নানা চিন্তা নিয়ে বার বার উঠে বসতে হল বা ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে হল। ছেলেমেয়েদের ওপরে বিরক্ত হয়ে উঠল সে, ব্যাঙ্ক ভালো লাগে না, কোথাও যেতে বা কোনো বিষয়ে কথা বলতে তার আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।

বড়দিনের ছুটি শুরু হতেই সে জিনিসপত্র গুছিয়ে স. শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়ল, বৌকে বলে গেল যে এক ছোকরার একটা কাজ করে দেবার জন্যে সে পিতার্সবুর্গে যাচ্ছে। স. শহরে যাচ্ছে কেন সে? সে নিজেই জানে কিনা সন্দেহ। তার ইচ্ছে হল আন্না সের্গেয়েভনার সঙ্গে দেখা করতে, কথা বলতে, সম্ভব হলে নিজেদের মেলবার ব্যবস্থা করতে।

স. শহরে এসে সে পৌঁছল সকালবেলা, হোটেলের সেরা কামরায় গিয়ে উঠল। ঘরের মেঝেতে ছাইরঙা পল্টনী কার্পেট। টেবিলের উপর একটি ধূলি-ধূসর দোয়াত। সেটা ছাড়িয়ে উঠেছে এক মুণ্ডুহীন ঘোড়সওয়ার, একটা হাত উঁচু দিকে ওঠানো আর সেই হাতে টুপি। সে যে খবরটা জানতে চায় সেটা হলের পোর্টারের কাছেই জানতে পারা গেল। স্তারো গন্চার্নায়া স্ট্রীটে ফন দিদেরিৎস-এর নিজস্ব বাড়ি, হোটেল থেকে খুব বেশি দূর নয়। খুবই জাঁকজমক করে আর বিলাসিতার মধ্যে থাকে লোকটি, নিজের গাড়ি হাঁকাবার ঘোড়া আছে, সারা শহরের লোক জানে তাকে। হলের পোর্টার তার নামটাকে উচ্চারণ করল 'দ্রিদিরিৎস্' বলে।

হাঁটতে হাঁটতে গুরভ স্তারো গন্চার্নায়া স্ট্রীটে এসে হাজির হল। বাড়িটা খুঁজে বার করল। বাড়ির সামনে ছাইরঙা লম্বা বেড়া, খুঁটির মাথায় উল্টনো পেরেক হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে বসানো।

বাড়ির জানলা আর বেড়ার দিকে তাকিয়ে গুরভ ভাবল, এই বেড়া দেখেই তো লোকের পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

সবদিক চিন্তা করে গুরভের মনে হল, যেহেতু আজকে ছুটির দিন, সুতরাং আন্না সের্গেয়েভনার স্বামীর বাড়িতে থাকারই সম্ভাবনা। যাই হোক না কেন, বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে আন্না সের্গেয়েভনাকে বিব্রত করা হবে এবং কাজটা বুদ্ধিমানের হবে না। যদি চিঠি

পাঠাই তবে সে চিঠি স্বামীর হাতে গিয়ে পড়তে পারে, তাহলেই তো হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে যাবে। কাজেই দেখা হয়ে যাওয়ার সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করাটাই হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। তখন সে সুযোগের সন্ধানে বাড়ির সামনে রাস্তায় পায়চারি করতে লাগল। একটা ভিখিরি ঢুকল বেড়ার ভেতরে। তাকে কুকুরগুলো তাড়া করল। ঘণ্টাখানেক পরে বাড়ির ভেতর থেকে পিয়ানো বাজাবার অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল। নিশ্চয়ই আন্না সের্গেয়েভনা বাজাচ্ছে। হঠাৎ সদর খুলে বেরিয়ে এল এক বুড়ী, তার পেছনে পেছনে গুরভের চেনা সেই সাদা পমেরানিয়ান কুকুরটা। কুকুরটার নাম ধরে ডেকে উঠতে তার ইচ্ছে হল, কিন্তু উত্তেজনায় তার বুকের ভেতরটা এমন ভীষণ ধড়ফড় করছে যে কিছুতেই কুকুরটার নাম মনে পড়ল না।

যতোই পায়চারি করছে ততোই সেই ছাই রঙা বেড়াটার ওপর তার রাগ হচ্ছে। শেষকালে বিরক্ত হয়ে এমন কথাও ভাববার উপক্রম করে যে আন্না সের্গেয়েভনা তাকে ভুলে গেছে, হয়ত ইতিমধ্যেই তার মন গিয়ে পড়েছে আরেকজনের ওপরে। একজন যুবতী স্ত্রীলোক যদি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বাইরের দিকে তাকিয়ে শুধু এই বিশ্রী বেড়াটাই দেখে তাহলে এমন হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। হোটেলে ফিরে গিয়ে আর কিছু করার না পেয়ে নিজের ঘরের সোফায় বসে কিছুক্ষণ সময় কাটাল, তারপর খাবার খেয়ে দিল লম্বা এক ঘুম।

ঘুম ভাঙল সন্ধ্যেয়। অন্ধকার জানলার শার্সির দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে ভাবল, ‘চূড়ান্ত বোকামি আর অস্থিরতার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে! এই তো, যা ঘুমোবার ঘুমিয়ে নিয়েছি, এখন রাত্রিবেলা করি কী?’

ছাইরঙা শস্তা লেপটা গায়ে জড়িয়ে সে বিছানায় উঠে বসল। লেপটা দেখে তার হাসপাতালের কথা মনে পড়ছে। বিরক্তিতে সে নিজেই নিজেকে খোঁচা দিতে লাগল:

‘তুমি আর তোমার এই কুকুরসঙ্গী মহিলা ... এ যে দেখছি তোমার রীতিমতো এক অ্যাড্‌ভেঞ্চার! দেখাই যাক এতখানি কষ্ট করার পরে কী জোটে তোমার কপালে!’

সকালবেলা স্টেশনে পেঁছে মস্ত বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা একটা পোস্টার তার নজরে পড়েছিল। স্থানীয় থিয়েটারে ‘গেইশা’ নাটকের প্রথম অভিনয়ের ঘোষণা কথাটা মনে পড়তেই থিয়েটারের দিকে সে রওনা হল।

'খুবই সম্ভব যে আন্না সের্গেয়েভনা প্রথম রাত্রির অভিনয় দেখতে আসে।' মনে মনে ভাবল সে।

প্রেক্ষাগৃহ লোকে ভর্তি। মফস্বল শহরের প্রেক্ষাগৃহ যেমনটি হয়, এটিও তাই। ঝাড়বাতিগুলো ঝাপ্সা হয়ে এসেছে। গ্যালারির ভিড়ে অস্থির সোরগোল। স্থানীয় ফুলবাবুরা পিঠের দিকে হাত রেখে পর্দা ওঠার অপেক্ষায় স্টলের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে। প্রদেশপালের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গার সামনের আসনটিতে বসে বোআ গলায় জড়ানো শাসনকর্তার মেয়ে, প্রদেশপাল নিজে বিনীতভাবে বসে আছেন পর্দার আড়ালে শুধু দেখা যাচ্ছে তাঁর হাতদুটি। পর্দা নড়ে উঠল, অর্কেস্ট্রা বাদকরা অনেকক্ষণ সময় নিয়ে সুর বাঁধল বাদ্যযন্ত্রে। দর্শকরা সারি দিয়ে নিজের নিজের আসনে বসেছে। অধীর আগ্রহে গুরভ দর্শকদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

আন্না সের্গেয়েভনাও এল। স্টলের তৃতীয় সারিতে তার আসন। তার ওপর চোখ পড়তেই গুরভের মনে হল যেন তার বুকের ধুকপুকুনি থেমে গেছে। আর সেই মুহূর্তটুকুর মধ্যেই সে বুঝে নিল যে এই বিশ্বসংসারে তার কাছে এই মেয়েটির চেয়ে নিকটতর ও প্রিয়তর আর কেউ নেই, তার সুখের জন্যে এই মেয়েটির প্রয়োজন যতোখানি এমন আর কারুর নয়। মফস্বল শহরের ভিড়ে হারিয়ে গেছে মেয়েটি, কোনো দিক দিয়েই ওর কোনো বিশেষত্ব নেই, হাতে ধরে আছে একটা বেমানান অপেরা গ্লাশ — তবুও এই মেয়েটিই এখন তার সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করেছে, এই মেয়েটিকে নিয়েই তার দুঃখ আর আনন্দ, তার যা কিছু কামনা। খারাপ অর্কেস্ট্রা ও চাপা, আনাড়ী বেহালার বাজনা শুনে সে ভাবছে, আন্না সের্গেয়েভনা কী সুন্দর। ভাবছে আর স্বপ্ন দেখছে ...

আন্না সের্গেয়েভনার সঙ্গে এসেছে একজন যুবক, লম্বা, গোল কাঁধ, খাটো জুল্পি। পায়ে পায়ে হেঁটে চলেছে আর প্রত্যেকবার পা ফেলার সঙ্গে মাথা নোয়াচ্ছে। সব সময়েই সে কাউকে না কাউকে অভিবাদন করছে। নিশ্চয়ই এই লোকটি ওর স্বামী, ইয়ালতাতে থাকার সময়ে মনের জ্বালায় যাকে ও বলেছিল 'চাকর'। লোকটির লিঙলিঙে চেহারা, দু ধারের জুল্পি, ব্রহ্মতালুর ছোট্ট একটুখানি টাকের মধ্যে কোথায় যেন সত্যি সত্যিই একটা চাকর-চাকর ভাব রয়েছে। তার মুখে মিষ্টি হাসি, বুকের ওপর কোটের

বোতাম লাগাবার জায়গায় চকচক করছে কোন্ এক বিজ্ঞানসভার ব্যাজ, দেখে মনে হচ্ছে, উর্দিপরা চাপরাশির বুকের ওপরে আঁটা নম্বর।

প্রথম বিরতির সময়ে স্বামী বেরিয়ে গেল ধূমপান করতে। আন্না সের্গেয়েভনা এখন একা। গুরভের বসার জায়গাও ছিল স্টলে, সেখান থেকে উঠে সে এগিয়ে এল আন্না সের্গেয়েভনার কাছে, জোর করে মুখের ওপরে হাসি ফুটিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'নমস্কার।'

মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েই ফ্যাকাশে হয়ে গেল আন্না সের্গেয়েভনা। দুচোখে আতঙ্ক নিয়ে আবার তাকাল ওর দিকে, নিজের চোখকেই যেন ও বিশ্বাস করতে পারছে না। একহাতে পাখা ও অপেরা গ্লাস মুচড়ে চেপে ধরল সে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যাতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে না পড়ে সেজন্যে ও নিজেকে সামলাচ্ছে। দুজনেই নির্বাক। আন্না সের্গেয়েভনা তেমনিভাবে বসে আছে আর গুরভ তেমনিভাবে পাশটিতে দাঁড়িয়ে। পাশে বসবার সাহস গুরভের নেই, আন্না সের্গেয়েভনার বিব্রতভাব দেখে ও কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। বেহালা আর বাঁশিতে এতক্ষণ সুর বাঁধা হচ্ছিল, চারদিকের আবহাওয়ায় কেমন একটা তীব্র উত্তেজনার ভাব। মনে হচ্ছে, প্রত্যেকটি বক্স থেকে সবাই লক্ষ্য করছে ওদের দুজনকে। শেষকালে আন্না সের্গেয়েভনা উঠে দাঁড়াল এবং দ্রুতপায়ে বাইরে বেরোবার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। গুরভ এল পেছনে পেছনে। করিডরে আর সিঁড়িতে উদ্দেশ্যহীনভাবে পায়চারি করতে লাগল দুজনে। পাশ দিয়ে নানা সাজের মানুষ যাতায়াত করছে, কেউ আদালত কর্মচারী, কেউ হাইস্কুলের শিক্ষক, কেউ সরকারী কর্মচারী। সকলেই ব্যাজ পরে আছে। আংটা থেকে ঝোলানো কোট, দাঁড়িয়ে থাকা মহিলারা চকিতে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে আবার। সিগারেট পোড়ার গন্ধ নিয়ে একটা দমকা বাতাস ভেসে এল। আর গুরভ বুকের একটা প্রচণ্ড ধড়ফড়ানি নিয়ে মনে মনে ভাবল, 'কী দরকার ছিল এত লোকজনের, এত বাজনার...'

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সেই দিনটির কথা, যেদিন আন্না সের্গেয়েভনাকে বিদায় দিয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ভেবেছিল, সব শেষ, দুজনের আর কোনো দিন দেখা হবে না। আর এখন মনে হচ্ছে—শেষ কোথায়, শেষের চিহ্নমাত্র নেই!

'আপার সার্কেল-এ যাবার পথ' লেখা একটা সিঁড়িতে এসে আন্না সের্গেয়েভনা দাঁড়িয়ে পড়ল।

'ইস্, কী ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন!' হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল। ওর মুখটা এখনো ফ্যাকাশে, ভালোভাবে কথা বলতে পারছে না। 'কী ভয়ই না পেয়েছিলাম! আরেকটু হলে মরে যেতাম! কেন এলেন? কেন বলুন আমাকে?'

'আন্না!' চাপা দ্রুত স্বরে গুরভ বলল, 'আমার কথাটা শুনুন আন্না... অবুঝ হবেন না... বুঝে দেখুন...'

আন্না সের্গেয়েভনা তাকাল ওর দিকে। ওর দৃষ্টিতে ভয় মিনতি, ভালোবাসা। অপলক চোখে সে তাকিয়ে রইল, যেন গুরভের মুখখানা চিরকালের জন্যে নিজের স্মৃতিতে ধরে রাখতে চাইছে।

গুরভের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে আন্না সের্গেয়েভনা বলে চলল, 'আমি একদণ্ডের জন্যেও সুখী হইনি। সব সময়ে আপনার কথাই ভাবতাম শুধু, আপনার কথা ভেবেই আমার দিন কাটত, চেষ্টা করতাম আপনাকে ভুলে থাকতে — কেন এলেন আপনি, বলুন আমাকে, কেন এলেন আপনি?'

মাথার ওপর সিঁড়ির শেষ ধাপে দুটি স্কুলের ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছে। গুরভ ভ্রূক্ষেপও করল না। আন্না সের্গেয়েভনাকে কাছে টেনে নিয়ে ঠোঁটে গালে আর হাতে চুমু খেতে লাগল।

'কী করছেন আপনি! করছেন কী!' পেছনে সরে গিয়ে আতঙ্কভরা স্বরে আন্না সের্গেয়েভনা বলল, 'আমাদের দুজনেরই মাথা খারাপ হয়েছে। আজ রাত্রেই আপনি চলে যান এখান থেকে, এই মুহূর্তেই... পায়ে পড়ি আপনার, আপনি যান... কে যেন আসছে...'

কে যেন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে।

আন্না সের্গেয়েভনা চাপা স্বরে বলে চলল, 'আপনি চলে যান এখান থেকে, শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা, আপনাকে যেতেই হবে... আমি যাব মস্কোতে আপনার কাছে। কোনো কালে আমি সুখী হতে পারিনি, এখনো সুখী নই, কোনো কালে সুখী হতে পারব না। কোনো কালেই নয়! আপনি আর আমার জীবনকে আরো অসুখী করে তুলবেন না! কথা দিচ্ছি, যাব মস্কোতে আপনার

কাছে! কিন্তু এখন আমাদের ছাড়াছাড়ি হওয়া দরকার। লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার!'

গুরভের হাতে চাপ দিয়ে আন্না সের্গেয়েভনা দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছে, চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সত্যি সত্যিই ও অসুখী। গুরভ যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল অল্প কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর চারদিক শান্ত হয়ে যেতেই কোটটা খুঁজে নিয়ে থিয়েটার ছেড়ে বেরিয়ে এল।

৪

গুরভের সঙ্গে দেখা করার জন্যে আন্না সের্গেয়েভনা মস্কো যাতায়াত করতে শুরু করেছে। দু তিন মাস অন্তর একবার করে সে স· শহর ছেড়ে চলে আসে। স্বামীকে বলে যে সে একজন স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করতে যাচ্ছে। তার স্বামী তাকে বিশ্বাস করে, আবার করেও না। মস্কোতে এসে সে প্রত্যেক বারেই থাকে 'স্লাভিয়ান্‌স্কি বাজারে', আর আসার সঙ্গে সঙ্গেই লাল টুপি পরা একজন লোক পাঠায় গুরভের কাছে। গুরভ আসে তার কাছে। ব্যাপারটা মস্কোর কেউ টের পায় না।

শীতকালের এক সকালে গুরভ যথারীতি গিয়েছিল তার সঙ্গে দেখা করতে। আগের দিন সন্ধ্যের সময়ে খবর নিয়ে লোক এসেছিল। কিন্তু গুরভ বাড়ি ছিল না। গুরভের মেয়ে ছিল সঙ্গে, যাবার পথেই মেয়ের স্কুল, কাজেই গুরভ ভেবেছিল যে মেয়েকে স্কুলে পেঁছে দেবার কাজটাও এইসঙ্গে সেরে নেওয়া যেতে পারে। ভারি ভেজা বরফ পড়ছিল।

গুরভ মেয়েকে বলল, 'শূন্যের তিন ডিগ্রী ওপরে তাপ, তবুও দ্যাখ বরফ পড়ছে। ব্যাপারটা কি জান, মাটির কাছাকাছি জায়গাতেই শূন্যের ওপরে তাপ, কিন্তু বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে তা নয়।'

'আচ্ছা বাবা, শীতকালে বাজ পর্যন্ত পড়ে না, কেন বাবা?'

এবারেও গুরভ ব্যাখ্যা করে বলল, কেন এমনটি হয়। কথা বলতে বলতে সে নিজের কথা ভাবছিল। সে চলেছে আরেকজনের সঙ্গে মিলিত হতে। দুজনের এই মিলনের ব্যাপারটি আজ পর্যন্ত কেউ টের পায়নি, হয়ত পাবেও

না। দুটি জীবন তার। একটি জীবন প্রকাশ্যে, সংশ্লিষ্ট সব মানুষের চোখের ওপর। সে জীবনে সবাই যা সত্যি বলে মানে সেও মানে, সবাই যে সব প্রতারণার আশ্রয় নেয় সেও নেয়, তার বন্ধু ও পরিচিতজনরা যে ধরনের জীবন যাপন করে তারও হুবহু তাই। আর অন্য জীবনটি বয়ে চলেছে গোপনে। ঘটনাচক্র এমনই অদ্ভুত এবং সম্ভবত এমনই আকস্মিক যে যা কিছু তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কৌতূহলোদ্দীপক ও জরুরি, যা কিছু সম্পর্কে তার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা আছে, যা কিছু রয়েছে তার জীবনের প্রাণকেন্দ্রে — তার সবটাই গোপন। আর যা কিছু তার মধ্যে মিথ্যে, যা কিছুকে সে খোসার মতো ব্যবহার করেছে নিজেকে আর নিজের মধ্যেকার সত্যকে গোপন করবার জন্যে যেমন, ব্যাঙ্কের কাজ, ক্লাবের আলাপ আলোচনা, 'নিম্নতর জাতি', বৌকে সঙ্গে নিয়ে বার্ষিক উৎসবে যাওয়া—সবই বাইরেকার জিনিস। অপরকেও সে বিচার করে নিজেকে দিয়ে, চোখে যা দেখে তা বিশ্বাস করে না, সব সময়েই ধরে নেয় যে প্রত্যেকটি মানুষেরই সত্যিকারের জীবন বা আসল ভালো লাগার জীবন থেকে যায় গোপনে, রাত্রির আড়ালে থাকার মতো। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের অস্তিত্ব আবর্তিত হয় রহস্যের চারপাশে, এবং প্রধানত এই কারণেই প্রত্যেক সভ্য ব্যক্তি ব্যক্তিগত জীবনের গোপনতাকে মেনে চলা সম্পর্কে এতখানি জোর দেয়।

স্কুলের দরজার কাছে মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে গুরভ পা চালাল 'স্লাভিয়ানস্কি বাজারের' দিকে। বাইরের লবিতে ওভারকোট ছেড়ে সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল এবং খুব আলতোভাবে টোকা দিল দরজায়। আন্না সের্গেয়েভনা ছাইরঙা পোশাকে। সেটা গুরভ সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। আগের দিন সন্ধ্যে থেকেই গুরভের অপেক্ষায় ছিল সে—এই উদ্বেগ এবং ট্রেন ভ্রমণ, দুয়ে মিলিয়ে তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মুখটা ফ্যাকাশে। গুরভের দিকে যখন তাকাল মুখে হাসি ফুটে উঠল না। কিন্তু গুরভ ঘরের মধ্যে পা দিতে না দিতেই আন্না সের্গেয়েভনা তার বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে চুম্বন যেন শেষ করতে পারল না তারা। মনে হতে পারে যে বহু বছর দুজনের দেখা হয়নি।

গুরভ জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ? নতুন কোনো খবর আছে?'

'বলছি, এক্ষুনি বলছি... আর পারি না আমি...' কান্নায় আন্না সের্গেয়েভনার কথা বন্ধ হয়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে রুমাল চেপে ধরল চোখে।

'কাঁদুক, কেঁদে কেঁদে মনটা হাল্‌কা করে নিক!' এই ভেবে গুরভ গা এলিয়ে দিল চেয়ারে।

ঘণ্টা টিপে চায়ের হুকুম সে দিল। একটু পরে যখন চায়ে চুমুক দিচ্ছে তখনো আন্না সের্গেয়েভনা জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে একইভাবে দাঁড়িয়ে। আন্না সের্গেয়েভনা কাঁদছে নিজের আবেগ থেকে, ওদের জীবনের বিষণ্ণতা সম্পর্কে তিক্ত চেতনা থেকে। এ কী জীবন তাদের! লোকের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে গোপনে দেখা করতে হবে দুজনকে চোরের মতো! এ জীবনকে কি ভগ্ন জীবন বলা চলে না!

গুরভ বলল, 'কেঁদো না।'

গুরভ স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে, ওদের দুজনের এই প্রেম ক্ষণস্থায়ী নয়, কোনো দিন এই প্রেম শেষ হয়ে যাবে কিনা কেউ বলতে পারে না। আন্না সের্গেয়েভনা ওকে ভালোবাসছে আরো গভীর অনুভূতির সঙ্গে, আরো শ্রদ্ধার সঙ্গে, সুতরাং আন্নাকে একথা বলে লাভ নেই ওদের দুজনের এই প্রেম একদিন না একদিন শেষ হবেই। বললে আন্না সের্গেয়েভনা বিশ্বাস করবে না।

কাছে সরে গিয়ে সে ওর দু কাঁধে হাত রাখল। ইচ্ছে ছিল, হাল্‌কা কথায় ওকে একটু আদর করে। কিন্তু হঠাৎ সামনের আয়নায় নিজের ছায়া সে দেখতে পেল।

গুরভের চুলে পাক ধরেছে। গত কয়েক বছরে বড়ো বেশি বুড়িয়ে গেছে সে। ভাবতেই কেমন যেন অবাক লাগল। যে দুটি কাঁধের ওপরে সে হাত রেখেছে সে দুটি কাঁধ উষ্ণ ও অনবদ্য। মেয়েটির কথা ভেবে তার মায়া হতে লাগল। যে জীবন এখনো এত উষ্ণ, এখনো এত সুকোমল সে জীবন হয়ত আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে এবং তার নিজের জীবনের মতো নুয়ে পড়বে। ও কেন তাকে ভালোবাসে? সত্যিকারের যা, সেই হিসেবে তাকে তো কোনো মেয়েই দ্যাখেনি, ওরা তার মধ্যে যে পুরুষকে ভালোবেসেছে সে পুরুষ সে নয়, সে পুরুষকে ভালোবেসেছে যাকে তারা তাদের কল্পনা দিয়ে তৈরি করে

নিয়েছে এবং সারা জীবন ধরে সাগ্রহে খুঁজে ফিরেছে। পরে যখন তাদের ভুল ভাঙে তখনো আগের মতোই তাকে তারা ভালোবাসতে থাকে। তাদের মধ্যে কেউই তাকে নিয়ে সুখী হয়নি। সময় পার হয়েছে, একটির পর একটি মেয়ে এসেছে তার জীবনে, প্রত্যেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে সে, প্রত্যেকের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে—কিন্তু কখনো সে ভালোবাসেনি। সে আর তাদের মধ্যে সবকিছুই হয়েছে, কিন্তু হয়নি শুধু একটি জিনিস—প্রেম।

আর এত বছর পরে যখন তার চুলে পাক ধরেছে তখন, তখনই কিনা সে প্রেমে পড়ল! তার জীবনের প্রথম প্রেম, সত্যিকারের প্রেম, যে প্রেমে কোনো ফাঁক নেই।

সে ও আন্না সের্গেয়েভনা, দুজনে দুজনকে ভালোবাসে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ জনের মতো, স্বামী স্ত্রীর মতো, প্রিয়বন্ধুর মতো। যেন ভাগ্য ওদের একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে। এ অবস্থায় কেন যে আন্না সের্গেয়েভনার স্বামী আছে আর তার আছে স্ত্রী তার কোনো ব্যাখ্যা ওরা খুঁজে পায় না। মনে হয়, ওরা হচ্ছে দুটি দেশান্তরী পাখি, একজন পুরুষ, একজন স্ত্রী। কিন্তু ওদের দুজনকে ধরে দুটি আলাদা খাঁচায় পুরে রাখা হয়েছে। অতীত ও বর্তমান জীবনে যা কিছু নিয়ে ওদের লজ্জা তা ভুলে দুজনে দুজনকে ক্ষমার চোখে দেখেছে আর অনুভব করছে ওদের এই প্রেম নতুন মানুষ করে তুলেছে দুজনকেই।

আগে বিষণ্ন বোধ করলে প্রথম যে যুক্তিটি চিন্তায় ভেসে উঠত তাই দিয়েই গুরভ সান্ত্বনা দিত নিজেকে। এখন আর যুক্তির আশ্রয় নিতে হয় না, গভীর একটা মমতা মনকে আচ্ছন্ন করে, আন্তরিক ও কোমল হবার ইচ্ছে জাগে।

গুরভ বলল, 'কেঁদো না, লক্ষ্মীটি। এতক্ষণ তো কাঁদলে, এবার এসো একটু কথা বলি... আমরা কী করব সে কথা ভাবতে চেষ্টা করি।'

দুজনে অনেকক্ষণ ধরে নিজেদের অবস্থা আলোচনা করল। ভাবতে চেষ্টা করল, কী করলে এভাবে লুকিয়ে বেড়াতে হবে না, এভাবে অন্যদের ঠকাতে হবে না, আলাদা আলাদা শহরে থাকার জন্যে এভাবে দীর্ঘকাল অদর্শনের জ্বালা ভোগ করতে হবে না। কী করলে এইসব অসহনীয় শেকল গা থেকে ঝেড়ে ফেলা যায়?

'কী করলে? কী করলে?' মাথাটা চেপে ধরে বারবার সে বলতে লাগল, 'কী করলে?'

দুজনের মনে হল, একটা কিছু সিদ্ধান্ত প্রায় তাদের নাগালের মধ্যে এসে গেছে, সেটা ধরতে পারা গেলেই শুরু হবে এক নতুন ও সুন্দর জীবন। দুজনেই বুঝতে পারল, শেষ এখনো দূরে, অনেক অনেক দূরে, সবচেয়ে শক্ত ও সবচেয়ে জটিল অংশটুকুর সবে সূত্রপাত হয়েছে।

১৮৯৯

নালায়

১

নালায় উকলেয়েভো গ্রাম। বড়ো সড়ক আর রেল স্টেশন থেকে সে গাঁয়ের গীর্জার চূড়ো আর কাপড় ছাপাই কলের চিমনিগুলো ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। 'এটা কোন গ্রাম?' পথ চলতি কেউ জিগ্যেস করলে তাকে জবাব দেওয়া হয়:

'সেই যে সেই শ্রাদ্ধের ভোজে সেক্সটন একলাই সব ক্যাভিয়ার খেয়ে ফেলেছিল, সেই গাঁ।'

কারখানা মালিক কস্তিউকোভের বাড়ির এক শ্রাদ্ধের নেমন্তন্নে ঘটনাটা ঘটে। নানা রকমের সুখাদ্যের মধ্যে বুড়োর চোখে পড়ে এক বয়াম ক্যাভিয়ার। সলোভে বুড়ো সেটিকে নিয়ে বসে। লোকে তাকে খোঁচা দেয়, জামার আস্তিন ধরে টানাটানি করে, কিন্তু কোনো কিছু গ্রাহ্য না করে বুড়ো কেবল খেয়েই চলে মোহগ্রস্তের মতো। বয়ামে ক্যাভিয়ার ছিল প্রায় দু সেরের মতো। বুড়ো একলাই সবটা শেষ করে। বহুকাল আগের এই ঘটনা, সেক্সটনও কবে গত হয়ে নিজেই মাটি চাপা পড়েছে কবরের নিচে, তবু এখনো কেউ ভোলেনি সেই ক্যাভিয়ার খাওয়ার কথা। জীবন এখানে নিতান্ত নিস্তরঙ্গ বলেই হোক, কি দশ বছর আগের ঐ তুচ্ছ ঘটনাটাই কেবল গাঁয়ের মানুষের মনে রেখাপাত করতে পেরেছে বলেই হোক, গ্রামখানা সম্পর্কে বলার মতো ঘটনা এ ছাড়া আর কিছুই নেই।

জ্বরজ্বারি লেগেই থাকে গাঁয়ে। গ্রীষ্মকাল পড়ে গেলেও কাদা শুকোয় না। বিশেষ করে বেড়ার ধারগুলোয় যেখানে অনেকদিনকার পুরনো উইলো গাছ বিরাট ছায়া ফেলে ডালপালা মেলে ঝুঁকে পড়েছে সেখানে চ্যাট্‌চ্যাট্‌ করে কাদা। সর্বদাই সেখানে কারখানার আবর্জনা আর এ্যাসেটিক এসিডের

গন্ধ -- জিনিসটা কাপড় ছাপার জন্যে লাগে। তিনটে সূতীকল আর চামড়ার কারখানাটা গাঁয়ের মধ্যে নয়, গ্রাম ছাড়িয়ে একটু দূরে। আকারে এগুলো ছোটোই — সব মিলিয়ে শ'চারেকের বেশি মজুর খাটে না। চামড়া কারখানার আবর্জনা পড়ে পড়ে নদীর জল থেকে সব সময়েই দুর্গন্ধ বেরয়। গোচর মাঠগুলো ভরে থাকে আবর্জনায়। চাষাদের গরু ঘোড়াগুলোর রোগ ভোগের বিরাম নেই। এ সবের জন্যে চামড়া কারখানাটাকে বাতিল বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে বন্ধ বলে ধরা হলেও কারখানাটার কাজ চলে গোপনে। জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের অফিসার আর গ্রামের দারোগার সহায়তায় সেটা চলে। কারখানার মালিক তাদের প্রত্যেককে প্রতি মাসে দশ রুবল করে দেয়। লোহার পাতের ছাউনি দেওয়া, দালানকোঠা বলতে সারা গাঁয়ে মাত্র দুটি — তার একটি ভোলোস্ত্ শাসন বোর্ডের। অন্যটি হল গ্রিগরি পেত্রোভিচ্ ৎসিবুকিন-এর দোতলা। গ্রিগরি পেত্রোভিচ্ এসেছিল ইয়েপিফান শহরের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে।

এখানে তার মুদিখানা আছে। কিন্তু সেটা নিতান্তই বাইরের একটা ভড়ং। তার আসল ব্যবসা অন্য — ভদকা, গরু ভেড়া, চামড়া, গম, শুয়োর, মোটকথা যখন যেটা সুবিধা হয়। যেমন সেবার বিদেশে মেয়েদের টুপিতে ম্যাগপাইয়ের পালক লাগাবার রেওয়াজ উঠল খুব। গ্রিগরি তখন একজোড়া পালকের জন্য তিরিশ কোপেক পর্যন্ত দাম নিয়েছে। সে বন কেনে কাঠ কাটবার জন্য। সুদেও টাকা খাটায়। সবদিক থেকেই বুড়ো বেশ তুখোড়।

বুড়োর দুই ছেলে। বড়ো আনিসিম কাজ করে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে। বেশির ভাগ সময়েই সে বাইরে বাইরে কাটায়। ছোটো ছেলে স্তেপান সাহায্য করে বাপের কারবারে যদিও তার সাহায্যের ওপর বড়ো একটা ভরসা রাখা হয় না। ছেলেটা রুগ্ন আর কালা। স্তেপানের বউ আক্সিনিয়া বেশ সুন্দরী, কাজেও বেশ চটপটে। রবিবার রবিবার, আর উৎসবের দিনে তাকে দেখা যায় টুপি মাথায় ছাতা হাতে বেরুতে। সে খুব ভোরে ওঠে, শুতে যায় রাত করে, আর সারা দিন ছুটোছুটি করে বেড়ায় গুদাম থেকে সেলারে, সেলার থেকে দোকানে — পরনের স্কার্টটা উঁচু করে গোঁজা, কোমরের বেল্ট্ থেকে ঝনঝন করছে একগোছা চাবি। বুড়ো ৎসিবুকিন তার দিকে তাকিয়ে থাকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে। ওকে দেখলেই খুশিতে ভরে ওঠে বুড়োর চোখ দুটো

আর সঙ্গে সঙ্গে আফশোস করে এই ভেবে, আহা মেয়েটি তার বড়ো ছেলের বৌ না হয়ে হল কিনা ঐ কালা ছেলেটার বউ। নারীর রূপ সে আর কিই বা বুঝবে।

ঘর সংসারের দিকে বুড়োর ভারি টান ছিল। দুনিয়ার মধ্যে তার নিজের সংসারটি—বিশেষ করে তার গোয়েন্দা বড়ো ছেলে আর ছোটো ছেলের বউটির মতো প্রিয় তার আর কিছুই ছিল না। কালা লোকটাকে বিয়ে করার পরেই দেখা গেল আকসিনিয়ার বিষয়ী বুদ্ধিটা অত্যন্ত তীক্ষ্ন। আক্‌সিনিয়া বুঝে ফেলল, দোকান থেকে কাকে ধারে মাল ছেড়ে দেওয়া যায়। কাকেই বা 'না' বলতে হয়। চাবির গোছাটি সে সব সময়েই রাখে নিজের কাছে, স্বামীর হাতে পর্যন্ত ছাড়ে না। গোণবার ফ্রেমটায় সে খটখট শব্দ করে, খাঁটি চাষার মতো ঘোড়াগুলোর মুখের ভিতরটা দেখে। সব সময়েই হয় হাসে না হয় চিৎকার করে। আর যাই সে বলুক কিংবা করুক, বুড়ো কর্তা তার তারিফ না করে পারে না। বিড়বিড় করে বলে:

'এমন না হলে আর ব্যাটার বৌ! একেই বলে রূপ!'

কিছুকাল আগে স্ত্রীবিয়োগ হয়েছিল বুড়োর। ছেলের বিয়ের এক বছর পরে সে আর বিপত্নীক অবস্থায় থাকতে পারল না, সে-ও বিয়ে করল। উকলেয়েভো গ্রাম থেকে তিরিশ ভের্স্ত দূরের এক সৎ পরিবারের মেয়েকে তার জন্য পছন্দ করা হল। মেয়েটির নাম ভারভারা নিকলায়েভ্‌না। বয়স খুব অল্প নয় বটে, তবু তখনো দেখতে সুন্দর, চোখে পড়ে। বউ যে মুহূর্তে বাড়ির উপরতলার তার ছোট ঘরখানিতে গিয়ে উঠল, তখন থেকেই যেন সারা বাড়ি উঠল ঝলমল করে। মনে হল যেন জানালায় নতুন করে শার্সি বসানো হয়েছে। আইকনের সামনে এবার থেকে বাতি দেওয়া সুরু হল, প্রত্যেকটা টেবিল ঢাকা পড়ল সাদা ধপধপে টেবিল ঢাকনায়, জানালার ধারিতে আর সামনের বাগানে দেখা গেল লাল ফুল, আর খাবার সময় সকলে একই থালা থেকে তুলে খাওয়ার রেওয়াজ বদলে গিয়ে প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা প্লেটের ব্যবস্থা হল। ভারভারা নিকলায়েভনার হাসিটি ভারি মিষ্টি আর মমতা ভরা। সে হাসির জবাবে যেন বাড়ির সব কিছু হাসি হাসি হয়ে উঠল। এই প্রথম বাড়ির উঠোনে ভিক্ষুক, তীর্থযাত্রী আর সাধুফকিরদের দেখা যেতে লাগল। উকলেয়েভোর গরীব মেয়েদের টানা টানা গলা জানালার নিচে

শোনা যেতে থাকল। আর শোনা যেতে থাকল রোগাটে, গাল ঢুকে-যাওয়া সেই সব মানুষগুলোর বিনীত কাশির খক্‌খক্‌ আওয়াজ, বেশি মদ গেলবার জন্যে কারখানা থেকে যারা বরখাস্ত হয়েছে। টাকাপয়সা, রুটি আর পুরনো কাপড়চোপড় দিয়ে ভারভারা এইসব দুঃখী মানুষগুলিকে সাহায্য করত। আর পরে সংসারে আর একটু গুছিয়ে বসার পর থেকে, এমন কি, দোকান থেকে এটা সেটা সরিয়ে নিয়ে এসেও ওদের বিলিয়ে দিত। একদিন কালা স্তেপানের চোখে পড়ল যে তার নতুন মা দোকান থেকে দু প্যাকেট চা নিয়ে যাচ্ছে। ভয়ানক বিচলিত হয়ে সে অতঃপর বুড়োকে জানাল, 'মা দুআউন্স চা নিয়ে গেছে, এখন এর হিসেব আমি কোন খাতায় রাখি?'

শুনে কিছুক্ষণ উত্তর করল না বুড়ো। ভ্রূ কুঁচকে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে, তারপর উঠে গেল স্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলতে।

স্নেহমাখা কণ্ঠে ভারভারা নিকলায়েভনাকে ডেকে সে বলল, 'কোন কিছুর দরকার পড়লে দোকান থেকে সোজা নিয়ে নেবে, বুঝলে। এই নিয়ে দ্বিধা কোরো না কিছু, কেমন?'

আর তার পরের দিন ভারভারা যখন উঠোন দিয়ে যাচ্ছিল তখন কালা ছেলেটা দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলল, 'মা, কিছু দরকার থাকলে নিয়ে নাও!'

ভারভারার দানধ্যানের মধ্যে কিছু একটা যেন অভিনবত্ব আছে, আইকনের সামনে জ্বালিয়ে রাখা বাতির আর বাগানে ফোটা লাল ফুলগুলোর মতোই উজ্জ্বল আনন্দময় একটা কিছু।

পালা-পার্বণে কি স্থানীয় অধিষ্ঠাতা সন্তের তিনদিন ধরে-চলা উৎসবের সময় দলে দলে চাষীদের কাছে যখন পিপে থেকে বিক্রি করা হত শুয়োরের মাংস, যার পচা দুর্গন্ধে পাশে দাঁড়ানো যায় না, যখন হাতের কাস্তে, মাথার টুপি এমন কি বউয়ের শাল বাঁধা দিতে আসত চাষীগুলো আর পচা ভদকা গিলে কাদায় গড়াগড়ি দিত কারখানার মজুররা, পাপ যেন ঘন হয়ে বাতাসে কুয়াসার মতো ঝুলত যখন, তখন ভাবতে ভালো লাগত যে এই বাড়িরই এক কোণে রয়েছেন শান্ত পবিত্র এক নারী, পচা মাংস আর ভদকার সঙ্গে যাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। এই সব বিষণ্ণ কুয়াসাভরা দিনগুলোয় ভারভারার দানব্রত যেন যন্ত্রের সেফ্‌টি ভালভের মতো কাজ করত।

ৎসিবুকিন সংসারে দিন কাটে বেশ একটি সদা-সযত্ন সতর্কতার মধ্যে দিয়ে। সূর্য ওঠার আগেই শোনা যায় আকসিনিয়া উঠে দরজার কাছে হাত মুখ ধোয়া শুরু করেছে। রান্নাঘরে জল ফুটছে সামোভারে — তার শোঁ শোঁ শব্দটা যেন এ সংসারের দুঃখের একটা হুঁশিয়ারি। ছিমছাম গ্রিগরি পেত্রোভিচ্ পালিশ-করা টপবুট ঠুকেঠুকে পায়চারি করে চলেছে সারা ঘরময়। পরনে তার দীর্ঘ কালো কোট, আর ছাপা পায়জামা। একহারা চেহারা। সব মিলিয়ে তাকে দেখায় ঠিক যেন সেই জনপ্রিয় গানটার শ্বশুরমশায়ের মতো। তারপর তালা খোলা হয় দোকান ঘরের। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় গ্রিগরির ঘোড়ার গাড়িখানা। লম্বা টুপিটায় কান ঢেকে বুড়ো কর্তা তড়তড়িয়ে গাড়িতে ওঠে লাফ দিয়ে। তার দিকে তাকিয়ে তখন কিছুতেই মনে হয় না লোকটার ছাপ্পান্ন বছর বয়স। বৌ আর ছেলের বৌ এসে তাকে বিদায় জানায়। আর ঠিক এই সময়, যখন কিনা সে তার তক্‌তকে সুন্দর কোটটি গায়ে দিয়ে তিনশ রুবলে কেনা তাগড়াই কালো ঘোড়াটিতে জোতা গাড়িখানিতে উঠে বসেছে, ঠিক এই সময়টাতে চাষীরা এসে তাকে যতো অভাব অভিযোগের কথা শোনাবে এটা সে মোটেই চায় না। চাষীদের সম্পর্কে বুড়োর ভারি একটা বিতৃষ্ণা। ফটকের সামনে কাউকে অপেক্ষা করতে দেখলে সে সরোষে চেঁচিয়ে ওঠে:

'ওখানে দাঁড়িয়ে কেন বাপু, বাইরে যাও, বাইরে যাও।'

ভিখিরী দেখলে বুড়ো বলে, 'ভগবান দেবেন বাছা, ভগবান দেবেন!'

তারপর সে তার নিজের কাজে চলে যায় গাড়িটি হাঁকিয়ে। কালো পোশাকের ওপর কালো এপ্রন পরে তার স্ত্রী তারপর ঘরের এটা সেটা গোছগাছ করে নয়ত রান্নাঘরের কাজে যায় সাহায্য করতে। আর দোকানের কাউণ্টারে গিয়ে দাঁড়ায় আকসিনিয়া। সামনের আঙিনা থেকে শোনা যায় বোতল নাড়ানাড়ির শব্দ, খুচরো পয়সার ঠন্‌ঠন্, আকসিনিয়ার হাসি আর ধমকানি, যেসব খদ্দেররা ঠকেছে তাদের সরোষ চেঁচামেচি। বোঝা যায় দোকানে ইতিমধ্যেই ভদ্‌কার গোপন কারবার শুরু হয়েছে। কালা ছেলেটা দোকানের মধ্যে বসে থাকে চুপচাপ, নয়ত টুপি খুলে পায়চারি করে রাস্তায়, আর মাঝে মাঝে অন্যমনস্কের মতো চেয়ে থাকে গাঁয়ের আকাশ আর কুঁড়েঘরগুলোর দিকে। সারাদিনে বরাদ্দ ছয়বার চা আর চারবার খানা। তারপর সন্ধ্যে হলে,

সারাদিনের বেচাকেনার হিসেবপত্তর খাতায় লিখে যে যার ঘরে গিয়ে ঢলে পড়ে গভীর নিদ্রায়।

উকলেয়েভোর সুতাকল তিনটির সঙ্গে টেলিফোনে যোগ আছে মালিকদের বাড়ি অবধি। মালিকরা তিনঘর — খ্রিমিন ছোটো তরফ, খ্রিমিন বড়ো তরফ, আর কস্তিউকোভ। টেলিফোন লাইনটাকে বাড়িয়ে ভোলোস্ত বোর্ড পর্যন্ত লাগানো হয়েছিল, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তা নষ্ট হয়ে যায়। দেখা গেল টেলিফোনের কলকব্জার মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে যতো আরশুলা আর ছারপোকা। ভোলোস্তের কর্তা লিখতে পড়তে বিশেষ জানে না। লিখতে গেলে সব কথাই সে শুরু করে বড়ো হাতের অক্ষর দিয়ে। কিন্তু টেলিফোন লাইনটা খারাপ হয়ে যেতে সেও বলল, 'টেলিফোন ছাড়া কাজ চালানো এখন ভারি মুশকিল হবে দেখছি।'

খ্রিমিন বড়ো তরফের সঙ্গে ছোট তরফের মামলা লেগে থাকে সর্বদাই। ছোটো তরফের নিজেদের মধ্যেও ঝগড়াঝাঁটি আইন-আদালত পর্যন্ত গড়ায়। ঝগড়া পেকে উঠলে দু' একমাসের মতো কারখানাটা বন্ধ পড়ে থাকে — যতক্ষণ না আবার মিটমাট হয়ে যায় ওদের। গাঁয়ের লোকেদের কাছে এ থেকে রগড়ের খোরাকও মেলে প্রচুর। কেননা ঝগড়া বাধলেই তা নিয়ে গালগল্পের সীমা থাকে না। ছুটির দিন এলে কস্তিউকোভ আর খ্রিমিন ছোটো তরফেরা উকলেয়েভোর রাস্তায় গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ায় আর দু' একটা গরুবাছুর চাপা দিয়ে যায়।

এই সব দিনে আকসিনিয়া তার সবচেয়ে ভালো পোশাকটি পরে দোকানের সামনে পায়চারি করে বেড়ায় এদিক থেকে ওদিক। সদ্য ইস্ত্রি-করা পেটিকোট থেকে খস্‌খস্‌ শব্দ ওঠে। ছোটো খ্রিমিনরা এসে প্রায়ই আকসিনিয়াকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায় তাদের গাড়িতে — আকসিনিয়া এমন ভাব করে যেন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর অন্যদিকে বুড়ো ৎসিবুকিন বেরোয় ভারভারাকে সঙ্গে নিয়ে, তার নতুন ঘোড়াটাকে দেখিয়ে বেড়াবার জন্য।

গাড়ি হাঁকানোর পালা শেষ হলে রাত্রে গ্রামের সকলে যখন শুয়ে পড়েছে তখন খ্রিমিন ছোটো তরফের বাড়ি থেকে ভেসে আসে দামী হারমনিয়ামের

সুরতরঙ্গ। তার ওপর রাতটা যদি চাঁদনী হয়, তবে সে সঙ্গীতের সুরে মানুষের বুক দুলে দুলে ওঠে, মন ভরে যায় আনন্দে। উকলেয়েভোকে তখন আর অমন একটা অন্ধকূপ বলে মনে হয় না।

২

বিশেষ ছুটিছাটা ছাড়া বড়ো ছেলে আনিসিম ততো একটা বাড়ি আসে না। তবে প্রায়ই সে বাড়িতে উপহার পাঠায় নানা রকমের। তার সঙ্গে থাকে অচেনা হাতের সুন্দর হরফে পুরো পাতা-জুড়ে লেখা এক-একখান চিঠি। প্রথাসিদ্ধ আবেদনপত্রের মতো তার ভাষা। এমনি কথাবার্তায় আনিসিম কখনো যেসব গৎ ব্যবহার করে না, চিঠিগুলি কিন্তু ভরে থাকে তেমনি নানা বাগ্‌ভঙ্গিতে যেমন: 'মহামহিম পিতামাতা, আমি আপনাদের শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য এতদ্বারা এক প্যাকেট চা প্রেরণ করিতেছি।'

প্রত্যেকটি চিঠির শেষে আঁকাবাঁকা করে সই করা থাকে আনিসিম ৎসিবুকিন, মনে হয় যেন কেউ ভোঁতা নিবে লিখেছে। সইয়ের নিচে আবার সেই সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা থাকে 'গোয়েন্দা'।

চিঠি এলে তা পড়ে শোনানো হয় বেশ কয়েকবার করে। রীতিমতো বিচলিত হয়ে বুড়ো আবেগভরে বলে, 'দেখ তাহলে, ও ছেলে তো বাড়িতে রইল না, বাইরে গেল লেখাপড়া শিখতে। তা গেছে যখন, যাক। আমার কথা হল, যার যা কাজ, যার যা সাজে তাই করবে।'

শ্রোভেটাইডের কিছু আগে একদিন বাইরে তুষারের সঙ্গে জোর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বুড়ো আর ভারভারা জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। দেখা গেল, স্টেশনের দিক থেকে স্লেজ গাড়ি হাঁকিয়ে আসছে আর কেউ নয় আনিসিম। কেউ ভাবেনি এ সময় সে আসতে পারে। ঘরের মধ্যে আনিসিম এল কেমন একটা উদ্বেগ আর চাপা শঙ্কার ভাব নিয়ে। সে শঙ্কা তার আর কাটল না বটে, তবু একটা জোর করা স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব নিয়ে সে চলাফেরা শুরু করল। এবার সে বাড়িতেই রয়ে গেল, ফিরে যাবার নামও তেমন করল না। মনে হল হয়ত সে চাকরি খুইয়ে এসেছে। তার বাড়ি আসায় কিন্তু খুশিই হল ভারভারা। আনিসিমের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত

করে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আর মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলে, 'মাগো মা! এর কোনো মানে হয়? সাতাশ বছরের জোয়ান ছেলে, এখনো আইবুড়ো হয়ে থাকা!'

জিভ দিয়ে আফশোসের শব্দ করে ভারভারা। পাশের ঘর থেকে শুনলে মনে হয়, ভারভারা যেন কথা কইছে না, নিচু একটানা কণ্ঠস্বরে অনবরত খেদসূচক চুক্‌চুক শব্দ করে চলেছে কেবল। বুড়োৎসিবুকিন আর আকসিনিয়ার সঙ্গে এই নিয়ে সে ফিসফিস করে শলাপরামর্শ করল। তারপর ওরা তিনজনেই এমন একটা ধূর্ত রহস্যময় মুখভাব ঘনিয়ে তুলল যে মনে হল কিছু একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তোলা হচ্ছে।

ঠিক হল আনিসিমকে বিয়ে করতেই হবে।

ভারভারা বলল, 'তোমার ছোটো ভাই বিয়ে করে ফেলেছে কবে। আর তুমি এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছো যেন বাজারের মোরগটি। ভগবানের দয়ায় বিয়েটা হয়ে যাক এবার। তারপর তুমি ইচ্ছে করলে তোমার কাজে ফিরে যেতে পারো। বউ থাকবে এখানে, বাড়ির কাজকর্মে সাহায্য করবে। তোমার জীবনে কোনো ছিরিছাঁদ নেই বাছা! কি যে হয়েছো তোমরা সব আজকালকার শহুরে ছেলেপুলেরা। জীবনের ছিরিছাঁদ সব কিছু ভুলে বসে আছো!'

ৎসিবুকিনদের বাড়ির কোনো ছেলে বিয়ে করতে চাইলে সবচেয়ে সেরা মেয়েই তার জন্যে দেখা হয়ে থাকে, কেননা ৎসিবুকিনরা পয়সাওয়ালা লোক। আনিসিমের জন্যেও দেখা হল একটি সুন্দরী কনে। আনিসিম নিজে দেখতে বিশেষ ভালো নয়। আকারে খাটো, শরীরের গড়ন রোগাটে, গাল দুটো ফুলো ফুলো, মনে হয় যেন সর্বক্ষণ ফুঁ দেবার উপক্রম করছে ও। তীক্ষ্ন চোখ দুটোয় তার পাতা পড়ে না। মুখে অল্প লালচে দাড়ি। আপন মনে কিছু একটা ভাবতে হলে সে দাড়ির প্রান্তটুকু মুখে পুরে প্রায়ই চিবোয়। তাছাড়া শেষ কথাটা হল এই যে সে মদ খায় অনবরত, তার মুখ চোখ হাবভাব থেকে তা স্পষ্টই ফুটে বেরোয়। তা সত্ত্বেও কিন্তু আনিসিমকে যখন বলা হল তার জন্যে একটি মেয়ে দেখা হয়েছে ভারি সুন্দরী, তখন সেও বলল:

'তা আমিও তো কানা নই। ৎসিবুকিনরা সবাই সুন্দর, এ কেউ না বলে পারবে না।'

শহরের গায়েই তরগুয়েভো গ্রাম। গ্রামের অর্ধেকটাই এখন শহরের অংশ হয়ে গিয়েছে। বাকিটুকু এখনো গ্রামই থেকে গেছে। শহরের দিকের অংশটায় নিজের বাড়িতে বাস করত একটি বিধবা মেয়ে। তার সঙ্গে ছিল তারই এক বোন, খুবই গরিব, দিনমজুরি খেটে যেত। এই বোনের ছিল এক মেয়ে লিপা, তাকেও দিনমজুরি খাটতে হয়। লিপা যে সত্যিই সুন্দরী একথা তরগুয়েভোতে বেশ রটে গিয়েছিল। তবু কিন্তু এতদিনও কেউ ওকে বিয়ে করতে এগোয়নি। তার কারণ ওদের অসহ্য দারিদ্র্য, লোকে ধরে নিয়েছিল কোনো বয়স্ক লোক, সম্ভবত কোনো দোজবরে ওর দারিদ্র্য সত্ত্বেও ওকে বিয়ে করবে অথবা বিয়ে না করেই গ্রহণ করবে এবং তাতে করে লিপার মায়েরও দুবেলা খাওয়া জুটে যাবে দু'মুঠো। ঘটকদের কাছে এই লিপা সম্পর্কে খোঁজখবর করে ভারভারা একদিন রওনা দিল তরগুয়েভো গ্রামের দিকে।

কনে দেখার ব্যাপারটা যথারীতি সম্পন্ন হল লিপার মাসীর বাড়িতে। যথারীতি পরিবেশিত হল খাদ্য ও মদ। শুভ দিনটির জন্যে বিশেষ করে বানানো একটি গোলাপী রঙের পোশাক পরেছিল লিপা, আর তার চুলে বেঁধেছিল আগুনের শিখার মতো গাঢ় লাল রঙের একটি ফিতে। দেখতে সে পাতলা, ছিপছিপে, একটু ফ্যাকাশে, আর গড়নখানি ভারি নমনীয়, ভারি সুকুমার। মাঠে ঘাটে কাজ করে তার রংটা একটু জ্বলে গেছে। পাতলা ঠোঁটের ওপর তার ভেসে আছে ভীরু ভীরু বিষণ্ণ একটু হাসি আর দুচোখে শিশুর মতো সরল কৌতূহলী দৃষ্টি।

বয়সের দিক থেকে লিপা এখনো খুব কাঁচা, প্রায় ছেলেমানুষ বললেই হয়, স্তনের ডৌল এখনো বিশেষ ভরে ওঠেনি, তবু বিয়ের যুগ্যি হয়েছে বৈকি। সুন্দরী সে বটে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। খুঁত বলতে একটি: হাত দুখানি তার পুরুষের মতো চওড়া, লাল লাল দুটি থাবার মতো। শরীরের দুপাশে এখন তা নেতিয়ে আছে অলস হয়ে।

মেয়ে দেখা হলে, কনের মাসীকে বুড়ো জানিয়ে দিল, 'পণের ব্যাপার নিয়ে ভাবনা নেই। ছোটো ছেলে স্তেপানের জন্যেও আমি গরিবঘর থেকে মেয়ে এনেছিলাম। বাড়ির কাজ থেকে দোকানের কাজ সবই তো সেই চমৎকার চালিয়ে নিচ্ছে। তার সুখ্যাতি বলে শেষ করা যাবে না।'

লিপা দরজার কোণটিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল। তার সমস্ত ভঙ্গিটা যেন বলছিল, 'আমাকে নিয়ে যা করবে করো — তোমাদের ওপর ভরসা আছে আমার।'

আর রান্নাঘরে, কেন জানি ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে রইল লিপার মা প্রাস্কোভিয়া। পাঁচ বাড়িতে ঠিকা দাসীর কাজ করে তাকে খেতে হয়। যৌবনকালে একবার সে কাজ নিয়েছিল এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে — ঘর মুছবার সময় লোকটা একদিন তাকে ভয় দেখিয়ে পা ঠোকে। ভয় খেয়ে আতঙ্কে কাঠ হয়ে গিয়েছিল লিপার মা। সেই থেকে কেমন একটা ভয় ভয় ভাব সে আর কখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ভয়ে তার হাত পা, গাল দুটো পর্যন্ত তির তির করে কাঁপতে থাকে। রান্নাঘরে বসে বসে সে কেবল অভ্যাগতদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করল, আর আইকনের দিকে চেয়ে কপালে হাত দিয়ে বারবার করে ক্রুশের চিহ্ন আঁকল।

একটু মত্ত অবস্থায় আনিসিম এসে রান্নাঘরের দরজা খুলে অবহেলায় ডাক দিল মাঝে মাঝে:

'বেরিয়ে আসুন না, মা! আপনাকে নইলে ঠিক জমছে না।'

আনিসিম যতোবার ডাকল, ততবারই প্রাস্কোভিয়া তার শীর্ণ শুকনো বুকের ওপর দুহাত জড়ো করে উত্তর দিয়ে গেল:

'আপনাদের দয়ার কথা আর কি বলব ...'

কনে দেখার পর বিয়ের দিন ঠিক করা গেল। আনিসিমকে প্রায়ই দেখা যায় শীস দিয়ে নিজের ঘরে ঘুরছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ কি যেন তার মনে পড়ে যায়। তখন খুব গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সে। স্থির একাগ্র দৃষ্টিতে সে মেঝের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে যেন মনে হয় বুঝিবা মাটি ভেদ করেই একটা কিছু সে দেখতে চাইছে। তার যে বিয়ে হচ্ছে এবং খুবই শীগ্‌গির, ইস্টারের পরবের সময়, এজন্যে তার মধ্যে না দেখা যেত কোনো খুশির ভাব, না পাওয়া যেত তার বাগ্‌দত্তাকে দেখার জন্যে কোন কৌতূহল। শুধু এইটুকু চোখে পড়ত, মৃদু সুরে শীস দিয়ে সে ঘুরছে। বেশ বোঝা গেল সে বিয়ে করছে কেবল বাপ আর সৎ মা খুশি হবে বলে এবং এইজন্য যে গাঁয়ের রীতি ছেলে বড়ো হলেই তাকে বিয়ে করে সংসারের কাজে সাহায্য করার জন্য একজনকে নিয়ে আসতে হয়।

আনিসিমের যখন বাড়ি থেকে কাজে ফেরবার সময় হল, তখনও তার কোনো চাড় দেখা গেল না। অন্যান্যবারে বাড়ি এলে সে যা করত, এবার তার চালচলনে তেমন কিছু দেখা গেল না। শুধু কথাবার্তায় আনিসিম সব সময় একটা প্রফুল্ল ঘনিষ্ঠতার সুর ফোটাতে চেষ্টা করে, আর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঠিক যেটি বলার নয়, তেমনি কথাই বলে বসে ফস্ করে।

৩

শিকালভো গাঁয়ে খ্রিস্টি ধর্মসম্প্রদায়ের দু'বোন ছিল, তারা পোষাক বানাবার কাজ করত। বিয়ের সাজ-পোষাক করার ভার দেওয়া হল তাদের কাছেই। পোষাকের মাপজোক ঠিক করে নেবার জন্যে তারা প্রায়ই এসে হাজিরা দিতে শুরু করল ৎসিবুকিনদের বাড়িতে, মাপজোক হয়ে যাবার পরেও তারা চা খেতে খেতে সময় কাটাতো বসে বসে। ভারভারার জন্যে তৈরি হল একটি বাদামী পোষাক, তার সঙ্গে কালো লেস আর কালো পুঁতি। আকসিনিয়ার জন্যে হল সবুজ পোষাক, তার সামনেটা হলুদ রঙের, পেছনে সুদীর্ঘ ঝুল। পোষাক তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেলে ৎসিবুকিন ওদের দাম দেবার সময় নগদ টাকা একটিও বার করল না, দোকান থেকে কিছু মোমবাতি আর সার্ডিন মাছের টিন বার করে দিয়ে হিসেব শোধ করে দিল। এ জিনিসগুলোর ওদের মোটেই কোনো দরকার ছিল না। তবু তাই বোঝা বেঁধে নিয়ে মেয়ে দুটি চলে গেল। তারপর গাঁ ছাড়িয়ে মাঠগুলোর কাছে এসে একটা ঢিবির ওপর বসে বসে তারা কাঁদল।

বিয়ের তিনদিন আগে এসে পেঁছল আনিসিম। পরনে তার আপাদমস্তক নতুন পোষাক। পায়ে চকচকে রবারের গালোশ, গলায় টাই-এর বদলে লাল একটা দড়ির মতো কিছু, তার শেষে দুটো সুতোর গুটি। নতুন কোটখানা সে কাঁধের ওপর ফেলে রেখেছে, কিন্তু আস্তিনে হাত দুটো ঢোকায়নি।

আইকনের সামনে গম্ভীরভাবে প্রার্থনা শেষ করার পর সে তার বাপকে প্রণামী জানাল দশটি রুপোর রুবল আর দশটি আধা-রুবল দিয়ে; ভারভারাকে সে দিল দশটি পুরো রুবল আর দশটি আধা-রুবল। কিন্তু আকসিনিয়াকে দিল কুড়িটি সিকি-রুবল। এ জিনিসগুলোর প্রধান আকর্ষণ

এই যে সব কটি মুদ্রাই একেবারে ঝকঝকে নতুন। গম্ভীর আর ভারিক্কি যাতে দেখায় সেই জন্যে আনিসিম তার মুখের পেশীগুলোকে টানটান করে রাখার চেষ্টা করল, গাল দুটো ফুলিয়ে তুলল আরো। সারা গা থেকে তার ভক্‌ভক্‌ করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। বোঝা গেল আসার পথে প্রত্যেকটি স্টেশনের রিফ্রেশমেণ্ট রুমে সে একবার করে হানা দিয়ে এসেছে। এবারেও ছেলেটার হাবভাবে সেই প্রফুল্ল ঘনিষ্ঠতার ভাবটা বেশ ফুটে উঠেছে। ফুটে উঠেছে কেমন একটা অপ্রয়োজনীয় আতিশয্য। আনিসিম বাপের সঙ্গে চা আর খাবার খেল, আর ওই ঝক্‌ঝকে নতুন রুবলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ভারভারা জিগ্যেসাবাদ করল তার গাঁয়ের সেইসব বন্ধুদের সম্পর্কে, যারা সহরে বসবাস করছে।

আনিসিম বলল, 'ভগবানের ইচ্ছায় সবাই বেশ ভালো আছে। অবিশ্যি ইভান ইয়েগরভের পারিবারিক জীবনে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, তার বুড়িটা, বেচারী সোফিয়া নিকিফরভনা মারা গিয়েছে। ময়রার দোকানে শ্রাদ্ধ-ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল — মাথা পিছু আড়াই রুবল করে বরাদ্দ। আঙুরের মদও ছিল। আমাদের এ অঞ্চল থেকে জনকয়েক চাষীও গিয়েছিল, জানো! তাদেরও আড়াই রুবল করে খাবার দেওয়া হল। কিন্তু কিছু খেলে না লোকগুলো। গেঁয়ো চাষী তার আচারের স্বাদ কি বুঝবে!'

'আড়াই রুবল করে?' বুড়ো মাথা নেড়ে জিগ্যেস করল।

'নিশ্চয়ই এ তো আর পাড়াগেঁয়ে ব্যাপার নয়। রেস্তরাঁয় এসে ঢুকলে এটা ওটা হয়ত অর্ডার দিলে, বেশ লোকও হয়ত কয়েকজনকে পেলে, একসঙ্গে নিয়ে দু এক ঢোক মদ খাওয়া শুরু হল — বাস্‌ হঠাৎ এক সময় দেখা গেল রাত পুইয়ে এসেছে, আর মাথা পিছু খরচাই হয়ে গেছে তিনচার রুবল করে। আর যদি সে রেস্তরাঁয় সামরোদভ থাকে, তবে মধুরেণ সমাপয়েৎ করতেই হয় কফি আর ব্রাণ্ডি দিয়ে — একগ্লাস ব্রাণ্ডির দামই পড়ে ষাট কোপেক।'

তারিফের সুরে বুড়ো বলল, 'যা, বাজে কথা!'

'কী বলছ! আজকাল তো আমি প্রায়ই সামরোদভকে সঙ্গে নিয়ে যাই। ওই তো আমার হয়ে চিঠিগুলো লিখে দেয়। চমৎকার লিখতে পারে লোকটা! তবে শুনুন, মা,' আনিসিম ভারভারাকে লক্ষ্য করে সহর্ষে বলে চলল, 'সামরোদভ যে কী রকম লোক বললে বিশ্বাস করবেন না। আমরা সবাই তাকে

ডাকি 'মুক্তার' বলে। দেখতে ঠিক একেবারে আর্মেনিয়ানের মতো। গায়ের রঙ একেবারে কালচে। লোকটার নাড়ীনক্ষত্র সব আমার জানা। সমস্ত কিছু! ও-ও বোঝে সে কথা, তাই আমার সঙ্গ ছাড়ে না কিছুতে। আমরা বলতে গেলে জোড়মানিক, ও আর আমি। আমাকে দেখে সে কিছুটা ভয়ও পায় বটে, কিন্তু আমাকে ছাড়া ও চলতেও পারে না। যেখানে আমি যাবো, ও সঙ্গে আছে। আর জানেন তো মা, আমার চোখ দুটো খুব তীক্ষ্ন। পুরনো কাপড়ের বাজারে হয়ত একটা চাষী সার্ট বিক্রি করছে, দেখেই আমি ধরে ফেলব। যদি একবার বলেছি, "রোখো! চোরাই মাল নিয়ে এসেছে!" তো বাস, ঠিক দেখা যাবে, একেবারে হুবহু ফলে গেছে -- চোরাই মালই বটে।'

ভারভারা বলল, 'কেমন করে বোঝা গেল চোরাই মাল?'

'তা ঠিক বলা মুশকিল। আমার চোখটাই হয়ত কাজ করে। সার্টটা সম্পর্কে কিচ্ছু আমি জানিও না। কিন্তু ওই চোখ টানবে। এটা চোরাই মাল; বাস হয়ে গেল। আমি বেরুলেই আপিসের লোকেরা বলে, "ওই আনিসিম বেরিয়েছে, কাদাখোঁচা মারতে!" চোরাই মাল ধরাকে ওরা ওই বলে। মানে, চুরি তো যে কেউ করতে পারে। কিন্তু সে মাল হজম করতে পারাই হল শক্ত। দুনিয়াটা যতো বড়োই হোক, চোরাই মাল রাখার মতো জায়গা সেখানে একটুও নেই।'

ভারভারা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'ও হপ্তায় আমাদের গাঁয়ে গুনতারেভদের বাড়ি থেকে একটা ভেড়া আর দুটো ভেড়ার বাচ্চা চুরি গেল, কিন্তু কই, চোরকে কেউ ধরতেই পারল না।'

'সেকি! তল্লাস করে দেখতে পারি। আমি তো "না" বলছি না।'

বিয়ের দিন এল। এপ্রিল মাসের কনকনে একটা দিন, তবু বেশ রোদ্দুরভরা, আনন্দময়। ভোর থেকে উকলেয়েভোর রাস্তায় রাস্তায় ছুটে বেড়াতে শুরু করল ত্রয়কা আর দুই ঘোড়ার গাড়িগুলো। গাড়ির সঙ্গে ঝমঝম করে বাজতে লাগল ঘণ্টা, তার ঘোড়াগুলোর জোয়াল আর কেশর থেকে উড়তে লাগল রঙীন ফিতে। গোলমালে চকিত হয়ে উইলো গাছগুলোর মধ্যে কু-কু করে ডাকতে শুরু করল রুক পাখিগুলো, আর সর্বক্ষণ গান গেয়ে গেল ষ্টার্লিংগুলো, যেন ৎসিবুকিনদের বাড়ি বিয়ে হচ্ছে বলে তাদেরও খুশি ধরছে না।

টেবিল ভরে সাজানো হল ভোজ্যের স্তূপ—বড়ো বড়ো মাছ, শুয়োরের মাংস, মসলা-পোরা পাখি এবং নানা রকমের খাদ্য, টিনে ভরা স্প্র্যাট মাছ, আর রাশি রাশি মদ আর ভদকার বোতল, দামী সসেজ আর কৌটোবন্দী বাসি গলদা চিংড়ির গন্ধ উঠল সবকিছু ছেয়ে। টেবিলের চারপাশে বুড়ো পায়চারি করতে করতে ছুরির ওপর ছুরি ঘসে ঘসে ধার শানিয়ে নিল। সকলেই ডাকাডাকি করল ভারভারাকে, কখনো এটা চাইল কখনো ওটা। ভারভারাকে দেখে মনে হল ব্যস্ততায় লাল হয়ে উঠেছে সে, রান্নাঘরের ঘর বার করে বেড়াল সে হাঁপাতে হাঁপাতে। হেংসেলে কস্তিউকভোদের বাবুর্চি আর খ্রিমিন ছোটতরফের বড়ো খানসামা কাজে লেগেছে ভোর থেকে। কোঁকড়ান চুল নিয়ে আকসিনিয়া শুধু তার অন্তর্বাসটুকু পরে ছোটাছুটি করে বেড়াল সারা আঙিনা, তার নতুন বুটজোড়া থেকে শব্দ উঠল ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্। এত জোরে আকসিনিয়া ছোটাছুটি করছিল যে, মাঝে মাঝে তার খোলা বুক আর নগ্ন জানুর ত্বরিৎ আভাস ছাড়া আর কিছুই বিশেষ চোখে পড়ছিল না। গণ্ডগোলের মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা গেল শপথ আর দিব্যি গালার আওয়াজ, হাট করে খোলা ফটকের সামনে পথ-চলতি লোকেরা এসে উঁকি মারল। আর সবকিছু থেকে বোঝা গেল অসাধারণ কিছু একটার আয়োজন শুরু হয়েছে এখানে।

'কনে আনতে চলে গেছে ওরা!'

ঘণ্টার ঠন্ ঠন্ আওয়াজ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল গাঁয়ের ওপারে। দুটো বাজার পর ভিড় ঠেলে এল বাড়ির দিকে, আবার শোনা গেল ঘণ্টার ঠন্ ঠন্। কনে আসছে। গীর্জা ভরে উঠল লোকে, মাথার ওপরকার শামদানে বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হল; আর বুড়ো ৎসিবুকিনের বিশেষ অনুরোধে গীর্জার চারণদল স্বরলিপি হাতে নিয়ে গাইতে শুরু করল। বাতি আর রঙচঙে পোষাকের ঝলকে লিপার চোখে ধাঁধা লেগে যাবার দাখিল—মনে হল যেন গাইয়েদের উঁচু গলার সুরগুলো বুঝি ছোটো ছোটো হাতুড়ির মতো তার মাথার খুলিতে এসে ঠুকে যাচ্ছে। জীবনে এই প্রথম সে কটিবন্ধসমেত অন্তর্বাস পরেছে; মনে হচ্ছে যেন জিনিসটা তাকে চেপে ধরেছে একেবারে, জুতো জোড়াও হয়েছে আঁট। দেখে মনে হল সে যেন সবে কোনো একটা মূর্ছা থেকে জেগে উঠেছে, এখনো যেন ঠাহর হচ্ছে না কোথায় আছে। আনিসিমের গায়ে কালো কোট, টাইয়ের বদলে সেই লাল দড়ির মতো

জিনিসটা। একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন একটা চিন্তায় সে আচ্ছন্ন হয়ে রইল সর্বক্ষণ। শুধু চারণেরা চড়া সুরে গান শুরু করা মাত্র সে তাড়াতাড়ি একবার ক্রুসের চিহ্ন আঁকল। ভাবাবেগে আনিসিমের কান্না পাচ্ছিল। এই গীর্জেটার সঙ্গে অতি শৈশব থেকেই তার পরিচয়। মায়ের কোলে চেপে সে এখানে আসত আশীর্বাদী নেবার জন্যে। আর একটু বড়ো হয়ে সে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে মিশে গান গেয়েছে চারণদলের সঙ্গে; এ গীর্জের প্রতিটি কোণ, প্রতিটি মূর্তি তার কী ভীষণ চেনা। আর তারপর এখানেই তার আজ বিয়ে হচ্ছে, কেননা বিয়ে করাটাই হল কর্তব্য, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে বিয়ের কথা সে একটুও ভাবছিল না — তারই যে বিয়ে হচ্ছে এই কথাটা কেমন করে যেন তার মনেই এল না। চোখের জলে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল তার। আইকনগুলো পর্যন্ত ভালো করে দেখতে পাচ্ছিল না সে। বুকের মধ্যে চেপে রয়েছে যেন একটা ভার। মনে মনে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করল, ভগবান যেন তার মাথার ওপর আসন্ন বিপর্যয়টাকে দূর করে দেন, মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টির সময় যেমন করে বর্ষার মেঘ এক ফোঁটা বৃষ্টি না দিয়ে গাঁয়ের ওপর দিয়ে মিলিয়ে যায়, তেমনি করে মিলিয়ে যাক তার বিপদ। অতীতে সে অনেক পাপ করেছে, অনেক অনেক পাপ; কোনোদিকে কোনো আশা নেই আর, সবকিছু একেবারে এমন বানচাল হয়ে গেছে এখন যে ক্ষমা প্রার্থনাও বিসদৃশ লাগার কথা। তবুও সে প্রার্থনা করল, তাকেও যেন ঈশ্বর ক্ষমা করেন। একবার চেঁচিয়ে কেঁদেও উঠল আনিসিম, কিন্তু সেদিকে কোনো নজর দিল না কেউ। সবাই ভাবল, আনিসিম বোধহয় মদ খেয়েছে।

একটা বাচ্চা ভয় পেয়ে কোথা থেকে চেঁচিয়ে উঠল, ‘বাইরে চলো, বাইরে নিয়ে চলো না মা!’

পাদরি ধমক দিল, ‘এই! চেঁচিয়ো না!’

বিয়ের দলটা গীর্জা ছেড়ে যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় ছুটল পেছন পেছন। দোকানের কাছে, ফটকের সামনে, আঙিনার মধ্যে, জানালার নিচে দেয়ালে ঘেঁসে ঠেসাঠেসি করে — সবখানেই ভিড়। তরুণ দম্পতিকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে এগিয়ে এল মেয়েরা। দরজার পাশে গাইয়ের দল তৈরি হয়ে ছিল। বরকনে চৌকাঠ পেরনো মাত্র তারা সজোরে গান শুরু করে দিল। শহর থেকে বায়না করে আনা বাজনদারেরা সঙ্গত শুরু করল বাজনার। লম্বা লম্বা

গেলাসে করে বিতরণ করা হল দন অঞ্চলের শ্যাম্পেন। তারপর রোগাটে লম্বা একজন বুড়ো, ভুরু দুটো এতো মোটা যে চোখ প্রায় দেখাই যায় না, নাম তার ইয়েলিজারভ। ছুতোর মিস্ত্রি আর বাড়ি তৈরি ঠিকাদারির কাজ করে সে — নবদম্পতিকে উদ্দেশ করে বলল, 'আনিসিম, আর বাছা বৌমা, তোমাদের বলি, দুজন দুজনকে ভালোবেসে চলো, ভগবানের কথা মনে রেখে কাজ করো, তাহলে স্বর্গের মাতৃদেবী তোমাদের দেখবেন।' বুড়ো ৎসিবুকিনের কাঁধে মুখ রেখে ইয়েলিজারভ ফুঁপিয়ে উঠল। 'একটু কেঁদে নিই গ্রিগরি পেত্রোভিচ, একটু সুখের কান্না কাঁদি।' ইয়েলিজারভ বলল তীক্ষ্ণ গলায়, তারপর হঠাৎ হাহা করে হেসে উঠল চড়া মোটা গলায় 'হো হো হো। তোমাদের এই বৌটিও দেখতে বেশ সুন্দরী হে। একেবারে ঠিকঠাক, বেশ প্লেন, সমান, ঘড়ঘড় শব্দ নেই—যন্তরখানা বেশ চালুই মনে হচ্ছে, ইস্ক্রুপ বল্টু সব যে যার জায়গায় ঠিকঠাক লেগেছে দেখা যাচ্ছে।'

লোকটার আদিনিবাস ইয়েগরিয়েভ্স্ক জেলা। কিন্তু উকলেয়েভোর কলে আর আশেপাশের অঞ্চলেই সে কাজ করে এসেছে জোয়ান বয়স থেকে, ফলে এখন সে নিজেকে এই এলাকারই লোক বলে ভাবে। যারা তাকে চেনে, তারা চিরকালই ওকে অমনি রোগাটে, বুড়ো আর লম্বাটে গোছের দেখে আসছে। আর চিরকালই ওকে ডেকে এসেছে 'পেরেক' বলে। চল্লিশেরও বেশি বছর ধরে সে কারখানাগুলোতে মেরামতির কাজ করে এসেছে। বোধহয় সেইজন্যেই সে মানুষ এবং বস্তু নির্বিশেষে সবকিছুকেই একটি নিরিখে যাচাই করে— তাদের মজবুতি, মেরামত করার দরকার হচ্ছে কি না। আজকেও, টেবিলে বসবার আগে সে বেশ কয়েকটা চেয়ার পরখ করে দেখল, সেগুলো যথেষ্ট শক্ত কিনা। এমন কি স্যামন মাছটা খাওয়ার আগেও একবার হাত দিয়ে পরখ করে নিল।

শ্যাম্পেন চলার পর সকলে এসে টেবিলে বসল। চেয়ার টেনে বসতে বসতে কথা চালিয়ে গেল আমন্ত্রিতেরা। গানের দল বারান্দায় তান ধরল। বাজনদারেরা ধরল বাজনা। আর ওদিকে মেয়েরা আঙিনায় জড়ো হয়ে গলা মিলিয়ে শুরু করল বরকনেকে অভিনন্দন জানান গান। ফলে, শব্দের এমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত মিশ্র জগঝম্প শুরু হল যে মাথা ঘুরে যাবার যোগাড়।

'পেরেক' তার চেয়ারে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না। পাশের লোককে

মাঝে মাঝে খোঁচা দিল কনুই দিয়ে। যে কেউ কথা বলুক তাকে থামিয়ে দিয়ে নিজে শুরু করল আর পালা করে এক একবার কাঁদল, এক একবার হাসল।

বিড়বিড় করে সে বলল, 'শোনো বাছা, শোনো। বৌমা আকসিনিয়া, ভারভারা—সবাই যেন বেশ আমরা মিলে মিশে শান্তিতে থাকি, শান্তিতে আর স্বস্তিতে, নাকি গো বাছারা?'

মদ্যপানের অভ্যাস ওর বিশেষ ছিল না। একগ্লাস জিন টেনেই বেশ মাতাল হয়ে উঠেছিল। কিসের থেকে যে এই তিত্‌কুটে গা গুলিয়ে ওঠা মদটা বানানো হয়েছিল কে জানে; যে টানল সেই এমন ভাবে ঝিম্‌ মেরে যেতে থাকল, যেন কেউ বুঝি মাথায় ডাণ্ডা মেরে গেছে। জড়িত আর অসংলগ্ন হয়ে উঠতে লাগল কথাবার্তা।

টেবিলের চারপাশে এসে জমেছিল গাঁয়ের পাদরী, কারখানার ফোরম্যান আর তাদের বৌয়েরা, আর আশেপাশের গাঁয়ের ব্যবসায়ী, আর হোটেলওয়ালারা সবাই। ভোলোস্ত-এর মাতব্বর আর ভোলোস্তের কেরানি, এরাও ছিল পাশাপাশি বসে। চোদ্দ বছর ধরে এরা একত্রে কাজ চালিয়েছে। কাউকে না কাউকে প্রতারিত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত না করে এরা কখনো একটি কাগজেও সই দেয়নি, তাদের কবল থেকে কাউকে ছাড়েনি। পাশাপাশি ওরা বসে রইল—দুটি মোটাসোটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি। মনে হচ্ছিল যেন লোক দুটি মিথ্যে কথায় এমন চুর হয়ে আছে যে গায়ের চামড়াটা পর্যন্ত জোচ্চোরের চামড়ার মতো দেখাচ্ছে। কেরানির বৌ দেখতে ভালো নয়, ট্যারা। সঙ্গে নিয়ে এসেছে তার সবকটি কাচ্চাবাচ্চা। চিলের মতো বসে বসে এ প্লেট সে প্লেট নজর করে করে দেখছিল সে আর যা পাচ্ছিল ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে নিজের আর বাচ্চাগুলোর পকেটের মধ্যে ভরে দিচ্ছিল।

লিপা বসে রইল মরার মতো, গীর্জেতে তার মুখখানা যেমন দেখাচ্ছিল এখনো ঠিক তেমনিই নিষ্প্রাণ। পরিচয় হবার পরে আনিসিমের সঙ্গে তার আর একটি কথাও হয়নি। লিপার গলার আওয়াজটাই বা কেমন আনিসিম এখনো পর্যন্ত তা শোনেনি। লিপার পাশে বসে সে জিন টেনে যেতে লাগল নিঃশব্দে। তারপর যখন বেশ মাতাল্‌ হয়ে উঠল, তখন টেবিলের ওপাশে লিপার মাসীকে ডেকে বলল:

'আমার একজন বন্ধু আছে জানেন, তার নাম সামরোদভ। যা-তা লোক

নয়, সম্মানিত নাগরিক তার উপাধি। খুব কথা বলতে পারে। আমি ওর নাড়ীনক্ষত্র সব জানি। ও-ও সেটা জানে। আসুন মাসীমা, সামরোদভের স্বাস্থ্য পান করা যাক!'

ভারভারা টেবিলের চারপাশে ঘুরে ঘুরে অভ্যাগতদের বলছিল আরো খান, আরো একটু খান। বেশ ক্লান্ত আর বিহ্বল হয়ে পড়েছিল ভারভারা, কিন্তু তৃপ্তিও পাচ্ছিল এই দেখে যে যাক, খাদ্যের কমতি হবে না—সব কিছুই বেশ ভালোভাবে এগুচ্ছে, কেউ কোনো নিন্দে করতে পারবে না। সূর্য অস্ত গেল, কিন্তু ভোজ চলতেই থাকল। নিমন্ত্রিতেরা যে কে কী মুখে পুরছেন এখন তার আর কোনো খেয়াল নেই। কে কী বলছে তাও কানে ঢুকছে না আর। শুধু মাঝে মাঝে যখন মুহূর্তের জন্য বাজনা একটু থামছে, তখন সামনের আঙিনা থেকে পরিষ্কার ভেসে ভেসে আসছে একটি মেয়েমানুষের কণ্ঠস্বর, 'রক্তচোষা, জুলুমবাজরা, মরণও হয় না তোদের!'

সন্ধ্যায় ব্যাণ্ডপার্টির তালে তালে নাচ শুরু হল। খ্রিমিন ছোট তরফেরা এসে যোগ দিল। সঙ্গে করে আনল তাদের নিজেদের মদ। ওদের একজন দুহাতে দুই বোতল আর দাঁতে একটা গেলাস নিয়ে কোয়াড্রিল নাচ দেখিয়ে সকলকে ভারি খুশি করে দিল। কয়েকজন কোয়াড্রিলের পায়ের তাল বদলে উবু হয়ে বসে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে নাচল রুশ প্রথা মতো। সবুজ পোষাক পরা আকসিনিয়া ঝলক তুলে ছুটে গেল। তার গাউনের ঝুলের ঝাপ্টায় হাওয়া উঠল একটু। নাচিয়েদের একজন তার পোষাকের শেষটুকু মাড়িয়ে দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে 'পেরেক' চেঁচিয়ে উঠল:

'এঃ ভিতটা পয়মাল করে দিলে বাছারা! পয়মাল করে দিলে।'

আকসিনিয়ার চোখ দুটো দেখতে নিরীহ, ধূসর রঙের। চেয়ে থাকলে চোখের পাতা পড়ে না বিশেষ। মুখের ওপর নিরীহ একটা হাসি সর্বক্ষণ লেগেই আছে। ওর সেই পলক না-পড়া চোখ, সুদীর্ঘ গ্রীবার ওপর ছোট্ট মাথাটুকু, আর ওর দেহের মধ্যেকার নমনীয় ঠাট—সব মিলিয়ে ওকে কেমন সর্পিল মনে হচ্ছিল। ওর সবুজ পোষাকের সামনের হলুদরঙা বুক, আর অনবরত তার মুখে লেগে থাকা হাসি—সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল ও যেন একটি এ্যাডার সাপ, কাঁচা রাইক্ষেত থেকে মুখ তুলে পথচলতি লোকেদের দিকে চাইছে। খ্রিমিনদের সঙ্গে তার ব্যবহারের মধ্যে বেশ একটা স্বচ্ছন্দ

চেনা জানার ভাব। বেশ বোঝা যাচ্ছিল খ্রিমনদের বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে তার একটা দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে। আকসিনিয়ার কালা স্বামীটা কিন্তু কিছুই লক্ষ্য করছিল না, আকসিনিয়ার দিকে তাকিয়েও দেখছিল না। পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে সে শুধু আপন মনে বাদাম চিবুচ্ছিল আর বাদামের খোলাগুলো ভাঙছিল পিস্তলের মতো এক একটা আওয়াজ করে।

অতঃপর বুড়ো ৎসিবুকিন ঘরের মাঝখানটায় এসে দাঁড়িয়ে এক বার রুমাল নাড়ল। ৎসিবুকিনও নাচতে চাইছে এটা তারই একটা সংকেত। আর সঙ্গে সঙ্গে এঘর সেঘর হয়ে একটা কানাকানি আঙিনার ভিড়টা পর্যন্ত পেঁৗছে গেল:

'কর্তা নিজেও নাচবে এবার! নিজেও নাচবে!'

নাচল অবশ্য ভারভারাই। বাজনার তালে তালে বুড়ো মানুষটা কেবল তার রুমাল নাড়তে লাগল আর জুতো দিয়ে তাল ঠুকল, কিন্তু তাতেই খুশি হয়ে বাইরের ভিড়টা জানলায় এসে জমল, শার্সি দিয়ে উঁকি দিল আর সেই মুহূর্তে ৎসিবুকিনের যতো ধন সম্পদ আর যতো অপকর্ম সবকিছু ভুলে তারা ক্ষমা করে ফেলল বুড়ো মানুষটাকে।

উঠোন থেকে তারা চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'চালাও গ্রিগরি পেত্রোভিচ, ছেড়ো না! বুড়োটার মধ্যে এখনো ক্ষ্যামতা আছে মন্দ নয়, হাঃ হাঃ!'

রাত একটার সময় আসর ভাঙল। টলতে টলতে গিয়ে আনিসিম গাইয়ে বাজিয়েদের প্রত্যেককে বিদায় উপহার হিসেবে ঝকঝকে নতুন একটি করে রুবলের আধুলি দিল। বুড়ো কর্তা ঠিক টলে না পড়লেও স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। সেই অবস্থাতেই অভ্যাগতদের বিদায় দিতে দিতে সবাইকে একবার করে বলে নিল, 'বিয়েতে খরচ হয়ে গেল দু হাজার রুবল।'

লোকজন যখন চলে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ আবিষ্কৃত হল শিকালভো'র সরাইওয়ালার দামী নতুন ওভারকোটখানা বদলে কে যেন তার পুরনো কোটটি রেখে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আনিসিম সচকিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'খবর্দার! এক্ষুনি বার করে দিচ্ছি দাঁড়াও। আমি জানি কে নিয়েছে, খবর্দার!'

আনিসিম রাস্তায় ছুটে গিয়ে অতিথিদের একজনকে ধরবার চেষ্টা করতে গেল। আনিসিমকে আটকে আবার ফিরিয়ে আনা হল বাড়িতে। সে মাতাল,

রাগে লাল হয়ে উঠেছে, ঘামে ভিজে গেছে। তাকে জোর করে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে শিকল তুলে দেওয়া হল দরজায়। ঘরের মধ্যে আগে থেকেই লিপার পোষাক ছাড়িয়ে দিচ্ছিল তার মাসী।

৪

দিন পাঁচেক কাটল। আনিসিম চলে যাবার আগে ওপরতলায় ভারভারার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে এল। দেবমূর্তিগুলোর সামনে বাতিগুলো সবকটি জ্বলছে। ধূপের গন্ধ উঠছে অল্প অল্প। জানলার পাশে বসে ভারভারা একটি পশমের লাল মোজা বুনে চলেছে।

ভারভারা বলল, 'কী আর বলব, তুমি আমাদের এখানে কটা দিনই বা রইলে। মন বসছে না বুঝি? আমাদের অবস্থা কিন্তু বেশ ভালোই, অভাব বলতে কিছু নেই, তোমার বিয়েটিও বেশ সুন্দর দেওয়া গেল। কর্তব্যের কোনো ত্রুটি হয়নি। বুড়ো কর্তা বলেন দুহাজার খরচ পড়েছে। বেশ স্বচ্ছল কারবারীদের মতোই আমরা থাকি বটে, কিন্তু ও বড়ো একঘেয়ে জীবন। লোকজনের সঙ্গে আমাদের ব্যবহার বড়ো খারাপ। হায় ভগবান, ওদের সঙ্গে আমরা এমন বিশ্রী ব্যবহার করি, বাছা, যে যন্ত্রণায় আমার বুকটা টনটন করে ওঠে। ঘোড়া বিনিময় করাই বলো, কি কিছু কেনাকাটার কথাই বলো, কি মজুর খাটানো—লোক ঠকানো ছাড়া আর কিছু না, কিচ্ছু না। যাই করো, শুধু ঠগবাজি। আমাদের দোকানে যে খাবার তেল বিক্রি হয় তা যেমন তিতকুটে, তেমনি পচা। ওর চেয়ে আলকাতরাও বোধ হয় খেতে ভালো! আচ্ছা তুমিই বলো, ভালো তেল কি আমরা বিক্রি করতে পারি না?'

'যে যার পাওনা বুঝে নিচ্ছে, মা।'

'কিন্তু একদিন তো মরতে হবে, তখন? তুমি বাছা, তোমার বাপকে একটু বলো না?'

'আপনি নিজে বললেই তো ভালো।'

'আমি বললে আর কী হবে। যখনই বলেছি, ঠিক তোমার মতোই উনি এই একই উত্তর দিয়েছেন, "যে যার পাওনা বুঝে নিচ্ছে।" কিন্তু পরলোকে কি আর কেউ হিসেব নেবে, কোন মালটা তোমার, কোনটা অন্যের? ভগবানের বিচারে যে ফাঁকি নেই।'

'তা বটে, কেউ বিচার করবে না।' আনিসিম বলল নিঃশ্বাস ফেলে, 'কেউ জিগ্যেস করবে না মা, কেননা ঈশ্বর বলেই যে কেউ নেই।'

ভারভারা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চাইল, তারপর দুহাত ছড়িয়ে হেসে উঠল হো হো করে। ভারভারার এই অকপট বিস্ময় দেখে অস্বস্তি লাগল আনিসিমের। যেভাবে সে চাইছিল তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছিল ভারভারা আনিসিমকে পাগল ছাড়া আর কিছু ভাবছে না।

আনিসিম বলল, 'মানে, হয়ত ঈশ্বর বলে কেউ আছেন, কিন্তু লোকে আর তাকে বিশ্বাস করে না। আমার যখন বিয়ে হচ্ছিল তখন ভারি অদ্ভুত লাগছিল। মুরগীর বাসা থেকে ডিমটা নিয়ে এসেছি, হঠাৎ যেমন ডিমের মধ্যে বাচ্চাটা কোঁ কোঁ করে ওঠে, আমার বিবেকটাও তেমনি যেন কোঁকোঁ করে উঠল। ওদিকে বিয়ে চলছে আর আমি ভাবছি: ভগবান বলে নিশ্চয়ই কেউ আছেন! কিন্তু যেই গীর্জা থেকে বেরিয়ে এলাম, অমনি আর কিছুই নেই। ভগবান আছেন কি নেই কী করেই বা তা বোঝা যাবে? ছেলেবেলায় এসব কথা কেউই আমাদের শেখায়নি। মায়ের দুধ খেতে খেতেই আমরা শুনতে শুরু করেছি, যে যার পাওনা বুঝে নাও। বাবাও তেমন ভগবানে বিশ্বাস করেন না। মনে আছে আপনার, সেই যে একবার গুনতারেভদের বাড়ি থেকে ভেড়া চুরি যাবার কথা বলেছিলেন? ব্যাপারটা আমি সব বার করেছি। শিকালভোর একটা চাষা চুরি করেছিল; হ্যাঁ, ওই লোকটাই চুরি করেছিল বটে, কিন্তু চামড়াগুলো সব এসে জমা হয়েছে আমার বাবার দোকানে ... এই তো আপনার ধম্ম!'

আনিসিম চোখ মটকে মাথা নাড়ল। বলল, 'ভোলোস্তের মাতব্বরও ভগবানে বিশ্বাস করে না। কেরানীটিও নয়, সেক্সটনও নয়। গীর্জায় ওরা যে যায়, কিংবা পালাপার্বনে যে উপোস করে তার কারণ লোকে যাতে নিন্দে না করে, সত্যিই যদি শেষ বিচারের দিন কখনো এসে পড়ে সেই ভয়ে। কেউ কেউ বলে, দুনিয়াটার অন্তিমকাল এসে পড়ল বলে, কেননা লোকে আজকাল বড়ো দুর্বল হয়ে গেছে, বাপ-মাকে সম্মান করে না ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এ সব নেহাৎ বাজে কথা। আমার ধারণা কি জানেন মা? লোকের কোনো বিবেক নেই, আর, সেই হল আমাদের যত দুঃখকষ্টের গোড়া। লোকের আগাপাছতলা আমি দেখতে পাই, লোক চিনতে আমার বাকি নেই। যে কোনো একটা

সার্ট দেখেই আমি বলে দেব সার্টটা চোরাই মাল কিনা। সরাইখানায় একটা লোক বসে আছে; তুমি ভাবছ লোকটা বুঝি বসে বসে চা খাচ্ছে, কিন্তু আমি ঠিক টের পাই, লোকটা চা খাচ্ছে শুধু নয়, লোকটার কোনো বিবেকও নেই। সারাদিন ঘুরে ঘুরেও এমন একটা লোক পাবে না, যার বিবেক বলে কিছু আছে। তার কারণ ভগবান আছেন কি নেই কেউ জানেই না ... আচ্ছা, মা, তাহলে আসি। শরীর ভালো রাখবেন, মন ভালো থাক আপনার। আমাকে মনে রাখবেন।'

ভারভারার সামনে আভূমি নত হয়ে নমস্কার করল আনিসিম। বলল, 'আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, মা। আমাদের সংসারের আপনি লক্ষ্মী, ভারি পুণ্যবতী নারী আপনি। আপনাকে ভারি ভালো লাগছে আমার।'

অতি বিচলিত হয়ে আনিসিম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল:

'সামরোদভ আমাকে এমন একটা ব্যাপারের মধ্যে ফাঁসিয়েছে যে হয় মরব, নয় খুব বড়োলোক হয়ে যাবো। খারাপ যদি কিছু হয়, তাহলে বাবাকে আপনি সান্ত্বনা দেবেন মা, কেমন?'

'ছি, ওসব কথা মুখে এনো না আনিসিম, ভগবান রক্ষা করবেন! তোমার বউকে তুমি আদর করলে ভালো হত। কিন্তু তোমরা দুজন দুজনের দিকে এমনভাবে তাকাও যেন বুনো জানোয়ার দুটো। একটু হাসতে দেখি না তোমাদের, কই একটুও হাসো না!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আনিসিম বলল, 'ও বড়ো অদ্ভুত মেয়ে। কিছু বোঝে না, কোনো কথাই বলে না। বড়ো অল্প বয়স, আর একটু বড়ো হোক।'

গাড়িবারান্দার কাছে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল আনিসিমের জন্যে। লম্বা নধর ঘোড়াটা গাড়িতে জোতা।

বুড়ো কর্তা ৎসিবুকিন বেশ ফুর্তির চালে লাফিয়ে গাড়িতে চেপে লাগাম হাতে নিল। ভারভারা, আকসিনিয়া আর ভাইকে চুমু দিল আনিসিম। বারান্দার ওপর লিপাও দাঁড়িয়েছিল নিঃশব্দে, অন্যদিকে চেয়ে। যেন তার স্বামীকে সে বিদায় দিতে আসেনি, যেন পায়চারি করতে করতে এমনি এসে পড়েছে। আনিসিম কাছে গিয়ে আলগোছে তার গালে ঠোঁট রাখল। বলল, 'আসি।'

আনিসিমের দিকে লিপা চাইল না, শুধু একটা বিচিত্র হাসি তার মুখে ছড়িয়ে পড়ল, শরীরটা কেঁপে উঠল একটু। মেয়েটির জন্যে সকলেরই কেমন একটা কষ্ট হল, কেন কে জানে। গাড়ির ভেতর আনিসিম লাফিয়ে উঠে বসল কোমরে হাত দিয়ে। তাকে যে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে মনে হল এ সম্পর্কে তার কোনো সন্দেহ নেই।

গাড়িটা যখন নালা ছেড়ে ওপর দিকে উঠছে তখন আনিসিম গাঁ-টার দিকে ফিরে ফিরে দেখল। গরম রোদে ভরা দিন। এ বছরে এই প্রথম গরু ভেড়াগুলোকে চরাবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মেয়ে বৌয়ের দল, গায়ে তাদের ছুটির দিনের সাজ। খুর দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে লাল রঙের একটা ষাঁড় মুক্তির উল্লাসে গর্জন করে উঠল সজোরে। চারিদিকে — ওপরে, নিচে ভরত পাখিগুলোর গান শুরু হয়ে গেছে। আনিসিম গীর্জাটার দিকে চেয়ে দেখল — সুঠাম, শাদা, সদ্য চুনকাম করা। আনিসিমের মনে ভেসে উঠল পাঁচ দিন আগে এই গীর্জাতে সে প্রার্থনা করেছে। সবুজ ছাতওয়ালা স্কুল ঘরটার দিকে তাকাল আনিসিম, তাকাল নদীটার দিকে—এইখানে সে কতো চান করেছে, মাছ ধরেছে। মনটা তার হঠাৎ ভারি একটা আনন্দে ভরে গেল। মনে মনে সে চাইল এই মুহূর্তে তার পথরোধ করে একটা দেয়াল উঠুক মাটি ফুঁড়ে, তাকে ছিন্ন করে আনুক সেইখানে, যেখানে সে আর তার অতীত ছাড়া আর কিছু নেই।

স্টেশনে পেঁছে রিফ্রেশমেণ্ট রুমে এক গ্লাস করে শেরি হল দুজনের। বুড়ো কর্তা দাম দেবার জন্যে পকেট থেকে টাকার থলি বার করতে গেলে আনিসিম বলল, 'আমি খাওয়াচ্ছি।'

তাতে বুড়ো কর্তার মনটা বেশ দুলে উঠল। আনিসিমের কাঁধে চাপড় মেরে সে বারের লোকটার দিকে চোখ মটকাল। যেন বলতে চাইল, 'দেখো, কেমন ছেলে আমার!'

আনিসিমকে সে বলল, 'আমি চাই, আনিসিম তুমি বাড়িতেই থাকো, আমার ব্যবসায়ে সাহায্য করো। তোমাকে পেলে আমার যে কী সুবিধা হয়! সোনা দিয়ে তোমাকে মুড়ে দিতে পারি তাহলে।'

'না বাবা, তা হয় না।'

শেরিটা টক। গন্ধ উঠছিল গালার মতো। তবু আর এক গ্লাস করে ওরা নিল।

স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরে বুড়ো তার নতুন বৌমাটিকে দেখে অবাক হয়ে গেল। স্বামী চলে যাওয়া মাত্র লিপা বদলে গিয়ে হয়ে উঠেছে এক হাসিখুশি তরুণী। জীর্ণ একটি স্কার্ট পরে, হাতের ওপর আস্তিন গুটিয়ে খালি পায়ে লিপা বারান্দার সিঁড়ি পরিষ্কার করতে শুরু করেছে, গান গাইছে চড়া রুপোলী গলায়। ময়লা জলের ভারি গামলাখানা বয়ে নিয়ে যেতে যেতে সে যখন সূর্যের দিকে চেয়ে ছেলেমানুষের মতো হাসল তখন সত্যি সত্যি মনে হল ও নিজেই বুঝি আর একটা ভরত পাখি।

গাড়িবারান্দার সামনে দিয়ে ঠিক সেই সময় একটা বুড়ো মজুর পেরিয়ে যাচ্ছিল। মাথা দুলিয়ে, গলা পরিষ্কার করে নিয়ে সে বলল, 'ভগবান তোমাকে ভারি সুন্দর সুন্দর সব ব্যাটার বৌ দিয়েছে, গ্রিগরি পেত্রোভিচ। লক্ষ্মী প্রতিমা সবাই!'

৫

সেদিন ছিল আট-ই জুলাই। লিপা আর ইয়েলিজারভ, ওরফে 'পেরেক' কাজানস্কোয়ে গাঁয়ে গিয়েছিল ওখানকার গীর্জার অধিষ্ঠাত্রী ঠাকুরাণী কাজান মাডোনার পরব উপলক্ষ্যে। ফিরছিল হেঁটে, লিপার মা প্রাস্কোভিয়া ছিল অনেকখানি পিছিয়ে। প্রাস্কোভিয়ার শরীর ভালো ছিল না বলে হাঁপাচ্ছিল। সন্ধে হয় হয়।

লিপার কথা শুনতে শুনতে অবাক হয়ে 'পেরেক' বলছিল, 'ও-ও! তাই নাকি?'

লিপা বলছিল, 'ইলিয়া মাকারিচ, আমি জ্যাম খেতে খুব ভালোবাসি, তাই কোণের দিকে বসে আমি চা আর জ্যাম খাই। নয়ত ভারভারা নিকলায়েভনার সঙ্গে বসে চা খাই, উনি আমাকে সুন্দর আর করুণ গল্প বলেন! ওদের জ্যাম কতো আছে জানো, অঢেল—চার বয়াম! ওরা কেবলি বলে, 'খেয়ে নাও লিপা, যত পারো খাও!'

'তাই নাকি? চার বয়াম!'

'হ্যাঁ। ওরা তো বড়োলোক—চায়ের সঙ্গে শাদা রুটি খায় ওরা, আর

যতো ইচ্ছে ততো মাংস। ওরা বড়োলোক, কিন্তু সব সময় এত ভয় করে আমার, ইলিয়া মাকারিচ, এত ভয় ভয় লাগে!’

‘ভয় কিসের বেটি?’ ‘পেরেক’ বলল ঘাড় ফিরিয়ে, প্রাস্কোভিয়া কতদূর পিছিয়ে আছে দেখার জন্যে।

‘বিয়ের পর, প্রথম প্রথম আমার ভয় লাগত আনিসিম গ্রিগরিচ্‌কে দেখে। লোক সে খারাপ নয়, আমার কোনো ক্ষতিও করেনি। কিন্তু ও কাছে এলেই আমার হাড় পর্যন্ত কেমন শিটিয়ে আসত। সারা রাত আমার ঘুম হত না, কাঁপতাম আর প্রার্থনা করতাম। তারপর এখন ভয় লাগে আকসিনিয়াকে দেখে, জানো ইলিয়া মাকারিচ! সত্যি বলতে, সেও খারাপ নয়, সব সময়েই মুখে তার হাসি লেগে আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে সে যখন জানলা দিয়ে তাকায়, তখন তার চোখ দুটো কেমন ভয়ংকর লাগে, অন্ধকার গোয়ালের মধ্যে ভেড়ার চোখগুলো যেমন জ্বলে তেমনি সবুজ হয়ে ঝক্‌ ঝক্‌ করে ওর চোখ দুটো। খ্রিমিনদের ছোটো তরফ সব সময়েই ওর পেছনে লেগে আছে। ক্রমাগত তাকে ওরা বলে, “বুতেকিনোতে তোমাদের বুড়ো কর্তার একটা জমি আছে, গোটা চল্লিশ দেসিয়াতিনের মতো হবে। মাটি বলতে সবটাই প্রায় বালি — কাছেই নদীও আছে। ওখানে তুমি নিজের নামে একটা ইঁটখোলা তৈরি করো না কেন আকসিনিয়া। আমরাও তোমার সঙ্গে অংশীদার থাকব।” আজকাল ইঁটের দাম বিশ রুবলে হাজার। ওরা একেবারে লাল হয়ে যাবে। গতকাল দুপুরের খাওয়ার সময় আকসিনিয়া বুড়ো কর্তাকে বলেছে, ‘বুতেকিনোতে আমি একটা ইঁটখোলা করে নিজের নামেই ব্যবসা শুরু করব ভাবছি।” আকসিনিয়া বেশ হেসে হেসেই বলল। কিন্তু গ্রিগরি পেত্রোভিচের মুখ একেবারে হাঁড়ি হয়ে গেল। দেখেই বোঝা গেল ওর মত নেই। বলল, “আমি যতোদিন বেঁচে আছি, পৃথক হয়ে ব্যবসা করা চলবে না। একত্র হয়েই আমাদের চলতে হবে।” আকসিনিয়া এমনভাবে চাইল, এমন করে দাঁত কড়মড় করল ... পাতে যখন লুচি দেওয়া হল তার একটিও ছুঁল না।’

‘বটে?’ ‘পেরেক’ অবাক হল, ‘একটা লুচি ছুঁল না?’

লিপা বলে চলল, ‘আর কখন যে ও ঘুমোয়, আমি এখনো টের পেলাম না। আধ ঘণ্টাখানেক শুয়েছে কি অমনি উঠে পড়ে শুরু হয়ে গেল পায়চারি।

এ কোণ ও কোণ চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখবে চাষাভুষোরা কিছু চুরি করল কি কিছুতে আগুন দিল কিনা। ওকে দেখে আমার ভারি ভয় করে, ইলিয়া মাকারিচ! আর জানো, সেদিন বিয়ের পর খ্রিমিন ছোটো তরফেরা তো আর ঘুমতে যায়নি, সোজা চলে গিয়েছিল শহরের আদালতে। লোকে বলে, এসব আকসিনিয়ার দোষ। ওদের তিন ভাইয়ের দুই ভাই কথা দিয়েছিল আকসিনিয়ার জন্যে একটা কারখানা বানিয়ে দেবে। কিন্তু বাকি ভাইটা রাগারাগি করল। তাই ওদের কারখানাটা মাসখানেক ধরে বন্ধ হয়ে রইল। আমার কাকা প্রখোরকে বেকার হয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হল ভিক্ষে করে। বললাম, গাঁয়ে গিয়ে চাষ আবাদের বা কাঠ কাটার কাজে লাগো না কেন, কাকা? সে বলল, "সৎচাষীর মতো কাজ করতে কবে ভুলে গিয়েছি রে লিপা, চাষ আবাদের কাজ আর আমার হবে না।"'

এ্যাস্পেন ঝোপটার কাছে ওরা জিরিয়ে নেবার জন্যে বসল। ইতিমধ্যে প্রাস্কোভিয়াও এসে ওদের ধরতে পারবে। ঠিকাদার হিসেবে ইয়েলিজারভ কাজ করছে অনেকদিন কিন্তু ঘোড়া রাখে না সে। সারা জেলাটা সে চককর দিয়ে বেড়ায় পায়ে হেঁটে। সঙ্গে থাকে পেঁয়াজ আর রুটিভরা একটা ঝোলা। লম্বা লম্বা পা ফেলে হনহনিয়ে চলে, দুপাশে হাত দুটো দোলে। হেঁটে ওর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া মোটেই সহজ নয়।

ঝোপটার ধারে বিভিন্ন সম্পত্তির সীমা নির্দেশক একটা শিলা। ইয়েলিজারভ পরখ করে দেখল, জিনিসটা যতোটা শক্ত দেখাচ্ছে আসলে ঠিক ততোটা শক্ত কিনা। ভয়ানক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে প্রাস্কোভিয়া ওদের সঙ্গ ধরল। তার শুকনো সদা শঙ্কিত মুখখানা কিন্তু এখন আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। সবাইকার মতো সেও গিয়েছে গীর্জের ভেতরে, সবাইকার মতো সেও মেলার মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে আর 'ক্ভাস' খেয়েছে। এরকম ঘটনা তার জীবনে ঘটেনি, সুখের দিন বলতে জীবনে এই একটি দিনই সে পেল বলে তার মনে হল। বিশ্রামের পর তিনজনই হাঁটতে লাগল পাশাপাশি। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বনভূমির ফাঁকে ফাঁকে রোদ এসে পড়েছে, গাছের গুঁড়িগুলো তাতে আলো হয়ে উঠেছে। সামনের কোনো একটা দিক থেকে গুঞ্জন আসছে ভেসে ভেসে। উকলেয়েভোর মেয়েরা অনেকটা আগিয়েছিল। বনভূমির মধ্যে ব্যাঙের ছাতা খোঁজার জন্যে সম্ভবত তারাই দেরি করছে এখনো।

ইয়েলিজারভ ডাকল, 'ওগো মেয়েরা! ওগো সুন্দরীরা!'

ইয়েলিজারভের ডাক শুনে হাসির হররা ভেসে এল।

'পেরেক আসছে রে! বুড়ো ব্যাঙ, পেরেক।'

হাসি ভেসে এল প্রতিধ্বনি থেকেও।

বনভূমি ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল কারখানার চিমনির ডগাগুলো, গীর্জার মাথার ক্রস রোদে ঝকমক করছে: সেই গ্রাম, যেখানে সেক্সটন বুড়ো শ্রাদ্ধের ভোজে সবটা ক্যাভিয়ার খেয়ে ফেলেছিল। আর অল্প গেলেই বাড়ি পৌঁছে যাবে ওরা; শুধু তার আগে বিরাট ঢালু বেয়ে নামতে হবে নিচে। লিপা আর প্রাস্কোভিয়া এতক্ষণ খালি পায়ে হাঁটছিল। এবার ওরা বসল বুট পরে নেবার জন্যে। ঠিকাদার ইয়েলিজারভ বসল তাদের পাশে ঘাসের ওপর। ওপর থেকে দেখল উকলেয়েভো গ্রামখানা, তার উইলো গাছের সারি, তার ধবধবে শাদা গীর্জা, আর ছোট নদীখানি সমেত বেশ ছবির মতো লাগে, বেশ শান্ত, নিভৃত। কেবল কারখানার ছাতটায় খরচ বাঁচানোর জন্যে যে ম্যাড়মেড়ে রঙ লাগানো হয়েছে তাতে সুর কেটে যায় কেমন। নালার অন্য পাড়ে দেখা যায় পাকা রাইয়ের বিশৃংখল স্তূপ — যেন ঝড় বয়ে গেছে। যেখানে যেখানে রাই কাটা সদ্য শেষ হয়েছে সেখানে সেখানে সেগুলোকে সারি দিয়ে রাখা হয়েছে ঘন ঘন। ওটের খেতও পেকে উঠেছে, অস্তগামী সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে মুক্তার মতো। ফসল কাটার কাজ পুরাদমে শুরু হয়ে গেছে। আজকের দিনটা ছুটি গেল। কাল আবার সবাই রাই আর বির্চালির ক্ষেতে গিয়ে জুটবে। তারপর দিনটা আবার ছুটি — রবিবার। আজকাল প্রত্যেক দিনই শোনা যায় কোথায় যেন গুরু গুরু করে মেঘ ডাকছে। বাতাসটা গুমোট—শীগ্গিরই বোধহয় বৃষ্টি হবে। ক্ষেতের দিকে চেয়ে ওরা প্রত্যেকেই ভাবছে, বৃষ্টির আগেই ফসল কাটার কাজটা মিটে গেলে ভালো। আর প্রত্যেকের বুকের মধ্যেই একটা আনন্দ, ফুর্তি আর অস্থিরতা।

প্রাস্কোভিয়া বলল, 'খড় কাটুনিরা এবছর বেশ পয়সা করে নিচ্ছে। এক রুবল চল্লিশ কোপেক রোজ।'

অনবরত কাজানস্কোয়ের মেলা থেকে লোক ফিরছে পিলপিল করে—মেয়ের দল, নতুন টুপি পরা কারখানার মজুর, ভিখিরি, ছেলেপিলে...

খামারের গাড়ি গেল একটা একরাশ ধুলো উড়িয়ে। গাড়ির পেছনে একটা ঘোড়া বাঁধা—বিক্রির জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, বিক্রি হয়নি। মনে হল যেন তাতে ঘোড়াটা খুশিই হয়ে উঠেছে। একটু পরেই একটা গরুকে নিয়ে যাওয়া হল শিঙ চেপে ধরে, গরুটা অনবরত ডাকছে। আর একটা গাড়ি গেল—একদল মাতাল চাষী তাতে চেপে আছে, ঠ্যাংগুলো তারা ঝুলিয়ে দিয়েছে গাড়ির পাশ দিয়ে। একটা বাচ্ছা ছেলের হাত ধরে এগিয়ে গেল একটা বুড়ি, ছেলেটার মাথায় একটা মস্ত টুপি, পায়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভারি বুট। অতো প্রকাণ্ড বুট পরায় হাঁটু বাঁকানোর উপায় নেই। তার ওপর গরম। বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে ছেলেটা, তবু আপ্রাণ জোরে সে একটা খেলনার শিঙা বাজিয়ে চলেছে অনবরত। তারা ঢালু বেয়ে নেমে রাস্তার বাঁকে হারিয়ে যাওয়ার পরেও শিঙার শব্দটা কানে এসে পেঁছচ্ছিল।

ইয়েলিজারভ বলল, 'আমাদের মিল মালিকদের মাথায় কি যে ঢুকেছে! ভগবান বাঁচালে হয়। কস্‌তিউকোভ্ আমার ওপর চটেছে। বলে, "কার্ণিশের ওপর তুমি অনেক বেশি তক্তা লাগিয়েছো।" বললাম, অনেক বেশি কোথায়? যা দরকার তাই তো লাগিয়েছি ভাসিলি দানিলিচ্! আমি তো আর পরিজের সঙ্গে তক্তাগুলো বেটে খেয়ে নেবো না। "তা বলে, আমার মুখের ওপর অমন করে মুখ করছ তুমি! আহাম্মুক কোথাকার, বড়ো বাড় বেড়েছ! তোমাকে ঠিকাদার বানিয়েছেটা কে? আমি?" আমি বললাম, তা বটে, কিন্তু কী হল তাতে? ঠিকাদার হবার আগেও আমার রোজ চা খাওয়া জুটত। ও বলল "যতো সব জোচ্চোরের দল, সব বেটা জোচ্চোর..." আমি রা করলাম না। মনে মনে ভাবলাম, এ দুনিয়ায় আমরাই তো জোচ্চোর বটি, কিন্তু ওপরের দুনিয়ায় জোচ্চোর হবে তোমরা! হায় রে! পরদিন অবিশ্যি আর তেমন মেজাজ গরম করল না ও। বলল, "যা বলেছি তার জন্যে রাগ কোরো না মাকারিচ, অন্যায় বলে থাকলে, সহ্য করে যেয়ো, কেননা হাজার হোক, মানমর্যাদায় আমি তো তোমার বড়ো, পয়লা নম্বরের একজন ব্যবসায়ী।" আমি বললাম, তা বটে, তুমি বড়ো আর পয়লা নম্বরের ব্যবসায়ী সে ঠিক, আর আমি একজন ছুতোর। কিন্তু সেণ্ট জোসেফও ছিল একজন ছুতোর—এ কাজ খারাপ কাজ নয়—ভগবানের কাছে এ কাজটাও ভালো কাজ। আর তুমি যদি আমার চেয়ে বড়ো হয়ে থাকতে চাও, তো বেশ ভালো কথা। আর তারপরে ঐ কথাবার্তা

কয়ে আমি মনে মনে ভাবলাম: আমাদের মধ্যে কে আসলে বড়ো? পয়লা নম্বরের ব্যবসায়ী না কি এই ছুতোর মিস্ত্রি? ছুতোর মিস্ত্রিই হল আসল বড়ো!'

'পেরেক' কী যেন ভাবল একটু। তারপর আবার বলল, 'হ্যাঁ বাছা, ছুতোর মিস্ত্রিই হল আসল বড়ো। যে মেহনত করে, সবকিছু সহ্য করে সেই হল বড়ো।'

সূর্য ডুবে গিয়েছিল। নদী আর গীর্জার চত্বর আর কারখানার আশেপাশের ফাঁকা জায়গাগুলো থেকে দুধের মতো শাদা ঘন একটা কুয়াশা উঠতে শুরু করেছে। ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার, নিচে মিটমিট করছে বাতিগুলো; মনে হচ্ছে যেন একটা অতলস্পর্শ শূন্যকে বুঝি কুয়াশা গোপন করে রাখতে চাইছে। ঠিক মুহূর্ত ক্ষণেকের জন্য লিপা আর তার মায়ের মনে হল বুঝি এই বিশাল দুর্জ্ঞেয় বিশ্বের মাঝখানে, জীবজগতের এই অসীম প্রাণধারার মধ্যে তাদেরও কিছু একটা মানে আছে, তারাও বড়ো। দারিদ্র্যের মধ্যে তারা জন্মেছে, সারা জীবন দারিদ্র্য সইবে বলে তাদের মন বাঁধা। অন্যের হাতে ওরা নিজেদের সব কিছু তুলে দিতেই অভ্যস্ত হয়েছে, শুধু নিজেদের ভীরু নম্র আত্মাটি ছাড়া। উপরে বসে বসে ওরা সময় কাটাল, মুখে ওদের লেগে রইল আনন্দের একটা হাসি আর কয়েক মুহূর্তের জন্য ওরা ভুলে গেল, এখুনি হোক কি পরে হোক নিচের উৎরাইয়ে ওদের নামতেই হবে।

ওরা যখন বাড়ি ফিরল তখন ফটকের পাশে আর দোকানের সামনে মাটির ওপর ফসল-কাটা মজুরেরা এসে বসেছে। উকলেয়েভো গাঁয়ের চাষীরা কেউ ৎসিবুকিনদের বাড়িতে মজুরি করতে আসে না। ক্ষেতমজুর জোগাড় করতে হয় অন্য গাঁ থেকে। ছড়িয়ে বসে আছে লোকগুলো, আবছা আলোয় মনে হচ্ছে ওদের সকলেরই মুখ ভরা বুঝি কালো কালো লম্বা দাড়ি। দোকানটা খোলা। দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে কালা লোকটা একটা বাচ্চার সঙ্গে বসে ড্রট্ খেলছে। ক্ষেতমজুরগুলো গান গাইছে এমন নরম গলায় যে প্রায় শোনাই যায় না। আর মাঝে মাঝে গান থামিয়ে আগের দিনের মজুরি দাবি করছে চেঁচিয়ে। মজুরি পেলে পাছে ওরা সকাল হবার আগেই চলে যায় এই ভয়ে ওদের মজুরি দেওয়া হয়নি। বারান্দার সামনেকার বার্চ গাছটার নিচে বুড়ো কর্তা ৎসিবুকিন আস্তিনওয়ালা সার্টখানি পরে চা খাচ্ছে আকসিনিয়ার সঙ্গে। টেবিলের ওপর বাতি জ্বলছে একটি।

ফটকের ওপাশ থেকে বিদ্রূপের সুরে একজন ক্ষেতমজুর গান ধরল, 'দা-আ-আ-দু! আধখানা দেবে, তাই দিয়ো দাদু,তাই দিয়ো।'

একটু হাসি শোনা গেল, তারপর আস্তে, প্রায় শোনা যায় না এমন সুরে গান ধরল ওরা... 'পেরেক' চা খাবার জন্যে টেবিলে এসে বসল।

সে বলতে সুরু করল, 'তারপরে তো আমরা মেলায় গিয়ে পেঁছিলাম। ভগবানের ইচ্ছায় আমাদের সময়টা বেশ ভালোই কাটল বাছারা, ভারি ভালো কাটল। তবে একটা ভারি খারাপ কাণ্ড হয়ে গেল। সাশা কামার তামাক কিনে দোকানীকে একটা আধুলি দিয়েছিল, দেখা গেল আধুলিটা জাল।' কথা বলতে বলতে 'পেরেক' চারিদিকটা একবার দেখে নিল। তার চেষ্টা ছিল ফিস্‌ফিস্‌ করে কথাটা বলবে, কিন্তু ভাঙা ভাঙা আধা-চাপা গলায় সে যা বলল তা কারুর কানে যেতে আর বাকি রইল না। 'দেখা গেল ওটা জাল। লোকে জিগ্যেস করল, "কোথায় পেলি এটা বল শীগ্‌গির।" সে বলল, "আনিসিম ৎসিবুকিনের কাছ থেকে, বিয়ের সময় আমাকে দিয়েছিল"... ওরা সবাই পুলিস ডেকে আনল, পুলিস লোকটাকে ধরে নিয়ে গেল।... শোনো বলি পেত্রোভিচ্‌, তুমি আবার কোনো মুশকিলে না পড়ো। লোকে বলাবলি করছে...'

'দা-আ-আ-দু!' ফটকের কাছ থেকে সেই বিদ্রূপের স্বরটা ভেসে এল একবার, 'দা-আ-আ-দু!'

তারপরে সবাই চুপ করে গেল।

'পেরেক' বিড়বিড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আহ্‌ বাছারা, বাছারা...' ওর ঝিমুনি এসে গিয়েছিল, 'চা আর চিনির জন্যে ধন্যবাদ বাছারা। ঘুমোবার সময় হয়ে এল। আমার শরীরে ঘুণ ধরেছে বাছা, আমার শরীরের কড়ি বর্গাগুলো এবার ভেঙে ভেঙে পড়ছে। হো-হো!'

চলে যাবার আগে সে বলল:

'তার মানে এবার মরণের দিন ঘনিয়ে এল!' বলে ফুঁপিয়ে উঠল সে। বুড়ো কর্তা ৎসিবুকিন চা শেষ না করেই বসে বসে কী ভাবতে লাগল। রাস্তা দিয়ে 'পেরেক' অনেকটা দূর চলে গেছে ইতিমধ্যে। তবুও যেন সে তার পায়ের শব্দ শোনার জন্যেই কান পেতে আছে।

ৎসিবুকিন কী ভাবছে আন্দাজ করে আকসিনিয়া বলল, 'সাশা নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলেছে।'

ৎসিবুকিন ঘরের ভেতর গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল একটা ছোট্ট মোড়ক নিয়ে। মোড়কটা খুলতে টেবিলের ওপর ঝকমকিয়ে উঠল নতুন রুবলগুলো। একটা রুবল তুলে নিয়ে দাঁতে কামড়ে সে দেখল, তারপর ট্রের ওপর ফেলে দিল। তারপর আর একটা তুলে নিল এবং সেটাকেও ফেলে দিল...

আকসিনিয়ার দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে বুড়ো বলল, 'টাকাগুলো সত্যিই জাল... এ হল সেই রুবলগুলো, আনিসিম প্রণামী হিসেবে দিয়েছিল। এই, নাও বাছা,' বুড়ো ফিসফিস করে বলল, 'নিয়ে কুয়োর মধ্যে ফেলে দাও গে... কী আর হবে এতে। আর শোনো, এ নিয়ে আর কোনো কথাবার্তা যেন না হয়। ফ্যাসাদ বাঁধতে পারে... সামোভার নিয়ে যাও আর বাতিটা নিবিয়ে দিয়ো...'

লিপা আর প্রাস্কোভিয়া চালার নিচে বসে বসে দেখল এক এক করে আলো নিভে গেল বাড়িটার। শুধু একেবারে ওপর তলায়, ভারভারার জানলায় দেবমূর্তির সামনে লাল নীল বাতিগুলো জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল যেন ওই বাতিগুলো থেকে শান্তি তৃপ্তি আর পবিত্রতা বিকীরিত হচ্ছে। তার মেয়েটির যে বিয়ে হয়েছে বড়োলোকের বাড়িতে এই ব্যাপারটা প্রাস্কোভিয়ার ধাতস্থ হয়নি এখনো। মেয়েকে দেখতে এলে সে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াতো জড়োসড়ো হয়ে, হাসত কৃতার্থের মতো। ওরা তার জন্যে চা আর চিনি পাঠিয়ে দিত বাইরে। লিপাও বিশেষ ধাতস্থ হতে পারেনি। স্বামী চলে যাবার পর থেকে সে আর নিজের বিছানায় শুত না, রান্নাঘর কি গোয়াল যেখানে হোক গা এলিয়ে দিত আর দৈনিক ধোয়া মোছার কাজ করে সময় কাটাত, মনে মনে ধরে নিয়েছিল এখনো বুঝি সে একজন ঠিকা ঝি-ই রয়ে গেছে। আজকেও তীর্থদর্শন করে ফিরে মা-মেয়েতে চা খেল রাঁধুনির সঙ্গে বসে, তারপর চালায় গিয়ে স্লেজগাড়ি আর দেয়ালের মাঝখানের জায়গাটুকুতে শুয়ে পড়ল মেঝের ওপর। বাড়ির সবখানে আলো নিভে গেল। শোনা গেল কালা লোকটা দোকানে কুলুপ দিচ্ছে। উঠোনের ওপর ঘুমোবার আয়োজন করছে ক্ষেতমজুরগুলো। অনেক দূরে, খ্রিমিন ছোটো তরফদের বাড়িতে কে যেন সেই দামী হারমনিয়াম বাজাতে শুরু করেছে। প্রাস্কোভিয়া আর লিপা ঘুমোতে লাগল।

কার যেন পায়ের শব্দে ওরা যখন জেগে উঠল তখন আলো হয়ে গেছে,

কারণ চাঁদ উঠেছে। চালার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে আকসিনিয়া। তার হাতে বিছানার টুকিটাকি।

ভেতরে এসে আকসিনিয়া বলল, 'এই খানটাতে তবু একটু ঠাণ্ডা হবে।' বলে প্রায় চৌকাঠের ওপরেই শুয়ে পড়ল। সারা শরীর তার আলো হয়ে উঠল জ্যোৎস্নায়।

আকসিনিয়া ঘুমোল না। গায়ের কাপড়জামা সবই প্রায় খুলে দিয়ে গরমে এপাশ ওপাশ করতে লাগল আর সজোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাঝে মাঝে। জ্যোৎস্নার যাদুতে তাকে দেখে মনে হল যেন কোন অপরূপ সুন্দরী গর্বিণী এক জন্তু। কিছুক্ষণ যেতে না যেতে আবার পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজার কাছে এসে দাঁড়াল বুড়ো কর্তা সাদা পোষাক গায়ে।

ডাকল, 'আকসিনিয়া! আছো নাকি এখানে?'

ব্যাজার হয়ে আকসিনিয়া বলল, 'কেন, কী দরকার?'

'বললাম যে টাকাগুলো কুয়োতে ফেলে দিতে। দিয়েছো?'

'অমন কড়কড়ে জিনিসগুলোকে জলে দেব আমাকে তেমন মুখ্যু পাননি! ওই দিয়ে ক্ষেতমজুরগুলোকে মিটিয়ে দিয়েছি।'

'এই সেরেছে!' বুড়ো কর্তার কণ্ঠস্বরে আশঙ্কা ফুটে উঠল,'বেয়াদব মাগীটাকে নিয়ে ... হায় ভগবান!'

হতাশার ভঙ্গিতে সে তার হাত দুটো জোড় করে চলে গেল নিজের মনে বকবক করতে করতে। খানিক বাদেই আকসিনিয়া উঠে বসে বিরক্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল জোরে। তারপর বিছানাপত্তর গুটিয়ে নিয়ে চলে গেল বাইরে।

লিপা বলল, 'এ বাড়িতে কেন আমার বিয়ে দিলে মা?'

'সবাইকেই বিয়ে করতে হয়, বাছা! এ তো আমাদের ইচ্ছের ওপর নয়, সকলের ইচ্ছে।'

সান্ত্বনাহীন এক দুঃখের অনুভূতিতে ওরা নিজেদের ছেড়ে দিতে চাইছিল। কিন্তু মনে হল, কেউ একজন আছেন, আকাশের অনেক উঁচুতে, গহন নীলের মধ্যে যেখানে তারা ওঠে সেখান থেকে তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, উকলেয়েভো গাঁয়ের যেখানে যা কিছু ঘটছে সব তিনি দেখতে পান, সবকিছু তিনি লক্ষ্য করে চলেছেন। এ জীবনে অন্যায়ের দিকটা বড়ো বটে, কিন্তু বড়ো

শান্ত সুন্দর এই রাত। ভগবানের রাজ্যে ন্যায় আছে, ন্যায় থাকবে, এই রাতের মতোই সে ন্যায় শান্ত সুন্দর, পৃথিবীর সবকিছু যেন সেই ন্যায়ের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে যেমন করে জ্যোৎস্না বিলীন হয়ে যায় রাত্রির সঙ্গে।

তারপর মনের শান্তি ফিরে পেয়ে মা মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল এ ওর গা ঘেঁসে শুয়ে।

৬

অনেক আগেই খবর এসে গিয়েছিল যে টাকা জাল করা এবং টাকা চালানোর জন্যে আনিসিম হাজতে গেছে। তারপর মাসের পর মাস কেটেছে, পেরিয়ে গেছে বছরের আর্ধেক, দীর্ঘ শীতকাল কেটে গিয়ে শুরু হয়েছে বসন্ত। গাঁ আর সংসারের সকলের কাছে সংবাদটা সয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বাড়িখানা অথবা দোকান ঘরটার সামনে দিয়ে রাতে কাউকে যেতে হলে সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে যেত আনিসিম হাজতে রয়েছে। কেউ মারা গেলে যখন গীর্জার ঘণ্টা বাজানো হত, তখনো কেন জানি আবার মনে পড়ে যেত সবাইকার আনিসিম হাজতে রয়েছে, তার বিচার হবে।

গোটা বাড়িখানার ওপর যেন ছায়া নেমেছে একটা। মনে হত বুঝি বাড়ির দেয়ালগুলোও কেমন কালচে হয়ে গেছে, মরচে ধরেছে ছাতে, দোকান ঘরের লোহা বাঁধানো সবুজ রঙের ভারি কবাট হয়ে উঠেছে ফাটা ফাটা। বুড়ো ৎসিবুকিন নিজেও যেন কালচে হয়ে গেছে কেমন। চুল কাটা, দাড়ি ছাঁটার পাট সে অনেকদিন হল ছেড়ে দিয়েছে। সারা গালে তার অপরিচ্ছন্ন দাড়ি গজিয়ে উঠেছে। গাড়িখানায় আর তেমন ফুর্তি করে লাফিয়ে ওঠে না সে, ভিখিরি দেখে চ্যাঁচায় না: 'ভগবান তোমাদের দেখবেন!' সামর্থ্য ক্ষয়ে আসছিল বুড়োর, তার আশেপাশের সবকিছু থেকেই সেটা টের পাওয়া যাচ্ছিল। লোকে আর তাকে তেমন ভয় করত না। ঠিক আগের মতোই মোটা ঘুস দেওয়া সত্ত্বেও পুলিসের লোক এসে একদিন তার দোকান সম্পর্কে একটা এজাহারও লিখে নিল। বিনা লাইসেন্সে মদ বিক্রির অভিযোগে বুড়োর তিনবার তলব এসেছে শহরের আদালত থেকে, কিন্তু তিনবারই

বিচারের তারিখ পিছিয়ে দিতে হয়েছে, কেননা সাক্ষী পাওয়া যায়নি। বুড়ো কর্তা কাহিল হয়ে গেল একেবারে।

হাজতে ছেলেকে দেখতে যেত সে প্রায়ই। একটা উকিল ঠিক করল, কোথায় কোথায় সব দরখাস্ত পাঠাল, গীর্জার জন্যে একটা ধ্বজা কিনে দিল। যে হাজতে আনিসিম ছিল সেখানকার ওয়ার্ডেনের জন্যে সে একটা রুপোর চামচ আর একটা গ্লাস-দানি উপহার দিল — জিনিসটার তলায় এনামেল করা অক্ষরে লেখা:

'আত্মা আত্মজ্ঞান রাখে।'

ভারভারা বলে বেড়াতে শুরু করল, 'কারুর কাছে সাহায্য নেবো এমন কেউ নেই আমাদের, কেউ নেই। জমিদার বাবুদের কাউকে ধরে বড়ো কর্তাদের কাছে দরখাস্ত পাঠানো দরকার ... বিচারের আগে ওকে যদি জামীনও দিত তাও হত... ছেলেটা ওখানে পচে পচে মরবে, এই কি কথা!'

দুঃখ ভারভারাও পেয়েছিল, তবু শরীরটা তার আর একটু মোটা আর একটু চেকনাই হয়ে উঠেছিল। ঠিক আগের মতোই সে প্রদীপ জ্বালাতো দেবমূর্তির সামনে, সংসারের দিকে নজর রাখত, আর কেউ এলে জ্যাম আর আপেলের জেলি এগিয়ে দিয়ে আপ্যায়ন জানাতো। আকসিনিয়া আর তার কালা স্বামী আগের মতোই কাজ করত দোকানে। নতুন একটা কারবার খোলার তোড়জোড় চলছিল — বুতেকিনোতে একটা নতুন ইঁটখোলা, আকসিনিয়া সেখানে রোজই প্রায় দেখতে যেত গাড়ি চেপে। গাড়িটা চালাতো সে নিজেই, পথে চেনা কারুর সঙ্গে দেখা হলে কচি রাইক্ষেত থেকে মাথা তোলা সাপের মতো সে মুখ বাড়িয়ে হাসত, সেই সরল রহস্যময় হাসি। আর সারাদিন লিপা খেলা করে বেড়াত তার বাচ্চাটাকে নিয়ে। লেণ্ট পরবের ঠিক আগেই তার ছেলেটি হয়েছে, ছোট্ট, রোগা, রুগ্ন। ওটা যে কাঁদতে পারে, আশেপাশে তাকাতে পারে, লোকে যে ওটাকে মানুষ বলে গণ্য করতে পারে এ সব দেখে ভারি অবাক লাগত তার। ছেলেটার নাম দেওয়া হয়েছিল নিকিফর। দোলনায় শুইয়ে রেখে লিপা দরজা পর্যন্ত পেছিয়ে এসে অভিবাদন করে বলত, 'কেমন আছো নিকিফর আনিসিমিচ্, ভালো তো?'

তারপর হঠাৎ ছুটে এসে চুমু দিয়ে ভরে দিত ছেলেটাকে। তারপর আবার দরজা পর্যন্ত পেছিয়ে গিয়ে অভিবাদন করে বলত:

'কেমন আছো নিকিফর আনিসিমিচ্, ভালো?'

আর বাচ্চাটা তার ছোটো ছোটো লাল লাল পা ছুঁড়ে হাসত আর কাঁদত প্রায় একই সঙ্গে, ঠিক একেবারে ছুতোর মিস্ত্রি ইয়েলিজারভের মতো।

অবশেষে বিচারের তারিখ ধার্য হল একদিন। সে তারিখের পাঁচ দিন আগেই বুড়ো কর্তা সহরে রওনা দিল। শোনা গেল, সাক্ষী হিসেবে গাঁয়ের কিছু চাষীকেও ডাকা হয়েছে। ৎসিবুকিনের পুরনো মুনিষটাও সমন পেয়ে চলে গেল।

কথা ছিল বৃহস্পতিবার বিচার হবে। কিন্তু রবিবারও পেরিয়ে গেল, না ফিরল বুড়ো কর্তা, না পাওয়া গেল কোনো সংবাদ। মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে ভারভারা তার জানলাটিতে বসে বসে ৎসিবুকিনের ফেরার অপেক্ষা করছিল। লিপা খেলছিল তার বাচ্চার সঙ্গে পাশের ঘরে। ছেলেটাকে নাচাতে নাচাতে সে সুর করে বলছিল:

'ছেলে আমার বড়ো হবে, কতো বড়ো হবে, মরদ হয়ে উঠবে। মায়ে পোয়ে আমরা তখন মজুরি করতে বেরুব! মায়ে পোয়ে কাজ করব আমরা!'

ভারভারা চমকে উঠল, 'ছিছি! মজুরি করতে যাওয়া, এসব আবার কী কথা! বড়ো হয়ে ও ব্যবসা করবে।'

ধমক খেয়ে লিপা আস্তে করে গান গাইতে শুরু করল। কিন্তু খানিক বাদেই আবার সব কিছু ভুলে শুরু করল, 'বড়ো হবে ছেলে, অনেক বড়ো হবে, মরদ হয়ে উঠবে, মায়ে পোয়ে একসঙ্গে কাজে বেরুব আমরা!'

'আবার শুরু করেছো তো?'

নিকিফরকে কোলে নিয়ে লিপা এসে দাঁড়ালো দোরগোড়ায়। বলল, 'বাচ্চাটাকে এত ভালোবাসি কেন মা, কেন যে এটাকে এত ভালো লাগে!' কথা বলতে গিয়ে ওর গলা ভেঙে আসে, চোখ দুটো চিক চিক করে উঠে জলে, 'কে ও? কী ওটা? পালকের মতো পলকা। ছিঁচকাদুনে এইটুকুন একটা জীব — অথচ মনে হয় সত্যিকারের একটা মানুষকেই বুঝি ভালোবাসছি। দ্যাখো দ্যাখো, চেয়ে দ্যাখো, একটা কথাও তো মুখ দিয়ে বেরোয় না, কিন্তু ওর চোখের দিকে চাইলেই আমি টের পাই কী চাইছে।'

ভারভারা কান পাতে আবার। সন্ধ্যার ট্রেনটা স্টেশনে এসে পেঁছিচ্ছে। তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বুড়ো কর্তা হয়ত এতে আসবে। লিপা কী বলছে

তার কিছুই সে শুনছিল না, বুঝছিল না। সময়ের জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে সে বসে বসে কাঁপছিল, ভয়ে ততটা নয়, বরং তীব্র একটা ঔৎসুক্যে। চাষী ভর্তি একটা গাড়ি পার হয়ে গেল সশব্দে। যারা সাক্ষী দিতে গিয়েছিল তারা স্টেশন থেকে ফিরছে। দোকানের সামনে দিয়ে গাড়িটা চলে যাবার পর এ বাড়ির পুরনো মুনিষটা লাফ দিয়ে নেমে উঠোনে এসে দাঁড়ালো। ভারভারা শুনতে পেল, উঠোনের লোকজন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে ...

লোকটা বেশ জোরে জোরে জবাব দিল, 'বিষয় সম্পত্তির অধিকার সব কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ছয় বছরের জন্যে সাইবেরিয়া — সশ্রম কারাদণ্ড।'

দোকানের খিড়কি দরজা দিয়ে আকসিনিয়াকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। কেরোসিন বেচছিল সে, তাই তার এক হাতে একটা বোতল, অন্য হাতে একটা ফানেল, আর দাঁতে কামড়ে ধরে রেখেছে কয়েকটা রুপোর মুদ্রা।

'কিন্তু বাবা কোথায়?' অস্ফুট স্বরে সে বলল।

মুনিষটি বলল, 'স্টেশনে। বলে দিলেন, অন্ধকার হলে বাড়ি ঢুকবেন।'

আনিসিমের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে, এখবরটা যখন বাড়ির ভেতর জানাজানি হয়ে গেল তখন রান্নাঘরের মধ্যে রাঁধুনী মরাকান্না জুড়ে দিল উচ্চ স্বরে। তার ধারণা এই রকম করাই শোভন।

'আমাদের ছেড়ে কোথায় চলে গেলে বাছা আনিসিম গ্রিগরিচ, কোথায় গেলে আমার ঈগল সোনামণি?'

কুকুরগুলো সচকিত হয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল। ভারভারা জানলার কাছে ছুটে গিয়ে শোকে অস্থির হয়ে দুলতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আপ্রাণ চেঁচিয়ে রাঁধুনীকে সে ধমক দিল:

'থামো বাপু স্তেপানিদা, থামো। ভগবানের দোহাই, মরাকান্না কেঁদে আর আমাদের যন্ত্রণা বাড়িয়ো না।'

সামোভারটা যে জ্বালাতে হবে সে কথা মনে পড়ল না কারুর। মনে হল সকলেরই যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একমাত্র শুধু লিপাই বুঝল না কী হয়েছে। ছেলেটিকে সে আদর করে গেল ঠিক একইভাবে।

স্টেশন থেকে বুড়ো কর্তা ফিরলে কেউ তাকে কিছু জিগ্যেস করল না। মামুলী কুশলের দু একটা কথা বলে বুড়ো নিঃশব্দে হেঁটে গেল ঘরগুলোর মধ্যে। রাত্রে খেলো না।

সবাই চলে গেলে ভারভারা বলল, 'সাহায্য করার মতো লোক আমাদের কেউ নেই। তখন বলেছিলাম, জমিদার বাবুদের কাউকে ধরতে। আমার কথা শুনলে না ... একটা দরখাস্ত পাঠানো উচিত ছিল ...'

হাত নেড়ে বুড়ো কর্তা বলল, 'যা সামর্থ্য তাই করেছি। রায় পড়া হলে আমি আনিসিমের উকিলের কাছে গেলাম। সে বলল, এখন আর কিছু করা যায় না, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আনিসিমও সেই কথাই বলল, "বড্‌ডো দেরি হয়ে গেছে।" তবুও, আদালত থেকে বেরুবার আগে আমি এক উকিলের সঙ্গে কথা কয়ে এসেছি। আগাম কিছু টাকাও দিয়ে এসেছি ওকে ... সপ্তাহ খানেক দেখে আবার যাবো। এখন ভগবান যা করেন।'

ঘরগুলোর মধ্যে দিয়ে আর এক দফা নিঃশব্দে পায়চারি করে বুড়ো কর্তা ফিরে এল ভারভারার কাছে। বলল:

'আমার বোধ হয় অসুখ করেছে। মাথাটা কেমন ঝাপসা ঝাপসা লাগছে। স্পষ্ট করে কিছু চিন্তা করতে পারছি না।'

তারপর, লিপা যাতে শুনতে না পায় সেইজন্যে দরজা বন্ধ করে এসে বলল:

'আমার টাকাপয়সাগুলো নিয়ে বড়ো ভাবনায় পড়েছি। সেই যে বিয়ের ঠিক আগে, ইস্টারের পরের হপ্তায় আনিসিম আমার জন্যে কতকগুলো নতুন নতুন রুবল আর আধুলি নিয়ে এসে দিয়েছিল না? তার একটা মোড়ক আমি রেখেছিলাম আলাদা করে। কিন্তু বাদবাকি সব আমি নিজের টাকাপয়সার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছি ...আমার খুড়ো দ্‌মিত্রি ফিলাতিচ্‌ (ভগবান তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন!) যখন বেঁচে ছিল, তখন মাল কেনার জন্যে সে কখনো ক্রিমিয়া কখনো মস্কো করে বেড়াত। তার একটি স্ত্রী ছিল। খুড়ো যখন মাল কেনার জন্যে বাইরে থাকত, তখন সেই স্ত্রী ঘুরত অন্য লোকের সঙ্গে। ওদের ছিল ছটি ছেলে মেয়ে। আর আমার খুড়োর পেটে যখন দু এক ঢোক বেশি মদ পড়ত তখন সে হাসতে হাসতে বলত, 'ছেলেগুলোর কোনটা আমার, কোনটা আমার নয় কিছুতেই ঠাহর করতে পারি না হে।" ওমনি কাছাখোলা লোক ছিল সে। এখন আমারও হয়েছে সেই দশা—কোনগুলো যে ভালো টাকা কোনগুলো জাল, কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে সবগুলোই বুঝি জাল।'

'ভগবানের দোহাই, অমন কথা বলো না!'

'সত্যি বলছি। স্টেশনে টিকিট করতে গিয়ে তিনটে রুবল বার করে দিয়েছি দাম হিসেবে। আর অমনি ভাবনা ধরে গেছে, জাল নয়ত? ভয়ানক ভয় করছে আমার। নিশ্চয়ই অসুখ হয়েছে একটা।'

ভারভারা মাথা নেড়ে বলল, 'যাই বলো, শেষ পর্যন্ত ভগবান যা করবেন তাই হবে। তাই পেত্রোভিচ্, আমাদের এখন থেকেই ভেবে রাখা উচিত ... খারাপ কিছু একটা ঘটে যেতে কতোক্ষণ, তুমি তো আর জোয়ান নও। তুমি না থাকলে, বলা তো যায় না, তোমার নাতির সঙ্গে যদি সকলে খারাপ ব্যবহার করে! নিকিফরের কথা ভেবে আমার ভাবনা হচ্ছে। বাপটা তো নেই বললেই হয়, আর মা-টির না হয়েছে বয়েস, না আছে জ্ঞানগম্যি... তুমি ওর জন্যে অন্তত বুতোকিনোর জমিটুকু দানপত্র করে যাও। এটা তোমার সত্যিই করা উচিত, পেত্রোভিচ্।' ভারভারা ভালো করে বোঝাতে শুরু করল, 'ভেবে দেখো ছোট্ট টুকটুকে ঐটুকু জীব। না করলে কী লজ্জার কথাই না হবে। কাল যাও, গিয়ে একটা দলিল করে এসো। অপেক্ষা করে কী লাভ?'

ৎসিবুকিন বলল, 'ঠিক বটে, ছেলেটার কথা আমার মনেই ছিল না ... আজ এসে আমি ওকে দেখিও নি। বেশ ভালো বাচ্চা, বলছ? আচ্ছা বেশ! তাহলে বড়ো হোক ছেলেটা, ভগবানের কৃপায় বেঁচে বর্তে থাকুক।'

দরজা খুলে বুড়ো তর্জনীর ইশারায় লিপাকে ডাকল। ছেলে কোলে লিপা এসে দাঁড়ালো।

বুড়ো বলল, 'লিপা বৌমা, তোমার যখনই কিছু দরকার হবে বলো, কেমন? যা খেতে ভালো লাগবে খাবে। আমরা কিছুই মনে করব না। তুমি বেশ ভালোভাবে থাকো এইটুকুই শুধু আমরা চাই।'... বাচ্চাটার শরীরের ওপর বুড়ো একটা ক্রুসের চিহ্ন আঁকল, 'আর আমার নাতিটিকে দেখো। আমার ছেলেটিকে আমি খোয়ালাম, কিন্তু নাতিটি তো আছে।'

গাল বেয়ে জলের ধারা পড়ছিল ওর। ফুঁপিয়ে উঠে বুড়ো চলে গেল নিজের ঘরে। তারপর, সাতটি বিনিদ্র রজনীর পর আজ শয্যা নেবার পর ঢলে পড়ল গভীর ঘুমে।

৭

মাঝখানে বেশ কয়েক দিনের জন্যে বুড়ো কর্তা শহরে গিয়েছিল। আকসিনিয়া কার কাছ থেকে যেন একদিন শুনল কর্তা শহরে গিয়েছিল উকিল ধরে একটা উইল করবার জন্যে। আর যেখানে সে ইঁটখোলা বানিয়েছে সেই বুতেকিনো জায়গাটাই সে উইল করে দিয়েছে তার নাতি নিকিফরের নামে। ঘটনাটা সে শুনল এক সকালবেলায়, ভারভারা আর বুড়ো কর্তা তখন বারান্দার সামনে বার্চ গাছটার তলায় বসে চা খাচ্ছে। দোকানের সদর খিড়কির দুটো দরজাতেই কুলুপ দিয়ে আকসিনিয়া তার সমস্ত চাবির গোছা নিয়ে এসে বুড়ো কর্তার পায়ের কাছে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'আমি আর আপনার জন্যে খেটে মরতে পারব না!' আকসিনিয়া তীক্ষ্ন গলায় চেঁচিয়ে উঠে হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। 'আমি তো আপনার বাড়ির বৌ নই, চাকরাণী। লোকে হেসে হেসে বলছে, 'দেখো, ৎসিবুকিনেরা কী সুন্দর একটা চাকরাণী পেয়েছে।' আপনার বাড়িতে মুনিষ খাটব বলে আমি আসিনি! ভিখিরি পাননি আমাকে— আমার মা আছে, বাপ আছে।'

চোখের জল না মুছেই সে তার রাগে জ্বলন্ত জলভরা দুই চোখে বুড়ো কর্তার মুখের দিকে চেয়ে আপ্রাণ জোরে চেঁচাতে শুরু করল; চেঁচানির ফলে মুখ আর ঘাড় লাল হয়ে উঠল তার:

'আপনার সেবা করা এই আমার শেষ! খাটতে খাটতে হাড় কালি হয়ে গেছি! কাজের বেলা তখন আমি, দিনের পর দিন দোকানে বসে থাকো রে, রাতের আঁধারে ভদকা বেচো রে! আর জমি দানপত্তর করার বেলায় ওরা, ঐ কয়েদীটার বৌ আর তার পুঁচকে বেটা! এ বাড়িতে উনিই তো রাজরাণী আর আমি হলাম চাকরাণী! বেশ, তাই করুন, ওকেই দিন সবকিছু, ওই জেলের কয়েদীটাকে। খেয়ে খেয়ে গলায় আটকে ওরা মরুক, আমি নিজের বাড়ি চললাম। শয়তান কোথাকার! বোকাসোকা আর একটা কাউকে পারলে ধরে নিয়ে আসুন গে!'

বুড়ো কর্তা জীবনে কখনো তার ছেলেমেয়েদের শাস্তি দেয়নি, গালাগালি করেনি। ভাবতেও পারেনি কখনো তারই সংসারের কেউ কোনোদিন তার মুখের ওপর মুখঝামটা দেবে, তাকে অসম্মান করবে। এ ঘটনায় সে এমন ভয়

পেল যে ঘরের মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে রইল একটা দেরাজের পেছনে। আর বিমূঢ় হয়ে গেল ভারভারা। ওঠবার শক্তি পর্যন্ত সে হারিয়ে ফেলে শুধু হাতটা এমন ভাবে নাড়তে লাগল যেন কোনো একটা মাছি তাড়াতে চাইছে।

আতঙ্কে সে বিড়বিড় করে কেবল বলতে লাগল, 'এ সব কী হচ্ছে, কী হচ্ছে এসব? অমনি করে চিৎকার করে নাকি কেউ? লোকে শুনতে পাচ্ছে যে! একটু আস্তে বললে কী হয়... একটু আস্তে!'

আকসিনিয়া চেঁচিয়েই গেল: 'ওই কয়েদীর বৌটাকে আপনি বুতেকিনো লিখে দিয়েছেন! দিন না, দিন, সবকিছু ওকেই দিন! আপনার কাছ থেকে এক পয়সাও আমার দরকার নেই! আপনারা গুষ্টিশুদ্ধ মরুন! চোরের ঝাড় সবাই! ঢের দেখেছি আমি, দেখে দেখে চোখ পচে গেল! রাস্তার লোক, পথিকদের গলা কাটেন আপনারা, বদমাইস কোথাকার, ছেলে হোক বুড়ো হোক, কাউকে ছাড়েন না! বিনা লাইসেন্সে বেআইনী ভদকা বেচে কে? জাল টাকা কে চালাচ্ছে? জাল টাকায় সিন্দুক তো ভর্তি করে ফেলেছেন—এখন আর আমাকে কী দরকার!'

হাট করে খোলা ফটকটার সামনে ইতিমধ্যে একটি ভিড় জমে উঠেছে। অন্দরের দিকে উঁকিঝুঁকি দেওয়া শুরু হয়ে গেছে।

আকসিনিয়া চিৎকার করে বলল, 'দেখুক সবাই! রাজ্যের লোকের সামনে হাটে হাঁড়ি ভাঙব! অপমানে জ্বলে পুড়ে মরবে! আমার পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে! এই, স্তেপান!' কালা লোকটাকে আকসিনিয়া ডাক দিল, 'এক্ষুনি চলো আমার সঙ্গে। বাপের বাড়ি নিয়ে চলো আমাকে! চোর জোচ্চোরদের সঙ্গে আমি আর থাকছি না। যা আছে বাঁধাছাঁদা করে নাও।'

দড়িতে মেলে-দেওয়া কাপড় শুকোচ্ছিল উঠোনের ওপর। সেখান থেকে আকসিনিয়া তার ভিজে বডিস্ আর পেটিকোট টান মেরে খসিয়ে এনে গুঁজে দিল কালার হাতের মধ্যে। তারপর ক্ষেপার মতো দাপাদাপি করে বেড়াল সারা আঙিনা। যা পেলে সবকিছু টেনে টেনে আনল, আর যে জিনিসগুলো ওর নিজের নয় সেগুলোকে সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে গেল।

ভারভারা বিলাপ করে উঠল, 'মা গো মা, ওকে থামাও কেউ তোমরা! একী হল ওর, যীশুর দোহাই, বুতেকিনোটা ওকেই দিয়ে দাও বাপু!'

ফটকের সামনে লোকগুলো বলাবলি করল, 'কী মাগী রে বাবা! এমন মেজাজ আর কখনো দেখিনি।'

আকসিনিয়া দাপিয়ে এসে ঢুকল রান্নাঘরে। রান্নাঘরে কাপড় সিদ্ধ করা হচ্ছিল। রাঁধুনী কাপড় ধুতে চলে গিয়েছিল নদীতে। ভেতরে একলা বসে বসে ধোয়াধুয়ি করছিল লিপা। উনুনের সামনে একটা ভাঁটি আর একটা কাপড় ধোয়া গামলা থেকে ধোঁয়া উঠে ঘরখানাকে ঝাপসা আর গুমোট করে তুলেছে। মেঝের ওপর একগাদা আ-কাচা কাপড় স্তূপ হয়ে আছে। আর তার পাশেই একটা বেঞ্চির ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে নিকিফরকে, যাতে ওখান থেকে পড়ে গেলেও না লাগে। রোগা রোগা লাল লাল পা ছুঁড়ে খেলা করছে নিকিফর। আকসিনিয়া যখন রান্নাঘরে ঢুকল তখন লিপা কাপড়ের স্তূপ থেকে তার একটা শেমিজ টেনে এনে গামলার মধ্যে গুঁজল, তারপর টেবিলের ওপর যে ফুটন্ত জল রাখা হয়েছিল সেইটের দিকে হাত বাড়াল...

গামলা থেকে আকসিনিয়া তার শেমিজটা ছিনিয়ে নিয়ে তীব্র ঘৃণায় তাকাল লিপার দিকে, 'ওটা ছেড়ে দাও! আমার কাপড় তোমাদের ছুঁতে হবে না। কয়েদীর বৌ তুমি—কার কি শোভা পায় সেটা জেনে রেখে দিয়ো।' স্তম্ভিত লিপা হাঁ করে চেয়ে রইল ওর দিকে। কিছুই মাথায় ঢুকছিল না তার। হঠাৎ তার নজরে পড়ল আকসিনিয়া কী রকম করে যেন চেয়ে আছে ছেলেটার দিকে। হঠাৎ জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে আর আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেল লিপা।

'আমার জমি চুরি করার ফল ভোগো এবার।' এই কথা বলে আকসিনিয়া গামলাভর্তি ফুটন্ত জল ঢেলে দিল নিকিফরের ওপর।

একটা চিৎকার শোনা গেল শুধু—উকলেয়েভো গ্রামে এরকম চিৎকার আর কখনো কেউ শোনেনি। লিপার মতো অমন নরম পলকা একটা শরীর থেকে অমন চিৎকার উঠতে পারে তা বিশ্বাসই হয় না। আর তারপর সারা আঙিনা জুড়ে নেমে এল একটা নিথর স্তব্ধতা। নিঃশব্দে আকসিনিয়া ঘরের ভেতর চলে গেল। মুখে তার সেই অদ্ভুত নিরীহ একটা হাসি... ভেজা জামাকাপড় হাতে নিয়ে কালা লোকটাও এতক্ষণ পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল। এবার সেগুলোকে সে নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে মেলে দিতে শুরু করল আবার। আর নদীর ঘাট থেকে রাঁধুনীটা না ফেরা পর্যন্ত রান্নাঘরে ঢুকে কী হচ্ছে দেখার সাহস হল না কারুর।

৮

নিকিফরকে নিয়ে যাওয়া হল জেমস্তভো হাসপাতালে। সন্ধ্যার দিকে সে মারা গেল। বাড়ির গাড়ির জন্য লিপা অপেক্ষা করেনি। সে তার মরা ছেলেকে কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে গেল।

হাসপাতালটা পাহাড়ের ওপরে। নতুন তৈরি, জানলাগুলো বেশ বড়ো বড়ো। ঢলে পড়া সূর্যের রোদে জ্বলছিল, যেন আগুন লেগেছে। নিচে এলিয়ে আছে গ্রামখানা। রাস্তা দিয়ে নেমে লিপা গাঁয়ে ঢোকার ঠিক আগে একটি পুকুরের পাড়ে গিয়ে বসে রইল। একটা ঘোড়াকে জল খাওয়ানোর জন্যে নিয়ে এসেছিল একটি মেয়ে। ঘোড়াটা জল খেতে চাইছিল না।

মেয়েটা যেন অবাক হয়ে বলল, 'জল খেলি না কেন? কী হল?'

জলের ঠিক ধারে লাল সার্ট পরা একটা ছেলে তার বাপের বুটজুতো পরিষ্কার করছিল উবু হয়ে বসে। এ ছাড়া আর একটি লোকও চোখে পড়ে না, না গাঁয়ের মধ্যে, না পাহাড়ের গায়ে।

ঘোড়াটার দিকে নজর করে লিপা বলল, 'ও খাবে না...'

মেয়েটা আর বুট হাতে-করা ছেলেটা দুজনেই চলে যাবার পর আর একটা লোককেও দেখা গেল না কোথাও। সিঁদুরে সোনালীতে গাঁথা এক উদার শয্যায় সূর্য গা এলিয়েছে। লাল আর বেগুনী রঙের লম্বা লম্বা মেঘের সারি আকাশ জুড়ে তাকিয়ে আছে তার ঘুমের দিকে। অনেক দূরে, কোথা থেকে কে জানে, একটা বক ডাকছিল। মনে হচ্ছিল যেন গোয়ালে বাঁধা কোনো গরুর ভাঙা ভাঙা বিষণ্ণ হাম্বারব। প্রতি বছর বসন্তে এই অদ্ভুত পাখিটার ডাক শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেউ জানে না, পাখিটা দেখতে কেমন, কোথায় বাসা। পাহাড়ের মাথায়, হাসপাতালের পাশে, পুকুর পাড়ের ঝোপঝাড়গুলোর মধ্যে আর সারা মাঠ জুড়ে নাইটিঙ্গেল পাখির গান শোনা যাচ্ছে। কোকিলগুলো যেন কারো বয়স গুনতে বসে বার বার ভুল করে বসছে তারপর আবার শুরু করছে প্রথম থেকে গুনতে। রূঢ় রুষ্ট গলায় পরস্পরকে ডাকাডাকি শুরু করেছে পুকুরের ব্যাঙগুলো — যেন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তাদের কথা:

'ঈ তি তাকভা, ঈ তি তাকভা।'* চারিদিকে শব্দের রাজ্য। মনে হয় বুঝি

---

* তুইও সমান পাজী।

ওরা সবাই যেন গান আর চীৎকার শুরু করেছে ইচ্ছে করে, যাতে এই বসন্তের রাত্রে কেউ না ঘুমিয়ে পড়ে, যাতে সকলেই এমনকি বদরাগী ব্যাঙগুলোও এ রাতের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে উপভোগ করে নিতে পারে: কেননা জীবন তো আমাদের এই একটাই!

তারাভরা আকাশে চাঁদ উঠল বাঁকা, রুপালী। কতোক্ষণ পুকুরের পাড়ে বসেছিল সে, খেয়াল ছিল না লিপার। উঠে যখন সে হাঁটতে শুরু করল তখন দেখা গেল গাঁয়ের সকলেই শুয়ে পড়েছে, আলোগুলো নিভে গেছে। এ গাঁ থেকে উকলেয়েভো সম্ভবত বারো ভের্স্ট দূরে; বড়ো কাহিল লাগছিল লিপার, পথ খুঁজে বার করার ইচ্ছেটুকুও তার আর ছিল না। চাঁদটা কখনো তার সামনে পড়ছে, কখনো বাঁয়ে কখনো ডাইনে, আর কোকিলটা যেন ডেকে ডেকে গলা ভেঙে ফেলেছে। আর ভাঙা গলাতেই হেসে হেসে টিটকিরি দিয়ে চেঁচিয়ে চলেছে: 'পথ ভুলো, পথ ভুলো!' লিপা জোরে জোরে হাঁটার চেষ্টা করল। মাথার ওড়নাটা তার হারিয়ে গেল কখন ... আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে সে ভাবছিল, তার ছেলের আত্মা এখন না জানি কোথায়। সে কী তার মায়ের পিছু পিছুই আসছে? নাকি তার মাকে ভুলে গিয়ে অনেক উঁচুতে ভেসে গেছে তারাগুলোর কাছে? কী নিঃসঙ্গ এই রাতের মাঠ, যখন চারিদিকের এই সঙ্গীতের মাঝখানে তোমার উপায় নেই গাইবার, যখন এই অবিরত হর্ষধ্বনির মাঝখানে তোমার আনন্দ নেই, যখন আকাশ থেকে তোমার মতোই নিঃশব্দ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে চাঁদ, বসন্তই হোক আর শীতই হোক, লোকে বেঁচেই থাক কি মরেই যাক, কিছুতেই যার কিছু যায় আসে না... মন যখন দুঃখে ভরে ওঠে তখন একলা থাকা বড়ো কষ্টের। শুধু যদি একবার তার মাকে, কি 'পেরেক'কে কি রাঁধুনীকে কি যা হোক কাউকে এখন কাছে পেত লিপা।

'বু-উ-উ!' বক ডাকল, 'বু-উ-উ!'

হঠাৎ পরিষ্কার শোনা গেল একটি মানুষের কণ্ঠস্বর:

'চলে আয়, ভাভিলা, ঘোড়াটাকে জোত।'

খানিকটা দূরে, রাস্তার ঠিক পাশেই আগুন জ্বালানো হয়েছিল। শিখাগুলো নিভে এসেছে এখন শুধু অঙ্গারগুলো জ্বলছে। ঘোড়ার দানা চিবুনোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। অন্ধকারে ঠাহর করা গেল দুটো গাড়ি, একটার ওপর ব্যারেল চাপানো; অন্যটা নিচু, বস্তায় ভর্তি। দুটো লোককেও ঠাহর

করা গেল, তাদের একজন গাড়ির কাছে ঘোড়াটাকে নিয়ে যাচ্ছে। অন্য লোকটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আগুনটার সামনে, হাত দুটো তার পেছন দিকে ধরা। গাড়িগুলোর কাছে কোথা থেকে একটা কুকুর গোঁ গোঁ করে উঠল। যে লোকটা ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছিল সে থেমে বলল:

'রাস্তা দিয়ে কেউ বোধ হয় আসছে।'

অন্য লোকটা কুকুরকে ধমক দিল, 'চুপ চুপ করো, শারিক!'

গলা শুনে বোঝা যায় লোকটা বুড়ো। লিপা দাঁড়িয়ে পড়ে বলল:

'ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।'

বুড়ো লোকটা লিপার কাছে এগিয়ে গেল কিন্তু প্রথমটা কিছু বলল না। পরে শুধু বলল:

'শুভ সন্ধ্যা!'

'তোমার কুকুরটা কামড়াবে না তো, দাদু?'

'না, না, পেরিয়ে যাও, কিছু বলবে না।'

একটু থেমে লিপা বলল, 'হাসপাতালে গিয়েছিলাম। আমার কচি ছেলেটা মারা গেল। ওকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।'

লিপার কথায় বেশ বোঝা গেল বুড়ো লোকটা বিচলিত হয়ে পড়েছে। লিপার কাছ থেকে সরে সে তাড়াতাড়ি বলল:

'ভেবে কী হবে বাছা, ভগবানের ইচ্ছা।' তারপর তার সঙ্গীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল, 'কী হল হে! জলদি করো না কেন?'

ছোঁড়াটা জবাব দিল, 'তোমার জোয়ালটা কোথায়,পাচ্ছি না বাপু।'

'কোনো কম্মের নোস তুই, ভাভিলা!'

একটা পোড়া কাঠকয়লা তুলে নিয়ে বুড়োটা ফুঁ দিতে লাগল। তাতে ওর চোখ আর নাকের ওপরটা আলো হয়ে উঠল খানিকটা। জোয়ালটা খুঁজে পাওয়া যাবার পর বুড়ো লিপার কাছে সরে এসে তাকিয়ে দেখল। কাঠকয়লাটা তখনো তার হাতে ধরা। বুড়োর চাউনিতে অনুকম্পা আর কোমলতা মেশা।

বলল, 'তুমি মা হয়েছো। সব মাই তার সন্তানকে ভালোবাসে।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাথা ঝাঁকালো বুড়ো। আগুনের মধ্যে কী একটা ঢেলে ভাভিলা পা দিয়ে মাড়িয়ে নিবিয়ে ফেলল আগুনটা। সঙ্গে সঙ্গে

চারিদিক ভরে উঠল নিবিড় অন্ধকারে। চোখে আর কিছুই দেখার উপায় রইল না, শুধু আবার ফিরে এল সেই মাঠ, সেই তারাভরা আকাশ, সেই মুখর পাখিপাখালি যারা পরস্পর পরস্পরকে জাগিয়ে রেখেছে। আর যেখানটায় আগুন জ্বালানো হয়েছিল মনে হল যেন ঠিক সেইখানটাতেই এসে কাঁদতে শুরু করেছে একটা ল্যান্ড্রেল।

মিনিট দুয়েক পরে অবশ্য গাড়ি দুটো, বুড়ো আর ঢ্যাঙ্গা ভাভিলাকে দেখতে পাওয়া গেল আবার। গাড়ি দুটোকে টেনে রাস্তায় আনার সময় চাকাগুলো ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল।

লিপা জিগ্যেস করল, 'তোমরা কি সাধু সন্ন্যাসী কিছু বটে?'

'না বাছা। আমরা থাকি ফিরসানভোতে।'

'তুমি তখন আমার দিকে এমন করে চেয়েছিলে যে আমার বুকটা জুড়িয়ে গিয়েছিল। আর তোমার সঙ্গের ঐ ছেলেটিও ভারি শান্ত। তাই মনে হয়েছিল, হয়ত সাধু সন্ন্যাসী কেউ হবে বা।'

'তোমাকে কি অনেক দূর যেতে হবে?'

'যাবো উকলেয়েভোতে।'

'উঠে বসো তাহলে। কুজ্‌মিনকি পর্যন্ত তোমায় পেঁাছে দিতে পারি। সেখান থেকে আমরা বাঁয়ে বেঁকব। তুমি চলে যাবে সোজা।'

যে গাড়িটায় ব্যারেল চাপানো ছিল তাতে উঠল ভাভিলা। আর অন্য গাড়িটায় বুড়ো আর লিপা। গাড়ি চলল আস্তে আস্তে, ভাভিলার গাড়িখানা আগে আগে।

লিপা বলল, 'সারাদিন ছেলেটা যন্ত্রণা পেয়েছে। ওর সেই সুন্দর সুন্দর চোখ দিয়ে সে আমার দিকে এমন করুণ করে চাইছিল। মনে হচ্ছিল কী যেন বলতে চাইছে, পারছে না। হায় ভগবান, হায় মা দেব-জননী, শোকে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। ওর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, কখন টলে পড়ে গেছি। কেন বলো না, মরার আগে ওইটুকু একটা ছেলেকে অত কষ্ট কেন সইতে হয়। যারা বড়ো, মেয়ে হোক মরদ হোক, বড়োরা যখন কষ্ট পায় তখন তাদের পাপ খন্ডন হয়ে যায়। কিন্তু কোনো পাপ ও করেনি, ওইটুকুন একটা বাচ্চাকেও কেন অতো কষ্ট সইতে হয়, কেন?'

বুড়ো লোকটা বলল, 'কে জানে বাছা?'

আধঘণ্টাখানেক ধরে ওদের গাড়িটা চলল নিঃশব্দে।

বুড়ো বলল, 'কেন, কী জন্যে এর সব তো আর কেউ জানতে পারে না। পাখির পাখা দুটো মাত্র, চারটে নয়, কেননা দুটো পাখাতেই ওরা উড়তে পারে। তেমনি যতো কিছু জানা উচিত ভগবান মানুষকে তা সব জানতে দেননি, তার অর্ধেক কি সিকি ভাগই শুধু সে জানতে পারে। জীবন কেটে যাবার জন্য যেটুকু জানা দরকার সে সেইটুকু জানে।'

'হাঁটলে বোধ হয় একটু ভালো লাগত আমার। ঝাঁকুনিতে বুকটা কেমন করছে।'

'ও কিছু না, বসে থাকো চুপ করে।'

বুড়ো হাই তুলল, মুখের ওপর ক্রুসের চিহ্ন আঁকল।

আবার বলল, 'কিছু ভেবো না মা। তোমার শোক তো কেবল অল্প শোক। জীবন অনেক বড়ো, আরো কতো ভালোমন্দ ঘটবে জীবনে।' তারপর রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠল, 'হায় গো মা রাশিয়া! রাশিয়ার সব জায়গায় আমি গেছি, দেখার যা আছে সব আমি দেখেছি, আমাকে বিশ্বাস করো, বাছা। সুখও আছে দুঃখও আছে। সারা পথ আমি পায়ে হেঁটে গিয়েছিলাম সাইবেরিয়াতে। আমুর নদী দেখে এসেছি, দেখেছি আলতাই পাহাড়। সাইবেরিয়াতে বাসা বেঁধে জমি চাষ শুরু করেছিলাম। তারপর রাশিয়া মায়ের জন্যে মন কেঁদে উঠল। নিজের গাঁয়ে আবার ফিরে এলাম। পায়ে হেঁটে ফিরছিলাম—ফেরি নৌকোয় করে একটা নদী পার হচ্ছিলাম আমরা, বেশ মনে আছে। আমার চেহারা হয়েছিল কাঠির মতো সরু, ছেঁড়াখোঁড়া পোষাক, পায়ে জুতো পর্যন্ত নেই। ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি, রুটির টুকরো পেলে তাই চুষে চুষে খিদে মেটাচ্ছি। ফেরি নৌকোতে একটি ভদ্রলোক ছিলেন—কে জানে বেঁচে আছেন কিনা। না থাকলে ভগবান তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন! তা সেই ভদ্রলোকটি আমার দিকে চেয়েছিলেন, দয়ায় তাঁর চোখ বেয়ে জল পড়তে শুরু করল। বললেন, "তোমার রুটিটাও কালো, জীবনটাও কালো..." তারপর ফিরে এলাম যখন, না ছিল একটা ঘর না একটা দোর। এক বৌ ছিল, তা সাইবেরিয়াতে তাকে মাটি চাপা দিয়ে ফিরে এসেছি গাঁয়ে। তাই দিনমুনিষী করতে শুরু করলাম। তারপর জানো বাছা, দুঃখও ছিল, সুখও ছিল। এখন বাছা, আমি মরতে চাই না, আরো কুড়ি বছর পারলে বাঁচি। তাই

বলছি, দুঃখের চেয়ে সুখই বেশি। আহ্‌ দ্যাখো, দ্যাখো, কী মস্ত আমাদের রাশিয়া মা!' এপাশে ওপাশে আর পেছনে তাকিয়ে তাকিয়ে লোকটা আবার বলল কথাটা।

লিপা শুধালো, 'আচ্ছা, মারা যাবার পর আত্মাটা কতো দিন পর্যন্ত এই পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে, জানো দাদু?'

'কে জানে বাপু। আচ্ছা রোসো, ভাভিলাকে জিগ্যেস করি। ও ইস্কুলে পড়েছে — ইস্কুলে আজকাল সবকিছু শিখিয়ে দেয়। ভাভিলা!'

'এ্যাঁ?'

'আচ্ছা ভাভিলা, কেউ মারা গেলে তার আত্মা কতো দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে?'

ভাভিলা ঘোড়াটাকে আগে দাঁড় করালো। তারপর জবাব দিল, 'ন' দিন। কিন্তু আমার খুড়ো কিরিলা মারা যাবার পর তার আত্মাটা আমাদের কুঁড়েতে তেরদিন অবধি ছিল।'

'কে বললে?'

'হ্যাঁ। তের দিন ধরে উনুনের মধ্যে খসখস শব্দ হত।'

বুড়ো বলল, 'খুব হয়েছে, গাড়ি হাঁকাও,' বোঝা গেল ওর একটি কথাও সে বিশ্বাস করেনি।

কুজ্‌মিনকির কাছে এসে গাড়িগুলো বড়ো রাস্তা ধরল। লিপা হেঁটে যেতে লাগল। অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছিল। ঢালুতে যখন সে নামছিল তখন উকলেয়েভোর গীর্জা আর ঘরবাড়িগুলো সব কুয়াসায় ঢাকা পড়ে আছে। শীত করছে বেশ। লিপার মনে হল যেন সেই কোকিলটাই এখনো ডেকে চলেছে।

লিপা যখন বাড়ি পেঁছিল তখনও গরু চরাতে নিয়ে যাওয়া হয়নি। সকলে ঘুমুচ্ছে। বারান্দায় বসে বসে সে অপেক্ষা করতে লাগল। সবার আগে বাইরে বেরিয়ে এল বুড়ো কর্তা। লিপার ওপর চোখ পড়তেই তার আর বুঝতে কিছু বাকি রইল না। কয়েক মুহূর্তের জন্যে থ হয়ে দাঁড়িয়ে সে জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল।

অবশেষে সে বলল, 'আঃ লিপা, আমার নাতিটিকে তুমি রাখতে পারলে না...'

ভারভারাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হল। হাত ছুঁড়ে সে কাঁদল, তারপর কফিনের জন্য মরা ছেলেটিকে সাজাতে বসল।

ভারভারা বলে যেতে লাগল, ‘কী সুন্দর ছিল ছেলেটা... তোর এই একটিই ছেলে বোকা মেয়ে, তাও রাখতে পারলি না!’

সকাল আর সন্ধ্যায় অন্ত্যেষ্টির ক্রিয়াকর্ম হল দু বার করে। কবর দেওয়া হল পরের দিন। কবর দেওয়ার পর পাদ্রী আর নিমন্ত্রিতেরা এমন হ্যাংলার মতো ভোজ্যবস্তু সংকার শুরু করল যে মনে হল যেন কতো দিন ধরে ওদের খাওয়া জোটেনি। লিপা পরিবেশন করছিল টেবিলে। একটা ব্যাঙের ছাতার আচার কাঁটায় তুলে নিয়ে পাদ্রী তাকে বলল:

‘বাচ্চাটার জন্যে দুঃখু করো না মা। ওপারে যে স্বর্গরাজ্য আছে সেখানে শুধু ওরাই তো যাবে।’

সকলে চলে যাবার পরে এতক্ষণে লিপা সত্যি সত্যি টের পেল নিকিফর নেই, নিকিফর আর ফিরবে না। আর টের পেয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। কোন ঘরে গিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে তা জানা ছিল না তার। সে বেশ অনুভব করছিল তার ছেলেটি মারা যাবার পর এ বাড়িতে তার আর কোনো জায়গা নেই, এখানে আশা করার কিছু নেই তার, সে অবাঞ্ছিত। আর সকলে যেন সে কথা টের পেয়ে গেছে।

দোরগোড়ায় হঠাৎ এসে হাজির হল আকসিনিয়া, অন্ত্যেষ্টির উপলক্ষ্যে সে আগাগোড়া নতুন পোষাক পরেছে, পাউডার লাগিয়েছে মুখে। সে চিৎকার করে বলল, ‘বা বেশ, এখানে এসে মরাকান্না জুড়েছো দেখছি। চুপ করো!’

কান্না থামাবার চেষ্টা করতে গিয়ে কেবল হুহু করে আরো কেঁদে উঠল লিপা।

রাগে পা ঠুকে আকসিনিয়া চেঁচাল, ‘কানে ঢুকছে না? এখান থেকে সরে পড়ো, এবাড়িতে আর মুখ দেখাতে এসো না, কয়েদীর বউ! যাও, বেরোয়!’

বুড়ো কর্তা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, ‘আঃ, ছেড়ে দাও আকসিনিয়া, একটু চুপ করো, বাছা... একটু কাঁদবেই তো... কোলের ছেলে মারা গেল...’

‘কাঁদবে! কাঁদবেই তো!’ ব্যঙ্গ করে উঠল আকসিনিয়া, ‘আজ রাত্রিটা থাক, কিন্তু কাল সকালে ওকে পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে ভাগতে হবে। কাঁদবে!’ মুখে হাসি নিয়ে আকসিনিয়া পা বাড়াল দোকানের দিকে।

পরদিন ভোরে লিপা চলে গেল তরগুয়েভোতে, তার মায়ের কাছে।

৯

দোকানের লোহার কবাট আর চালায় আবার টাটকা রঙ পড়ে নতুনের মতো চকচক করে আজকাল, বাড়ির জানলায় সুন্দর জেরানিয়াম ফোটে ঠিক আগের মতোই। ৎসিবুকিনদের সংসারে তিন বছর আগে কী ঘটেছিল তা এখন প্রায় ভুলে গেছে সবাই।

বুড়ো মানুষ গ্রিগরি পেত্রোভিচ্‌কেই এখনো বাড়ির কর্তা বলে ধরা হয়, কিন্তু আসলে সব কিছু চলে গেছে আকসিনিয়ার হাতে। কেনা বেচা যা করার সেই করে, তার মত ছাড়া কিছুই হয় না। ইঁটখোলার কারবারটা ভালোই চলছে, রেলওয়ের জন্যে ইঁটের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় দাম চড়ে গেছে চব্বিশ রুবলে হাজার। গাঁয়ের মেয়ে বৌয়েরা ইঁট বয়ে নিয়ে গিয়ে স্টেশনে মালগাড়ি ভর্তি করে দেয় আর মজুরি পায় পঁচিশ কোপেক রোজ।

খ্রিমিনদের সঙ্গে অংশীদারিতে ঢুকেছে আকসিনিয়া। কারখানাটার নাম হয়েছে এখন 'খ্রিমিন জুনিয়ার এণ্ড কোং'। স্টেশনের কাছেই খুলেছে একটা সরাইখানা—সেই দামী হারমনিয়ামের বাজনাটা এখন আর কারখানায় শোনা যায় না, শোনা যায় সরাইখানাটাতে। সরাইখানাটায় যাতায়াত করে স্টেশন মাস্টার আর পোস্ট মাস্টার। পোস্ট মাস্টার নিজেও একটা ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। খ্রিমিন ছোটো তরফেরা একটা সোনার ঘড়ি দিয়েছে কালা স্তেপানকে। ঘড়িটা সে অনবরত পকেট থেকে বার করে কানের কাছে এনে ধরে।

গাঁয়ের লোকে বলে আকসিনিয়ার ক্ষমতা খুব বেড়ে গিয়েছে। কথাটা সত্যিই হবে। কেননা সকালে যখন সে গাড়ি হাঁকিয়ে কারখানায় যায় আর সুখ উপচে পড়া সুন্দর চেহারায় তার সেই নিরীহ হাসি মুখে সারাদিন ধরে যখন সে চারপাশের লোককে হুকুম করে বেড়ায় তখন তার ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। বাড়ির লোকই বলো, কি গাঁয়ের লোক কি কারখানার লোক, তাকে ভয় করে সবাই। আর যখন সে পোস্ট আপিসে এসে হাজির হয়, পোস্ট মাস্টার লাফিয়ে উঠে বলে:

'বসুন বসুন, ক্সেনিয়া আব্রামভনা, বসুন।'

একদিন এক বয়স্ক জমিদার তাকে একটা ঘোড়া বিক্রি করতে এসেছিল।

লোকটা ভয়ানক বাবু, গায়ে চমৎকার কাপড়ের একটা কোট, পায়ে পেটেন্ট লেদারের টপ বুট। আকসিনিয়ার কথাবার্তায় লোকটা এমন মোহিত হয়ে গেল যে আকসিনিয়া যে দরে চাইলে সেই দরেই ঘোড়াটা ছেড়ে দিল। আকসিনিয়ার হাতখানা সে অনেকক্ষণ ধরে নিজের হাতের মধ্যে ধরে রেখে তার উজ্জ্বল, নিরীহ, চালাক চোখ দুটোর দিকে চেয়ে বলল:

'আপনার মতো একটি মেয়ের জন্য আমি সবকিছু করতে পারি, ফ্রেনিয়া আব্রামভনা। কবে আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে, কেউ যখন আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না?'

'যখন আপনার খুশি!'

তারপর থেকে প্রায় প্রত্যেকদিনই দেখা যেত বয়স্ক বাবুটি গাড়ি হাঁকিয়ে দোকানে আসছে বিয়ার খেতে। বিয়ারটা জঘন্য, তিতকুটে। জমিদার বাবু কিন্তু তাই খেয়ে নিত মাথা ঝাঁকিয়ে।

ব্যবসার ব্যাপারে ৎসিবুকিন বুড়ো আর কোনো হস্তক্ষেপ করত না। নিজের পকেটে সে কোনো টাকাপয়সা রাখত না আর। কোনটা খাঁটি কোনটা জাল তা কিছুতেই ঠাহর করতে পারত না সে। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো কথা সে কাউকে বলেনি, তার এই অক্ষমতাটা কেউ জানুক, তা ও চাইত না। ভয়ানক অন্যমনস্ক হয়ে গেছে সে, সামনে খাবার ধরে না দেওয়া পর্যন্ত খাবারের কথাও মনে থাকে না তার। ওকে ছেড়েই খেতে বসার চল হয়ে গেছে বাড়িতে। কেবল ভারভারা মাঝে মাঝে বলে:

'না খেয়েই ও আবার শুয়ে পড়েছে।'

বলে অবশ্য নিতান্ত নিরুদ্বেগে, কেননা ঐ ব্যাপারটা অভ্যেস হয়ে গেছে তার। শীত গ্রীষ্ম সব সময়েই বুড়ো তার ফার কোটখানি গায়ে দিয়ে বাইরে ঘোরে, কেবল অত্যন্ত গরম পড়লে বাড়িতে থাকে। গাঁয়ের রাস্তাতেই সাধারণত হাঁটা চলা করতে দেখা যায় তাকে। শীতের কোটটির কলার তুলে দিয়ে চলেছে স্টেশনের দিকে, নয়ত সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে আছে গীর্জার ফটকের সামনে একটি বেঞ্চিতে। বসে থাকে একেবারে নিথর হয়ে। রাস্তা দিয়ে যারা যায় তারা নমস্কার জানায়, কিন্তু নমস্কার সে ফিরিয়ে দেয় না কখনো, চাষাদের সম্পর্কে বিতৃষ্ণাটা তার এখনো বজায় আছে। কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তার উত্তর যে অমায়িক আর যুক্তিসঙ্গত হয় না তা নয়, কিন্তু ভারি সংক্ষিপ্ত।

গাঁয়ের লোকে বলে ওর ব্যাটার বৌ তাকে তার নিজের বাড়ি থেকেই বার করে দিয়েছে, খেতে দেয় না। বুড়ো যেন ভিক্ষে করে চালায়। এ গুজব শুনে কেউ কেউ খুশি হয়, কেউ কেউ দুঃখ করে লোকটার ভাগ্য দেখে।

ভারভারা আরো মোটা হয়েছে, গায়ের রঙ হয়েছে আরো ফর্সা। এখনও সে দানধর্ম করে বেড়ায়, আকসিনিয়া বাধা দেয় না। প্রতি বছর গ্রীষ্মে সে এত বেশি করে জ্যাম বানায় যে পরের বছর বেরিফল পেকে গেলেও তা খেয়ে ফুরানো যায় না। ফলে জ্যামগুলো শক্ত হয়ে যায় আর ভারভারার চোখে প্রায় জল এসে পড়ে — ওগুলো নিয়ে কী করা যাবে ভেবে পায় না সে।

আনিসিমের কথা লোকে ভুলতে শুরু করেছে। একদিন তার কাছ থেকে একটি চিঠি এল পদ্য করে মেলানো, মস্ত বড়ো একখান কাগজে সেই চমৎকার হস্তাক্ষরে আবেদন পত্রের মতো করে লেখা। বোঝা গেল তার সেই বন্ধু সামরোদভও ওর সঙ্গেই জেল খাটছে। পদ্যের নিচে কদর্য, প্রায় অপাঠ্য হিজিবিজিতে লেখা: 'আমার অসুখ করেছে, সর্বক্ষণ কষ্ট পাইতেছি, খৃষ্টের দোহাই কিছু সাহায্য পাঠাইয়ো।'

একদিন রোদ্দুরে ভরা শরতের বিকেলে বুড়ো ৎসিবুকিন গীর্জার সামনে বসেছিল। গরম কোটের কলারটা উলটিয়ে দেওয়ায় তার নাকের ডগাটুকু আর টুপির সামনেটা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। লম্বা বেঞ্চিটার অন্য প্রান্তে বসে ছিল ঠিকাদার ইয়েলিজারভ আর বছর সত্তর বয়সের ফোগলামুখো ইস্কুলের চৌকিদার ইয়াকভ। 'পেরেক' আর চৌকিদার কথা কইছিল।

ইয়াকভ বলল বিরক্তভাবে, 'সন্তানের কর্তব্য বুড়োদের পালন করা... পিতামাতাকে ভক্তি করা। কিন্তু ঐ মেয়েটা, ওর ব্যাটার বৌ শ্বশুরকে তারই বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে। বুড়ো মানুষটা না পায় দুটো খেতে পরতে, না আছে যাবার মতো কোনো জায়গা। তিনদিন ধরে কিছুই খায়নি ও।'

'তিন দিন!' 'পেরেক' চেঁচিয়ে উঠল।

'হ্যাঁ। আর ওইখানে ও বসেই আছে। কোনো কথাও বলে না। কথা বলার সামর্থ্যই নেই। কী হবে রেখে ঢেকে। ব্যাটার বৌয়ের নামে ওর মামলা আনা উচিত — আদালতে মাগীটার শাস্তি হয়ে যাক।'

'আদালতে কী হবে বললে?' চৌকিদারের কথাগুলো ঠিক শুনতে না পেয়ে জিগ্যেস করল 'পেরেক'।

'কী বললে?'

'মেয়েটা নেহাৎ খারাপ নয়, খাটে খুব। তবে বলছি কি, ওই ছাড়া... মানে একটু আধটু ব্যভিচার না করে তো মেয়েরা চলতে পারে না...'

ইয়াকভ বলল রাগতভাবে, 'তাই বলে নিজের বাড়ি থেকেই বার করে দেবে লোককে! আগে নিজের একটা বাড়ি করুক, তারপর সেখান থেকে যেন বার করে দেয়। ও নিজেকে কী ভেবেছে? রাক্ষুসী কোথাকার!'

ৎসিবুকিন ওদের কথাবার্তা শুনেও একটু নড়ল না।

'বাড়িখানা যদি একটু গরম থাকে আর মেয়েগুলো ঝগড়া না করে তাহলে বাড়িটা তোমার নিজের কি পরের তাতে কী এসে যায় বলো ...' 'পেরেক' নিজের মনে হাসল। 'যখন জোয়ান ছিলাম, তখন আমার বৌ নাসতাসিয়াকে বেশ লাগত। বেশ শান্ত শিষ্ট ছিল মেয়েটা। আর কেবল ঘ্যান ঘ্যান করে লাগত আমার পেছনে, "একটা ঘর কেনো মাকারিচ, একটা বাড়ি কেনো। একটা ঘোড়া কেনো!" যখন মরছে তখনো সে বলেছে, "নিজের জন্যে একটা দ্রজ্‌কি কেনো, মাকারিচ, পায়ে হেঁটে আর কতো বেড়াবে।" আর আমি ওর জন্যে যা কিনেছি সে কেবল ওই মশলাদার বিস্কুট, বাস আর কিছু নয়।'

পেরেকের কথায় কান না দিয়েই ইয়াকভ বলে চলল, 'মেয়েটার স্বামীটা কালা আর ন্যালাবোকা। একেবারে খাঁটি ন্যালাবোকা। একটা হাঁসের চেয়ে একছিটে বেশি বুদ্ধিও নেই ছোঁড়াটার। কিছু যদি মাথায় ঢোকে ওর! হাঁসের মাথায় বাড়ি মারলেও হাঁস বুঝতে পারে না কী হচ্ছে।'

কারখানায় তার আস্তানায় যাবার জন্যে 'পেরেক' উঠে দাঁড়াল। ইয়াকভও উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল একসঙ্গে কথা বলতে বলতে। ওরা যখন গোটা পঞ্চাশেক পা এগিয়ে গেছে তখন বুড়ো ৎসিবুকিনও উঠে দাঁড়িয়ে ওদের পেছু পেছু যেতে লাগল। যেতে গিয়ে পা টলছিল তার, যেন বরফের ওপর দিয়ে হাঁটছে।

গোধূলির আলোয় ভরে উঠতে শুরু করেছে গ্রামটা। সাপের মতো এঁকেবেঁকে যে রাস্তাটা চড়াই বেয়ে উঠে গেছে তার মাথায় এসে লেগেছে সূর্য। বন থেকে বুড়ির দল ফিরছে, তাদের পাশে ছুটে ছুটে চলেছে

ছেলেপিলেরা। সঙ্গে এদের ঝুড়ি ভর্তি ব্যাঙের ছাতা। স্টেশন থেকে বৌ-ঝিরা ফিরে আসছে। মালগাড়িতে ইঁট ভর্তি করার জন্যে ওরা গিয়েছিল। ওদের মুখে চোখে ইঁটের লাল লাল ধুলো লেগে আছে। গান গাইছে ওরা। তাদের সামনে আছে লিপা, গাইছে পঞ্চমে গলা তুলে আর আকাশের দিকে তাকিয়ে ঢেউ তুলছে সুরে। দেখে মনে হচ্ছে যেন সে খুশি হয়ে উঠেছে এই জন্যে যে ভগবানের দয়ায় দিনটা শেষ হল এবার, এবার বিশ্রামের সময়। তার মা, দিন মজুরণী প্রাস্কোভিয়া হাঁটছে দলের সঙ্গে মিশে, হাতে তার একটি পুঁটলি। যেমন চিরকাল হাঁপায়, তেমনি হাঁপাচ্ছে।

'পেরেক'কে দেখে লিপা বলল, 'নমস্কার মাকারিচ, ভালো আছো তো?'

'নমস্কার, লিপা, সোনা আমার!' পেরেক জবাব দিল খুশিতে।

'ওগো মেয়েমাগীরা, এই বড়োলোক ছুতোর মিস্ত্রিটার কথা একটু ভেবো! আহা রে, বাছারা সব!' ('পেরেক' ফুঁপিয়ে উঠল।) 'আমার দামী দামী কুড়ুল রে!'

'পেরেক' আর ইয়াকভ চলে গেল। সকলেই শুনতে পাচ্ছিল ওরা কথা কইতে কইতে যাচ্ছে। গোটা দলটার সম্মুখে এবার এসে পড়ল ৎসিবুকিন। হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল চারিদিকটা। লিপা আর তার মা ইতিমধ্যে পেছিয়ে গেছে দলের পেছন দিকে। বুড়ো লোকটা ওদের কাছাকাছি আসতে লিপা আভূমি নত হয়ে অভিবাদন করে বলল:

'নমস্কার গ্রিগরি পেত্রোভিচ!'

লিপার মাও অভিবাদন করল। বুড়ো দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে চেয়ে রইল ওদের দিকে। ঠোঁট দুটো কেঁপে গেল তার, চোখ ভরে উঠল জলে। লিপা তার মায়ের পুঁটলি থেকে এক টুকরো খাবার তুলে দিল বুড়ো মানুষটার হাতে। ও নিল, নিয়ে খেতে শুরু করল।

সূর্য ডুবে গিয়েছে। রাস্তার মাথাটাতেও আর এখন সূর্যাস্তের আভা নেই। অন্ধকার হয়ে আসছে। ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। লিপা আর প্রাস্কোভিয়া হাঁটতে শুরু করল তাদের গন্তব্যের দিকে। আর অনবরত ক্রুসচিহ্ন আঁকতে লাগল।

১৯০০

কনে

১

রাত দশটা বেজে গেছে, পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় আচ্ছন্ন বাগানটা। শুমিনদের বাড়িতে ঠাকুমা মারফা মিখাইলভনার কথা মতো সান্ধ্য উপাসনা এইমাত্র শেষ হল। নাদিয়া এক মুহূর্তের জন্য বাগানে সরে এসেছিল। সেখান থেকে সে দেখল খাবারঘরে আহার্য সাজানো হচ্ছে আর ঠাকুমা তার ঢেউ-খেলানো রেশমী পোশাকে ঘরে ব্যস্তসমস্ত ভাবে ঘোরাঘুরি করছেন। গীর্জার পাদ্রী ফাদার আন্দ্রেই কথা কইছেন নাদিয়ার মা নিনা ইভানভনার সঙ্গে। নিনা ইভানভনাকে জানালার মধ্য দিয়ে কৃত্রিম আলোয় কেন জানি না খুবই তরুণ দেখাচ্ছে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ফাদার আন্দ্রেইয়ের ছেলে আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ মনোযোগ দিয়ে শুনছে কথাবার্তা।

বাগানে শীতল নিস্তব্ধতা, প্রশান্ত ঘন ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে মাটিতে। বহুদূর থেকে, বোধহয় শহরের বাইরে, ব্যাঙের ডাকের অস্পষ্ট শব্দ আসছে। বাতাসে মনোরম মে মাসের আভাস। দীর্ঘশ্বাস টেনে মনে মনে কল্পনা করে নেওয়া যায় — শহর ছাড়িয়ে দূরে কোথাও আকাশের নীচে, বৃক্ষচূড়ার ঊর্ধ্বে, বনে প্রান্তরে বসন্তের জীবন জাগছে, জাগছে সেই রহস্যময় চিত্তহারী মাধুর্যের জীবন, সেই শুচিশুদ্ধ ঐশ্বর্যময় জীবন পৃথিবীর দুর্বল পাতকী, মানুষের কাছে দুর্বোধ্য। প্রায় কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে।

নাদিয়ার বয়স এখন তেইশ। ষোলো বছর বয়স থেকেই সে বিয়ের স্বপ্ন দেখছে গভীর আগ্রহে। এখন অবশেষে আন্দ্রেই আন্দ্রেইচের সঙ্গে, খাবারঘরে দাঁড়ানো ওই তরুণ পুরুষটির সঙ্গে তার বিবাহের বাগ্দান করা হল। তাকে পছন্দ হয়েছে নাদিয়ার। জুলাই মাসের সাত তারিখে বিয়ের দিন স্থির

হয়েছে। কিন্তু কোনো আনন্দ বোধ করছে না সে। ভালো ঘুম হচ্ছে না, সমস্ত ফূর্তি উল্লাস তাকে পরিত্যাগ করেছে ... মাটির নীচের রান্নাঘর থেকে খোলা জানালা দিয়ে তাড়াহুড়া ব্যস্ততার শব্দ, ছুরি কাঁটার ঝনঝনানি কানে আসছে। ভারী একটা ঝোলানো ভারে দরজাটা বন্ধ হয়। সেটা অনবরত দুমদাম করে বন্ধ হচ্ছে। টার্কির রোস্ট আর মসলাদার চেরির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আর মনে হচ্ছে, সবকিছু এমনি করেই, একটুও না বদলে চলতে থাকবে আবহমান কাল ধরে।

একজন লোক ঘর থেকে বেরিয়ে দেউড়িতে এসে দাঁড়াল। সে আলেক্সান্দ্র তিমফেইচ, ওরফে সাশা — যে নামে সবাই তাকে ডাকে; সে এসেছে মস্কো থেকে দিন দশেক আগে, বেড়াতে। অনেককাল আগে মারিয়া পেত্রোভনা নাম্নী এক দরিদ্র, ক্ষুদ্রকায়, শীর্ণ, রোগা ভদ্র বিধবা নাদিয়ার ঠাকুমার কাছে বেড়াতে আসতেন; ওঁরা ছিলেন দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। বিধবা আসতেন যৎসামান্য সাহায্যের প্রত্যাশায়। তাঁরই ছেলে সাশা। কেন কে জানে লোকে বলত সে একজন উঁচুদরের শিল্পী; তার মা মারা গেলে ঠাকুমা তাঁর নিজ আত্মার সদগতির জন্য তাকে পাঠিয়ে দিলেন মস্কোর কমিসারভ স্কুলে। দু' এক বছর বাদে সে বদলি হয়ে গেল একটি আর্ট স্কুলে, সেখানে সে কাটাল প্রায় বছর পনর। শেষ পর্যন্ত স্থপতি বিভাগ থেকে কোনোরকমে ফাইনাল পরীক্ষা পাশ করে বেরুল। কোনোদিন সে স্থপতির কাজ করেনি, মস্কোর একটি লিথো কারখানায় কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। সে প্রায় প্রতি গ্রীষ্মে আসে, সাধারণত খুব অসুখ নিয়ে আসে, এসে বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে।

তার গায়ে একটা গলাবন্ধ লম্বা কোট, পরনে জীর্ণ ক্যাম্বিসের পাৎলুন — তার প্রান্তভাগ ছিঁড়ে ক্ষয়ে গেছে। তার সার্টটা ইস্ত্রি করা নয়, আর সমস্ত চেহারা ও হাবভাব মলিন। কৃশ কাহিল তার দেহ, চোখদুটি বিশাল, হাড়সর্বস্ব সরু লম্বা আঙুলগুলি, মুখে দাড়ি, গায়ের রং ময়লা। কিন্তু এই সবকিছু নিয়েও সে সুদর্শন। শুমিনদের সংসারে সে নিজের আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে আছে বলেই মনে করে, তাদের বাড়িতে সে থাকে নিজের বাড়ির মতোই। বেড়াতে এসে যে ঘরটায় সে থাকে সেটা বহুকাল সাশার ঘর বলেই পরিচিত হয়ে গেছে।

বারান্দা থেকে নাদিয়াকে দেখতে পেল সে, দেখে নেমে গেল তার কাছে।

বলল, 'চমৎকার জায়গাটা।'

'নিশ্চয়। শরৎকাল পর্যন্ত থাকা উচিত আপনার।'

'হ্যাঁ জানি। বোধহয় থাকতেই হবে। সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত থাকব আপনাদের সঙ্গে।'

স্পষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই সে হাসল শব্দ করে, হেসে তার পাশে বসে পড়ল।

নাদিয়া বলল, 'এখানে বসে বসে মাকে দেখছিলাম। এখান থেকে কত কম বয়স দেখায়।' একটু থেমে আবার সে বলল, 'অবশ্য মার দুর্বলতা আছে জানি, কিন্তু তবু মা একটি আশ্চর্য মেয়ে।'

সাশা সায় দিল, 'হ্যাঁ, খুব চমৎকার উনি। আপন প্রকৃতি অনুযায়ী আপনার মা সত্যি খুব ভালো আর দয়ালু, কিন্তু... কী ভাবে বলব কথাটা — আজ সকালে রান্নাঘরে গিয়েছিলাম একটু আগেভাগে, দেখলুম চারটে চাকর ঠায় মেঝের ওপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে, বিছানাপত্র কিছু নেই, কেবল কতকগুলো ন্যাকড়া বিছানো, তাতে একটা দুর্গন্ধ, অজস্র ছারপোকা আর আরশোলা ... বিশবছর আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনি, সামান্য একটুখানিও বদলায়নি। ঠাকুমাকে দোষ দেওয়া যায় না, তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন। কিন্তু আপনার মা ফরাসী জানেন, সখের থিয়েটারের ভক্ত। মনে হয় তিনি কথাটা বুঝবেন।'

সাশা যখন কথা বলে তখন শ্রোতার দিকে দুটো লম্বা হাড়সর্বস্ব আঙুল তুলে রাখা তার অভ্যেস।

সে বলে চলল, 'এখানে সবকিছু আমার এমন অদ্ভুত লাগে। হয়ত আমি এতে অভ্যস্ত নই। হায় ভগবান, এখানে কেউ কিচ্ছুটি করে না! আপনার মা কিছু না করে সম্ভ্রান্ত ডাচেসের মতো ঘুরে বেড়ান, ঠাকুমা কিছুই করেন না, আপনিও না। আর আপনার বাগ্‌দত্ত আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ সেও করে না কিছু।'

নাদিয়া এই কথা গেল বছর শুনেছে, আগের বছরেও শুনেছে বলে মনে পড়ছে তার, এবং সে জানে শুধু এইভাবেই ও ভাবতে পারে। এককালে নাদিয়ার এসব কথা শুনে হাসি পেত কিন্তু এখন এসব শুনলে কেন যেন তার রাগ ধরে।

উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'সেই পুরনো কথা, শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে গেছি। নতুন আর কিছু ভাবতে পারেন না?'

সাশাও উঠে পড়ল হেসে, তারপর দুজনেই ঘরে ফিরল। নাদিয়া সুদর্শনা, লম্বা, কৃশাঙ্গী। সাশার পাশে তাকে খুব সুসজ্জিতা এবং স্বাস্থ্যবতী বলে মনে হচ্ছে। সে কথা সে নিজেও জানে, সেজন্য সাশার প্রতি সে দুঃখবোধ করে, আর নিজেকে মনে করে প্রায় অপরাধী বলে।

কিন্তু সে বলল, 'তাছাড়া অনেক বাজে কথা বলেন আপনি। দেখুন না, এইমাত্র আমার আন্দ্রেই সম্পর্কে কী বললেন। সত্যিই ওকে আপনি একবিন্দুও জানেন না!'

'আমার আন্দ্রেই ... ছেড়ে দিন আপনার আন্দ্রেইয়ের কথা! আপনার যৌবনের জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে।'

ওরা যখন খাবারঘরে ঢুকল তখন খেতে বসছে সবাই। নাদিয়ার ঠাকুমা, বাড়ির সকলে তাঁকে ঠান্‌দি বলে ডাকে, জোরে জোরে কথা কইছেন। স্থূলাঙ্গী, সাদাসিধে বৃদ্ধা মহিলা, মোটা ঘন তাঁর ভ্রূ যুগল, ঠোঁটে একটু গোঁফ — গলার স্বর এবং কথা বলবার ভঙ্গী থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনিই সংসারের আসল কর্ত্রী। বাজারে তাঁর একসারি দোকানঘর আছে, এই থামওয়ালা প্রাচীন বাড়িটা আর বাগান তাঁরই, তবু প্রত্যেকদিন সকালে চোখের জলে ভেসে তিনি প্রার্থনা করেন, ঈশ্বর তাঁকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করুন। তাঁর পুত্রবধূ এবং নাদিয়ার মা নিনা ইভানভনা, ফাদার আন্দ্রেই এবং তাঁর পুত্র ও নাদিয়ার বাগ্‌দত্ত আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ — তিনজনে সংবেশন বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করছিল। নিনা ইভানভনা শ্বেতাঙ্গিনী, চুলগুলো সোনালী, গায়ে আঁটো করে আঁটা কাঁচুলি, চোখে পাঁশনে চশমা এবং হাতের সবকটা আঙুলে হীরের আংটি। ফাদার আন্দ্রেই শীর্ণকায় দন্তহীন বৃদ্ধ, সব সময় তাঁকে দেখে মনে হয় যে এখ্‌খুনি যেন কিছু একটা মজার কথা বলবেন। আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ হৃষ্টপুষ্ট প্রিয়দর্শন যুবক, কোঁকড়া চুলগুলি দেখে বরং অভিনেতা কিংবা শিল্পী বলে মনে হয়।

ঠাকুমা বললেন সাশাকে, 'সাতদিনে তুমি মুটিয়ে যাবে এখানে। কিন্তু আরো খেতে হবে তোমাকে। নিজের দিকে তাকিয়ে একবার দেখো দিখি!'

দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন ঠাকুমা। 'তোমাকে বিশ্রী দেখাচ্ছে। আসল একটি উড়নচণ্ডী, তুমি ঠিক তাই।'

চোখ পিট্ পিট্ করে, কথাগুলো ধীরে ধীরে টেনে টেনে জুড়ে দিয়ে ফাদার আন্দ্রেই বললেন, 'পৈত্রিক দান খুইয়ে সে বোকা জন্তুদের সঙ্গে মাঠে মাঠে চরে বেড়াত।'

বাপের কাঁধ চাপড়ে আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ বলল, 'বুড়ো বাবাকে ভালোবাসি আমি। লক্ষ্মী বাবা আমার। খাসা বুড়া আদমী!'

কেউ কিছু বলল না। সহসা সাশা জোরে হেসে উঠল, ন্যাপকিনটা চাপা দিল ঠোঁটে।

ফাদার আন্দ্রেই নিনা ইভানভনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে সংবেশন বিদ্যায় বিশ্বাস করেন আপনি?'

নিনা ইভানভনা জবাব দিলেন, 'ঠিক বিশ্বাস করি তা বলা যায় না।' তাঁর মুখে গম্ভীর, প্রায় কঠোর একটি অভিব্যক্তি প্রকাশ পেল। 'কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে প্রকৃতিতে এমন বহু কিছু আছে যা রহস্যজনক এবং বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না।'

'আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত, তবু আমি এও বলব যে, ধর্মবিশ্বাস বহু পরিমাণে এই রহস্যের ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করে দেয়।'

একটা প্রকাণ্ড রসালো টার্কি রাখা হল টেবিলে। ফাদার আন্দ্রেই এবং নিনা ইভানভনা তাঁদের আলাপ চালিয়ে যেতে থাকলেন। নিনা ইভানভনার হাতের আঙুলে হীরেগুলি জ্বলজ্বল করতে লাগল, তারপর চোখে ঝিকমিক করে উঠল অশ্রু। তাঁর মনে গভীর নাড়া লেগেছে।

তিনি বললেন, 'আমি অবশ্য আপনার সঙ্গে যুক্তিতে পেরে উঠব না, সে সাহসও আমার নেই। কিন্তু আপনিও স্বীকার করবেন জীবনে অনেক প্রহেলিকা আছে যার কোনো ব্যাখ্যা মীমাংসা হয় না।'

'না, আমি বলছি আপনাকে, একটিও নেই।'

আহারের পর আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ বেহালা বাজাল, নিনা ইভানভনা তার সঙ্গে পিয়ানোয় সঙ্গত করলেন। আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ দশবছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাবিদ্যা বিভাগের গ্রাজুয়েট হয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু কোনো চাকরি-বাকরি করে না, নির্দিষ্ট কোনো কাজও তার নেই। মাঝে মাঝে কেবল

'সাহায্য রজনীর' ঐকতান বাদনে সে বেহালা বাজায়। শহরে তাকে লোকে বলে 'ওস্তাদ'।

আন্দ্রেই আন্দ্রেইচের বাজনা নীরবে সবাই শুনল। টেবিলের উপর নিঃশব্দে সামোভার থেকে বাষ্প বেরুচ্ছে, আর চা খাচ্ছে একমাত্র সাশা। ঠিক বারোটা যখন বাজল বেহালার একটি তার গেল ছিঁড়ে। প্রত্যেকে হেসে উঠল, তারপর পড়ে গেল বিদায় গ্রহণের ব্যস্ততা।

বাগদত্তের কাছে শুভরাত্রি জানিয়ে নাদিয়া উঠে গেল দোতলার ঘরে। সেখানে সে থাকে মায়ের সঙ্গে (একতলাটায় থাকেন ঠাকুমা)। নীচে, খাবারঘরে আলোগুলি একে একে নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সাশা তবু বসে রইল, বসে চা খেতে লাগল। বরাবরই সে চা নিয়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ মস্কোর কায়দায়, আর একের পর এক ছয় সাত গেলাস চা খেয়ে যায়। সাজপোশাক ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ার অনেকক্ষণ পরেও নাদিয়া শুনতে পাচ্ছিল চাকরবাকরগুলো টেবিল সাফ করছে আর ঠাকুমা গজ্ গজ্ করে যাচ্ছেন। অবশেষে নিঝুম হল বাড়িটা, কেবল, নীচের তলায় সাশার ঘর থেকে মাঝে মাঝে জোরে জোরে কাশির শব্দ শোনা যেতে লাগল।

২

নাদিয়া যখন জেগে উঠল তখন বোধ হয় দুটো হবে, রাত ভোর হয়ে আসছিল। দূরে রাত-পাহারার ঝনঝনানি শোনা যাচ্ছে। ঘুমবার ইচ্ছে ছিল না নাদিয়ার, শয্যা তার এত হাল্কা নরম মনে হচ্ছিল যে আরাম করে শোয়া যায় না। এই মে মাসে আগের আগের রাত্রিগুলির মতো আজও নাদিয়া বিছানায় উঠে বসল, তারপর চিন্তার স্রোতে গা ঢেলে দিল। আগের রাত্রির মতো সেই একই একঘেয়ে, তুচ্ছ, অসাড়, অদম্য চিন্তা — আন্দ্রেই আন্দ্রেইচের পূর্বরাগের কথা, কেমন করে সে তার পাণি প্রার্থনা করেছে, কেমন করে সে নিজে তার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং ধীরে ধীরে এই সৎ ও চতুর যুবকটির গুণের আদর করতে শিখেছে — সেই সব চিন্তা। কিন্তু কী কারণে যেন, আজ যখন বিয়ের মাত্র আর একমাস বাকী, সে একটা ভয়, একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মনে হতে লাগল যেন তার বরাতে অনির্দিষ্ট একটা দুঃখ আছে।

'টিক-টক, টিক-টক,' চৌকিদার মন্থর শব্দ করে চলেছে, 'টিক-টক ...'

সাবেকি ধরনের প্রকাণ্ড জানালাটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাগান, খানিকটা ছাড়িয়ে লাইলাকের ঝোপ। ফুলভারে সেটা ভারাক্রান্ত, তন্দ্রাচ্ছন্ন, ঠাণ্ডা হাওয়ায় অবসাদগ্রস্ত। ধীরে নিঃশব্দে ফুলগুলির ওপর নেমে এল ঘন সাদা একটা কুয়াশা, যেন ওদের আচ্ছন্ন করে ফেলতে সে ব্যগ্র। দূরে দূরে গাছের শাখায় ডাকছে অলস তন্দ্রামগ্ন রুক পাখিরা।

'হা ভগবান, এমন মন খারাপ লাগছে কেন আমার?'

বিয়ের আগে সব মেয়েরই কি এরকম হয়ে থাকে? কে জানে? না কি এ সাশার প্রভাব? কিন্তু সাশা তো সেই একই কথা যেন মুখস্থ করে বলে গেছে বার বার, বছরের পর বছর, আর সে যা বলেছে সবই বরাবর কেমন নির্বোধ আর অদ্ভুত লেগেছে। কিন্তু কেনই বা সে মাথা থেকে সাশার চিন্তাটা দূর করতে পারছে না? কেন?

বহুক্ষণ চৌকিদারের রোঁদ শেষ হয়েছে। জানালার নীচে এবং বাগানে পাখিদের কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেছে। বাগানের কুয়াশাটা কেটে গেল, সবকিছু বসন্ত রৌদ্রে স্বর্ণাভ হয়ে উঠল, সব যেন হাসতে লাগল। দেখতে দেখতে সারা বাগানটি সূর্যরশ্মির আলিঙ্গনে উষ্ণ হয়ে যেন প্রাণ পেল, পাতায় পাতায় শিশির-বিন্দু হীরের মতো দীপ্তিময় হয়ে উঠল। আর সেই জীর্ণ পুরাতন তুচ্ছ অবহেলিত বাগানটা এই প্রভাতবেলায় সজীব জীবন্ত, উল্লসিত হয়ে উঠল।

ঠাকুমা আগেই জেগেছেন। সাশা সেই তার গম্ভীর কর্কশ কাশি কাশছে। নীচে শোনা যায় চাকরবাকরেরা সামোভার আনছে, চেয়ারগুলো টানাটানি করছে।

সময় কেটে যায় ধীরে ধীরে। নাদিয়া ঘুম থেকে উঠে অনেকক্ষণ থেকে পায়চারি করছে বাগানে। তবুও সকালটা যেন কাটতে চায় না।

এবারে এলেন নিনা ইভানভনা জলভরা চোখে আর হাতে এক গেলাস সোডা নিয়ে। তাঁর বাতিক আধ্যাত্মিকতা আর হোমিওপ্যাথি। প্রচুর পড়েছেন। তাঁর নিজের সন্দেহের কথাগুলো বলতে ভালোবাসেন। নাদিয়ার মনে হয় এই সবকিছুর মধ্যে যেন একটা গভীর, রহস্যময় তাৎপর্য আছে। মাকে চুমু খেয়ে সে তাঁর পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।

সে প্রশ্ন করল, 'কাঁদছিলে কেন মা?'

'কাল রাতে একটা বই পড়েছি, এক বৃদ্ধ আর তার মেয়ের কাহিনী। বুড়ো কাজ করত কী একটা অফিসে, তারপর জানো কী হল, অফিসের বড়কর্তা বুড়োর মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল — বইটা শেষ হয়নি, কিন্তু এমন একটা জায়গায় এসে থেমেছি যে আর কান্না সামলাতে পারিনি।' বলে নিনা ইভানভনা গেলাস থেকে এক ঢোক জল খেলেন। 'সকালে আবার মনে পড়ে গেল গল্পটা, তাই কেঁদে ফেলেছি আবার।'

নাদিয়া একটুখানি থেমে বলল, 'আর আমি এমন মনমরা হয়ে আছি আজকাল। ঘুমুতে পারছি না কেন?'

'জানি না বাছা। কিন্তু আমার যখন ঘুম আসে না তখন আমি শক্ত করে চোখ বুজে থাকি — এই, এই রকম করে — আর কল্পনা করি আন্না কারেনিনাকে দেখতে ছিল কেমন, কেমন করে সে কথা বলত, কিংবা কিছু একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, পুরাকালের কিছু একটা ভাবতে চেষ্টা করি ...'

নাদিয়া অনুভব করল মা তাকে বুঝতে পারেননি, বুঝতে পারেন না, সে ক্ষমতা নেই তাঁর। এরকম একটা অনুভূতি এর আগে আর দেখা দেয়নি। সে ভয় পেয়ে গেল। তার লুকোতে ইচ্ছা করল। নিজের ঘরে সে ফিরে গেল।

দুটোর সময় খেতে বসল সবাই। আজ বুধবার, উপোসের দিন। ঠাকুমাকে খেতে দেওয়া হল নিরামিষ 'বর্‌শ' এবং ব্রীম মাছের সঙ্গে বাকহুইটের পরিজ।

ঠাকুমাকে চটাবার জন্য সাশা 'বর্‌শ'ও খেল, মাংসের সুপও খেল। খেতে খেতে সারাটা সময় সে হাসি-মস্করা করে চলল, কিন্তু তার সব ঠাট্টাই অতিরিক্ত বিস্তারিত, সব সময় তা একটা নীতিকথার নির্দেশ দেয়। তাছাড়া কোনো একটি রসিকতা করার আগে সে যখন লম্বা অস্থিসার, মড়ার মতো আঙুলগুলো তুলে ধরে তখন ব্যাপারটা মোটেই আর মজাদার থাকে না। তার ওপর যখন হঠাৎ মনে পড়ে সে অত্যন্ত অসুস্থ এবং সম্ভবত আর বেশি বাঁচবে না, তখন এমন দুঃখ হয় তার জন্য যে কান্না পায়।

খাওয়ার পর ঠাকুমা চলে গেলেন তাঁর ঘরে বিশ্রাম নিতে। একটুক্ষণ পিয়ানো বাজালেন নিনা ইভানভনা, তারপর তিনিও ঘর ছেড়ে উঠে চলে গেলেন।

আহারের পরে যে বিষয়টি নিয়ে সাশা বরাবর কথা বলে, তা নিয়েই সে

বলল, 'আঃ, নাদিয়া লক্ষ্মীটি, শুধু যদি আমার কথা শুনতেন! যদি শুনতেন আপনি!'

সাবেকি ফ্যাশনের একখানা কেদারায় গুটিশুটি মেরে বসে নাদিয়া চোখ বুজল, আর সাশা নীরবে ঘরে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল।

সে বলল, 'এখান থেকে যদি কেবল চলে যেতেন আপনি, আর পড়াশুনা করতেন। শিক্ষিত সাধু লোকেরাই আকর্ষণের বস্তু, একমাত্র তাদেরই জগতে প্রয়োজন আছে। আর এমন লোক যত বেশি হবে পৃথিবীতে তত দ্রুত স্বর্গরাজ্য আসবে। তখন কোনোরকম প্রচেষ্টাই বাদ যাবে না, আপনাদের এই শহরে সবকিছু ওলট পালট হয়ে যাবে, সবই বদলে যাবে যেন যাদুমন্ত্রে। আর তারপর গড়ে উঠবে বিশাল চমৎকার সব বড় বড় বাড়ি, সুন্দর সুন্দর পার্ক, আশ্চর্য সব ফোয়ারা, আর কত সব চমৎকার লোক ... কিন্তু তাও আসল কথা নয়। মূল কথাটা হচ্ছে, তখন আর কোনো ভিড় থাকবে না, এখন আমরা ভিড় বলতে যা বুঝি তখন থাকবে না, বর্তমানের এই পাপ দূর হয়ে যাবে, কারণ তখন প্রত্যেকটি ব্যক্তির মনে প্রত্যয় দেখা দেবে, তারা জানবে জীবনের লক্ষ্য কী। কেউ আর তখন ভিড়ের কাছ থেকে সমর্থন চাইবে না। লক্ষ্মীটি, এখান থেকে চলে যান আপনি — ওদের সবাইকে দেখিয়ে দিন যে এই নিস্তরঙ্গ নিরানন্দ, বিকৃত জীবন আপনার অসহ্য হয়ে উঠেছে — অন্তত নিজেকে তো দেখিয়ে দিন।'

'না, সাশা, তা আমি পারি না। আমার বিয়ে হতে চলেছে।'

'ও কথা ভাববেন না! তাতে কী আসে যায়?'

বাগানে গিয়ে ওরা ইতস্তত পায়চারি করতে লাগল।

সাশা বলে চলল, 'সে যাই হোক, নাদিয়া, আপনাকে ভেবে দেখতেই হবে, বুঝতে হবে, আলস্যের জীবন কী বীভৎস, কী অন্যায়। আপনি কি দেখতে পান না যে আপনার, আপনার মায়ের, আপনার ঠাকুমার আরামে আলস্যে জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে দিতে আর সবাইকে কাজ করতে হয়? দেখতে পান না যে অন্যান্যের জীবন গ্রাস করে ফেলছেন আপনারা? তা কি ন্যায়সঙ্গত? বলুন, তা কি কলুষিত নয়?'

নাদিয়া বলতে চাইছিল, 'হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন,' বলতে চাইছিল,

হ্যাঁ, সে বুঝেছে সব। কিন্তু তার চোখ ভরে জল এল, সে নীরব হয়ে গেল, আর যেন কেমন সংকুচিত হয়ে গেল নিজের মধ্যে। নিজের ঘরে চলে গেল নাদিয়া।

সন্ধ্যায় এল আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ আর বরাবরের মতো অনেকক্ষণ ধরে বেহালা বাজাল। সে স্বভাবতই স্বল্পভাষী, আর বোধ হয় বাজাবার সময় কথা বলতে হয় না বলেই বেহালাটাকে সে ভালোবাসে। দশটার কিছু পরে বাড়ি যাবার জন্য কোটটি গায়ে দেওয়া হলে সহসা সে জড়িয়ে ধরল নাদিয়াকে আর তার মুখে, কাঁধে, হাতে প্রবল আবেগে চুম্বন বর্ষণ করতে লাগল।

মৃদু স্বরে সে বলল, 'লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার!' ওঃ, আজ আমি ভারী সুখী! মনে হয় আনন্দে পাগল হয়ে যাব!'

এ সব কথাও যেন নাদিয়া শুনেছে অনেক অনেক কাল আগে, বা পড়েছে কোনো একটা উপন্যাসে, কোনো পুরনো জীর্ণ একটা বইয়ে— যা আজকাল কেউ আর পড়ে না।

খাবারঘরে টেবিলের সামনে বসে সাশা পিরিচ থেকে চা খাচ্ছে, পিরিচটা তার লম্বা পাঁচ আঙুলের ডগায় স্থির করে বসানো। ঠাকুমা তাসে পেশেন্স খেলছেন। নিনা ইভানভনা পড়ছেন। আইকনের সামনে প্রদীপের শিখাটা পিট পিট করছে। সবকিছু যেন শান্ত, নিশ্চিত, নিরুদ্বেগ। নাদিয়া তাদের শুভরাত্রি কামনা করে উঠে চলে গেল তার ঘরে, আর বিছানায় শুতে না শুতে ঘুমে গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ঠিক আগের দিনের মতো উষার প্রথম আভাসে সে জেগে উঠল। ঘুমুতে পারল না সে, হৃদয়ের ওপর কিছু একটা ভারী আর অশান্ত যেন চেপে রয়েছে। উঠে বসে হাঁটুতে মাথা রেখে সে ভাবতে লাগল তার বাগদত্তের কথা, বিবাহের কথা... কেন যেন তার মনে এল তার মা স্বামীকে ভালোবাসতেন না, এখন তাঁর নিজের বলতে কিছু নেই, সম্পূর্ণ অধীন তিনি তাঁর শাশুড়ীর—ঠাকুমার, কিন্তু নাদিয়া যতই চেষ্টা করুক, কিছুতেই সে বুঝতে পারল না কেন সে তার মাকে দেখেছে বিশিষ্ট অসাধারণ রূপে, দেখতে পায়নি যে তিনি একজন অতি সাধারণ, অভাগিনী মহিলা।

নীচের তলায় সাশাও জেগে, এখান থেকে সে তার কাশির শব্দ শুনতে পাচ্ছে। অদ্ভুত, অতি সরল একটা লোক, নাদিয়া ভাবল; তার স্বপ্নের মধ্যে, ওই সব অপূর্ব বাগানের মধ্যে, আশ্চর্য সুন্দর ফোয়ারার মধ্যে অসম্ভব উদ্ভট কিছু আছে। কিন্তু তার সেই মূঢ় সরলতায়, তার অসঙ্গতির মধ্যেই এমন

অনেক কিছু আছে যা রমণীয়। নাদিয়া যখনই চিন্তা করতে লাগল তার এখান থেকে চলে গিয়ে পড়াশুনো করা উচিত কিনা, সেই মুহূর্তে তার সমস্ত হৃদয়, তার পূর্ণ সত্তাটি যেন সজীব একটি শীতলতায় অবগাহন করে উঠল, আর আশ্চর্য একটি হর্ষোচ্ছ্বাসে সে নিমগ্ন হয়ে গেল।

'না, ভাববো না...' ফিসফিস করে সে বলল, 'ও কথা না ভাবাই ভালো।'

'টিক-টক,' শব্দ করে চলল রাত্রির চৌকিদার। 'টিক-টক ... টিক-টক ...'

৩

জুন মাসের মাঝামাঝি সাশা হঠাৎ ক্লান্তিতে বিরক্তিতে অভিভূত হয়ে উঠল, মস্কো ফিরে যাবার কথা বলতে লাগল।

মনমরা হয়ে সে বলল, 'এ শহরে আমি থাকতে পারি না। কলের জল নেই, নর্দমা নেই! খাবারগুলো আমার গলা দিয়ে নামতেই চায় না। রান্নাঘরটা এমন নোংরা যে বর্ণনা করা যায় না ...'

ঠাকুমা বললেন ফিসফিস করে, 'আর কটা দিন থেকে যা উড়নচণ্ডী ছেলে। বিয়ে সাত তারিখে।'

'না, পারি না কিছুতেই!'

'বলেছিলে সেপ্টেম্বর মাস অবধি আমাদের কাছে থাকবে।'

'এখন আর তা চাইনে। আমায় কাজ করতে হবে!'

গ্রীষ্মটা সেবার ঠাণ্ডায় আর বাদলে ভরা। গাছের পাতা থেকে জল ঝরছে সর্বদা, বাগানটাকে দেখাচ্ছে কেমন যেন থমথমে মনমরা। এখান থেকে চলে গিয়ে কাজ করার ইচ্ছেটা তাই নিতান্ত স্বাভাবিক। ওপরে, নীচে, সব ঘরগুলোতে অপরিচিত নারীকণ্ঠ শোনা যায়, ঠাকুমার ঘরে ঝকর ঝকর করে চলেছে একটা সেলাই-এর কল। এ সবই নববধূর সাজসজ্জা প্রস্তুতিপর্বের অঙ্গ। কেবল শীতের কোটই নাদিয়া পাবে ছয়খানা, আর তার মধ্যে সব থেকে যেটা শস্তা, ঠাকুমা গর্ব করে বলেন, তারই দাম তিনশ রুবল। এই সব হুজুগ আড়ম্বর দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে সাশার। নিজের ঘরে বসে মনে মনে সে গুমরে মরে। কিন্তু সবাই তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করালো থেকে যেতে। সে কথা দিল পয়লা জুলাই-এর আগে যাবে না।

সময় কেটে গেল দ্রুত গতিতে। সেণ্ট পিটারের বার্ষিকী দিবসে খাওয়া দাওয়ার পর আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ নাদিয়াকে নিয়ে গেল মস্কো স্ট্রীটে, আর একবার সেই বাড়িটাতে চোখ বুলিয়ে আসার জন্য, অনেক আগে নব-দম্পতির জন্য সেটা ভাড়া নিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। বাড়িখানা দোতলা, এখন পর্যন্ত কেবল ওপর তলাটাই সাজানো হয়েছে আসবাবপত্রে। বল-নাচের ঘরে চকচকে মেঝেটায় রঙ্গালয়ের মতো রং লাগানো হয়েছে, রয়েছে বাঁকানো কাঠের চেয়ার, একটা জমকালো পিয়ানো, আর বেহালাটার জন্য একটি সঙ্গীত-মঞ্চ। ঘরে রং-এর গন্ধ পাওয়া যায়। দেয়ালে গিল্টি করা ফ্রেমে একখানা বড় তৈলচিত্র—হাতলভাঙা বেগুনী রঙের ফুলদানীর পাশে দাঁড়ানো একটি নগ্ন নারীর ছবি। 'চমৎকার ছবি,' সন্ত্রস্ত একটি দীর্ঘশ্বাসের পর বলল আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ। 'এটি শিশ্‌মাচেভস্কির আঁকা।'

এর পর বৈঠকখানা। সেখানে রয়েছে একটি গোল টেবিল, একখানা সোফা, আর কয়েকখানা উজ্জ্বল নীল রঙের আরাম কেদারা, গদিআঁটা। সোফার ওপরটাতে ঝুলছে আন্দ্রেইয়ের বাবার বড় একখানা ফটো। বাবার বুকে সবগুলি পদক লাগানো আর মাথায় লম্বা একটি পুরোহিতের টুপি। ওরা এল খাবারঘরে, ঘরের পাশে আহার্য রাখবার আলমারী একটি। খাবারঘরের পরে শোবার ঘর। এখানে আবছা আলোয় পাশাপাশি রয়েছে দুটি শয্যা। দেখে মনে হয় যেন এই ঘর যারা সাজিয়েছে তারা ধরেই নিয়েছে এখানকার জীবন চিরকাল আনন্দেই কাটবে, ধরে নিয়েছে এখানে অন্যরকম কিছু হতে পারে না। আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ ঘরগুলোতে নাদিয়াকে ঘুরিয়ে আনল, একবারও তার কোমর থেকে হাতখানা সরিয়ে নেয়নি। আর নাদিয়া দুর্বল, অপরাধী বোধ করল নিজেকে, এই সব ঘর আর শয্যা আর চেয়ার দেখে ঘেন্না লাগল তার, আর সেই নগ্ন নারীর চিত্র তাকে পীড়িত করে তুলল। এবার সে স্পষ্ট বুঝতে পারল: আন্দ্রেই আন্দ্রেইচকে আর সে ভালোবাসে না, বোধ হয় কোনো দিনই ভালোবাসেনি তাকে। কিন্তু সে জানে না কী করে বলা যায় একথা, কাকে বলা যায়, আর আদৌ কেনই বা বলতে হবে এই কথাটা। দিন রাত্রি সে ভাবল ব্যাপারটা নিয়ে, তবু কিছুই কিনারা করতে পারল না সে ... আন্দ্রেই আন্দ্রেইচের বাহু তার কোমর বেষ্টন করে ছিল, সে তার সঙ্গে কথা বলছে অত্যন্ত সহৃদয়তায় অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে। নিজের বাড়িতে সে ঘুরে বেড়িয়েছে

কী রকমই না খুশি হয়ে। কিন্তু নাদিয়ার চোখে সবকিছু নীচ আর অমার্জিত লাগল — একটা নির্বোধ, মূঢ়, অসহ্য নীচতা! কোমর বেষ্টন করা ওই বাহুখানা মনে হয়েছিল কঠিন, ঠাণ্ডা, নিরাসক্ত, একটা লোহার বেড়ির মতো। যে কোনো মুহূর্তে সে ছুটে পালিয়ে যেতে প্রস্তুত, প্রস্তুত কান্নায় ভেঙে পড়তে, জানালা দিয়ে লাফাতে। আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ তাকে নিয়ে এল স্নানঘরে, দেওয়ালে গাঁথা কলের মুখ খুলল, জল বেরিয়ে এল হুড়মুড় করে।

'দেখলে? কেমন লাগল?' বলে সে হাসল। 'ওদের বলে একটা চৌবাচ্চা বসিয়েছি, তাতে একশ বালতি জল ধরবে, আর চানের ঘরে আমরা কলের জল পাব।'

দুজনে উঠোনে একটু হেঁটে বেড়ালো, তারপর রাস্তায় পা দিয়ে উঠল এসে একটা ভাড়া গাড়িতে। মেঘের মতো ঘন হয়ে ধুলো উড়ছিল, মনে হচ্ছিল এখ্‌খুনি বৃষ্টি হবে।

ধুলো থেকে বাঁচিয়ে চোখদুটো কুঁচকে ছোটো করে আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ প্রশ্ন করল, 'ঠাণ্ডা লাগছে তোমার?'

নাদিয়া জবাব দিল না।

একটুক্ষণ থেমে আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ বলল, 'আমি কিছু কাজকর্ম করি না বলে কাল সাশা আমাকে ভর্ৎসনা করছিল মনে আছে? বুঝলে, সে কিন্তু ঠিকই বলেছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অসংখ্য বার ঠিক। আমি কিছুই করি না, আর জানিও না কিছু করতে। কেন বলতে পারো, লক্ষ্মীটি? কোনো একদিন টুপিতে ফিতে লাগিয়ে কোনো একটা আফিসে কাজ করতে যাব, একথা মনে হলেই আমার গায়ে জ্বর আসে কেন? উকীল, কিংবা লাটিনের মাস্টার অথবা পৌর-সভার সদস্য — এদের দেখে পর্যন্ত আমি সহ্য করতে পারি না কেন? ও জন্মভূমি রাশিয়া, ওগো আমার মা রাশিয়া! কত যে অলস অকর্মা অপদার্থকে এখনো তোমার বুকে স্থান দিয়ে রেখেছ! ওগো দুখিনী মা, আমার মতো আর কতগুলো!'

নিজের নিষ্কর্ম আলস্য নিয়ে সে খুব তত্ত্বকথা বলতে লাগল। সে মনে করে — এটাই এ যুগের হাওয়া।

সে বলে চলল, 'আমাদের বিয়ে হয়ে গেলে আমরা পল্লীতে চলে যাব, বুঝলে সোনা, তখন আমরা কাজ করব। বাগান আর একটি ছোটো নদী

সমেত অল্প একটু জমি কিনব, আর সেখানে মেহনত করব, জীবন দেখব ... আঃ কী চমৎকার হবে!'

মাথা থেকে টুপিটা সে খুলে নিল, বাতাসে কাঁপতে লাগল তার চুলগুলি, আর মেয়েটি তার কথা শুনে চলল ভাবতে ভাবতে, 'ভগবান, বাড়ি যেতে চাই। ও ভগবান!' নাদিয়াদের বাড়িতে ফিরে আসবার ঠিক আগে ফাদার আন্দ্রেইকে ওরা ধরে ফেলে পেছনে রেখে এল।

'ওই যে দেখ আমার বাবা!' সোল্লাসে বলল আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ, আর টুপি নাড়াতে লাগল। 'বুড়ো বাপকে আমি ভালোবাসি, সত্যি ভালোবাসি।' গাড়িটার ভাড়া চুকিয়ে দিল সে। 'লক্ষ্মী বাবা আমার! চমৎকার বুড়া আদমী!'

নাদিয়া বাড়ি ঢুকল। মেজাজ বিগড়ে গেছে। শরীরটা তার অসুস্থ বোধ হতে লাগল। সে ভুলতে পারল না সন্ধ্যায় অতিথি অভ্যাগতরা সব আসবেন। তাকে তাঁদের আপ্যায়ন করতে হবে, হাসতে হবে, বেহালা শুনতে হবে, শুনতে হবে যত সব বাজে কথা আর বলতে হবে কেবল বিয়ে বিয়ে বিয়ের কথা, অন্য কিছু নয়। ঠাকুমা রেশমী পোশাক পরে জাঁক করে বসে আছেন সামোভারের পাশে আড়ষ্ট হয়ে; ভয়ানক উদ্ধত দেখাচ্ছে, অতিথি অভ্যাগত সমাগম হলে যেমন তাঁকে দেখায় বরাবর। ফাদার আন্দ্রেই প্রবেশ করলেন মুখে তাঁর সূক্ষ্ম হাসিটি নিয়ে।

ঠাকুমাকে তিনি বললেন, 'আপনাকে সুস্থ দেখে আনন্দ হচ্ছে, পুণ্যময় সান্ত্বনা পাচ্ছি।' কথাটা তিনি অকপট আন্তরিকতা নিয়ে বললেন, না ঠাট্টা করে—বলা শক্ত।

৪

বাতাস খট খট করছে জানালার শার্সিতে আর গৃহশীর্ষে। শন্ শন্ শব্দ শোনা যায়, চিমনীতে ঘরো-ভূতটা বিষণ্ণ বিলাপে গুন গুন করছে। রাত একটা। সবাই শুয়ে আছে, কিন্তু ঘুমিয়ে নেই কেউ। নাদিয়া ভাবতে লাগল সে যেন নীচতলায় বেহালার বাজনা শুনতে পাচ্ছে। বাইরে থেকে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ পাওয়া গেল, একটা খড়খড়ি নিশ্চয় সশব্দে খুলে গেল। এক মিনিট বাদে শেমিজ গায়ে নিনা ইভানভনা ঘরে এলেন হাতে একটি বাতি নিয়ে।

বললেন, 'ওটা কিসের শব্দ, নাদিয়া?'

নাদিয়ার মায়ের চুলগুলো একটা বিনুনি করে বাঁধা, ভয়ে ভয়ে তিনি একটু হাসছেন; আজ এই ঝড়ের রাতে তাঁকে অনেকটা বেশি বয়স্কা, অনেকটা বেঁটে এবং বরাবরের তুলনায় অনেক সাধারণ দেখাচ্ছে। নাদিয়ার মনে পড়ল, এই তো সম্প্রতি মাকে সে কেমন অসামান্যা এক নারী বলে মনে করেছিল, তাঁর কথাবার্তা শুনে সে কত গর্ব বোধ করত। কিন্তু এখন সে কিছুতেই মনে করতে পারল না সেই কথাগুলো কী — মনে যা এল তা সবই দুর্বল, কৃত্রিম।

চিমনীর মধ্যে যেন কয়েকটি মোটা, টানা গলায় গান হচ্ছে, এমনকি যেন 'হে ভগবান' কথাটা পর্যন্ত কানে শোনা যায়। নাদিয়া বিছানায় উঠে বসে জোরে জোরে চুলগুলি টানতে লাগল, আর কাঁদল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

কেঁদে কেঁদে সে বলল, 'মা, ও মা! মাগো, আমার যে কী হচ্ছে যদি জানতে পারতে মা! আমাকে এখান থেকে চলে যেতে দাও মা—তোমার পায়ে পড়ি!'

বিহ্বল হয়ে নিনা ইভানভনা বললেন, 'কোথায়?' তারপর বিছানার পাশে বসে বললেন, 'কোথায় যেতে চাও?'

নাদিয়া কাঁদল, কেঁদেই চলল, একটাও কথা আর বলতে পারল না।

অবশেষে সে বলল, 'এই শহর থেকে আমায় চলে যেতে দাও। বিশ্বাস করো, এই বিয়েটা হবে না, হতে পারে না। ওকে আমি ভালোবাসি না ... তার সম্বন্ধে কথা বলাও আমার সহ্য হয় না।'

আতঙ্কে নিনা ইভানভনার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল, তাড়াতাড়ি তিনি বললেন, 'না, খুকী না। শান্ত হও। তুমি উতলা হয়ে গেছ। ও কেটে যাবে' খন। ওরকম হয়েই থাকে। আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছ বোধ হয়, কিন্তু প্রেমের ঝগড়া তো শেষ হয় চুমুতে।'

নাদিয়া ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'যাও, তুমি চলে যাও মা!'

একটু থেমে নিনা ইভানভনা বললেন, 'হ্যাঁ। এই তো সেদিনের কথা, ছিলে ছোট্ট খুকীটি আর আজ তো প্রায় বিয়ের কনে। প্রকৃতিতে অহরহ পরিবর্তন ঘটছে। কী ঘটল বোঝার আগেই একদিন মা হয়ে উঠবে তুমিই, তারপর বুড়ি, মেয়ে নিয়ে দুর্ভোগ ভুগবে আমার মতো।'

নাদিয়া বলল, 'মা মনি, তুমি কত দয়াময়ী, কত বুদ্ধি তোমার, কিন্তু তুমি অসুখী। বরাবর তুমি এমন দুখিনী। মা, তুমি এমন মামুলি কথাগুলো বলো কেন? কেন বলো, ঈশ্বরের দোহাই, কেন বলো?'

নিনা ইভানভনা কথা বলতে চাইলেন, কিন্তু একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারলেন না। কেবল ফুঁপিয়ে কাঁদলেন, তারপর নিজের ঘরে গেলেন চলে। আবার চিমনীর মধ্যে সেই মোটা কয়েকটা গলা বিলাপ করে উঠল। হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল নাদিয়া। বিছানা থেকে লাফিয়ে সে ছুটে গেল মায়ের কাছে। নিনা ইভানভনার চোখদুটো ফুলে উঠেছে কান্নায়। নীল একখানা কম্বল গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে রয়েছেন তিনি। হাতে একটা বই।

নাদিয়া বলল, 'মা, শোনো। একটু ভেবে দেখ, আমাকে একটু বুঝতে চেষ্টা করো, তোমার পায়ে পড়ি! একটু কেবল ভেবে দেখ আমাদের এই জীবন কী রকম ক্ষুদ্র সংকীর্ণ, কী রকম অবমাননাকর জীবন! আমার চোখ খুলে গেছে, এখন আমি সব দেখতে পাচ্ছি। আর তোমার আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ? কী বলব, একটুও সে চালাক চতুর নয়, মা। হায় ঈশ্বর, হে ভগবান! মাগো, একটুখানি ভেবে দেখ; ভারি সে বোকা!'

একটা ঝাঁকি দিয়ে উঠে বসলেন নিনা ইভানভনা।

ফুঁপিয়ে হাঁপিয়ে তিনি বললেন, 'তুমি আর তোমার ঠাকুমা আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছো। আমি বাঁচতে চাই! হ্যাঁ, বাঁচতে! বার বার বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন, 'বাঁচতে চাই! আমাকে মুক্তি দাও! আমার এখনো বয়স আছে, বাঁচতে চাই আমি, আর তোমরা আমাকে বুড়ি বানিয়ে দিয়েছ!'

তিক্ত কান্নায় ফেটে পড়লেন তিনি। তারপর কম্বল জড়িয়ে গুটি শুটি হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁকে মূঢ়, করুণ, ক্ষুদ্র একটা প্রাণীর মতো দেখাতে লাগল। নাদিয়া নিজের ঘরে ফিরে সাজপোশাক পরে নিল, তারপর জানালার কাছে বসে রইল প্রভাতের প্রতীক্ষায়। সারা রাত সে সেখানে বসে রইল চিন্তায় ডুবে, আর মনে হতে লাগল কে যেন বাইরে খড়খড়িতে ধাক্কা মারছে আর শিস দিচ্ছে।

পরদিন সকালে ঠাকুমা আক্ষেপ করে জানালেন বাতাসে সব আপেলগুলো ঝরে পড়ে গেছে আর বুড়ো একটা কুল গাছের গুঁড়ি দোফালা হয়ে চিরে

গেছে। ধূসর, মলিন, নিরানন্দ সকালটা, এক একদিন যেমন মনে হয় সাত সকালেই আলো জ্বেলে রাখি — সেই রকম। সবাই নালিশ জানাল বড়ো ঠান্ডা, আর জানালার শার্সিতে বৃষ্টির ফোঁটা দিয়ে চলল টোকা। প্রাতরাশের পর নাদিয়া গেল সাশার ঘরে, তারপর একটাও কথা না বলে কোণে একটা চেয়ারের সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়ল। দুহাতে ঢেকে ফেলল মুখখানা।

সাশা প্রশ্ন করল, ‘কী ব্যাপার?’

নাদিয়া বলে উঠল, ‘এভাবে আমি আর পারছি না, পারছি না! জানি না আগে এখানে কী করে ছিলাম, একেবারে বুঝতে পারি না! আমি আমার বাগদত্তকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি নিজেকে, এই অলস, শূন্য জীবনের সবটাকে আমি ঘৃণা করি ...’

সে কী বলছে, তখনো না বুঝে সাশা তাকে বাধা দিয়ে বলল, ‘আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে ... ওসব কিছু নয় ... সব ঠিক আছে!’

নাদিয়া বলে চলল, ‘আমার কাছে এই জীবনটা ঘৃণায় ভরা. এখানে আমি আর একটা দিনও টিকতে পারব না — কাল চলে যাব এখান থেকে। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে নিয়ে চলুন আপনার সঙ্গে!’

এক মুহূর্ত সাশা তার দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। তারপর শেষ পর্যন্ত সত্যটি সে উপলব্ধি করল; শিশুর মতো আনন্দে মত্ত হয়ে উঠল সে, দু’হাত তুলে নাচাল, ঢিলে চটি পায়ে তড়বড় করে উঠল, যেন আনন্দে নাচছে।

হাত রগড়ে সে বলল, ‘চমৎকার। কী অপূর্ব, ভগবান!’

বিস্ফারিত দুই পলকহীন চোখে নাদিয়া তাকিয়ে রইল তার দিকে। তার চাউনিতে ভালোবাসা যেন সে মোহিত হয়ে গেছে। সে অপেক্ষা করে রইল, কিছু তাৎপর্যময়, অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ কথা একটা বলবে সাশা। এ পর্যন্ত সাশা কিছু বলেনি তাকে, কিন্তু তার মনে হতে লাগল কী যেন নূতন আর বিরাট, যা সে আগে কখনো জানেনি, কিছু তার সামনে উন্মোচিত হচ্ছে। প্রত্যাশা নিয়ে সে তাকিয়ে রইল তার দিকে। এখন সে সবকিছুর জন্যই প্রস্তুত, প্রস্তুত মরতেও।

সাশা বলল একটু পরে, ‘কাল আমি যাচ্ছি। আমাকে বিদায় দিতে আসতে

পারেন স্টেশনে। আপনার জিনিসপত্র আমি আমার ট্রাঙ্কে নিয়ে নেব আর একটি টিকিট কেটে রাখব' খন আপনার জন্য। তারপর যখন তিনবারের ঘণ্টা বাজবে আপনি তখন চাপবেন ট্রেনে, ব্যস চলে যাব আমরা। আমার সঙ্গে যাবেন মস্কো পর্যন্ত, তারপর একলা যাবেন পিটার্সবুর্গে। আপনার পাসপোর্ট আছে?'

'আছে।'

সাশা বলল সোৎসাহে, 'কখনো আপনি অনুতাপ করবেন না, এর জন্য কোনো অনুশোচনার কারণ থাকবে না আপনার, আমি জানি! চলে যাবেন আপনি, পড়াশুনো করবেন, তারপর দেখবেন সব চলছে ঠিক ঠিক আপন গতিধারায়। নিজের জীবনকে যখনি ওলট পালট করে ফেলবেন তখনই বদলে যাবে সবকিছু। আসল বড়ো কথাটা হচ্ছে নিজের জীবনটাকে ওলট পালট করে ফেলা, তারপর আর কিছু আসে যায় না। তাহলে আমরা যাচ্ছি কাল?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়! ঈশ্বরের দোহাই!'

নাদিয়া কল্পনা করে নিয়েছে গভীর একটি আলোড়ন এসেছে তার মধ্যে, মনে করেছে তার হৃদয় এমন ভারাক্রান্ত আগে আর কখনো হয়নি। সে নিশ্চিত বুঝল যাত্রার প্রাক্‌কালে ভয়ানক কষ্ট পাবে সে, তীব্র মনস্তাপের যন্ত্রণায় পীড়িত হবে। কিন্তু ঘরে গিয়ে বিছানায় শুতে না শুতে সে ঢলে পড়ল গভীর ঘুমে। মুখে অশ্রুর ছাপ আর ঠোঁটে মৃদু হাসি মেখে সে একেবারে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা নিটোল ঘুমল।

৫

ভাড়া গাড়ি ডেকে পাঠানো হয়েছে। কোট গায়ে, টুপি মাথায় নাদিয়া ওপরে উঠে গেল। একবার মাকে শেষ দেখা দেখে আসবে, দেখে আসবে সেই সব জিনিস যা এতকাল তার ছিল। ঘরে, তখনো-উষ্ণ বিছানাটির পাশে সে দাঁড়াল, তারপর নিঃশব্দ পায়ে ঢুকল মায়ের ঘরে। নিনা ইভানভনা নিদ্রিতা, ঘরখানায় নিবিড় নিস্তব্ধতা। মাকে চুমু খেয়ে, চুলগুলোয় একটু হাত বুলিয়ে সোজা করে দিয়ে নাদিয়া দুয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল ... তারপর ধীর পায়ে নেমে এল নীচে।

মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ভিজে চুপসে একটা গাড়ি দাওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে, গাড়িটার হুড তোলা।

চাকর যখন মালপত্র গাড়িতে তুলতে শুরু করল, ঠাকুমা বললেন, 'তোমার জায়গা হবে না, নাদিয়া। এই আবহাওয়ায় তুমি সাশাকে তুলে দিতে যেতে চাও — আমার অবাক লাগছে! বাড়িতেই থাকো বরং! বৃষ্টিটা একবার দেখ!'

নাদিয়া একটা কিছু বলতে চাইল, পারল না। সাশা তাকে ধরে তুলল গাড়িতে, তারপর কম্বল দিয়ে হাঁটু দুটো ঢেকে দিল। এবার সে গিয়ে বসল ওর পাশে।

দাওয়া থেকে ঠাকুমা চেঁচিয়ে বললেন, 'এসো বাছা! ভগবান তোমার কল্যাণ করুন! মস্কো পেঁছেই চিঠি দিও কিন্তু, সাশা, মনে থাকে যেন!'

'আচ্ছা চলি এবার, ঠাকুমা!'

'স্বর্গের রাণী তোমাকে রক্ষা করুন!'

'কী দিন বাবা!' সাশা বলল।

আর ঠিক তখনই কাঁদতে লাগল নাদিয়া। এই এখনই সে ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছে, সে চলে যাচ্ছে সত্যি সত্যি; চলে যাচ্ছে — কথাটা সে এ যাবৎ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেনি। ঠাকুমার কাছে বিদায় নেবার সময়ও না, কিংবা মায়ের পাশে যখন দাঁড়িয়েছিল, তখনও না। বিদায় শহর! প্রবল বেগে তার মনে এল সবকিছু — আন্দ্রেই, তার বাবা, নতুন বাড়িটা, ফুলদানী সমেত নগ্ন সেই নারী। কিন্তু এসব আর এখন তাকে আতঙ্কিত করল না, বুকে ভার হয়ে বসল না। ও সব তুচ্ছ, মূঢ়, অর্থহীন হয়ে গেছে। সব অপসরণ করে যাচ্ছে দূরে আরো দূরে, অতীতে। তারপর যখন তারা রেলগাড়িতে চাপল, ছেড়ে দিল ট্রেনটা, তখন এই সমগ্র অতীতটা, সেই বৃহৎ এবং গুরুতর অতীতটা ছোট্ট একটা পিণ্ডমাত্রে সঙ্কুচিত হয়ে গেল, আর সামনে উন্মোচিত হয়ে গেল প্রসারিত এক বিরাট ভবিষ্যৎ, যা এখনো তার প্রত্যক্ষ বোধের প্রায় বাইরে। জানালায় টপ টপ করে ঝরে পড়ছে বৃষ্টিবিন্দু, কেবল সবুজ মাঠ প্রান্তর, দ্রুত অপসৃয়মান টেলিগ্রাফ পোস্টগুলি, তারের ওপর পাখিরা — এ ছাড়া আর দেখা যায় না কিছু; সহসা একটি আনন্দে যেন তার শ্বাস রুদ্ধ

হয়ে যেতে চাইল। মনে পড়ল সে চলেছে মুক্তি পেতে, পড়াশুনা করতে। মনে পড়ল, এমন একটা কাজ সে করছে যাকে আগেকার দিনে লোকে বলত, 'কসাকদের কাছে পালিয়ে চলে যাওয়া।' সে হেসে উঠল, কেঁদে ফেলল, আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করল।

একগাল হেসে সাশা বলল, 'এই দেখ দেখ, এসো, দেখ কাণ্ড! এসো! কী করে দেখ!'

৬

হেমন্ত পার হয়ে গেল, তারপর শীতও। নাদিয়ার এবার বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে। রোজ রোজ সে ভাবে তার মায়ের আর ঠাকুমার কথা, সাশার কথাও ভাবে। বাড়ির চিঠিপত্রে একটা শান্ত আর সহৃদয়তার সুর, সব কিছু যেন ভুলে যাওয়া হয়েছে, ক্ষমা করা হয়েছে। মে মাসের পরীক্ষা পাশ করে সুস্থ দেহে খুশি মনে সে বাড়ির দিকে রওনা হল। মাঝপথে থামল মস্কোয় সাশাকে দেখে যাওয়ার জন্য। এক বছর আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে সাশা — এক মুখ দাড়ি, অমার্জিত কেশ বেশ, পরনে সেই ক্যাম্বিসের পাৎলুন, গায়ে সেই পুরানো সাবেকি ফ্যাশনের লম্বা কোট, চোখদুটি বরাবরের মতো তেমনি ডাগর আর সুন্দর। কিন্তু তাকে অসুস্থ আর উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, আরো রোগা হয়ে গেছে সে, আরো বয়স্ক হয়ে গেছে। আর অবিশ্রান্ত কাশছে। তাকে নাদিয়ার মলিন আর গ্রাম্য মনে হল।

'আরে নাদিয়া যে!' বলে সে চেঁচিয়ে উঠল আনন্দে হাসতে হাসতে। 'আমার লক্ষ্মী, আমার সোনা!'

লিথো কর্মশালায় তামাকের ধোঁয়ায় আর রং আর কালির দম-আটকানো গন্ধের মধ্যে ওরা বসল দুজনে, তারপর সাশার ঘরে এল তারা। তাতেও ভুর ভুর করছে তামাকের গন্ধ। ঘরটা নোংরা, আগোছালো। ঠাণ্ডা সামোভারের পাশে টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে একটা ভাঙা প্লেট, তাতে একটুকরো কালো কাগজ, আর সারা মেঝেটায় এবং টেবিলে ছড়িয়ে আছে অজস্র মরা মাছি। এখানকার প্রত্যেকটি জিনিস স্পষ্ট দেখিয়ে দিচ্ছে সাশা তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনো চিন্তা করে না, সর্বদাই বাস করে বিশৃংখলার মধ্যে, আরাম আয়েসের প্রতি একটা অসীম অবজ্ঞা নিয়ে। যদি কেউ তার ব্যক্তিগত সুখ ও

জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করত, যদি প্রশ্ন করত এমন কেউ আছে কিনা যে তাকে ভালোবাসে, তবে সে প্রশ্নের মানেই সে বুঝতে পারত না, কেবল হেসে ফেলত খানিকটা।

নাদিয়া তাড়াতাড়ি বলল, 'সবকিছু ভালোয় ভালোয় কেটে গেছে। হেমন্তে মা এসেছিলেন পিটার্সবুর্গে, আমায় দেখতে এসেছিলেন। বলেছেন ঠাকুমা রাগ করেননি। কেবল বার বার আমার ঘরে গিয়ে দেয়ালে ক্রুশ আঁকেন।'

সাশাকে প্রফুল্ল দেখাল, কিন্তু সে কাশছে আর কথা বলছে ভাঙা গলায়। নাদিয়া বার বার তাকাতে লাগল তার দিকে, ভাবতে লাগল সে কি সত্যি গুরুতর অসুস্থ, না কি সব তার নিজের কল্পনা।

সে বলল, 'সাশা, লক্ষ্মী সাশা! কিন্তু আপনি যে অসুস্থ!'

'আমি ঠিক আছি। একটুখানি অসুখ — ও তেমন কিছু নয় ...'

আকুল স্বরে নাদিয়া বলল, 'কিন্তু দোহাই আপনার, ডাক্তার দেখান না কেন? স্বাস্থ্যের যত্ন নেন না কেন আপনি, সাশা?' মৃদুকণ্ঠে সে বলল, আর চোখদুটি তার জলে ভরে উঠল। কেন যেন আন্দ্রেই আন্দ্রেইচ, আর সেই ফুলদানীর কাছে নগ্ন নারীচিত্রটি, আর তার সমগ্র অতীত জীবন — যা আজ সেই ছোটোবেলার মতো সুদূর অতীত — সবকিছু তার মনের সামনে উঠল ভেসে। কাঁদতে লাগল সে; গেল বছরের মতো সাশা আর তার কাছে তেমন নতুন, তেমন চতুর, তেমন আকর্ষণীয় নেই। 'লক্ষ্মী সাশা, আপনি ভয়ানক অসুস্থ। আপনি যাতে অমন ফ্যাকাশে আর রোগা হয়ে না যান তার জন্য কী আমার অদেয় জানি না! আপনার কাছে বড়ো ঋণী আমি। আমার জন্য কত প্রচুর যে আপনি করেছেন তা আপনার নিজের জানা নেই। লক্ষ্মীটি সাশা! আমার জীবনে আজ আপনিই সব থেকে ঘনিষ্ঠ, আপনিই প্রিয়তম, জানলেন।'

বসে বসে তারা আলাপই করে চলল। একটা শীত নাদিয়া কাটিয়ে এসেছে পিটার্সবুর্গে, এখন তার মনে হতে লাগল: সাশার প্রত্যেকটি কথায়, তার হাসিতে, তার সমগ্র সত্তার মধ্যে যেন টের পাওয়া যায় এমন একটা কিছু যা বাতিল হয়ে গেছে, যা সাবেকি, যা সমাপ্তি, এমন কিছু যা সম্ভবত অর্ধ-কবরস্থ হয়ে গেছে।

সাশা বলল, 'পরশুদিন আমি যাচ্ছি ভলগায় বেড়াতে। তারপর সেখান

থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে কুমিস্* নেব। কুমিস্ পরখ করে দেখতে চাই। আমার এক বন্ধু আর তার স্ত্রী যাচ্ছেন আমার সঙ্গে। স্ত্রীটি অপূর্ব। চেষ্টা করছি বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে পড়াশুনা করতে পাঠিয়ে দিতে পারি কিনা। তিনি তাঁর জীবনটাকে ওলট পালট করে দিন — তাই আমি চাই।'

কথার ঝুলি ফুরোলে তারা গেল স্টেশনে। সাশা তাকে চা খাওয়াল আর আপেল এনে দিল কয়েকটা। ট্রেন ছাড়লে সাশা হাসিমুখে রুমাল নাড়তে লাগল, আর নাদিয়া শুধু তার পায়ের দিকে তাকিয়ে টের পেল কী সাংঘাতিক অসুস্থ সে, টের পেল বেশি দিন আর তার বাঁচার আশা নেই।

আজন্ম পরিচিত শহরে নাদিয়া এল দুপুরবেলায়। স্টেশন থেকে গাড়ি চেপে বাড়ি আসতে আসতে রাস্তাগুলি তার বেমানান রকম চওড়া মনে হল, আর বাড়িগুলিকে অত্যন্ত ছোটো আর বেঁটে। রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই, একমাত্র যার সঙ্গে দেখা হল সে হচ্ছে সেই পুরানো ওভারকোট গায়ে পিয়ানোর সুর-বাঁধার জার্মান কারিগর। বাড়িগুলো যেন ধুলোর একটা স্তরে ঢেকে গেছে। ঠাকুমা এখন সত্যি বুড়ি হয়ে গেছেন, কিন্তু আগেকার মতোই স্থূলকায়া সাদাসিধে রয়েছেন। নাদিয়াকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন, মুখখানা তাঁর লেগে রইল তার কাঁধে। যেন উনি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারছেন না। নিনা ইভানভনারও বেশ বার্ধক্য দেখা দিয়েছে, তাঁর চেহারার জৌলুস চলে গেছে, আর যেন সংকুচিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু জামাকাপড় কাঁচুলি তাঁর আগের মতোই আঁটোসাঁটো আর আঙুলে এখনো ঝকঝক করছে হীরের আংটিগুলি।

সারা শরীর তাঁর কাঁপতে লাগল। তিনি বললেন, 'আমার সোনা লক্ষ্মী খুকী আমার!'

তারপর তারা বসে নীরবে কাঁদতে লাগল। সহজেই বোঝা যায় ঠাকুমা এবং মা — দুজনেই স্পষ্ট উপলব্ধি করেছেন যে, অতীত চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে আর কখনো ফিরিয়ে আনা যাবে না। তাঁদের সামাজিক মর্যাদা, তাঁদের পুরানো প্রতিষ্ঠা, বাড়িতে অতিথিদের আমন্ত্রণ করার অধিকার— সব শেষ হয়ে গেছে। নির্ঝঞ্ঝাট, সচ্ছল স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রার মাঝখানে যদি সহসা এক রাত্রিতে পুলিস ঢুকে বাড়িতে তল্লাসী করে আর আবিষ্কার হয়ে

* ঘোড়ার দুধ।

যায় যে গৃহকর্তা কোনো একটা তহবিল তছরুপ করেছেন বা জালিয়াতি করেছেন, এমনি একটা অবস্থা হলে লোকের যে অনুভূতি হয় এঁদেরও ঠিক তাই — তখন অভ্যস্ত নির্ঝঞ্ঝাট সচ্ছল স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রাকে চিরকালের মতো বিদায় দিতে হয়!

ওপরে গেল নাদিয়া। দেখল সেই একই শয্যা, একই জানালা, তাতে টাঙানো একই সাদা সাধারণ পর্দা। জানালা থেকে দেখা বাগানের সেই একই দৃশ্য—সূর্যের আলোয় প্লাবিত, উল্লসিত, জীবনের কোলাহলে মুখরিত। সে তার টেবিলে হাত ছোঁয়াল, বসল, একটি জাগর-স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেল। আহারটি দিব্যি হয়েছে, আহারের পর ঘন সুস্বাদু ক্রিম দিয়ে চা খেয়েছে সে। কিন্তু কী যেন একটা নেই, ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা শূন্যতা, আর সিলিংটা যেন ভারি নীচু। সন্ধ্যায় সে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমুতে গেল, কিন্তু এই উষ্ণ, অতি নরম বিছানাটায় শোয়ার মধ্যে হাস্যকর কী যেন একটা ব্যাপার আছে।

এক মুহূর্তের জন্য এলেন নিনা ইভানভনা। অপরাধীর মতো বসলেন ভয়ে ভয়ে, চোখে চোরা চাউনি নিয়ে।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর, নাদিয়া, কেমন চলছে সব? তুমি সুখী হয়েছ? সত্যি সুখী?'

'হ্যাঁ, মা।'

নিনা ইভানভনা উঠে নাদিয়ার গায়ে আর জানালার ওপরে ক্রুশ আঁকলেন। বললেন, 'দেখতে পাচ্ছ আমি ধর্মভীরু হয়ে উঠেছি। এখন দর্শন পড়ছি জানো, আর ভাবছি, কেবল ভাবছি ... এখন অনেক কিছু আমার কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। আমার মনে হয় প্রিজম্-এর মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখাটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'

'মা, ঠাকুমা সত্যি কেমন আছেন?'

'মনে হয় ঠিক আছেন। তুমি যেদিন সাশার সঙ্গে চলে গেলে, সেদিন ঠাকুমা তোমার টেলিগ্রাম পড়ে ঠায় পড়ে গেলেন মাটিতে। তারপর তিনদিন একেবারে নিশ্চল হয়ে শুয়েছিলেন বিছানায়। তিনদিন পরে তিনি কাঁদতে লাগলেন আর প্রার্থনা করতে লাগলেন। কিন্তু এখন ভালোই আছেন।'

উঠে নিনা ইভানভনা ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন।

চৌকিদারের ঘণ্টা শোনা গেল, 'টিক-টক, টিক-টক।'

নিনা ইভানভনা বললেন, 'বড়ো কথাটা হচ্ছে প্রিজম-এর মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখা। তার মানে আমাদের চেতনায় জীবনটাকে ভাগ করে নিতে হবে তার মৌলিক সরল উপাদানে, সূর্যালোকের সাতটা প্রাথমিক বর্ণ যেমন, সেইভাবে। তারপর প্রত্যেকটি উপাদান আলাদা আলাদা করে অধ্যয়ন করতে হবে।'

নিনা ইভানভনা আরো কী বললেন, আর কখনই বা তিনি চলে গেলেন নাদিয়া জানতে পারল না। সে ঘুমিয়ে পড়েছিল তাড়াতাড়ি।

মে মাস কেটে গেল, এল জুন। নাদিয়ার আবার বাড়ি থাকা অভ্যাস হয়ে গেছে। ঠাকুমা বসে থাকেন সামোভারের পাশে, চা ঢেলে নেন আর দীর্ঘশ্বাস নেন বুক ভরে। সন্ধ্যায় দর্শনের কথা বলেন নিনা ইভানভনা। এখনো তিনি থাকেন পরাধীনের মতো, কয়েকটা কোপেকের দরকার হলে হাত পাততে হয় ঠাকুমার কাছে। বাড়িটা মাছিতে ভরে গেছে, আর সিলিংগুলো যেন ক্রমাগত নীচে নামছে। ফাদার আন্দ্রেই এবং আন্দ্রেই আন্দ্রেইচের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে ঠাকুমা আর নিনা ইভানভনা কখনো বাইরে বেরোন না। নাদিয়া ঘুরে বেড়ায় বাগানে, রাস্তায় রাস্তায়। বাড়িঘরগুলি আর পুরানো মলিন বেড়াগুলো দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে, তার মনে হয় শহরে সবকিছু বহুকাল থেকেই পুরানো হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় সব মরে গেছে অনেক আগে। এখন সে প্রতীক্ষা করছে শেষ সমাপ্তির কিংবা সজীব এবং নবীন কিছুর সূচনার। আঃ, কবে শুরু হবে সেই নূতন, খাঁটি নিষ্কলুষ জীবনটা, যখন একেবারে সোজা সামনে এগিয়ে যাওয়া যাবে, যখন নির্ভীক দৃষ্টিতে তাকানো যাবে নিজের ভাগ্যের সঙ্গে চোখাচোখি, নিজে ঠিক পথে আছি—এই আত্মবিশ্বাস দেখা দেবে, যখন সুস্থ মুক্ত আনন্দিত হয়ে ওঠা যাবে! এ জীবন আসবেই, দ্রুত হোক আর দেরীতে হোক আসতে বাধ্য। একটা সময় আসবে যখন এই ঠাকুমার বাড়ির — যে বাড়িতে চার চারটি চাকরের পক্ষে একমাত্র পথ হল একতলার একটাই ঘরের মেঝেতে নোংরামির মাঝখানে বাস করা — হ্যাঁ, একটা সময় আসবে যখন এরকম একটা বাড়ির অবশেষও আর থাকবে না, যখন এর কথা ভুলে যাবে প্রত্যেকে, যখন এ বাড়ির কথা স্মরণ করারও কেউ থাকবে না। এইসব

চিন্তা-ভাবনা থেকে নাদিয়াকে বিক্ষিপ্ত করে দেয় কেবল ওই পাশের বাড়ির ছোটো ছেলেগুলি। সে যখন বাগানে পায়চারি করে বেড়ায় ওরা তখন বেড়া পিটিয়ে হাসে আর চেঁচিয়ে বলে, 'ওই দেখ বিয়ের কনে!'

সারাতভ থেকে চিঠি এল একখানা, সাশার চিঠি। সে তার অসাবধান, বাঁকাচোরা দ্বিধাগ্রস্ত হস্তাক্ষরে লিখেছে, ভলগায় বেড়ানোর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। কিন্তু সারাতভে সে অসুস্থই হয়ে পড়েছে, গলার স্বর হারিয়েছে, এবং গত একপক্ষকাল হাসপাতালে রয়েছে সে। এর মানে বুঝল নাদিয়া, প্রায় দৃঢ় বিশ্বাসের মতো-একটা অমঙ্গল আশঙ্কা তাকে চেপে ধরল। কিন্তু এই অমঙ্গল আশঙ্কা, এমন কি সাশারই চিন্তা তাকে আর আগের মতো বিচলিত করে না দেখে সে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠল। সে অনুভব করল বাঁচবার একটা অদম্য স্পৃহা, পিটার্সবুর্গে যাওয়ার কামনা, আর সাশার সঙ্গে তার যে বন্ধুত্ব তা যেন অতীতের বস্তু, সে বন্ধুত্ব অন্তরঙ্গ প্রিয় হলেও আজ যেন বহু দূরের বস্তু। সারা রাত সে ঘুমুতে পারল না, সকালে উঠে বসল জানালায়, যেন কান পেতে কিছু শুনছে। আর সত্যি সত্যি গলার আওয়াজ শোনা গেল একতলা থেকে—ঠাকুমা কী যেন বলছেন অসন্তুষ্ট দ্রুতস্বরে। তারপর কেঁদে উঠল কে ... নাদিয়া নেমে এসে দেখল ঠাকুমা ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছেন, তাঁর মুখে অশ্রুর ছাপ। টেবিলের ওপর পড়ে আছে একখানা টেলিগ্রাম।

টেলিগ্রামটি তুলে নিয়ে পড়বার আগে নাদিয়া অনেকক্ষণ পায়চারি করল ঘরের মধ্যে, ঠাকুমার কান্না শুনতে শুনতে। তারপর টেলিগ্রাম দেখল। জানান হয়েছে, গতকাল সকালে, সারাতভে, আলেক্সান্দ্র তিমফেইচ, সংক্ষেপে সাশা, যক্ষ্মায় মারা গেছে।

ঠাকুমা এবং নিনা ইভানভনা মৃতের সদগতি কামনায় উপাসনা করতে গেলেন গীর্জায়, আর নাদিয়া ঘরময় অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালো চিন্তা করতে করতে। সে হৃদয়ঙ্গম করল তার জীবনটা গেছে ওলট-পালট হয়ে, সাশা চেয়েছিল তাই। উপলব্ধি করল সে বড়ো একাকী, নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন, পর, এখানে অবাঞ্ছিত। বুঝল এখানে আর তার কিছু চাওয়ার নেই। অতীতটা ছিন্ন হয়ে গেছে, লুপ্ত হয়ে গেছে, যেন তা পুড়ে গেছে আগুনে আর তার ভস্মরাশি ছড়িয়ে গেছে হাওয়ায় হাওয়ায়। সাশার ঘরে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

বলল, 'বিদায়, বন্ধু সাশা।' জীবন তার সম্মুখে প্রসারিত। একটি নূতন, বিস্তৃত বিশাল জীবন, অস্পষ্ট রহস্যময়। তবু এ জীবন তাকে আহ্বান করল ইসারায়, তাকে টানল সামনে।

জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করতে সে গেল ওপরে। পরের দিন সকালে পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিল, তারপর আনন্দে আর উৎসাহময় সাহসের সঙ্গে শহর ছেড়ে সে চলে গেল— আর আসবে না ফিরে, সে কথা সে নিশ্চিত জানে।

১৯০৩

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে
আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত
হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Foreign Languages Publishing House
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union